ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতি, সুশাসন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

রোবায়েত ফেরদৌস
মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী
সাইফুল হক

দুর্নীতি, সুশাসন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

রোবায়েত ফেরদৌস
মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী
সাইফুল হক

দুর্নীতি, সুশাসন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

রোবায়েত ফেরদৌস
মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী
সাইফুল হক

সম্পাদনা: আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ, টিআইবি

প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০১৫

গ্রন্থস্বত্ব: © ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এবং লেখকগণ

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ০৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

ISBN: 978-984-33-8377-8

মুখবন্ধ

আধুনিক বিশ্বে গণমাধ্যমকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয় যেখানে জনমতের প্রতিফলনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কার্যক্রমের প্রতি জনগণের আস্থা বা অনাস্থার বিষয়টি প্রকাশ পায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণমাধ্যম যেমন সমসাময়িক রাষ্ট্র বা সমাজের দর্পন হিসেবেও কাজ করে, তেমনি জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রকেও সম্প্রসারণ করে থাকে। এ কারণে গণতান্ত্রিক ও সুশাসিত রাষ্ট্রের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে অবাধ, স্বাধীন, শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যম যা সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সাথে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভের দায়িত্ব পালন করবে। তাই ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গণমাধ্যমকে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জবাবদিহিমূলক সরকার ব্যবস্থা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে অন্যতম অংশীজন বিবেচনা করে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতায় পেশাদারিত্বের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৯ সাল থেকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কেন্দ্রিক নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যার মধ্যে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার, প্রশিক্ষণ এবং ফেলোশিপ অন্যতম।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মাধ্যমে যেমন জনসাধারণের সামনে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র উঠে আসে তেমনি এর কারণগুলোও চিহ্নিত হয়। সরকারসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তখন চিহ্নিত অনিয়ম দূরীভূত করতে ও দুর্নীতি দমনে কার্যকর কৌশল প্রণয়ন বা আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে টিআইবি উপলব্ধি করে যে দুর্নীতি, সুশাসন এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এ তিনটি বিষয় নিয়ে গবেষণা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক প্রকাশনা গণমাধ্যমকর্মী ও সাংবাদিকের দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। সেই ভাবনা থেকেই টিআইবি'র এই ছোট্ট প্রয়াস।

আশা করি বইটি সাংবাদিক, গণমাধ্যম কর্মী এবং শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সহায়ক হবে। বইটির লেখক রোবায়েত ফেরদৌস, মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী ও সাইফুল হকসহ এর প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বইটি সম্পর্কে পাঠকের মন্তব্য, পরামর্শ ও সমালোচনা সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

লেখক ভাবনা

"ভক্স পপুলাই ভক্স ডাই"
(জনগণের কণ্ঠস্বরই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর)

- ল্যাটিন প্রবাদ

জ্যামিতির মতো সুশাসন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠারও সহজ সড়ক নেই; সুশাসন, গণতন্ত্র ও দুর্নীতিমুক্ত সংস্কৃতি নির্মাণের পথে রাষ্ট্রের পথচলা কখনোই একরৈখিক নয়, সবসময়ই তা আঁকা-বাকা – দুস্তর আর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ; এ এক দীর্ঘ আর কষ্টকর ভ্রমণ - যার পথে পথে পাথর ছড়ানো। মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আত্মম্ভর আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে রাষ্ট্রকে দু পা সামনে তো এক পা পেছনে চলতে হয়। অগণতান্ত্রিক, দুর্নীতিগ্রস্ত, সামন্ত বা সামরিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে পেছনে মাড়িয়ে রাষ্ট্রকে আয়াসসাধ্য ভ্রমণে নামতে হয় - লক্ষ্য সুশাসন ও গণতন্ত্রে নোঙর গাড়া। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের উপস্থিতি, সুষ্ঠু নির্বাচন, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, সাংবিধানিক চর্চার ধারাবাহিকতা, জবাবদিহিতা, চিন্তার বহুত্ববাদিতা -যা গণতন্ত্রের অন্যতম নিদান-একটি রাষ্ট্রে তার সঠিক চর্চা নিশ্চিত করা মোটেই সহজ কোনো বিষয় নয়। গণতন্ত্রেরই আরেক অনুষঙ্গ মত প্রকাশের স্বাধীনতা; বলা হয় গণতন্ত্রেরে জন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অপরিহার্য।

গণমাধ্যম সরকারের সমালোচনা করবে, সাংবাদিক সরকারের ভুলচুক নিয়ে নিয়ত রিপোর্ট করবে, সেই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বা সেই সাংবাদিকের নিরাপত্তা আবার সেই সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে। অনেকটা সংসদে বিরোধী দলের অবস্থানের মতো, তারা সংসদে সরকারের কাজের সমালোচনা বা বিরোধিতা করবে, তারা যেন সংসদে তা সুষ্ঠুভাবে করতে পারে, সেই সুযোগ সরকারি দলকেই নিশ্চিত করতে হবে। 'আমি তোমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারি কিন্তু তোমার কথা বলতে দেওয়ার জন্য আমি আমার জীবন দিতে পারি'- ভলতেয়ারের এই উক্তিই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মৌল চেতনা; এই চেতনা আর এর চর্চার ভেতরেই লুক্কায়িত থাকে গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা।

তো গণতন্ত্রের পথচলায় গণমাধ্যম কী করতে পারে? গণমাধ্যম নাগরিকদের বহুমুখীণ যোগাযোগের পাটাতনটি তৈরি করে দেয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানে যেহেতু খোলা সমাজ, তাই মানুষকে এখানে বহু স্তরে, বহু পর্যায়ে, বহু ধরনের তথ্য আদান-প্রদান করতে হয়। গণমাধ্যম মানুষের জন্য তথ্যের বৃহত্তর প্রবেশগম্যতা তৈরি হয়। সরকারকে চোখে চোখে রাখার মধ্য দিয়ে 'গণতন্ত্রের প্রহরী'র ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যম জনবিতর্ক উস্কে দেয়, পলিসি এজেন্ডা নির্ধারণ করে, নাগরিক মতামতের ফোরাম তৈরি করে – যেখানে জনগণ রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে তাদের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। দুর্নীতির ওপর সার্চ লাইট ফেলে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাজে স্বচ্ছতা নির্মাণ করে। অমর্ত্য সেন যেমন বলেছেন, রাষ্ট্রে গণমাধ্যম স্বাধীন হলে এমনকি ঠেকিয়ে দেওয়া যায় দুর্ভিক্ষও। অজ্ঞতা ও ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি না করে জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে পারে – সচেতন ভোটাররা তখন খারাপ শাসককে ক্ষমতা থেকে ফেলে দিতে পারে। গণমাধ্যম প্রতিনিয়ত জনপরিসর বাড়িয়ে রাষ্ট্র ও জনগণের মাঝে সেতু গড়ে। প্রতিদিনের রাজনৈতিক ইস্যু/বিতর্ক তুলে ধরে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি পর্যবেক্ষণ করে। বহু স্বার্থ, বহু কণ্ঠস্বর তুলে ধরে। সরকারে কাজের রেকর্ড, তাদের মিশন-ভিশন, নেতাদের পারঙ্গমতা তুলে ধরে। শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণকে সম্ভব করে তোলে।

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ তৈরি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যম তথা সাংবাদিকতার শক্তিকে পদ্ধতিগতভাবে কীভাবে ব্যবহার করা যায় দুর্নীতি, সুশাসন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ক আলোচ্য গ্রন্থটির বিভিন্ন অধ্যায়ে তা তুলে ধরা হয়েছে; বইটি রচনার মূল উদ্দেশ্যও কিন্তু তাই। কর্মরত সাংবাদিক, উন্নয়ন-যোগাযোগ/ উন্নয়ন-সাংবাদিকতার অ্যাক্টিভিস্ট, দুর্নীত ও সুশাসন বিষয়ক গবেষক, গণমাধ্যম শিক্ষক-প্রশিক্ষক এবং সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের চাহিদা-প্রয়োজনকে সামনে রেখে বইটির আধেয়র বিস্তার ঘটানো হয়েছে। তের অধ্যায়ে বিন্যস্ত বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুর্নীতি ও সুশাসন নিয়ে আলোচনা আছে; অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রাথমিক ধারণা মিলবে তৃতীয় অধ্যায়ে; বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চালচিত্র, প্রয়োজনীয়তা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা পারা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে; পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় সাজানো হয়েছে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কর্মপরিকল্পনা, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি নিয়ে; ইন্টারনেট ও অনলাইনে তথ্য খোঁজার কলাকৌশল আলোচিত হয়েছে এর পরের অধ্যায়ে; অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় নথিপত্রের ব্যবহারের জন্য পুরো একটি পরিচ্ছদ বরাদ্দ করা হয়েছে অষ্টম অধ্যায়ে; অনুসন্ধানের বিভিন্ন সূত্র, সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ-জরিপ বিষয়ে ব্যাখ্যা-বয়ান পাওয়া যাবে যথাক্রমে নবম, দশম ও একাদশ অধ্যায়ে; প্রতিবেদন লেখার কলা-কৌশল নিয়ে সাজানো হয়েছে দ্বাদশ অধ্যায়টি; সবশেষে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় আইন ও নৈতিকতার গুরুত্ব নিয়ে আলোকপাত আছে তেরতম অধ্যায়ে। এই বইটিতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রক্রিয়া ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে নতুন একটি মডেলের অবতারণা করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অ্যাকাডেমিক আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। বইটির প্রতিটি অধ্যায়ে তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি সাংবাদিকতার কাজ ও চলমান চর্চা থেকে বাস্তব উদাহরণ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আশা করছি দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনার তাত্ত্বিক কাঠামো ও ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে বইটি সাংবাদিকদের সহায়ক হবে। এছাড়া বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের কাছে খুবই পছন্দনীয় বিষয়। সাংবাদিকতার শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এখান থেকে প্রচুর উপাদান ব্যবহার করতে পারবেন; বিশেষ করে উচ্চতর রিপোর্টিং ও এডিটিং-এর কোর্সে বইটিকে অ্যাকাডেমিক ম্যানুয়ালের মতো করে ব্যবহার করার উপযোগিতাও রয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে রচনা করা হয়েছে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার এমন তাত্ত্বিক-কাম-ব্যবহারিক গ্রন্থ নেই বললেই চলে, আলোচ্য এই বই কিছুটা হলেও সে অভাব মেটাবে।

শেষে বলা যায়, আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যমের কাজ সরকার ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে চোখে চোখে রাখা, তাদের ভুলচুক-ত্রুটিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। মানুষ প্রত্যাশা করে সরকারি, বেসরকারি, বহুজাতিক বা ব্যক্তিমালিকাধীন প্রতিষ্ঠান – যাদের কাজের সঙ্গে জনগণের স্বার্থ জড়িত গণমাধ্যম তাদের কাজের ওপর নজরদারি রাখবে, জনবিরোধী বা কোনো অন্যায়-অনিয়ম, দুর্নীতি হলে সেসবের সমালোচনা করবে। মিডিয়াকে তাই 'আই অন গভর্নমেন্ট' বলে। তবে মনে রাখা দরকার, প্রেসের স্বাধীনতা মানে হাত-পা খুলে যা-খুশি রিপোর্ট করা নয়, প্রকাশিত রিপোর্টকে অবশ্যই সত্য, যথার্থ আর পক্ষপাতহীন হতে হবে। অনেস্টি, অ্যাকিউরেসি আর ফেয়ারনেস হচ্ছে সাংবাদিকতার মৌল তিন নীতি – যার ওপর দাঁড়িয়ে সাংবাদিকতার স্বাধীনতার চর্চাটি হয়ে থাকে। তাই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা জারি রাখার জন্য যেমন সদা সোচ্চার থাকতে হবে তেমনি দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার পথে আমাদেরকে আরো অনেক দূর অবধি যেতে হবে; যেতে হবে গণতন্ত্রকে সতেজ টাটকা আর ফুরফুরে রাখার

তাগিদে। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার এই বড় কাজে দুর্নীতি, সুশাসন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা গ্রন্থটি ক্ষুদ্র ভূমিকা রাখতে সক্ষম হলেও ভাববো আমাদের পরিশ্রম বৃথা যায়নি। বইটি রচনা ও প্রকাশে সহযোগিতার উদার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য টিআইবিকে যারপরনাই ধন্যবাদ; আর বিশেষ কৃতজ্ঞতা টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, পরিচালক ড. রিজওয়ান-উল-আলম ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহানাজ মমতাজ বিথীকে।

রোবায়েত ফেরদৌস
মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী
সাইফুল হক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উৎসর্গ

সকল
অনুসন্ধানী সাংবাদিক
যাঁরা
সত্য অনুসন্ধানে প্রাণ হারিয়েছেন।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১: দুর্নীতি	**৮**
দুর্নীতি	৮
বাংলাদেশে দুর্নীতির চিত্র	৯
দুর্নীতি কীভাবে পরিমাপ করা যায়: ধারণাসূচক	১১
দুর্নীতি প্রতিরোধে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ভূমিকা	১৩
অধ্যায় ২: সুশাসন	**১৫**
সুশাসন	১৫
সুশাসনের নির্দেশকসমূহ	১৬
সুশাসন: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত	১৮
সুশাসনের অন্তরায়সমূহ ও উত্তরণের উপায়	১৮
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের ভূমিকা	২২
অধ্যায় ৩: অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা	**২৬**
অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা	২৬
অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সাধারণ ভিত্তি	২৭
সাদামাটা বনাম অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা	৩৫
অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মিথসমূহ	৩৮
অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের গুণাবলী ও যোগ্যতা	৩৯
অধ্যায় ৪: বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা	**৪৬**
বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চালচিত্র	৪৬
বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা	৪৯
বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বাধাসমূহ	৫০
অধ্যায় ৫: অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া	**৫৪**
পেয়াজের খোসা ছাড়ানো	৫৪
অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ার কাঠামো	৫৫
অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের স্তরসমূহ	৫৮
লার্স মোলারের মডেল-অনুসন্ধানী পরিকল্পনার চেকলিস্ট	৯৪
অধ্যায় ৬: অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ	**৯৮**
অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে গবেষণা	৯৮
অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তথ্য আহরণের কৌশল ও গতিধারা	১০১
অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার	১০২
গতিধারা ও হাতিয়ারের সমন্বয়	১০৩
অধ্যায় ৭: কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা	**১০৪**
কম্পিউটার এসিসটেড রিপোর্টিং	১০৪
সংগৃহীত তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি করা	১০৫
অনলাইনে নথিপত্র খোঁজা	১০৬

অধ্যায় ৮: নথিপত্র	**১১১**
কাগুজে গতিধারা (চিহ্ন-রেখা) অনুসরণ	১১১
নানারকম নথিপত্র	১১৪
নথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	১১৮
নথিপত্র মূল্যায়ন	১১৯
অধ্যায় ৯: মানবীয় সূত্র ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা	**১২১**
সূত্রের নকশাকরণ	১২১
নানারকম মানবীয় সূত্র	১২৩
সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা পরিমাপ	১৩১
সূত্রের গোপনীয়তা রক্ষা	১৩৪
অধ্যায় ১০: অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকার	**১৩৮**
সাক্ষাৎকার	১৩৯
সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য	১৪১
সাদামাটা ও অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের সাক্ষাৎকারের পার্থক্য	১৪২
অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের দশ ধাপ	১৪৩
সাক্ষাৎকারের ৯টি 'আর'	১৭৫
অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের ছয় বিপত্তি	১৭৬
অধ্যায় ১১: অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পর্যবেক্ষণ ও জরিপ	**১৮৭**
পর্যবেক্ষণ	১৮৭
জরিপ	১৮৮
অধ্যায় ১২: অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লিখন কৌশল	**১৯১**
অনুসরণীয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য	১৯১
সুষ্ঠু পরিকল্পনা	১৯৪
অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মৌলিক কাঠামো	২০৫
খসড়া ও পুনঃচিন্তা	২৪৪
সিরিজ প্রতিবেদন লেখা	২৪৭
টেলিভিশনের জন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখা	২৪৭
অধ্যায় ১৩: অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় নৈতিকতা ও আইন	**২৫৬**
অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় নৈতিকতার ইস্যুসমূহ	২৫৮
নৈতিকতার সীমা ও ঢাল	২৭১
অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও আইন	২৭৮
তথ্য অধিকার আইন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা	২৮৬
লেখক পরিচিতি	**২৯২**

অধ্যায়
১

দুর্নীতি

এ অধ্যায়ে থাকছে

- দুর্নীতি
- বাংলাদেশে দুর্নীতির চিত্র
- দুর্নীতি কীভাবে পরিমাপ করা যায়: ধারণাসূচক
- দুর্নীতি প্রতিরোধে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ভূমিকা

দুর্নীতি

সময় এবং স্থানের বিচারে মানবসমাজের সবচেয়ে স্থিত বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম হল দুর্নীতি। দুর্নীতি বর্তমান বিশ্বের প্রধান সমস্যাগুলোর অন্যতম। মানব সভ্যতার ইতিহাস অনুসারে দুর্নীতি সাম্প্রতিক কোন প্রবণতা নয়। তবে মানব সমাজে সবসময় এর অস্তিত্ব থাকলেও সামাজিক ব্যাধি হিসেবে এর আবির্ভাব সাম্প্রতিক কালের। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবর্তন, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, আমলাতন্ত্রের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের ক্রমাগত অবক্ষয় দুর্নীতিকে সর্বব্যাপী করে তুলেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। দুর্নীতির মহামারিতে আজ বিশ্বের শুধু কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল বা দেশ যে আক্রান্ত হচ্ছে এমন নয়। বরং স্থান, কালের সীমা পেরিয়ে দুর্নীতি আজ বিবেচিত হচ্ছে বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে। সাধারণ আইন ও সরকার পরিচালিত সংস্থার পাশাপাশি এ সমাজ ব্যাধিকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রথমে হংকং ও পরে অস্ট্রেলিয়ায় গঠিত হয়েছে স্বাধীন দুর্নীতি দমন সংস্থা। বাংলাদেশেও ২০০৪ সালে গঠন করা হয় দুর্নীতি দমন কমিশন। দুর্নীতির সমস্যাটি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্বব্যাপী এর প্রতিরোধকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)।

দুর্নীতির গতিপ্রকৃতি বহুমুখী। ফলে এর সরল ও সার্বজনীন সংজ্ঞায়ন দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া বিষয়বস্তুগত জটিলতা, সংস্কৃতিগত বৈচিত্রতা এবং সমাজভেদে এর মাত্রা ও প্রকৃতিগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দুর্নীতি মূলত আর্দশ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী বিশেষ ধরনের আচরণ। দুর্নীতির সাথে পেশা, ক্ষমতা সুযোগ-সুবিধা, পদ-পদবি প্রভৃতির অপব্যবহার সংশ্লিষ্ট। দার্শনিক ও নৈতিক মানদণ্ডে নৈতিক দূষণ অথবা আদর্শচ্যুত হওয়া দুর্নীতির নামান্তর। দুর্নীতির সংজ্ঞায়নে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পড়তে হয় বিপাকে। প্রতিদিনকার যাপিত জীবনে দুর্নীতির শিকার হওয়া মানুষের পক্ষে দুর্নীতিকে চেনা যতটা সহজ তার চেয়ে ঢের কঠিন কোন একটি কাঠামোবদ্ধ সংজ্ঞায় একে চিহ্নিত করা। তবে একে কাঠামোবদ্ধ সংজ্ঞায় ফেলে বিচার করার পক্ষে অর্থনীতির পণ্ডিতগণ। অর্থনীতিবিদ A. K Jain এর মতে, "*দুর্নীতি হল আইনের সরাসরি লংঘন করে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ক্ষমতার ব্যবহার*"[১]। অন্যদিকে Shleifer, A. I R. W. Vishny মনে করেন, "*ব্যক্তিগত লাভের জন্য সরকারি কর্তাব্যক্তি কর্তৃক সরকারি সম্পদের বিক্রয় হল দুর্নীতি*।"[২] আবার ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) মনে করে "ব্যক্তিগত লাভের জন্য অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার হল দুর্নীতি।" আলোচ্য তিনটি সংজ্ঞায়

[১] Jain A. K. (2001), "Corruption: A Review", Journal of Economic Surveys 15(1), p.71–121.

[২] Shleifer, A. and R. W. Vishny, (1993), "Corruption", Quarterly Journal of Economics 108, p.618.

একটি বিষয় স্পষ্ট তা হল ব্যক্তিগত স্বার্থে রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার হল দুর্নীতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগত লাভের বিষয়টি আর্থিক মানদণ্ডে রূপান্তরযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, মোটর গাড়ির লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে ঘুষের বিনিময়ে অযোগ্য ব্যক্তিকে লাইসেন্স দেয়া, ব্যক্তিগত পরিচয়ের খাতিরে অযোগ্য ব্যক্তিকে পদোন্নতি প্রদান যেমন দুর্নীতি, তেমনি সরকারি হাসপাতালে সিট পেতে ওয়ার্ডবয়কে বকশিস প্রদানও দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ব্যক্তিগত লাভের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারই কেবল দুর্নীতি নয় বরং সকল ধরনের অব্যবস্থাপনাও দুর্নীতির অস্তিত্বকে নির্দেশ করে। আবার প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ কিংবা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব অন্য কাউকে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে যদি কোন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি নিজের খেয়াল খুশি মতো সরকারি ক্ষমতা বা পদমর্যাদার অপব্যবহার করে কিংবা আর্থিক বস্তুগত বা অন্য যেকোন উৎকোচের বিনিময়ে কোন কাজ করে বা ন্যায়সঙ্গত কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকে তাহলে এরূপ কার্যাবলী দুর্নীতি বলে বিবেচ্য। Social work Dictionary-এর সংজ্ঞানুসারে, "*Corruption is in political and public service administration, the abuse of public gain, usually through bribery, extortion, influence peddling and special treatment given to some citizen and not to other*"- উক্ত সংজ্ঞায় দুর্নীতির মাধ্যম হিসেবে ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ, বলপ্রয়োগ বা ভয়-ভীতি প্রদর্শন, ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি বিষয়কে নির্দেশ করা হয়েছে।

দুর্নীতির কারণে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়; রুদ্ধ হয় স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের পথ। তাই বিশেষজ্ঞরা দুর্নীতিকে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ কারণে, সাম্প্রতিককালে দাতা দেশ ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহ বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণদানের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত আরোপ করছেন তার অন্যতম হল সুশাসন।

বাংলাদেশে দুর্নীতির চিত্র

বাংলাদেশে উন্নয়ন, গণতন্ত্র আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে দুর্নীতি। দুর্নীতির কারণে গণতন্ত্রের মূল প্রতিষ্ঠানগুলো (জাতীয় সততা ব্যবস্থা) অকার্যকর হয়ে পড়ছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে সুশাসন। দুর্নীতির প্রভাব সকল শ্রেণীর মানুষের উপর পড়লেও এর প্রভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচারব্যবস্থা সহ জীবনধারনের জন্য সকল সরকারি সেবা পেতে হচ্ছে ঘুষের বিনিময়ে। তাই সরকারি সেবা থেকে বেশিরভাগ দরিদ্র মানুষ হচ্ছে বঞ্চিত। দুর্নীতি দারিদ্র ও অবিচার বাড়ায়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এমনকি দুর্নীতি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়। বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণে গার্মেন্টস খাতসহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের প্রাণহানির দৃষ্টান্ত যেমন স্থাপিত হয়েছে তেমনি উচ্চ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কর্তৃক টেন্ডারবাজি, জমি-জলাশয় দখল, বাজার সেতু ইত্যাদির ইজারাকে কেন্দ্র করে মৃত্যুর সংখ্যাও কম নয়। ক্ষমতার রাজনীতির মূল উপাদান দুর্নীতি। রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় থাকুক আর বিরোধী দলেই থাকুক দুর্নীতিকে পুঁজি করে নিজেরা লাভবান হয়, ক্ষমতার অপব্যবহার করে। ফলে সহিংস ও অস্থিতিশীল রাজনৈতিক চর্চা সুশাসন ও জবাবদিহিমূলক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দুর্নীতির কারণে দেশ কেবল অর্থনৈতিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে অবক্ষয় সৃষ্টি করে।

বর্তমান বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাপক সংখ্যক ফৌজদারি ও দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহার, দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যকারিতা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার প্রয়াস, দুদকের প্রশ্নবিদ্ধ অবস্থান, প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার রাজনীতিকরণের অব্যাহত ধারা, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ, বর্জনের ফলে ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে দুর্বল সংসদ, দুর্নীতির জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান এবং আইনের উর্ধ্বে থাকার প্রবণতা ইত্যাদি দুর্নীতির চিত্র বিদ্যমান। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ জীবনযাত্রার প্রায় সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি এক মহাবিপর্যয়কর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে। এই সামাজিক ব্যাধির ক্ষতিকর প্রভাবে ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। বর্তমান সমাজে দুর্নীতির প্রভাব এতই শক্তিশালী যে, সাধারণ মানুষ দুর্নীতির শিকার হয়ে এটিকে তাদের নিয়তি বলে ধরে নেয়। স্বাধীনতার চার দশকে আমাদের যা কিছু প্রশংসনীয় অর্জন যেমন- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, জামানত ছাড়াই উন্নয়নমূলক ঋণ কর্মসূচি, শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, নারী শিক্ষার প্রসার ও রপ্তানীমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের প্রসার এর সব কিছুই যেন ম্লান হচ্ছে দুর্নীতির কারণে।

এ সম্প্রসারিত দুর্নীতির বহুবিধ কারণ রয়েছে। কখনও দারিদ্র্যের কারণে, কখনো লোভের বশবর্তী হয়ে, আবার কখনো দুর্নীতি করার সুযোগ আছে কিন্তু শাস্তির আশঙ্কা নেই এরূপ পরিস্থিতির কারণে দুর্নীতির ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। সুশাসনের অভাব দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। শাসনব্যবস্থা স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক না হলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। এছাড়া রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসততা এবং দুর্বলতাও দুর্নীতির কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

নিচের আলোচনায় দুর্নীতির কারণসমূহ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে।

কাঠামোগত/প্রাতিষ্ঠানিক কারণ

- **ক্ষমতার অপব্যবহার রোধকল্পে সরকারি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অনুপস্থিতি:** সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারির ক্ষমতার অপব্যবহারের রয়েছে বিস্তর সুযোগ। ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন তারা, অথচ এই বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি কোন প্রক্রিয়া কার্যকর নয়। নেই কোন আইনের প্রয়োগ।

- **অপর্যাপ্ত এবং অকার্যকর নিয়ম, আইন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ:** দুর্নীতি প্রতিরোধে নেই পর্যাপ্ত আইন, নিয়মনীতি বা প্রতিষ্ঠান। যা আছে তা কার্যকর নয়, নেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ । দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো নানা মহলের প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

- **স্বচ্ছতা, প্রকাশ ও জবাবদিহিতার অভাব:** সরকারি ও বেসরকারি সকল খাতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। রয়েছে তথ্য গোপনের সংস্কৃতি। এ সকল প্রপঞ্চ উৎসাহিত করছে দুর্নীতিকে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও তথ্য প্রকাশের অভাব শুধু দুর্নীতি ঘটতেই সহায়তা করে না বরং তা গোপন রাখতেও ভূমিকা রাখে।

ব্যক্তি ভিত্তিক কারণ

- **উদ্দীপনা, বাধ্যবাধকতা, সুযোগ ও প্রয়োজন:** অনেক সময় ব্যক্তি তার প্রয়োজন বা চাহিদার তুলনায় কম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে তিনি বাধ্য হয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নেন। সরকারি-বেসরকারি সকল খাতেই কিছু কর্মীর বেতনভাতা, সুযোগ-সুবিধা এত কম যে

তারা জীবনধারনের জন্য ন্যূনতম চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। এ সকল ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা অন্যায় পথে তা পূরণের চেষ্টা করেন।

- **লোভ:** বঞ্চিত হয়ে দুর্নীতি করেন কিছু মানুষ আর কিছু করেন লোভের বশবর্তী হয়ে। অর্থ, ক্ষমতা, খ্যাতি ইত্যাদির লোভে এ সকল দুর্নীতি সংঘটিত হয়। মূল্য ও লাভের হিসেব নিকেশ-এ দেখা গেছে, ঝুঁকি বা মূল্যের তুলনায় দুর্নীতির সুবিধা বা লাভ সবসময়ই বেশী। তাই তুলনামূলকভাবে ক্ষমতাধর মানুষরাই এমন দুর্নীতি বেশী করে থাকেন।

- **নাগরিকদের সচেতনতার ও সম্পৃক্ততার অভাব:** দুর্নীতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজের সকল মানুষকেই প্রভাবান্বিত করে। দুর্নীতির কারণে কেউ হয়তো সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হন আবার কেউবা ক্ষতিগ্রস্ত হন পরোক্ষভাবে। কিন্তু জনসাধারণের মাঝে দুর্নীতি বিষয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে। সাধারণ মানুষের মাঝে এক ধরনের অক্ষমতার অনুভূতি/বোধ রয়েছে যা তাদেরকে দুর্নীতি প্রতিরোধে বাধা দেয়। আবার অনেকে সচেতন হলেও দুর্নীতি প্রতিরোধে কি করবেন তা বুঝতে পারেন না। দুর্নীতি প্রতিরোধে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করতে ফোরাম ও চ্যানেলের অভাব রয়েছে।

- **মূল্যবোধের অবক্ষয়:** নীতিশাস্ত্র অনুসারে দুর্নীতি এক অর্থে নৈতিক বিচ্যুতির ফসল। জনগণের মাঝে নীতি-নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ও দুর্নীতির কারণ। মূল্যবোধের অবক্ষয় আজ যেন গ্রাস করেছে পুরো সমাজকে। এর চরম মূল্য দিতে হচ্ছে সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণী পেশার মানুষকে। প্রতিদিন সংবাদপত্রে হাজারো অপরাধের যে চিত্র দেখা যায় তা সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়েরই ফল। মূল্যবোধের অভাবে দুর্নীতি করতে যেমন মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়না তেমনি দুর্নীতিকে অপরাধ বলেও গণ্য করে না। ফলে দুর্নীতিকে স্বাভাবিকত্বের চোখ দিয়ে দেখার প্রবণতাটি বর্তমানে প্রকটরূপ নিচ্ছে। দুর্নীতিবাজদের সামাজিকভাবে বয়কট করার প্রচেষ্টাও তাই ক্রমহ্রাসমান।

- **জীবনযাপন পদ্ধতি:** এদেশে সামাজিক মর্যাদা পরিমাপের ক্ষেত্রে অর্থকে প্রধান মানদণ্ড হিসেবে দেখার একটি সংস্কৃতি বিদ্যমান। সমাজে যার যত অর্থ কিংবা সম্পদ সে-ই তত প্রভাব, ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। সামাজিক প্রতিপত্তি ও মর্যাদা লাভের অসম এই প্রতিযোগিতা সমাজে দুর্নীতি বিস্তারে সহায়তা করছে। সৎপথে অর্জিত অর্থের মাধ্যমে দ্রুত সম্পদশালী হওয়া সম্ভব নয় বিধায় অনেকে দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন।

- **দণ্ড থেকে অব্যাহতির সংস্কৃতি:** আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাব দুর্নীতিকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এদেশে দুর্নীতি করেও আইনের আওতায় না আসা বা এলেও শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সংস্কৃতি বিদ্যমান। ফলে দুর্নীতি বারংবার সংঘটিত হচ্ছে।

দুর্নীতি কীভাবে পরিমাপ করা যায়: ধারণা সূচক

দুর্নীতি পরিমাপে নানা সমস্যা থাকলেও দুর্নীতি পরিমাপের জন্য বিশ্বব্যাপী নানারকম পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয়েছে। দুর্নীতি পরিমাপের জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বেশকিছু পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। এর মধ্যে- গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার, ঘুষ দাতাদের সূচক, দুর্নীতির ধারণা সূচক উল্লেখযোগ্য। দুর্নীতি পরিমাপের জন্য দুর্নীতির ধারণা সূচক (Corruption Perceptions Index) ১৯৯৫ সাল থেকে বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত একটি সূচক যা দুর্নীতি প্রতিরোধে বিশ্বব্যাপী একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই সূচকের মাধ্যমে একটি দেশের রাজনীতি ও

প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে দেশসমূহের দুর্নীতির অবস্থান নির্ণয় করা হয়। এটি একটি যৌগিক সূচক যাকে জরিপের ওপর জরিপও বলা হয়ে থাকে। দুর্নীতির ধারণা সূচক অনুযায়ী দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে ব্যক্তিগত সুবিধা বা লাভের জন্য 'সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার' (abuse of public office for private gain)।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সিপিআই নির্ণয়ে নির্ণয়ন পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতা ও সূচকের সহজবোধ্যতার জন্য নতুন স্কেল ব্যবহার শুরু করেছে। ১৯৯৫ সাল থেকে ব্যবহৃত ০-১০ এর স্কেলের পরিবর্তে দুর্নীতির ধারণার মাত্রাকে ২০১২ সালে ০-১০০ এর স্কেলে দেখানো হয়েছে। এই পদ্ধতি অনুসারে স্কেলের ০ স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণায় সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ১০০ স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণার মাপকাঠিতে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত বা সর্বোচ্চ সুশাসন প্রতিষ্ঠিত দেশ বলে ধারণা করা হয়। যে দেশগুলো এ সূচকে অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের সম্পর্কে কোনো মন্তব্য এ সূচকে করা হয় না।

দুর্নীতির ধারণা সূচক নির্ণয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বোচ্চ পদ্ধতি এবং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এ ক্ষেত্রে যে সকল উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলো হলো: বার্টেলসমান ফাউন্ডেশন, ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, পলিটিক্যাল এন্ড ইকনোমিক রিস্ক কনসালটেন্সি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম, ইউরোপিয়ান ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকসন এন্ড ডেভেলপমেন্ট, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্রিডম হাউজ, গ্লোবাল ইনসাইট, ইনফরমেশান ইন্টারন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর মেনেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট, মাল্টিলেটারেল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, মার্সেন্ট ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ, ওয়ার্ল্ড মার্কেটস রিসার্চ সেন্টার এবং ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট পরিচালিত রুল অব ল ইনডেক্স এর রিপোর্ট। সূচকের তথ্য সংগ্রহে মূলত চারটি ধাপ অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যেমন: উপাত্তের উৎস নির্বাচন, পুনঃপরিমাপ, পুনঃপরিমাপকৃত উপাত্তের সমন্বয় এবং পরিমাপে অনিশ্চিত বিষয় সম্পর্কে যথাযথ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ। জরিপগুলোতে মূলত ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট দেশ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এবং দেশে বসবাসরত দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের ধারণার প্রতিফলন ঘটে থাকে।

সিপিআই-এ ব্যবহৃত তথ্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো হচ্ছে: দুর্নীতি ও ঘুষ আদান-প্রদান; স্বার্থের সংঘাত ও তহবিল অপসারণ; দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগ ও অর্জনে বাধাদান; ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক দলের স্বার্থে সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার; প্রশাসন, কর আদায়, বিচার বিভাগসহ সরকারি কাজে বিধি বহির্ভূত অর্থ আদায় এবং সর্বোপরি এ ধরনের অনিয়ম প্রতিরোধে ও দুর্নীতি সংঘটনকারীর বিচার করতে সরকারের সামর্থ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতা।

খানা জরিপ

বাংলাদেশে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরার জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ খাতওয়ারি ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক নানা প্রকার গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। সেই সাথে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণের জন্য 'দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ' করে থাকে। এই জরিপের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ বিভিন্ন সেবাখাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে যে ধরনের দুর্নীতির শিকার হয় তার ধরন, ব্যাপকতা ও মাত্রা নির্ধারণ করে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়। এই জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য সরকার, নীতি-নির্ধারক ও অন্যান্য

অংশীদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেন তারা জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল ও তার ওপর ভিত্তি করে টিআইবি প্রণীত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই জরিপে নির্ধারিত সেবাখাতে সেবাগ্রহীতা সেবা প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে সেবাপ্রদানকারীর কাছে ঘুষ সহ যে ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হন তার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে দুর্নীতির ধারণাসূচকে মূলত জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের দুর্নীতির প্রকোপ বা ব্যাপকতার ধারণা-নির্ভর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়।

টিআইবি ১৯৯৭ সাল থেকে জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করছে। সবশেষ খানা জরিপটি পরিচালিত ২০১২ সালে যেখানে দেখা যায়, বাংলাদেশের ৬৩.৭% খানা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাত বা প্রতিষ্ঠানের সেবা নিতে গিয়ে কোন না কোনভাবে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এই খাতগুলোর মধ্যে শ্রম অভিবাসন সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত (৭৭%) এর পরেই রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৫.৮%), ভূমি প্রশাসন (৫৯%), বিচারিক সেবা (৫৭.১%), স্বাস্থ্য (৪০.২%), শিক্ষা (৪০.১%), ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (৩০.৯%)। ভৌগলিক অবস্থানভেদে দুর্নীতির মাত্রা গ্রামাঞ্চলে বেশি, যা এ সমস্যার গভীরতা ও ব্যাপকতার উদ্বেগজনক অবস্থার প্রতিফলন। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কৃত প্রাক্কলনে দেখা যায়, বাংলাদেশের খানাগুলো জরিপকৃত সেবাখাতে বছরে প্রায় ২১,৯৫৫.৬ কোটি টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পেছনে খানাপ্রতি বার্ষিক গড় ব্যয়ের ৪.৮% খরচ হয়, তবে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্নীতির প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি (মোট ব্যয়ের ৫.৫%), পক্ষান্তরে ধনীদের জন্যে তা তুলনামূলক কম (মোট ব্যয়ের ১.৩%)। অর্থাৎ এই বিপুল ক্ষতির বোঝা আপেক্ষিক অর্থে দরিদ্র জনগণের ওপরেই বেশি।

দুর্নীতি প্রতিরোধে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ভূমিকা

বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই দুর্নীতি একটি জটিল সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দুর্নীতির কারণে অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা। ফলশ্রুতিতে নড়বড়ে হয়ে পড়ছে সুশাসনের ভিত। সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের প্রতিটি স্তরেই দুর্নীতি দৃশ্যমান। তাই দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকার ও সুশীল সমাজের পাশাপাশি গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে Eigen বলেন, "*Media can play an important public accountability role by monitoring and investigating the actions of those who are granted public trust and who may be tempted to abuse their office for private gain.*"[৩]

Rick Stapenhurst-মনে করেন, দুর্নীতি প্রতিরোধে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা একটি সমাজে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য- দুইভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। দৃশ্যমান প্রভাব বলতে এখানে কোন একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশের পরবর্তী তাৎক্ষণিক প্রভাবসমূহকে নির্দেশ করে। যেমন, ওয়াটারগেট কেলেংকারির ঘটনায় প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পদত্যাগের ঘটনাটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার দৃশ্যমান প্রভাবকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ বা প্রচারের পর এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হওয়া, সরকারি কর্মকর্তাদের চাকুরিচ্যুত বা অপসারন ইত্যাদি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার দৃশ্যমান প্রভাব।

---

[৩] Eigen, P (1999), The Media and the Fight Against Corruption, Transparency International, Presented to the CELAP Conference, San Juan, Puerto Rico.

জনগণের দুর্নীতিবিরোধী চেতনা তৈরির ক্ষেত্রে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতির খবরাখবর প্রকাশের ফলে জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রভাব তৈরি হয়, যা পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজদের ভোটের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে। এছাড়া অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা রাষ্ট্রযন্ত্রের অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে একদিকে যেমন রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশের দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করা সহজ হয় অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পথও উন্মোচিত হয়। এছাড়া অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কারণে বিচারবিভাগ, পুলিশ, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সবসময় জবাবদিহিতার আওতায় থাকে। পাশাপাশি গণমাধ্যমের অনুসন্ধানী দৃষ্টি সবসময় সজাগ থাকলে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহ এমনভাবে তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করে যাতে করে অভিযোগ অবতারণারই কোন সুযোগ সৃষ্টি না হয়। অর্থাৎ দুর্নীতি প্রতিরোধে রাষ্ট্র ও সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানকে চোখে চোখে রাখার মাধ্যমে একটি কার্যকর এবং শক্তিশালী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ভূমিকা অপরিহার্য।

দুর্নীতি প্রতিরোধে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অদৃশ্য প্রভাবকে বুঝতে হলে একটি সমাজে বৃহত্তর অর্থে গণমাধ্যমের ভূমিকা কী তা অনুধাবন জরুরি। বিশেষত আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশ যেখানে স্বাধীনতার ৪২ বছর পরও সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও প্রতিযোগিতা গড়ে ওঠেনি। এ ধরনের পরিস্থিতিতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা আরো দায়িত্বশীলতার সাথে করতে হয়। কেননা, দুর্নীতির বিস্তার ঠেকাতে রাজনৈতিক দল বা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যর্থতার ফলে যে ঘাটতি তৈরি হয়, তা মেটানোর দায়িত্বও নিতে হয় গণমাধ্যমকে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম জনগণকে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক বির্তককে যেমন উৎসাহিত করতে পারে তেমনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুস্থ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রটিও প্রস্তুত করতে পারে। দুর্নীতি প্রতিরোধে সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার যে প্রয়োজনীয়তা তাও পূরণ হতে পারে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মাধ্যমে। তথ্যকে দুর্নীতির উপকারভোগীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা দুর্নীতির অন্যতম প্রবণতা। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দেশের সাধারণ জনগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন না। ফলে ক্ষমতাধর এলিটদেরকে তাদের স্বার্থ হাসিলে খুব একটা বেগ পেতে হয় না। এক্ষেত্রে তথ্যকে মুক্ত করতে হবে ক্ষমতার বলয় থেকে। অর্থাৎ অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণমাধ্যম দুর্নীতির একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। এর মধ্য দিয়ে গণমাধ্যম একটি সমাজ তথা রাষ্ট্রের এমন এক সংস্কৃতি তৈরি করতে পারে যেখানে, দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি জনগণও সবসময় সতর্ক থাকে। তবে এক্ষেত্রে একটি কথা বলা প্রয়োজন, দুর্নীতি প্রতিরোধে গণমাধ্যম কতটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে তা নির্ভর করে গণমাধ্যমের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, আর্থিক সক্ষমতা, তথ্যের অভিগম্যতা, গণমাধ্যম সমূহের মধ্যকার প্রতিযোগিতা এবং সর্বোপরি গণমাধ্যমের ওপর জনগণের আস্থার ওপর।

তথ্যসূত্র

Eigen, P (1999), The Media and the Fight Against Corruption, Transparency International, Presented to the CELAP Conference, San Juan, Puerto Rico.
Jain A. K. (2001), “Corruption: A Review”, Journal of Economic Surveys 15(1).
Shleifer, A. and R. W. Vishny, (1993), “Corruption”, Quarterly Journal of Economics 108.

অধ্যায়
২

সুশাসন

এ অধ্যায়ে থাকছে

- সুশাসন
- সুশাসনের নির্দেশকসমূহ
- সুশাসন: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত
- সুশাসনের অন্তরায়সমূহ ও উত্তরণের উপায়
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের ভূমিকা

সুশাসন

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ অঞ্চলের অনগ্রসরতা এবং অনুন্নয়নের মূল কারণ সুশাসনের অভাব এবং একইসাথে সুশাসন সম্পর্কিত ধারণার অভাব। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে জনপ্রশাসনের উদ্দেশ্য উন্নয়ন, যার পূর্বশর্ত হচ্ছে সুশাসন। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন নীতিমালার ব্যর্থতার পটভূমিতে সুশাসনের ধারণাটি ক্রমশ অধিকতর মনোযোগের দাবি রাখে। আশির দশকের বাজার অর্থনীতি ও কাঠামোগত সমন্বয় ধারণা যখন উত্থাপিত হয়, তখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সুশাসনের ধারণা বেশ জনপ্রিয় হতে থাকে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রশাসনিক পুনর্গঠন পদ্ধতির পূর্ববর্তী ব্যর্থতার কারণে অতীতের সকল ত্রুটি ও বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে শাসন কাঠামোকে জনকল্যাণে নিয়ে আসার জন্য অনেক এনজিও এবং দাতা সংস্থা '৯০ এর দশকে সুশাসন নামক ধারণার অবতারণা ঘটান।

সুশাসন ইস্যুটি বর্তমানে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে দাতাগোষ্ঠী এখন সরকার ও সরকারের বাইরে সকলকে শর্ত দিচ্ছেন যে এটি নিশ্চিত না হলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেবেন। তবে সুশাসন সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে শাসনের ধারণাটি পরিস্কার করা প্রয়োজন। শাসন হচ্ছে এমন একটা পদ্ধতি যা অনুশীলন করা হয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায়, অর্থনীতি ও সামাজিক সম্পদসমূহে। অর্থাৎ অর্থনীতি ও সামাজিক সম্পদসমূহ এবং রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার কাজে রাষ্ট্রের জনগণ যুগ যুগ ধরে শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে আসছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল তাদের 'দ্য এন্টিকরাপশন প্লেইন ল্যাঙ্গুয়েজ গাইড' বইতে সুশাসনকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে যে, "সুশাসন হল অংশগ্রহণমূলক, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ, দক্ষ, দায়িত্বশীল, ক্রিয়াশীল এবং সামুদয়িক একটি ব্যবস্থা যাতে আইনের শাসনের প্রতি সম্মান থাকার পাশাপাশি দুর্নীতির সুযোগ সংকুচিত হবে।"[৮] সহজভাবে বলতে গেলে, কোনো দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ পরিচালনায় কীভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় তারই নির্দেশক সুশাসন। এটি এমন একটি কার্যপ্রণালী যে প্রক্রিয়ায় ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নাগরিক ও নাগরিক সমাজ তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ আইনগত অধিকার ও মত-পার্থক্যসমূহ প্রকাশ ও রাষ্ট্রের সকল ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। V.K. Chopra-এর মতে, "*A system of governance that is able to unambiguously identify the basic values of the society where values are economic, politicl and*

[8] The Anti-Corruption Plain Language Guide (2009), p. 22.

socio-cultural issues including human rights and persue these value through an accountable and honest administration.”[৫]

সুশাসন ছাড়া গণতন্ত্র অর্থহীন ও অকার্যকর, কারণ সুশাসন ও গণতন্ত্র একে অন্যের পরিপূরক। গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হিসেবে যে সব বিষয়কে গণ্য করা হয়, সুশাসন সেগুলোকে নিশ্চিত করে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হল- দেশে আইনের শাসন বিদ্যমান থাকা, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসন পরিচালিত হওয়া, গণমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা, প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলসহ সকল নাগরিকের বাক্ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান, ক্ষমতাসীন দলের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা, একটি কার্যকর সংসদ, বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা ইত্যাদি। অন্যদিকে একটি দেশে সুশাসন থাকলেই কেবল উপরোক্ত বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন সম্ভব। এ কারণে রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের ভিত মজবুত করতে হলে সরকারকে সুশাসন নিশ্চিত করতে হয়। এক্ষেত্রে সরকারকে বিশেষত রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে সরকারের সম্পর্ক কী এবং কেমন করে তা এগিয়ে চলবে তাই সুশাসনের মর্মকথা। একটি দেশের ফলপ্রসূ উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকর সরকার কাঠামো দরকার যা দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে। শুধু তাই নয়, সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে সরকারের কার্য পরিচালনা হতে হয় জবাবদিহিতামূলক এবং গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেক্ষেত্রে সরকারী নীতি নির্ধারণে প্রান্তিক মানুষের অংশগ্রহণের পাশাপাশি জেন্ডার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা বা নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হয়। শাসন প্রক্রিয়ার অনেকগুলো ধারার মধ্যে সুশাসন একটি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে সুশাসনকে বিবেচনা করা হয়। যে কোন শাসন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়গুলো লক্ষ্য করি তা হল, ব্যবস্থাটি অংশগ্রহণমূলক কিংবা কার্যকরী হওয়ার সাথে সাথে জনগণের চাহিদার পর্যাপ্ত সরবরাহকারী কী না। সুশাসন সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের অভিমত হল, সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিকল্প নেই।

শাসন প্রক্রিয়ার সুশৃঙ্খল ও কাঠামোবদ্ধ একটি রূপ হল সুশাসন, যা একটি আদর্শরূপে বাস্তবায়িত হয় এবং যেখানে সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য, জনগণের দায়িত্ব এবং কর্তব্য, রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পর্ক, নেতা-জনতা ও রাষ্ট্রের আন্তঃসম্পর্ক, প্রশাসন, গণমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের নানা দিক বিস্তারিত বিশ্লেষণসহ স্থান পায়।

সুশাসনের নির্দেশকসমূহ

- বাকস্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা
- স্থিতিশীল ও অহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতি
- সরকারের কার্যকারিতা
- মাননিয়ন্ত্রক এর উপস্থিতি
- আইনের শাসন
- দুর্নীতি দমন

[৫] V.K. Chopra (1997), The Mirage of Good Governance: Towards Good Governance, Konark Publishers Private Limited, Delhi, p. 32.

• **বাকস্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা**

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দেশের সরকার গঠনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে জনগণের মতামত, সংগঠন এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন। জবাবদিহিতা এমন একটি ধারণা যেখানে ব্যক্তি, সংস্থা এবং সংগঠন (সরকারি, বেসরকারি এবং সুশীল সমাজ) তাদের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে দায়গ্রস্থ থাকেন। তাত্ত্বিকভাবে তিন ধরনের জবাবদিহিতা রয়েছে: কৌণিক, অনুভূমিক ও উলম্ব।

কৌণিক জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের কার্যক্রমের অধিকতর পর্যবেক্ষণের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবহার করে থাকেন। এই প্রক্রিয়ায় তারা নীতি প্রণয়ন, বাজেটিং, ব্যয় অনুসরণ এবং অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন। অনুভূমিক জবাবদিহিতায় সরকারি কর্মকর্তাগণ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান (যেমন আদালত, ন্যায়পাল, নিরীক্ষণ বিভাগ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক) কর্তৃক পর্যবেক্ষিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন এবং অনুপোযুক্ত আচরণের জন্য তাদেরকে তলব করা যেতে পারে এবং কার্যত শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে। উলম্ব জবাবদিহিতায় একজন সরকারি কর্মকর্তা স্বাধীন সংবাদপত্র, সক্রিয় নাগরিক সমাজ এবং সমতুল্য অন্যান্য চ্যানেলের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলী বা জনগণের নিকট দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিতার মধ্যে থাকেন।

সরকার কী করছে, কেন করছে এর প্রভাবই বা কী এর চূড়ান্ত জবাবদিহিতা জনগণের কাছেই পেশ করার মাঝেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল শক্তি নিহিত। সরকারের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেই যে জনগণকে জবাব দিতে হবে বিষয়টি এমন নয়, তবে জবাবদিহিতার মানসিকতা নিয়েই সরকারের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। এতে করে সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা যেমন লোপ পাবে তেমনি সরকারের প্রতি জনগণের আস্থাও বৃদ্ধি পাবে।

• **স্থিতিশীল ও অহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতি:** সরকার সমর্থিত রাজনৈতিক অস্থিরতা বা সন্ত্রাসবাদ অথবা সরকারকে উৎখাত করতে অসাংবিধানিক শক্তির উদ্ভব যা দেশের স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল এবং সহিংস করে তুলতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে দেশের জনগণের জীবন ও সম্পদ অনিরাপদ হয়ে পড়ে। সুশাসনের বৈশ্বিক নির্দেশক হিসেবে স্থিতিশীল ও অহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিবেচনা করা হয়।

• **সরকারের কার্যকারিতা:** সাধারণত এটির সাথে যুক্ত থাকে জনগণকে সরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থার সেবার মান এবং সেবা নিশ্চিতের পদক্ষেপ।

• **মাননিয়ন্ত্রক এর উপস্থিতি:** সরকারের সেবা প্রদানের বিভিন্ন নীতির ফলাফল ও নীতির কোথায় ঘাটতি রয়েছে তা মান নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে নির্ধারণ হয়। সরকারি সেবা বা সম্পত্তি প্রদানের নীতি গ্রহণের প্রক্রিয়া কতটা বিচক্ষণতার সাথে ও স্বচ্ছতার সাথে গৃহীত হয় এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কতটা জনবান্ধব সেটিও সুশাসনের নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়।

• **আইনের শাসন:** রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত জনগণের নিরাপত্তা, আইনগত সুরক্ষা এবং মানসম্পন্ন বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি আইনের সুষম প্রয়োগ- সবমিলে হয় আইনের শাসন, যা সুশাসনের অন্যতম নিয়ামক। এক্ষেত্রে আইনি কাঠামো যেমন যথার্থ হবে তেমনি এর প্রয়োগও ঘটতে হবে নিরপেক্ষভাবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে একদিকে যেমন মানবাধিকার সুরক্ষিত হবে অন্যদিকে আইনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও আস্থার ক্ষেত্রটিও সুসংহত হবে।

- **দুর্নীতি দমন**

দেশে দুর্নীতি দমনের নিমিত্তে কার্যকর আইন ও আইন প্রয়োগের সংস্কৃতি, দুর্নীতি দমনে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, সরকার ও জনগণের দুর্নীতি প্রতিরোধের স্বদিচ্ছা ও দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপ ইত্যাদি একটি দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম নিয়ামক। দুর্নীতি সহনীয় মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করা সুশাসনের জন্য আবশ্যক।

সুশাসন: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই দেশের স্বাধীনতার একটাই লক্ষ্য ছিল- দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরও অর্জিত হয়নি সেই অভিষ্ট লক্ষ্য। "শুরুতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল গণতন্ত্রের আশাপ্রদ পুঁজি নিয়ে। আশা ছিল মূল পুঁজিতে ক্রমাগতভাবে জমা হবে ক্রমবর্ধমান মুনাফা। কিন্তু সময় গড়িয়ে যেতে দেখা গেলো মুনাফার আশায় গুড়ে বালি; আর মূল পুঁজিও উধাও। অর্থাৎ উধাও বাংলাদেশের গণতন্ত্র।"[৬] কারণ দেশ আজ দুর্নীতির বেড়াজালে আবদ্ধ। পাঁচবার টিআই ধারণা সূচকে দুর্নীতির শীর্ষে অবস্থান করেছে বাংলাদেশ। সন্ত্রাসের কালো থাবা বিস্তৃত হয়েছে সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে। চরমভাবে লজ্জিত হচ্ছে মানবাধিকার। লুটপাট হচ্ছে দেশের সম্পদ। সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত প্রায় অনেকেই দুর্নীতির সাথে জড়িত।

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের টেন্ডার, প্রশাসনে নিয়োগ ও পদোন্নতি নিয়েই প্রায়ই গণমাধ্যমে দুর্নীতির খবর প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়। চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য, তটস্থ ব্যবসায়ী সমাজ। নিরাপত্তাহীনতার জন্য বিদেশী বিনিয়োগকারীরা এদেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত হচ্ছেনা। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা কোনো সরকারই গ্রহণ করেনি। অথচ ক্ষমতায় আসার আগে সবারই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থাকে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি নির্মূল করে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ক্ষমতায় গেলে সেই প্রতিজ্ঞার কথা তারা বেমালুম ভুলে যান। সরকারি অফিসে একটি ফাইলও নড়েনা ঘুষ ছাড়া, সকল পর্যায়ের সাধারণ মানুষ যেন দিনদিন জিম্মি হয়ে পড়ছে।

দেশের সংবিধানে সকল সম্প্রদায়ের সমঅধিকার এবং সমানভাবে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা লাভের অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিপদমুক্ত নয়। সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাহীনতায় তাদের দিন কাটছে। বিভিন্ন সময়ে সংখ্যালঘুদের উৎখাত করে তাদের সম্পত্তি দখলের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সুশাসনের অন্তরায়সমূহ ও উত্তরণের উপায়

ক. প্রাতিষ্ঠানিক সংকট

বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হল প্রাতিষ্ঠানিক সংকট। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ইংরেজরা তাদের স্বার্থ ব্যতীত কোন আধুনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেনি। ১৯৪৭ পরবর্তীতেও কোনো প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়নি। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হলেও ইংরেজি ও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর তৈরি করা দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিয়ে দেশ চলতে হয়েছে। যে কারণে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক

---

[৬] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (২০০৯), গণতন্ত্রের বিজয় হোক, বাংলাদেশে মনুষ্যত্বের সংকট, বিদ্যাপ্রকাশ, পৃ- ৬৬।

সমস্যার বৃত্ত থেকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বরং পুরোনো প্রতিষ্ঠানসমূহকে দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, বাণিজ্যিকীকরণের মধ্য দিয়ে ক্রমশ নিঃশেষ করা হয়েছে।

খ. দারিদ্র ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা

বাংলাদেশে অন্য যেকোন সমস্যার চেয়ে এ সমস্যাটি প্রকট। কবে নাগাদ এ সমস্যার সমাধান হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। মূলত দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত সাধারণ মানুষ তাদের জীবনের নানা চাহিদা পূরণের নিমিত্তে দুর্নীতির ফাঁদে পা দেয়। ফলে সুশাসনের পথ হয়ে যায় রুদ্ধ। কেননা জনগণ যদি সুশাসনের তাৎপর্য উপলব্ধি না করেন তবে সকল ধরনের কর্মপ্রয়াসই ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা না গেলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

গ. রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতা

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন দক্ষ, যোগ্য ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃত্ব। অথচ বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধিকাংশ অদক্ষ, অযোগ্য ও জনবিচ্ছিন্ন। এদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টি হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক, উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির জোরে। নেতৃত্বের চারিত্রিক দুর্বলতা ও আদর্শগত দীনতার ফলে এক দিকে যেমন রাষ্ট্রকাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে অন্যদিকে সুশাসনের পথটিও রুদ্ধ হতে থাকে। নীতির প্রশ্নে অবিচল, নিজের বা অন্যের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়া, অন্যায় নির্দেশ অগ্রাহ্য করা, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রভৃতি চারিত্রিক সবলতার অভাবে দুর্নীতি, অনিয়মের ডালপালা বিস্তার সহজ হচ্ছে। সুতরাং বাংলাদেশের প্রেক্ষিত বিবেচনায় যোগ্য নেতৃত্বের অভাব সুশাসনের অন্যতম অন্তরায়।

ঘ. রাজনৈতিক ঐকমত্যের অভাব

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ঐকমতের প্রশ্নে মারাত্মকভাবে বাধার সম্মুখীন। যার ফলে আজও সমাধান হয়নি বাঙালী জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ দ্বন্দ্ব, স্বাধীনতার জনক-ঘোষক সমস্যা, স্থানীয় সরকার কাঠামোর সুনির্দিষ্ট রূপরেখা, পররাষ্ট্র নীতি পূর্বমুখী না পশ্চিমমুখী হবে এ দ্বন্দ্ব। ফলে দেখা যায়, যখন যে দল ক্ষমতায় আসে তখন সে রাজনৈতিক দল তাদের আর্দশ, নীতি ও সুবিধা অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কাজেই বারবার একই ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতিমালার পরিবর্তন করা হয়। ফলে উন্নয়ন হয় ব্যাহত সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়ে পড়ে অনিশ্চিত।

ঙ. নীতিহীন রাজনীতি

দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ না থাকা দেশের বর্তমান দুরাবস্থার একটি অন্যতম কারণ। একে অপরকে বিভিন্ন সমাবেশে কটুক্তি, অশালীন বক্তব্য প্রদান ও জাতীয় সংসদে অশালীন তর্কে লিপ্ত হওয়া নিত্যনৈমিত্তিক চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও বড় দলগুলোর কথা ও কাজের মিল না থাকার কারণে দেশে অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড উৎসাহিত হচ্ছে।

চ. স্থানীয় সরকার কাঠামোর দুর্বলতা

একটি শক্তিশালী, কার্যকর, দক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার

সুশাসনের অপরিহার্য শর্ত। যে দেশে স্থানীয় সরকার কাঠামো যত শক্তিশালী ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল, সে দেশে গণতন্ত্র ততটাই বিকশিত। অথচ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সময়ের বিবর্তনের সাথে নানা রূপ পরিগ্রহ করলেও কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা এখনও পূরণ হয়নি। আর এর মূলে রয়েছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দুর্বলতা- যেমন অবকাঠামোগত পশ্চাৎপদতা, স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচনে উত্তরাধিকার নীতি, পেশীশক্তির ব্যবহার, স্থানীয় পরিকল্পনার অভাব ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা। সুতরাং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে গেলে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়ানোর বিকল্প নেই।

ছ. আইন-শৃঙ্খলার অবনতি

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকা একান্ত জরুরি। কিন্তু বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে উপস্থাপন তা কোনভাবেই নয়। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির ফলে বিদেশী বিনিয়োগ যেমন নিরুৎসাহিত হচ্ছে তেমনি উন্নয়ন প্রচেষ্টাও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

জ. রাজনীতিতে সন্ত্রাস

দলীয় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য অনেক রাজনৈতিক নেতাই সন্ত্রাসীদের লালন পালন করছে। রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়ে থাকা সন্ত্রাসীরা তাদের বিভিন্ন অপকর্মের জন্য আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে। মাস্তানদের ব্যবহার করা হচ্ছে নির্বাচনে দলের নেতা-কর্মী ও ভোটারদের ভয় ভীতি প্রদর্শন, কেন্দ্র দখল, খুন, অপহরণ ও অগ্নিসংযোগের মত গুরুতর অপরাধমূলক র্কমকাণ্ডে। ফলে চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে জননিরাপত্তা।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় যে বিষয়গুলো গুরুত্ব ও দ্রুততার সাথে করণীয় তা হল:

ক. সংসদকে কার্যকর করা

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংসদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সংসদের মাধ্যমে গঠনমূলক বিতর্ক, সংসদীয় কমিটিকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বিভিন্ন নীতি পর্যবেক্ষণ এবং সরকারী আয়-ব্যয়ের যথাসম্ভব সঠিক হিসাব নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। বিরোধী দলের সদস্যদেরও সংসদীয় কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে রাখা হয়। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যের অনুপস্থিতি এবং কম সক্রিয় ভূমিকা এ ব্যবস্থায় প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হয়।

খ. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সরকারকে জবাবদিহি করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করা সম্ভব। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তারা জনপ্রতিনিধির কাছে দায়বদ্ধ এবং জনপ্রতিনিধিরা নিজ নিজ এলাকার নাগরিকদের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। ইতোমধ্যে সরকারী বিভিন্ন সেবা জনগণের দোঁড়গোড়ায় পৌঁছাতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বিশেষ করে দারিদ্র দূরীকরণ, সুশাসন নিশ্চিত, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়াটা বেশ জরুরী। দক্ষ এবং নিবেদিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে জাতীয় উন্নয়নে কাজ করতে পারে।

গ. সরকারী চাকুরীর সংস্কার

সেবক হিসেবে কাজের মানসিকতা প্রস্তুতের লক্ষে সরকারী চাকুরীর বিধান সংস্কার করা জরুরি।

এই সংস্কার নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরো মানসম্মত করা, হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সেই সাথে সরকারী চাকুরীর আচরণবিধি সঠিকভাবে মানতে যেমন কাজ করবে তেমনি দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং রাজনৈতিক স্বার্থে প্রশাসনের ব্যবহার হ্রাসকল্পে কাজ করবে।

ঘ. দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা

দুর্নীতির কারণে জনগণ সরকারকে অবিশ্বাস করা শুরু করে যা সুশাসনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের দেশ ইতোমধ্যে দুর্নীতির ধারণাসূচকসহ বিভিন্ন জরিপে বিশ্বের অন্যতম দুর্নীতিপরায়ন দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচির ফলাফলেও এ চিত্র ফুটে উঠেছে। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সনদ (ইউএন কনভেনশন এগেইনস্ট করাপসন - UNCAC) এ স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে সনদ অনুযায়ী সকল বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারলে অনেকাংশে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশনকে সকল প্রকার ভয়ভীতি ও করুণার উর্ধ্বে থেকে সত্যিকার অর্থে কার্যকর করতে হবে। এই কার্যকর করণে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সমর্থন থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। দুদক-কে সত্যিকার অর্থে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে কাজ করতে হবে। দুদক আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করে প্রকৃত অর্থে একটি কার্যকর আইনে পরিণত করা এবং আইনের সঠিক প্রয়োগ দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে আবশ্যক।

ঙ. আইন ও বিচার প্রক্রিয়ার সংস্কার

নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকের প্রত্যাশিত ফলের এখনও অনেক ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে বিচারকদের নিয়োগ সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে নিশ্চিত করা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে দক্ষ ও যোগ্য বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়া মেনে চলা, বিচারকার্যে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি হ্রাসে বিচারিক কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা, নিরপেক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি নিশ্চিত করা।

চ. ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন করা

সরকারী সেবা প্রদানে ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়া প্রবর্তন জরুরি। সকল মন্ত্রণালয় ও সরকারী সংস্থার তথ্য অনলাইনে প্রকাশ, আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করা, ই-গভর্নেন্স চালুর জন্য প্রশাসনিক তদারকি ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাতেও ই-গভর্নেন্স চালু ও এর মাধ্যমে সরকারী সেবা নিশ্চিত করা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য।

ছ. প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রগতি

প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রগতির স্বার্থে গুনগত মান বাড়ানোর জন্য নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস করে প্রকল্প পরিচালকদের আরো প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান, মালামাল ও সেবা সঠিক সময়ে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ক্রয় করা, প্রকল্পের সাথে জড়িতদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা জরুরী।

জ. খাতওয়ারি সুশাসন নিশ্চিত করা

খাতওয়ারি দুর্নীতি সুশাসনের একটি বড় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, বিচারিক সেবা, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা, কৃষি, বিদ্যুৎ, ভূমি প্রশাসন, শ্রম অভিবাসন, আইন, প্রশাসন, কর ও শুল্ক, ব্যাংকিং, বীমা, এনজিওসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে খাতওয়ারি দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরি।

ঝ. তথ্য অধিকার

তথ্য অধিকার জনগণের অন্যান্য সকল অধিকার নিশ্চিত করতে পারে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য

অধিকারের ভূমিকা অনন্য। জনগণের তথ্য অধিকার সরকারের কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করতে সাহায্য করে। তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগ, সরকারী - বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, গণমাধ্যমের ব্যাপক বিকাশ এবং তথ্য কমিশনের সফল উদ্যোগের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আন্দোলনের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব। গণমাধ্যম ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের গুণগত প্রশিক্ষণ তথ্য অধিকার নিয়ে জনগণকে সচেতন ও ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে।

ঞ. মানবাধিকার নিশ্চিত করা

জাতি-ধম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান অধিকার নিশ্চিতের লক্ষে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং কার্যকর সংসদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও দেশে ২০০৭ সালের অর্ডিন্যান্স অনুসারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা হয়েছে, কিন্তু অদ্যাবধি সংস্থাটি প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। সফলতার জন্য স্বাধীন ও কার্যকর মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা জরুরি।[৭]

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের ভূমিকা

গণমাধ্যম ও রাষ্ট্রের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আজ অবধি বিস্তর আলোচনা হয়েছে। এধরনের আলোচনার একটি বিশেষ দিক হল, রাষ্ট্র ও সমাজে গণমাধ্যমের ভূমিকা, প্রভাব ও তার ধরন কিরূপ। একথা অনস্বীকার্য যে, গণমাধ্যম আজ একটি বহুমাত্রিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এর রয়েছে নিজস্ব কিছু নিয়ম, বিধি-নিষেধ ও চর্চার ক্ষেত্র। গণমানুষের মাধ্যম বলে গণমাধ্যমের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। যে দেশের গণমাধ্যম যত স্বাধীন সেদেশে গণতন্ত্র ও সুশাসনের ভিত্তি তত মজবুত। *"স্বাধীন সংবাদমাধ্যম হচ্ছে একটি জাতির গণতন্ত্র কতটুকু সুদৃঢ় এবং সমুন্নত তার মাপকাঠিস্বরূপ। স্বাধীনতার পর থেকে গণতন্ত্র, নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র, একদলীয় ব্যবস্থা বা সামরিক শাসনামল সর্বক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমগুলো ভয়ভীতি অথবা পক্ষপাতকে যথাসাধ্য উপেক্ষা করে বস্তুনিষ্ঠ ও গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশের চেষ্টা করেছে।"*[৮]

তথ্যনির্ভর বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। বর্তমানে গণমাধ্যম আমাদের যাপিত জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, চেতনার দিকে যার হাত বাড়ানো। মানুষকে প্রভাবিত করায়, বয়ানের সত্য-মিথ্যায়, জীবনের সাধুতায়-স্বাদহীনতায় গণমাধ্যম এক অর্থে আমাদের অস্তিত্বকে ঘিরে রেখেছে। জনগণকে কেবল তথ্য বা সংবাদ জানানো নয় বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের চলমান ঘটনার সাথে জনগণকে যুক্ত করার মধ্য দিয়েই একটি সমাজ বা রাষ্ট্রে গণমাধ্যম তার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দালাইলামা ২০০৩ সালে ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে উপলক্ষে ওয়ার্ল্ড নিউজ পেপার অ্যাসোসিয়েশনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এই বিষয়টি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেন- *"When there is a problem, a crisis, the media must show that there is an alternative, there is a method, there is potential."*[৯] তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল এমন

---

[৭] Mujeri. Mustafa K, Alam Shamsul (ed.) (2011), Background Papers, Sixth Five Year Plan of Bangladesh 2011-2015, Volume 4, (Cross Sectoral Issues), Dot printing and Packaging, p. 365-373.

[৮] মাসুদ আলম রাগীব আহসান (২০০৫), মত প্রকাশের স্বাধীনতাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, গণমাধ্যম সম্মিলনী, ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে-২০০৫, ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), পৃ-৫৭।

[৯] কে. এম রবিউল ইসলাম ও নীনা শামসুর নাহার, জাতীয় প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকদের নিরাপত্তাঃ কার্যকারণ অনুসন্ধান, গণমাধ্যম সম্মিলনী, ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে-২০০৫, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), পৃ:৬৯

এক রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ, যেখানে আইনের শাসন এখনও কেতাবি প্রপঞ্চ, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা ফ্যান্টাসির নামান্তর, জেন্ডার সমতা মানে ফ্যাশন, জনগণের অংশগ্রহণ যেন নির্বাচনী মৌসুমি বায়ু। এমন বাস্তবতায় দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের গণমাধ্যম জগতের আয়তন এবং ওজন ক্রমশই বাড়ছে। গণমাধ্যমের এই প্রসারিত বাজারে সবাই নিরন্তর চেষ্টা চালাচ্ছে নিজ নিজ অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য। বাজারের এমন প্রতিযোগিতাশীল চরিত্র মানসম্মত সাংবাদিকতার জন্য সহায়কও বটে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমকে প্রকৃত অর্থে তার এই 'ওয়াচডগ' এর ভূমিকাটি দায়িত্বশীলতার সাথে পালন করতে হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথ ভূমিকা পালন করছে কিনা তার ওপর গণমাধ্যমকে সর্বদা নজর রাখতে হয়। কেবল প্রতিদিনকার রুটিনমাফিক সংবাদজ্ঞাপন এই দায়িত্বপালনে যথেষ্ট নয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মাধ্যমে গণমাধ্যম সমাজে প্রতিষ্ঠার ভারসাম্য আনায়নের কাজটি করে থাকে। "রাষ্ট্র এক অর্থে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত রূপ। রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ যথাযথভাবে তার দায়িত্ব পালন করছে কিনা এবং কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে কী করা উচিত তা চিহ্নিত করা গণমাধ্যমের কাজ। জনগণের পক্ষ থেকে গণমাধ্যম সতর্ক দৃষ্টি রাখে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের ওপর। রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি শাখা-নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগ যেমন পরস্পরের কার্যাবলীর ওপর নজর রাখে ঠিক তেমনি গণমাধ্যমের কাজ হচ্ছে এই সব প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী নিরীক্ষণ করা।"[১০]

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের ভূমিকা বিষয়ক আলোচনায় একটি বিষয় বলা প্রয়োজন- তা হল গণমাধ্যম ও সরকারের উপস্থিতি দৃশ্যমান হলেও সুশাসনের বিষয়টি অনেকটাই অনুধাবণগত। অর্থাৎ সুশাসনের উপস্থিতি প্রয়োগ নির্ভর। সুশাসনের প্রকৃতি বা চরিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, অংশগ্রহণমূলক শাসন এর ভিত্তিকে শক্তিশালী করে। এক্ষেত্রে, "সমাজে বিরাজমান আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে গণমাধ্যম জনগণের জন্য জবাব প্রাপ্তির একটি পরিবেশ তৈরি করে।"[১১] অর্থাৎ রাষ্ট্রের সকল স্তরে বিশেষ করে ক্ষমতাধর এলিটদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিয়ে দিয়ে তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় এনে গণমাধ্যম সুশাসনের ক্ষেত্র বিস্তৃতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে গণমাধ্যমের এরূপ ভূমিকা একেবারেই নতুন নয়। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান, দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "*আজ থেকে বহু বছর আগে জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম যখন ক্যালকাটা গেজেট বের করেন, তখন সেই পত্রিকায় লেখা থাকত, আমরা পত্রিকা বের করছি টু ওয়ার্ন ফিউরিয়াসলি অব দেয়ার ফল্টস্ (To warn furiously of their faults)। মানে সরকারের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে ভীষণভাবে হুঁশিয়ার করার জন্যই আমরা পত্রিকা বের করেছি।*"[১২]

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম পূর্বশর্ত হল তথ্যের অবাধপ্রবাহ। তথ্যের প্রবাহ স্বচ্ছ না হলে দুর্নীতি বেড়ে যায়, শক্তির অপপ্রয়োগ ঘটে এবং জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতার জায়গাটি আলগা হয়ে যায়। রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক যে জনগণ, জনগণের মাঝে এই বিশ্বাসে ঘাটতি দেখা দেয়। তাই রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্ম সরকারের গোপন এখতিয়ারে রাখার পুরনো ধারণা আজ অচল। আজকের যুগ তথ্যের অবাধ স্বাধীনতার যুগ। আধুনিক রাষ্ট্রে যেমন দ্রুত যান্ত্রিক

[১০] আলী রিয়াজ (১৯৯৪), অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হ্যান্ডবুক, প্রথম সংস্করণ, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ঢাকা, পৃ- ১১।

[১১] মাহফুজ উল্লাহ (২০০৫), সরকার, সুশাসন ও গণমাধ্যম, গণমাধ্যম সম্মিলনী, ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে-২০০৫, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ঢাকা, পৃ-০১।

[১২] অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান, দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ এপ্রিল ২০০৫।

উন্নতি ঘটছে তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। আজকের জটিল রাষ্ট্রকাঠামো নাগরিককে দেশের শাসন প্রক্রিয়ায় অধিকতর অংশগ্রহণ ও দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে তথ্যে প্রবেশের অধিকারকে শুধু কৌশল হিসেবেই ভাবা হচ্ছে না বরং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অর্থবহ করার হাতিয়ার হিসেবেও বিবেচনা করা হচ্ছে। তাই আধুনিক গণতান্ত্রিক সভ্যতায় এটা সর্বজন স্বীকৃত ব্যাপার যে তথ্য গোপন করে কোন লাভ নেই কিংবা অনেক ক্ষেত্রে গোপনের সুযোগও সীমিত হয়ে আসছে। সুতরাং তথ্য প্রকাশ করা সমাজের জন্য স্বাস্থ্যকর, রাজনীতির জন্যও স্বাস্থ্যকর এবং শেষ বিচারে তা সুশাসনের জন্য সহায়ক। কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে সরকার ভুল ভাবনা দ্বারা পরিচালিত হয়। তথ্যের অবাধ প্রবাহ সরকারকে সেই ভুলের বৃত্ত থেকে বের হওয়ার সুযোগ করে দেয়। তাই গণমাধ্যমকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে তথ্য গোপন করার প্রবণতাকে পরাস্ত করে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রধান এজেন্টের ভূমিকা পালন করতে হয়। সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে ব্যক্তির অধিকারকে প্রাধান্য দিতে হয় সর্বাগ্রে। ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে কিনা; তা কীভাবে সংরক্ষিত হতে পারে- এসব ভাবনা গণমাধ্যমকে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, "জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে সমাজকে তথ্য সমৃদ্ধ করতে হবে। সমাজের সর্বস্তরে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন আইনের মারপ্যাঁচে তথ্যপ্রবাহের গতি ও বিস্তৃতিকে কমিয়ে দেয়া কখনই কাম্য নয়। ভুলে গেলে ভুল হবে যে, সুশাসনের স্বার্থে গণতান্ত্রিক দেশের সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড কখনই সমালোচনার উর্ধ্বে থাকতে পারেনা।"[১৩] গণমাধ্যমকে প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনিয়ম, দুর্নীতি জনগণের কাছে প্রকাশ করতে হয় যা সুশাসনের পথ সুগম করে।

রাজনৈতিক সচেতনতা দিয়েই সরকার ও শাসনের গতি-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সুতরাং গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য গণমাধ্যম একান্ত জরুরি হলেও গণতন্ত্র ও সুশাসন কার্যকর করায় রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানকেই তৎপর হতে হবে। কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এককভাবে এ কাজ করা সম্ভব নয়। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের পাশাপাশি সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানকে নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

তথ্যসূত্র

Mujeri. Mustafa K, Alam Shamsul (ed.) (2011), Background Papers, Sixth Five Year Plan of Bangladesh 2011-2015, Volume 4, (Cross Sectoral Issues), Dot printing and Packaging.

The Anti-Corruption Plain Language Guide (2009).

V.K. Chopra (1997), The Mirage of Good Governance: Towards Good Governance, Konark Publishers Private Limited, Delhi.

আলী রিয়াজ (১৯৯৪), অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হ্যান্ডবুক, প্রথম সংস্করণ, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ঢাকা।

মাসুদ আলম রাগীব আহসান (২০০৫), মত প্রকাশের স্বাধীনতা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, গণমাধ্যম সম্মিলনী, ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে-২০০৫, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), ঢাকা।

মাহফুজ উল্লাহ (২০০৫), সরকার, সুশাসন ও গণমাধ্যম, গণমাধ্যম সম্মিলনী, ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে-২০০৫,

[১৩] রোবায়েত ফেরদৌস ও মীর মোশারফ হোসেন (২০০২), অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট: অবাধ তথ্য-প্রবাহের পক্ষে জনপ্রত্যাশার অন্তরায়, প্রান্তজন, সংখ্যা: ২ জুলাই ২০০২, পৃ-১৩।

ম্যাস্ লাইন মিডিয়া সেন্টার-এমএমসি।
রোবায়েত ফেরদৌস ও মীর মোশারফ হোসেন (২০০২), অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট: অবাধ তথ্য-প্রবাহের পক্ষে জনপ্রত্যাশার অন্তরায়, প্রান্তজন, সংখ্যা: ২ জুলাই ২০০২।
অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান, দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ এপ্রিল ২০০৫।
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (২০০৯), গণতন্ত্রের বিজয় হোক, বাংলাদেশে মনুষ্যত্বের সংকট, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

অধ্যায়
৩

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

এ অধ্যায়ে থাকছে
- অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা
- অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সাধারণ ভিত্তি
- সাদামাটা বনাম অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা
- অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মিথসমূহ
- অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের গুণাবলী ও যোগ্যতা

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

"There is no more important contribution that we can make to society than strong, publicly-spirited investigative journalism."

(*Tony Burman, editor-in-chief, CBC News*)

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার আলেচনায় এর সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে বহুবিধ মত ও প্রকৃতি রয়েছে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কী- এর অর্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কোনটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নয় প্রাথমিকভাবে তা নির্ণয় করা যৌক্তিক। কারণ সাংবাদিক মাত্রই নিজেকে অনুসন্ধানী সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দিতে চান এবং তার কাজকে অনুসন্ধানী কাজ বলে পরিচয় দিতেই তিনি আনন্দবোধ করেন। সেদিক থেকে সাংবাদিকতার আলোচনায় সব ধরনের সাংবাদিকতাকেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হিসেবে আখ্যায়িত করার একটি রীতি প্রচলিত রয়েছে। এক্ষেত্রে যুক্তি হলো, একজন সাংবাদিক মাত্রই রুটিন মাফিক তথ্যের অনুসন্ধান করে থাকেন কিংবা তথ্য খননের কাজে লিপ্ত থাকেন। তারা প্রশ্ন করেন, তথ্য জোগাড় করেন এবং মোটের উপর 'অনুসন্ধান' করেন। এ কারণে Bruce Itule ও Douglas Anderson বলেছেন, "*All reporters are investigators who are trained to ask questions, uncover information and write the most complete stories possible.*"[১৪] কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা কি তাই? বোধ করি এখানেও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। প্রতিদিনকার সাংবাদিকতায় একজন সাংবাদিক আসলে তথ্যের কতটুকু গভীরে প্রবিষ্ট হন কিংবা তথ্যের খননকার্যে কতটুকু গভীরে যাবার সুযোগ পান? যে প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে তারা সত্যের খোঁজ করেন সেগুলোই বা কতটুকু গভীরতা সম্পন্ন? এবং যে তথ্যগুলো তারা জনসমক্ষে তুলে ধরেন তার মধ্যেও কতটুকু মৌলিকত্ব বা সম্পূর্ণতা থাকে এ বিষয়গুলো নিয়ে ভাবনার সুযোগ আছে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কোনভাবেই প্রতিদিনকার সাদামাটা বা সরল সাংবাদিকতা নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি কিছু। তাই Alan Rusbridger মনে করেন, "*All journalism is investigative to a greater or lesser extent, but investigative journalism - though it is a bit of tautology– is that because it requires more, it's where the investigative element is more pronounced.*"[১৫]

শব্দগত দিক থেকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ইংরেজি হলো 'Investigative Reporting' এই 'Investigative' শব্দটি এসেছে ইতালীয় শব্দ 'Investigare' যার মূল হলো ল্যাটিন শব্দ 'vestigium'। এই 'vestigium'-এর অর্থ হলো পদচিহ্ন বা গতিধারা (footprint/track)।

---

[১৪] Bruce Itule and Douglas Anderson (2007), News Writing and Reporting for Today's Media, 7th edition, McGraw Hill New York U.S.A., p. 397.

[১৫] Hugo de Burgh (2008), Investigative Journalism: Context and Practice, Routledge, p. 17.

আর 'Reporting' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'reportare' যার অর্থ হলো কোন স্থান থেকে কোন কিছু বের করে আনা। অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং বলতে কোন গতিধারা বা পদচিহ্ন অনুসরণ করে কোন স্থান থেকে কোন কিছু উদঘাটন করে আনাই অনুসন্ধানী রিপোর্টিং। সাধারণ দৃষ্টিতে যে তথ্যের নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না তাকে বের করে আনাই এ ধরনের প্রতিবেদনের মূল উদ্দেশ্য। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির খবর ফাঁস করে দুনিয়া জুড়ে খ্যাতি পাওয়া সাংবাদিক কার্ল বার্নস্টাইনের মতে '*সব ভাল রিপোর্টিংই অনুসন্ধানী রিপোর্টিং*'।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে অবশ্য অনুসন্ধানী রিপোর্টিংকে মাকরেকিং রিপোর্টিং (Muckraking Reproting) বলা হত। মাকরেকার ছিল লেখক জন বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' বইয়ে বর্ণিত দুষ্ট চরিত্রের মানুষ, যেখানে বলা হয়েছে, "*the Man with the Muckrake . . . who could look no way but downward.*" ১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট এক বক্তৃতায় আজকের রাজনীতিবিদদের মতই সাংবাদিকদের ব্যাপারে রাগ প্রকাশ করে তাদের মাকরেকার বলে ডেকেছিলেন। সেই থেকে পরবর্তী কয়েক দশক সাংবাদিকরা খুশি মনেই তাদের এই কৌশলটিকে মাকরেকিং রিপোর্টিং বলেছেন। প্রধানত ম্যাগাজিন আর বইকে বাহন করে মাকরেকাররা সরকারের দুর্নীতি, করপোরেশনগুলোর অসদুপায় অবলম্বন, শিল্প কারখানায় কাজের অসহনীয় পরিবেশ– এর মতো বিষয়গুলো মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন। অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের মাকরেকার বলা হত (Muckraker) রূপকঅর্থে; কারণ তারা সমাজের ময়লা, আবর্জনা সরানোর কাজ করতেন। তাদের প্রতিবেদনের বিষয় হিসেবে স্থান পেত দুর্নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম, অস্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ, বস্তিসমূহে দারিদ্রতা ইত্যাদি। ১৯০৪ সালে লেখক লিংকন স্টেফেন্সের 'দি শেম অব দ্য সিটিস' নামক বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এ ধারার সাংবাদিকতার শুরু হয়েছিল। এতে আমেরিকার কয়েকটি শহরে সরকারী দুর্নীতির বিবরণ তুলে ধরা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী অর্থনৈতিক মহামন্দা মাকরেকিং সাংবাদিকতার ধারণাটিকে স্তিমিত করে দেয়। মাকরেকিং রিপোর্টিং সম্পর্কে বলা হয়েছে, "*Muckraker, any of a group of American writers, identified with pre-World War I reform and exposé literature. The muckrakers provided detailed, accurate journalistic accounts of the political and economic corruption and social hardships caused by the power of big business in a rapidly industrializing United States.*"[১৬]

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মত দেখা যায়। অনেকেই অনেক ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। সেজন্য সরাসরি অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের সংজ্ঞা দেয়ার চেয়ে এর বৈশিষ্ট্য বা মৌলিক ভিত্তির ওপর আলোচনা করা অনেক বেশি যৌক্তিক। অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের সাধারণ ভিত্তিগুলো আলোচনা করলে এর প্রকৃতি ও চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সাধারণ ভিত্তি

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা যা নয়:

- প্রতিদিনকার/ নিত্যদিনের সাংবাদিকতা
- লিক সাংবাদিকতা
- একসূত্র নির্ভর সাংবাদিকতা
- তথ্যের অপব্যবহার
- পাপারাজ্জি সাংবাদিকতা

[১৬] http://www.britannica.com/EBchecked/topic/395831/muckraker.

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হল:
- অতন্দ্র প্রহরী সাংবাদিকতা
- আইন-কানুন ভঙ্গের উন্মোচন
- ক্ষমতাধরদেরকে জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় আনয়ন
- জনস্বার্থে দুর্নীতির মুখোশ উন্মোচন

ক. নিত্যদিনের রিপোর্টিং নয়; গভীরতম প্রতিবেদন

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং উপরিতল বা Surface Reporting নয়। সাংবাদিকরা নিত্যদিন যেসব সংবাদ তৈরি করেন বা 'দিনে আনি দিনে খাই' সাংবাদিকতার সাথে এর বিস্তর ফারাক আছে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উৎস ঘটনার গভীরতম প্রদেশে। একজন সাংবাদিক যখন কোন সাদামাটা প্রতিবেদন তৈরি করেন তখন তিনি দু-চারজনের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে কথা বলেন আর বড়জোর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এক্ষেত্রে অফিসিয়াল ভাষ্যকে সাংবাদিকরা প্রায়ই সংবাদ হিসেবে বিবেচনা করেন। কিন্তু এখানে ঘটনার গভীরে গিয়ে অনুসন্ধানের কোন বালাই থাকে না। তাই "Daily news reporting is seldom investigative, it is mostly reactive."[১৭] পক্ষান্তরে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হলো সত্যের খোঁজে গভীর খনন। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় প্রচলিত প্রাত্যহিক রিপোর্টিংয়ের কলাকৌশলগুলো আরো ঐকান্তিক, আরো দুধর্ষ, আরো দুর্দমনীয়ভাবে প্রয়োগ করা হয়। সাদামাটা রিপোর্টিংয়ের চেয়ে অনেক নিগূঢ়ভাবে চালানো হয় তদন্ত-তল্লাশি। Sheila S. Coronel বলেছেন, "*Investigative reporting, however, does not just report the information that has been given out by others - whether government, political parties, companies or advocacy groups. It is reporting that relies on the journalist's own enterprise and initiative. Investigative reporting requires journalists to go beyond what they have seen and what has been said, to unearth more facts and to provide something new and previously unknown.*"[১৮]

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সাথে লিক সাংবাদিকতার (Leak Journalism) পার্থক্য আছে। সাধারণত সরকারি কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী প্রতিবেদন তৈরি করাকে বলা হয় লিক সাংবাদিকতা। কিন্তু অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সরকারী কর্তৃপক্ষের ভাষ্যর উপর নির্ভর করে রচিত হতে পারে না। কারণ একজন দই বিক্রেতা যেমন কখনও বলে না তার দই টক, তেমনি সরকারী ভাষ্য কখনই সরকারি অফিসের অনিয়ম বা দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে না। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি অবশ্যই সাংবাদিকের নিজস্ব অনুসন্ধানের ফল হবে। অর্থাৎ অন্য কারো মাধ্যমে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে (যেমন সরকারী তদন্ত এজেন্সি) তা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হিসেবে বিবেচিত হবে না। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রতিবেদক কেবলই যা দেখেন কিংবা সরকার, রাজনৈতিক দল, প্রতিষ্ঠান অথবা এডভোকেসি দলসমূহের পক্ষ থেকে যে তথ্যসমূহ প্রকাশ করা হয় তার ভিত্তিতেই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন না। বরং সাংবাদিকের নিজ উদ্যোগ ও উদ্যমের ভিত্তিতে সাংবাদিকতার এ ধারায় প্রতিবেদন রচিত হয়। এ কারণে অনুসন্ধানী সাংবাদিককে সম্পূর্ণ নতুন ও পূর্বে জনসমক্ষে আসেনি এমন সংবাদ পরিবেশনের

[১৭] Sheila S. Coronel (2009), Digging Deeper: A Guide for Investigative Journalists in the Balkans, Sarajevo, Balkan Investigative Reporting Network, p. 13.
[১৮] Ibid, p 14.

জন্য খালি চোখে যা দেখা বা শোনা যায় তার বাইরে গিয়ে সত্যানুসন্ধান করতে হয়। এজন্য Sheila S. Coronel বলেছেন, "*Leak journalism is not investigative reporting. An investigation can begin from a leak, but journalists must do their own digging, verify information and provide context. Unless they do so, their reports will be distorted and incomplete. They will also be allowing themselves to be used to manipulate public opinion and to advance the agenda of individuals, rather than the public interest.*"[১৯]

প্রকৃতপক্ষে দৈনিক সংবাদ কাভারেজের যে বাস্তবতা তাতে অনুসন্ধানের সুযোগ এক অর্থে নেই বললেই চলে। নিত্যদিনের সংবাদ কাভারেজ নীতি অনুযায়ী আসলে সংবাদ হিসেবে আমরা যে বিষয়সমূহকে বিবেচনা করি তার অধিকাংশই ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক ভাষ্যকেন্দ্রিক। পাশাপাশি এই ভাষ্যের প্রতিক্রিয়ায় অন্যপক্ষের কী মতামত তাতেও দৈনিক সংবাদের খোরাক আছে। উদাহরণস্বরূপ বহুল আলোচিত পদ্মা সেতুর বিষয়ে সরকারের অবস্থান নিয়ে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য যেমন দিনের সংবাদ হিসেবে বিবেচিত হয় তেমনি উক্ত ভাষ্যে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে দলের মহাসচিবের বক্তব্য সংবাদ হয়ে ওঠে। এছাড়া প্রতিদিনকার সাংবাদিকতা মূলত ঘটনানির্ভর যা সাংবাদিকরা প্রত্যক্ষ করেন কিংবা সে সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করেন। যেমন: ট্রেন সংঘর্ষে পাঁচজনের মৃত্যু, মানবতাবিরোধী অপরাধে সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে শাহবাগে তারুণ্যে গণজোয়ার, কিংবা সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যায় জড়িত থাকার সন্দেহে দারোয়ান গ্রেপ্তার ইত্যাদি। উক্ত উদাহরণসমূহের কোনটিই যা দেখা হয়েছে কিংবা যা শোনা হয়েছে, এর উর্ধ্বে নয়। অধিকংশ ক্ষেত্রেই একজন সাংবাদিক যা ঘটেছে অথবা জনগণ যা জানছে সেই বিষয়ে সাড়া দেন। খুব কম ক্ষেত্রেই একজন সাংবাদিক নিজ সিদ্ধান্তে কোন বিষয় অথবা কোন ব্যক্তিকে কাভার করবেন তা ঠিক করেন। প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান গণমাধ্যম জগতে তাই রুটিন মাফিক সংবাদ সম্মেলন, যে তথ্য নিজে নিজেই তার ভাঁজ খুলছে অথবা সূত্রের মাধ্যমে খবর পেয়ে প্রতিবদেক ঘটনাস্থল থেকে যা সংগ্রহ করে আনছেন তার ওপর ভিত্তি করেই নির্মিত হচ্ছে সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও অনলাইন সাংবাদিকতার পরিসর। তাই প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদমূল্য ও উপাদান বিবেচনা করে, তথ্যের নির্ভুলতা যাচাই বাছাই করে, সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমের নীতি অনুসারে একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে ঘটনাকে স্থাপন করেই আবর্তিত হচ্ছে সাংবাদিকতার দিন-রাত্রি। এখানে প্রতিবেদকের দায়িত্ব কেবলই তথ্যের নির্ভুলতা ও যথার্থতা যাচাই করে একটি অসামঞ্জস্যশীল কাঠামোকে পাঠক-দর্শকের সামনে তথ্যকে তুলে ধরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

খ. দীর্ঘমেয়াদী গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হলো এক ধরনের গভীরতর তথ্য উন্মোচন প্রক্রিয়া। এ ধরনের রিপোর্টিং দীর্ঘ সময় ধরে সম্পন্ন করতে হয়। যে কোন গভীরতম প্রতিবেদনে দীর্ঘমেয়াদী গবেষণার দরকার হয়। অনুসন্ধানী রিপোর্টিং খুব বেশি সংখ্যায় অর্থনৈতিক দুস্কর্ম বা বেআইনি কর্মকাণ্ডগুলোকে উদঘাটিত বা উন্মোচিত করে। কিন্তু এর বাইরে, জনদৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি এমন জনগুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়, প্রবণতা বা পরিস্থিতিকে কঠোর গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরার কাজটিও এ ধরনের সাংবাদিকতায় করা হয়। এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরিতে সামাজিক গবেষণা পদ্ধতিগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরির জন্য কখনও কখনও প্রতিবেদককে সপ্তাহ, মাস এমনকি বছরব্যাপী কাজ করতে হয়।

---

[১৯] Ibid, p 14.

গ. ইস্যু বা বিষয়ের সঙ্গে জনস্বার্থ জড়িত

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য হলো এ ধরনের প্রতিবেদনের বিষয় অবশ্যই জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট হবে। কোন একটি পক্ষ এখানে জড়িত যারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে জনগণের কাছে বিষয়টি গোপন করে থাকে। অর্থাৎ অনুসন্ধনী রিপোর্টিং এমন এক কৌশল যার মাধ্যমে জনস্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট লুকানো সত্য অনুসন্ধানে ব্রতী হন প্রতিবেদক। উলম্যান এবং কলভার্টের মতে বিখ্যাত ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারির ঘটনার মধ্যেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ধ্রুপদী সংজ্ঞাটি নিহিত রয়েছে। তাদের ভাষায়, "*প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও তার সহযোগীদের কর্মকাণ্ডের সাথে মার্কিন জনস্বার্থের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। যদিও প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও তার সহযোগীরা বিষয়টি জনগণের কাছে গোপনের প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত প্রতিবেদকদ্বয়ের উদ্যম ও উদ্যোগের ফলে সত্য প্রকাশ পেয়েছে।*"[২০] অনুসন্ধানী সাংবাদিককে জনস্বার্থের অভিভাবক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, অনিয়ম, ব্যর্থতা প্রকাশের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিক ক্ষমতাধরদের তাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করে তোলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার Forum for African Investigative Journalism এর কো-অর্ডিনেটর Evelyn Groenink বলেছেন, "*[Investigative journalism is the] proactive pursuit of a complete picture of important developments in a community and society in the public interest, as opposed to a narrow focus on incidental scandal or exposure… The pursuit needs to be proactive to counter the problem of waiting for tip offs from informers with grievances or agendas.*"[২১] জনস্বার্থ বলতে কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে যারা ওই নির্দিষ্ট তথ্যটি না জানার কারণে তাদের ক্ষতি হবে এবং বিপরীতভাবে ওই তথ্যটি জানার ফলে ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা গোয়েন্দার মতই গোপন তথ্য বের করে আনে। কিন্তু অনুসন্ধানী রিপোর্টিং অবশ্যই একজন গোয়েন্দার কাজের চেয়ে বেশি কিছু। কারণ একজন সাংবাদিক তার অর্থনৈতিক লাভ বা পেশাগত সুবিধার জন্য গোপন তথ্য বের করে আনেন না; বরং তিনি জানেন ওই তথ্যগুলো দেশ ও জাতির জন্য কিংবা মানুষের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এসব তথ্য জানার অধিকার জনগণের আছে। Sheila S. Coronel বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, "*Like private detectives, investigative reporters uncover hidden or secret information. But investigative reporting is more than just private detective work. Investigative journalists uncover information because they know that it is crucial to the public, and because the public has a right to know of it. Investigative reporters do not reveal secret facts merely for the thrill of doing so, or the prospect of winning an award. They do not dig for dirt just to sell newspapers or to make profits for television networks. Their work is motivated by a desire to expose wrongdoing, so the public may know about it. They also hope that once the wrongdoing is publicised, it will eventually be corrected.*"[২২] তথ্য যখন প্রকাশ্য থাকে না, তথ্য যখন থাকে কোন গোপন খুপড়ির মধ্যে আবদ্ধ, আবৃত তথ্য তখনই অনুসন্ধানের প্রয়োজন পড়ে।

[২০] John, Ullman and Jan, Colbert (1991), The Reporter's Handbook: an Investigator's Guide to Documents and Techniques, New York: St. Martin's Press, p. vii.

[২১] Derek Forbes (2005), A watchdog's guide to investigative reporting: A simple introduction to principles and practice in investigative reporting, Konrad Adenauer Stiftung Media Programme, Johannesburg, Republic of South Africa, p. 2.

[২২] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p 24.

ঘ. প্রহরী সাংবাদিকতা

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কোন পাপারাজ্জি সাংবাদিকতা নয়। এটি কোন ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তি জীবনের ওপর আলোকপাত করে না। বরং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, জনগণ প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার এসব নিয়েই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচিত হয়। সে কারণে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হলো 'ওয়াচডগ জার্নালিজম' বা 'প্রহরী সাংবাদিকতা'। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির অপব্যবহার, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে। এ চিত্র তুলে ধরে দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষস্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপকর্ম, দুর্নীতি কিংবা ভুলভ্রান্তি প্রকাশ পায়। এর মধ্য দিয়ে অপরাধী এবং তার শিকার সাধারণ মানুষ সবাই সচেতন হতে পারে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সরকারি অফিস প্রভৃতি ক্ষেত্রে নানা ধরনের দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার সংঘটিত হয়ে থাকে। এসব অঙ্গনে প্রতিনিয়ত জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয়। আর যেসব ক্ষেত্রে অনুরূপ জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয় সেসব ক্ষেত্র বা অঙ্গনই হলো অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতার প্রধান চারণভূমি। বস্তুতপক্ষে আইনের বরখেলাপ, তহবিল তসরূপ, অসাধুতা, স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক মিথ্যাচার, নিপীড়নমূলক কাজ অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রত্যয়গত আলোচনায় জনপরিচিত ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্যের উন্মোচনের সাথে নৈতিকতা ও জনস্বার্থ পারস্পরিক সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। যেমন: একজন বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ বা রাজনীতিকের প্রণয়ের বিষয়টি জনগণ জানুক এটি তারা চান না। তবে কোন সাংবাদিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা উন্মোচন করলেন এ পরিস্থিতিতে বিষয়টিকে প্রকৃত অর্থে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হিসেবে বিবেচনার সুযোগ আছে কিনা তা খোলাসা করা প্রয়োজন। যে তথ্যের উন্মোচনের মাঝে পরিস্কারভাবে জনস্বার্থ নিহিত আছে তা যতই ব্যক্তিগত হোক না কেন তা প্রকাশ করতেই হবে। অর্থাৎ জনস্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদকের আপোষের সুযোগ নেই। যেমন: অনুসন্ধানের ভিত্তিতে একটি মার্কিন সংবাদপত্র একবার একজন ক্যাথলিক ধর্মযাজক কর্তৃক শিশু যৌন নিপীড়নের খবর প্রকাশ করেছিল। এ উন্মোচনের সাথে সরাসরি জনস্বার্থ আছে বলে সংবাদপত্রটি মনে করেছিল। কারণ ক্যাথলিক চার্চের কর্তাব্যক্তিরা ঐ ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার পর অভিযুক্ত পাদ্রীর বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা না নেয়ায় বিষয়টি জনস্বার্থের অংশ হয়ে পড়ে।

ঙ. গোপনীয় তথ্য বের করে আনা

"[The] type of journalism which thrives on exclusive stories through digging [up] information from government, non-governmental organisations and the private sector to do stories in public interest."
(Benedict Tembo, Executive Member of Press Association of Zambia, Zambia)

লুকানো তথ্যের পেছনে ছোটাই অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের কাজ। সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠান অনেক সময় জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য জনসাধারণকে জানাতে চায় না। অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের কাজ হচ্ছে এসব গোপনীয় তথ্য উন্মোচন করা। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কিংবা প্রতিষ্ঠান গোপন রাখতে উদগ্রীব- এমন কোনো জনস্বার্থযুক্ত ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল-পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগে তথ্য বের করে আনাই হলো অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। সেজন্য বলা হয়, বন্ধ মুখ ও রুদ্ধ দুয়ার খোলার এক মোক্ষম এবং নিরন্তর প্রয়াসের নাম অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা।

দুইবারের পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী সাংবাদিক রবার্ট গ্রিন মনে করেন, "*Uncovering something somebody wants to keep a secret.*"[২৩] *William Gaines* যথার্থই বলেছেন, "*It often produces a story that may be contrary to the version given by government or business officials who might want to conceal the truth.*"[২৪] *Rucker Brywee* বলেছেন, "*Investigative Reporting means to bring to light deeds and facts that principal information sources would prefer curtained.*"[২৫]

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নিয়ে ডেভিড এন্ডারসন ও পিটার বেনজামিনের ধারনা রবার্ট গ্রিনের কাছাকাছি। তাদের ভাষায়, "Simply the reporting of concealed information."[২৬] ক্ষমতাসীনরা কিভাবে আইনের ব্যত্যয় ঘটায় কিংবা আইনের বাইরে গিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাই বের করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নিয়ে বিশ্বব্যাপী কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠান Investigative Reporters and Editors (IRE) এর সংজ্ঞা হলো, "*It is the reporting, through one's own work product and initiative, matter of importance which some persons wish to keep secret.*"[২৭] জিম্বাবুয়ের Financial Gazette-এর সাবেক বার্তা সম্পাদক Dumisane Ndlela বলেছেন, "*Investigative journalism would be going well beyond the obvious facts of a story, digging … for facts that would normally be kept hidden from the public domain.*"[২৮]

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুসন্ধানী সাংবাদিক ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির মুখোশ উন্মোচন করেন। তাদের কৃতকর্মের গোমর ফাঁস করে দেন তিনি। Sheila S. Coronel বলেছেন, "*Investigative journalists 'strike through the mask' - they go beyond what is publicly proclaimed and expose the lies and hypocrisy of those who wield power.*"[২৯] Mpho Moagi বলেছেন, "*Investigative journalism … does not only report something new; it must educate, expose and uncover secrets.*"[৩০] সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালী জনসংযোগ কাঠামো থাকায় তাদের ভাল কাজের খবরগুলো ফলাও করে প্রকাশ এবং অপকর্মের সংবাদগুলোকে লুকিয়ে রাখার একটা রাজনীতি আমাদের গণমাধ্যম সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। তবে ক্ষেত্রবিশেষে সরকারী কর্মকর্তা, পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা তাদের নিজেদের স্বার্থেই অনুসন্ধানের প্রাথমিক খোরাক হিসেবে কিছু গোপন তথ্য প্রকাশ করে থাকেন, এই প্রক্রিয়া প্রায়শই সাংবাদিক উক্ত তথ্যের পাশাপাশি অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ না করে এবং প্রাপ্ত তথ্যের অধিকতর অনুসন্ধান না করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন এতে করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মূল সুর ব্যহত হয়।

---

[২৩] Curtis D. MacDougall (1982), Interpretative Reporting, 8th ed., New York: Macmillan Publishing Co., Inc., p. 225.

[২৪] William C. Gaines (1998), Investigative Reporting for Print and Broadcast, 2nd ed., Belmont, CA: Nelson-Hall, Inc., p.1

[২৫] Ibid, Curtis D. MacDougall (1982) p. 225.

[২৬] Peter Benjaminson and David, Anderson (1990), Investigative Reporting, 2nd ed, Ames: Iowa State University Press, p. 5.

[২৭] David L. Protess et al. (1991), The Journalism of Outrage: Investigative Reporting and Agenda-building in America, New York: The Guilford Press, p. 5.

[২৮] Ibid, Derek Forbes (2005) p. 2.

[২৯] Ibid. Sheila S. Coronel (2009), p 14.

[৩০] Ibid/ Derek Forbes/ 2005/ p. 2.

চ. ঘটনা নয়; প্রক্রিয়া

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে আবেগের কোনো স্থান নেই। এটি পুরোপুরি যুক্তিনির্ভর একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া। এ ধরনের প্রতিবেদনে ঘটনাকে খণ্ডিত নয় বৃহত্তর ঘটনা প্রবাহের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কোন একটি শুধু বিশেষ ঘটনা বা ইস্যু নয়; বরং ওই ঘটনা বা ইস্যুর ওপর একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তথ্য খোঁজা এবং সেসব তথ্য যাচাই-বাছাই করে সত্য তথ্যগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরাই হলো অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কখনও তাৎক্ষণিক কোন সংবাদ সরবরাহ করে না। পরিকল্পনা ও রিপোর্টিংয়ের নানা স্তর পার করেই একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করেন। এ স্তরগুলো পার না করলে তার প্রতিবেদনের স্বপক্ষে প্রমাণ যেমন মেলে না তেমনি এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দেয়। এসব স্তরে প্রতিবেদককে প্রচুর নথিপত্র সংগ্রহ করতে হয়, নিতে হয় নানাজনের সাক্ষাৎকার। সেজন্য Paul Williams মনে করেন, "*Investigative reporting is an intellectual process. It is a business of gathering and sorting ideas and facts, building patterns, analyzing options, and making decisions based on logic rather than emotions -- including the decision to say no at any of several stages.*"[৩১]

ছ. মৌলিক ও পরিকল্পনাভিত্তিক

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা মৌলিক ও পরিকল্পনাভিত্তিক সাংবাদিকতা। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে অবশ্যই নতুন তথ্যের অবতারণা করতে হয়। ইতিমধ্যে প্রকাশিত বা পটভূমিমূলক তথ্যগুলোকে প্রতিবেদক ধর্তব্যের মধ্যে নিতে পারেন, যা তার গবেষণার জন্য কার্যকরী ভূমিকা রাখে। কিন্তু সেগুলোর ভিত্তিতে তাকে অবশ্যই অনুসন্ধান চালিয়ে নতুন কোন তথ্য বের করে আনতে হয়। কোন ধারণা বা টিপসের ভিত্তিতে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন শুরু হতে পারে। কিন্তু এর জন্য অনুমিতি গঠনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা করতে হয় প্রতিবেদককে। সে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সূত্রের কাছে গিয়ে তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে হয়। তারপর সেসব তথ্য যাচাই-বাছাই করতে হয়। এ কারণে অনুসন্ধানের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে নতুন তথ্য। যেমন: সরকারী হাসপাতালে অবৈধভাবে ওষুধ বিক্রিকারক চক্রের মুখোশ উন্মোচন করতে গিয়ে সে হাসপাতাল সম্পর্কে প্রকাশিত আগের প্রতিবেদনগুলো প্রতিবেদককে ভালোভাবে পড়ে নিতে হয়, না হলে পুরাতন প্রতিবেদনের পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

জ. একাধিক সূত্র নির্ভর

সাদামাটা প্রতিবেদন একটি বা দুইটি সূত্রের ওপর নির্ভর করে রচিত হতে পারে। কিন্তু কোন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এক বা দুটি সূত্রের ওপর নির্ভর করে হতে পারে না। একক সোর্স বা সূত্রের ওপর রচিত প্রতিবেদন কখনই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বলে বিবেচ্য হতে পারে না। এখানে একাধিক মানবীয় ও নথিপত্রভিত্তিক সূত্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করেই তবে প্রতিবেদক তার অনুমিতি বা হাইপোথেসিস সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। সেজন্য Sheila S. Coronel বলেছেন, "*Investigative reporting entails the use of multiple sources - both human and documentary - that together paint a picture of wrongdoing or abuse. It requires the verification and corroboration of every piece of information, even if these come from sources that are considered reliable or*

---

[৩১] Paul N. Williams (1978), Investigative Reporting and Editing, PRENTICE-HALL, INC., Englewood Cliffs, New Jersey, p. 12.

authoritative. Reporting based on a single source cannot be considered investigative."[৩২] এক্ষেত্রে সাদামাটা সাংবাদিকতার সাথে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পার্থক্য চিহ্নিতকরণের আলোচনায় লিক সাংবাদিকতার বিষয়টিও কিছুটা আলোচনার দাবি রাখে। লিক সাংবাদিকতাকে (কোন একটি সূত্র থেকে কোন অজানা তথ্য ফাঁস হয়েছে এমন) অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হিসেবে বিবেচনা করার একট ভ্রান্ত চল প্রচলিত রয়েছে। যদিও লিক সাংবাদিকতা কোন অবস্থাতেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নয়। কোন তথ্য ফাঁসের মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার কেবল শুরু হতে পারে। সেক্ষেত্রে একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিককে ওই তথ্যের গভীরে যেতে হয়, তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের পাশাপাশি তথ্যকে একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে স্থাপন করতে হয়। এর ব্যত্যয় ঘটলে প্রতিবেদন হবে সত্যের বিকৃত ও অসম্পূর্ণ উপস্থাপন। এ কারণেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় একাধিক সূত্রের সন্নিবেশ অনিবার্য। মানবীয় সূত্রের পাশাপাশি প্রতিবেদক বক্তব্যের সমর্থনে নথি বা দলিল অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় দরকার। এই দুয়ের মেলবন্ধনেই দুর্নীতি ও অনিয়মের পূর্ণদৈর্ঘ্য চিত্র জনসমক্ষে উঠে আসে।

ঝ. দলীয় প্রচেষ্টার ফসল

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি গভীরতম প্রতিবেদন। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে এর জন্য প্রচুর সময়, অর্থ ও জনবলের দরকার হয়। রাতারাতি কোন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করে ফেলা সম্ভব নয়। তাছাড়া এখন যে কোন সংবাদ মাধ্যমে বিটভিত্তিক রিপোর্টিং প্রচলিত। কিন্তু একটি জটিল ও স্পর্শকাতর বিষয়ে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একাধিক বিটের সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন বিটের প্রতিবেদকের পক্ষে তার বিটের বাইরে গিয়ে ওই বিষয়টি ভালোভাবে ও সহজে অনুসন্ধান করা সম্ভব নাও হতে পারে। যেমন ধরা যাক, পদ্মাসেতুর দুর্নীতি বিষয়টি সেতু বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন, থানা পুলিশ, আদালত ইত্যাদি অনেক সংস্থার সাথে জড়িত। কোন সংবাদ মাধ্যমেই একজন প্রতিবেদক এসব সংস্থার খবর একা কাভার করেন না। এ কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হলো দলীয় প্রচেষ্টার ফল, "*Investigative reporting requires painstaking work. It is not something that can be done overnight. It implies talking to a range of sources, obtaining documents, when they are available, and spending weeks, even months, piecing a story together."*[৩৩]

'Manual for Arab Journalists on Freedom of Information and Investigative Journalism'-এ টিম ওয়ার্কের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে এভাবে, "*Quite frequently, investigative journalists operate in teams, since the work involved requires long hours, extensive research, and follow-up. Journalists "investigating" unilaterally may find themselves overwhelmed by the volume of material they uncover, the lack of resources, the scarcity of sources, other pressures at work, intimidation, or a combination of these factors. So they would do better to team up with others to create a support system to alleviate the burden."*[৩৪]

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রায়ই স্পর্শকাতর ও জটিল বিষয় নিয়ে তৈরি হয় বলে এখানে ঝুঁকি থাকে

[৩২] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p 14.
[৩৩] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p 24.
[৩৪] Manual for Arab Journalists on Freedom of Information and Investigative Journalism (2007),

বেশি। সেজন্য Investigative Reporters and Editors (IRE) -এর পরামর্শ হলো একটি টিম গঠন করে অনুসন্ধান করলে কখনই দুস্কৃতিকারীরা উদ্যোগটি নষ্ট করতে পারে না। আইআরই বলছেন, "*You can't kill a story by killing a reporter.*" [৩৫]

সাদামাটা বনাম অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

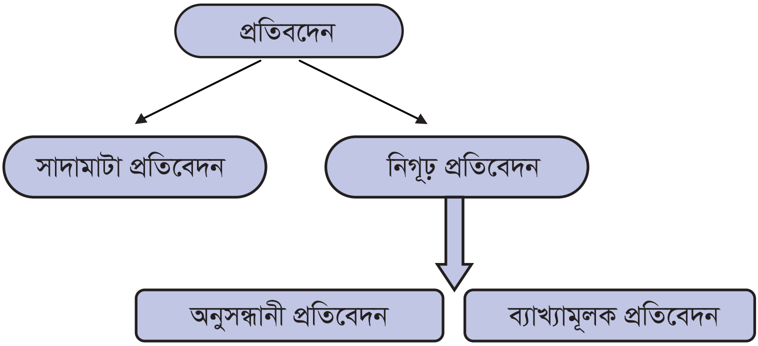

সাদামাটা সাংবাদিকতার সাথে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পার্থক্য মূলত সাদামাটা প্রতিবেদনের সাথে গভীরতম বা নিগূঢ় প্রতিবেদনের পার্থক্যের মাঝেই নিহিত রয়েছে। চারিত্রিক বিবেচনায় যে কোন প্রতিবেদনকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। সাদামাটা/উপরিতল প্রতিবেদন (Surface reporting) এবং গভীর প্রতিবেদন বা নিগূঢ় প্রতিবেদন (Depth reporting)। নিগূঢ় প্রতিবেদনের একটি রূপ হল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন আর অন্যটি ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন। উপরিতল প্রতিবেদনের চৌহদ্দি পার করে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করলে দেখা মেলে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের। গভীরতার বিষয়টি এখানে সার্বিকঅর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিবেদনের বিষয়টি কতটুকু গভীরে গিয়ে তলিয়ে দেখা হয়েছে কিংবা বিষয়টা হিসেবে এর গভীরতা আছে কিনা, প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়ায় প্রতিবেদক কাজের কতখানি গভীরে যেতে পেরেছেন এবং প্রতিবেদনটির প্রকাশের পর এর প্রভাব জনমনে কতখানি পড়েছে এর সবটুকু বিচার করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সাটামাটা রুটিন প্রতিবেদনের সীমানা ছাড়িয়ে নিগূঢ় প্রতিবেদনের রাজ্যে প্রবেশ করে। একথা সত্য যে, সংবাদ প্রতিবেদন মাত্রই অনুসন্ধানের দাবি রাখে অর্থাৎ প্রতিবেদককে সংবাদ রচনা প্রক্রিয়ায় কিছুটা খোঁজ-খবর বা অনুসন্ধান চালাতে হয়। কিন্তু শেষ বিচারে সব প্রতিবেদনই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হয়ে উঠে না। কেননা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের একমাত্র লক্ষ্যই অনুসন্ধান, তথ্য জ্ঞাপনের নিগড়ে একে সীমিত করার সুযোগটি এক্ষেত্রে সীমিত। সাদামাটা প্রতিবেদেন রচনায় একজন প্রতিবেদক যা প্রত্যক্ষ করেন বা তার বিশ্বস্তসূত্রসমূহ থেকে যেসব তথ্য পান তার ভিত্তিতে সংবাদ প্রতিবেদন রচনা করেন। এ ধরনের প্রতিবেদন হয় ঘটনানির্ভর এবং সংবাদের নিজ চরিত্র বিবেচনায় সাদামাটা বা সরল প্রতিবেদন। তরতাজা খবর নিয়ে গড়ে ওঠে এ ধরনের প্রতিবেদনের পরিসর। তথ্যের জন্য পাঠক-দর্শকের যে প্রাথমিক ক্ষুধা তা এ ধরনের প্রতিবেদনের মাধ্যমে মেটানো যায়। অন্যদিকে গভীরতম প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হল ঘটনার উপরিতলে থাকা তথ্যের গভীরে প্রবেশ করে পাঠককে বিস্তারিত পটভূমি ও ঘটনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং পর্যাপ্ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে তথ্যের ভেতরকার অন্তর্নিহিত সত্যের উপস্থাপন। এই গভীরতম প্রতিবেদনের

[৩৫] Lovell P. Ronald (1983), Reporting Public Affairs: Problems and Solutions, Belmont, Calif: Wadsworth, p. 119.

অন্যতম ধারা হল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিংবা রেডিও-টিভিতে প্রচারিত অধিকাংশ প্রতিবেদনই উল্টাপিরামিড কাঠামোতে নির্মিত সাদামাটা ধরনের। প্রতিবেদক নিজে যা প্রত্যক্ষ করেন বা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে যে সংবাদ লাভ করেন তার বিবরণ উপস্থাপন করেন। চারিত্রিক বিবেচনায় এগুলো হলো ঘটনা নির্ভর সরল সংবাদ। তথ্যের জন্য পাঠকের তাৎক্ষণিক যে চাহিদা তা পূরণ করাই এ ধরনের প্রতিবেদনের লক্ষ্য। কখনো কখনো পাঠকের তথ্য চাহিদা সাদামাটা খবরে মেটে না। পাঠক আরো বেশি জানতে চায়। গভীর প্রতিবেদনের মাধ্যমে পাঠকের সেই চাহিদাগুলো পূরণ করা হয়। গভীর প্রতিববেদনের লক্ষ্য হচ্ছে ঘটনার উপরিতলে উপস্থিত তথ্যাদির গভীরে ঢুকে পাঠককে বিস্তারিত পটভূমি ও তথ্যাবলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া, তথ্য ও ঘটনাবলী পটভূমির আলোকে ব্যাখ্যা করা এবং এগুলোকে অর্থপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করা।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায়, সাংবাদিকতার মৌল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত 'বস্তুনিষ্ঠতা'র বিষয়টি প্রায়শই প্রশ্নবিদ্ধ হয়। সাদামাটা সাংবাদিকতার সাথে এ বিশেষ ধারার সাংবাদিকতাকে গুলিয়ে ফেলার কারণেই এমনটি ঘটে থাকে। সাদামাটা সংবাদিকতার প্রকৃতির কারণেই প্রতিবেদক নিজের আহরিত অথবা সূত্র মারফত প্রাপ্ত তথ্যের উপস্থাপন করে থাকেন। তথ্য বা উপাত্তের সর্তক বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদক কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছালেও প্রতিবেদনের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটে না। পক্ষান্তরে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সূত্রপাতই ঘটে এমন একটি প্রেক্ষিত থেকে যেখানে ধরে নেয়া হয় যে কোন একটি বিষয় উন্মোচন বা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। পরবর্তীতে প্রতিবেদকের গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকৃত সত্যটি বেরিয়ে আসে ফলে প্রাথমিক সন্দেহ বা অনুমানটি দূরীভূত বা প্রমাণিত হয়। কোন একটি বিষয় যেখানে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটছে কিংবা দুর্নীতি হচ্ছে এর উন্মোচনের পাশাপাশি তা রোধকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা এ ধরনের সাংবাদিকতার প্রতিপাদ্য। এ কারণে প্রকৃতি ও প্রক্রিয়াগত দিক থেকে এ ধরনের সাংবাদিকতায় প্রতিবেদকের নিজস্ব অনুসন্ধানের প্রতিফলন হয় বিধায় এক ধরনের সিদ্ধান্তে প্রতিবেদক উপনীত হন, তবে এটি কোন ক্ষেত্রেই প্রতিবেদকের নিজস্ব মত নয়, কেবল নিজ অনুসন্ধানের প্রাপ্ত ফল হিসেবে বিবেচনা করাই শ্রেয়। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

১. সাধারণত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান পরিস্থিতির একটি আশু পরিবর্তন ও এর সমাধানকল্পে পদক্ষেপ গৃহীত হবে এমন ভাবনা প্রতিবেদককে চিন্তার খোরাক যোগায়। পক্ষান্তরে সাদামাটা সাংবাদিকতায় ঘটনার অনুপুঙ্খ ও বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনার মধ্যেই প্রতিবেদককে তার ভাবনার বলয় সীমিত রাখতে হয়। যেমন: ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন নিহত এটি সাদামাটা সাংবাদিকতা। এখানে প্রতিবেদক ঘটনাটি কীভাবে, কখন, কেন ঘটেছে এ প্রশ্নগুলোর বিস্তারিত উত্তর পাঠকের সামনে তুলে ধরবেন। অন্যদিকে প্রতিবেদক যদি প্রাথমিকভাবে ধারণা করেন যে, এটি একটি দুর্ঘটনাপ্রবণ সড়ক, কেন এখানে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে অনুসন্ধানের মাধ্যমে এর কারণ উদঘাটন করা হবে, এর মাধ্যমে বিদ্যমান সমস্যার একটি সমাধানও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বের হয়ে আসবে।

২. আকারের দিক দিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন যেমন সাদামাটা প্রতিবেদনের তুলনায় দীর্ঘ, তেমনি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা করতেও সাদামাটা সংবাদের তুলনায় বেশি সময় প্রয়োজন হয়। এ কারণে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ডেড লাইন সত্য উদঘাটন না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

৩. একথা সত্য যে, কোন সংবাদই তাৎপর্যহীন নয়। তবে সংবাদের প্রকৃতির কারণে তাৎপর্যের মাত্রাগত তারতম্য ঘটে থাকে। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে যেহেতু অনুসন্ধানের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, সেক্ষেত্রে রুটিন সাংবাদিকতার চেয়ে এর গুরুত্ব খানিকটা বেশি। ফলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় জনবল, অর্থ ও সময় তুলনামূলক বেশি প্রয়োজন হয়।

এ পর্যায়ে গবেষণা, সূত্রের সাথে সম্পর্ক ও প্রতিবেদনের ফলাফলের ভিত্তিতে সাদামাটা সাংবাদিকতার সাথে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পার্থক্যসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

সাদামাটা সাংবাদিকতা	অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা
গবেষণা	
তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন রচনা করা হয় একটি ধারাবাহিক ছন্দ অনুসরন করে (দৈনিক, সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক)।	তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা ও সম্পূর্ণতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়ার আগ পর্যন্ত তথ্য প্রকাশ করা হয় না।
এক্ষেত্রে দ্রুত প্রাথমিক গবেষণার কাজ শেষ করা হয় এবং প্রতিবেদন প্রকাশ বা প্রচারের পর প্রায়ক্ষেত্রেই পরবর্তীতে কোন গবেষণা হয় না।	প্রতিবেদন প্রস্তুতের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত গবেষণা চলমান থাকে; এমনকি প্রতিবেদন প্রকাশের পরও ক্ষেত্রবিশেষে তা চলতে পারে।
প্রয়োজনীয় ন্যূনতম তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ প্রতিবেদন রচনা করা হয় এবং এর আকার হয় তুলনামূলক ছোট।	প্রতিবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ তথ্যের সন্নিবেশ ঘটে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এবং এর আকার দীর্ঘ হতে পারে।
প্রতিবেদনে সূত্রের উল্লেখ নথির প্রতিস্থাপক হিসেবে কাজ করে।	অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে সূত্রকে সমর্থন বা নাকচ করার জন্য পর্যাপ্ত নথি থাকতে হয়।
সূত্রের সাথে সম্পর্ক	
সূত্রের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে অনেক ক্ষেত্রে সূত্র প্রদত্ত তথ্যের যাচাই বাছাই করা হয় না।	সূত্রের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক যতই গভীর হোক না কেন যাচাই-বাছাই না করে কোন তথ্যই প্রকাশের সুযোগ নেই। কেননা সূত্র ইচ্ছাকৃতভাবে যেমন ভুল তথ্য দিতে পারেন তেমনি তার অজ্ঞতার কারণেও তথ্য ভুল হতে পারে।
দাপ্তরিক সূত্রসমূহ তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য অনায়াসে তথ্য সরবরাহ করে থাকে।	দাপ্তরিক তথ্যসমূহ সংবাদকর্মীর কাছে গোপন রাখা হয়। কেননা তা প্রকাশ পেলে কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান বিপদে পড়তে পারে।
সাংবাদিককে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট পক্ষের মত বা বক্তব্য গ্রহণ করতে হয় যদিও অন্য সূত্রের মতামত বা ব্যাখ্যার সন্নিবেশ ঘটিয়ে তিনি তাতে ভারসাম্য আনতে পারেন।	প্রতিবেদকের কাছে যদি পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ থাকে সেক্ষেত্রে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট পক্ষের যে কোন বক্তব্যকে তিনি চ্যালেঞ্জ বা নাকচ করতে পারেন।
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংবাদ সূত্র সনাক্ত করা যায় বা প্রতিবেদনেই সংবাদ সূত্রের উল্লেখ তাকে।	অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় সূত্রের নিরাপত্তার স্বার্থেই কোন কোন ক্ষেত্রে সূত্র প্রকাশ করা হয় না।
ফলাফল	
ঘটনার হুবহু প্রতিফলনকেই সংবাদ প্রতিবেদন হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং জনগণকে তথ্য জ্ঞাপনের মধ্যেই প্রতিবেদকের প্রত্যাশা সীমাবদ্ধ থাকে।	ঘটনার হুবহু উপস্থাপনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রতিবেদনের অনুসন্ধান এবং যার মধ্য দিয়ে একটি উন্নততর পরিস্থিতির দিকে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়।
সংবাদ প্রতিবেদনে সাংবাদিকের ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততা না থাকলেও চলে। ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততা বলতে ঘটনার সাথে নিজেকে জড়ানোকে বোঝানো হচ্ছে না। বরং প্রতিবেদক এক্ষেত্রে শুধু তার দৈনিক রুটিন ওয়ার্কের মতো কাজ করেন।	সাংবাদিকের ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততা না থাকলে প্রতিবেদন কখনও সম্পূর্ণতা পায় না। এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরির জন্য পর্যাপ্ত সময় ও শ্রম দিতে হয় বলে প্রতিবেদককে মানসিকভাবে ঘটনার মধ্যে সম্পৃক্ত হতে হয়।

প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের কাজটি করে থাকেন। অর্থাৎ প্রতিবেদক অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত- এই দুই পক্ষের বক্তব্য উপস্থাপন করে দায় সারেন।	অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তথ্য প্রমাণের ধারাবাহিতার ফলে একটি অনিবার্য পরিণতি গ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে প্রতিবেদনের মধ্যেই প্রমাণ সাপেক্ষে একটি মত সন্নিবেশিত থাকতে পারে। তবে এটি কোনভাবেই প্রতিবেদকের নিজস্ব মতামত নয়।
সংবাদ লিখনশৈলীতে নাটকীয়তা থাকে না বললেই চলে। কারণ এ ধরনের প্রতিবেদন চূড়ান্ত সমাপ্তির দিকে না গিয়ে একটি চলমান প্রক্রিয়ার অংশে রূপ নেয়।	সংবাদের তাৎপর্যতা তৈরির জন্য প্রতিবেদনের কাঠামোতে নাটকীয়তা অনিবার্য।
যদিও সাংবাদিকতায় যেকোন ভুল পরিত্যাজ্য। কিন্তু সাদামাটা সংবাদের ক্ষেত্রে ভুল হলে সাংবাদিক বা সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমে ওই ভুলের জন্য ব্যাপক মাশুল দিতে হয় না।	এক্ষেত্রে প্রতিবেদকের কোনরূপ ত্রুটি বা বিচ্যুতি প্রতিবেদেকের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমের বিশ্বস্ততাকে প্রশ্নের মুখোমুখি করে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মিথসমূহ

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বহু চর্চিত কিন্তু কষ্টসাধ্য বলে একে ঘিরে কিছু মিথ বা ভ্রান্ত ধারণার কথা শোনা যায়। এক্ষেত্রে ঘানায় জন্মগ্রহণকারী অনুসন্ধানী সাংবাদিক Edem Djokotoe অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চারটি মিথকে শনাক্ত করেছেন।

মিথ-১: পেশাগত বিবেচনায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা অত্যন্ত আকর্ষণীয়।
মিথ-২: কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের ব্যাপ্তি ছাড়িয়ে প্রতিবেদকই মুখ্য হয়ে ওঠেন।
মিথ-৩: অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা মাত্রই নায়কের একক কীর্তি।
মিথ-৪: রাষ্ট্রায়াত্ত গণমাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সম্ভব নয়।

মিথ:১ পেশাগত বিবেচনায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

সাংবাদিকের ক্যারিয়ার নির্দেশক হিসেবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা অতি উর্বর ক্ষেত্র। এ ধরনের একটি মিথ দীর্ঘদিন ধরে গণমাধ্যম জগতে প্রচলিত আছে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদক এমন বিষয় নিয়ে কাজ করেন যেখানে একটি অনুসন্ধানী স্কুপ সংবাদ প্রকাশ করেই তিনি রাতারাতি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসতে পারেন। এ কারণে পেশাগত বিবেচনায় এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হিসেবে পরিগণিত হয়। ওয়াটার গেট কেলেংকারির ঘটনা উন্মোচনকারী বব উডওয়ার্ড ও কার্ল বার্নস্টাইনের কথা আমরা সবাই জানি। তবে এ আকর্ষণের কারণে কোন সাংবাদিক অনুসন্ধানে ব্রতী হবে এমনটা কাম্য নয়। সাংবাদিকের লক্ষ্য হবে অন্যায়, অনিয়ম, দুর্নীতির জট উপড়ে ফেলার জন্য চূড়ান্ত সত্যের উন্মোচন।

মিথ-২: কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের ব্যাপ্তি ছাড়িয়ে প্রতিবেদকই মুখ্য হয়ে ওঠেন।

যেহেতু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সম্পূর্ণভাবে প্রতিবেদকের নিজ উদ্যোগের ফল সেক্ষেত্রে কোন কোন সময় অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের কাছে তার অহং প্রতিবেদনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে প্রতিবেদকের মনে রাখা প্রয়োজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা তার ব্যক্তিগত অহং প্রতিফলনের ক্ষেত্র নয়। সর্বাবস্থায় জনস্বার্থে নিজ অহংকে নিয়ন্ত্রণে রেখে জনস্বার্থে সত্যপ্রকাশ করাই হবে প্রতিবেদকের মূল কাজ। আবার অনেকেই মনে করেন, খুব নামীদামী প্রতিবেদক বা সাংবাদিক না হলে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করা যায় না। বিষয়টি একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। কারণ সাংবাদিকতার জন্য নামীদামী হতে হয় না, বরং দরকার নিষ্ঠা, সততা ও একাগ্রতা।

মিথ-৩: অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা মাত্রই নায়কের একক কীর্তি।

প্রতিবেদক যদিও গল্পের মূল চরিত্র তবে পার্শ্ব অভিনেতাদের চরিত্রগুলোকে খাটো করে দেখবার সুযোগ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় নেই। কারণ দলীয় কর্মপ্রয়াস ব্যতীত একটি সফল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা করা প্রায়ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়না। এ কারণে বব উডওয়ার্ড ও কার্ল বার্নস্টাইন তাদের সাড়া জাগানো বই 'অল দ্যা প্রেসিডেন্টস্ ম্যান' (১৯৭৪)-এর ধন্যবাদ স্বীকার অংশে লিখেছেন-"*Like the Washington Post's coverage of Watergate, this book is the result of a collaborative effort with our colleagues- executives, editors, reporters, librarians, telephone operators, news aides.*" সুতরাং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় যদিও প্রতিবেদকই প্রধান তবে এটি তার সম্পূর্ণ একক কীর্তি এটি ভাবার সুযোগ নেই।

মিথ-৪: রাষ্ট্রায়াত্ত গণমাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সম্ভব নয়।

যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেসরকারী গণমাধ্যমই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা করে থাকে তবে রাষ্ট্রায়াত্ত গণমাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা একেবারেই যে হয়নি তেমনটা কিন্তু নয়। উইলোগেট কেলেংকারির (১৯৮৮-১৯৮৯) ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই জিম্বাবুয়ের রাষ্ট্রায়াত্ত সংবাদমাধ্যম 'বুলাওয়ে ক্রনিকল' সরকারী শীর্ষ কর্মকর্তাদের দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। ঘটনার ফলশ্রুতিতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবের ক্যাবিনেট থেকে পাঁচ সংসদ সদস্য পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। যদিও পরে সাংবাদিকদ্বয় জিওফ্রে নায়ারোটা ও ডেভিসন মারুযিবাকে তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং ইতিহাস বলছে সৎ সাহস থাকলে রাষ্ট্রায়াত্ত গণমাধ্যমেও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করা সম্ভব। যদিও আমাদের দেশের রাষ্ট্রায়াত্ত গণমাধ্যমে এ ধরনের নজির নেই বললেই চলে।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের গুণাবলী ও যোগ্যতা

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সাংবাদিকতার সেই ধারা যার মাধ্যমে একজন সাংবাদিক সুবৃহৎ পরিসরে জনগণের সেবা করতে পারেন। এর মাধ্যমে বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোর অসঙ্গতিকে চ্যালেঞ্জ করা যায়। আবার জনস্বার্থের জন্য যে তথ্যের সামনে আসা অনিবার্য তাকেও জনপরিসরে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। একজন ব্যক্তি যে পেশায় নিয়োজিত থাকুক না কেন পেশার উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি নিজ পরিমণ্ডলে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করার জন্য ব্যক্তিকে কিছু গুণ রপ্ত করতে হয়। অথবা ভিন্নভাবে বললে কিছু গুণের সংশ্লেষ দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদনের জন্য অনিবার্য। আর সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই পেশাগত গুণাবলীর বিষয়টি আরো তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এ পেশার উপকারভোগী হল সরাসরি জনগণ। একজন দক্ষ সাংবাদিক হওয়ার জন্য যেসকল গুণের সন্নিবেশ একজন ব্যক্তির মধ্যে থাকা প্রয়োজন, কেউ যদি তা রপ্ত করতে পারেন তবে তার পক্ষে এ পেশায় উৎকর্ষ সাধনে কোন বেগ পেতে হয় না। একজন ক্রীড়াবিদ বা প্রকৌশলী কিংবা চিকিৎসককে তার পেশায় পারঙ্গম হতে হলে যেমন দীর্ঘদিনের অনুশীলনের মাধ্যমেই তা করতে হয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকের বেলায় বিষয়টি তেমনই ঘটে। সাংবাদিকতার শাস্ত্রীয় শিক্ষায় সংবাদের গন্ধ শোঁকার নাক (Nose for news)- এ গুণটিকে ভিত্তিস্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের প্রাথমিক গুণাবলী হল তার সংবাদ চিনতে পারার ক্ষমতা। এ গুণটি ব্যক্তিভেদে জন্মগত। তবে কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে এটি রপ্ত করা যায়। এ অধ্যায়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকের এমন কিছু গুণাবলীর ওপর আলোকপাত করা হবে, যার মাধ্যমে ব্যক্তি আরো দক্ষতার সাথে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা করতে পারেন।

প্রবল অনুরাগ

“Journalists run a high risk if they dare to take on serious investigative work.”...

David Remnick

একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিককে হতে হবে প্রবল অনুরাগী। এখানে অনুরাগ বলতে পেশার প্রতি প্রেমের প্রবলতাকেই নির্দেশ করা হচ্ছে। মানুষ মাত্রই ধন্যবাদ প্রত্যাশী। একজন ব্যক্তি তার সমস্ত কাজের জন্য পুরস্কৃত হতে চান। তবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিককে এর উর্ধ্বে উঠতে হয়। কারণ সাংবাদিকতার এ ধারায় একজন সাংবাদিককে পোহাতে হয় বহু ঝক্কি-ঝামেলা, শুনতে হয় পেশী শক্তির গর্জন, তারপরও সত্য প্রকাশের দুরন্ত সাহস নিয়ে জনস্বার্থে সাংবাদিক ছুটে চলেন সত্যের পেছনে। বিনিময়ে ধন্যবাদের সিকিটুকুও না জুটতে পারে। কর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ না থাকলে ব্যক্তির পক্ষে একজন প্রকৃত অনুসন্ধানী সাংবাদিক হয়ে ওঠা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। যে ব্যক্তি নিশ্চিত আয় এবং নিয়মিত পদোন্নতির জীবন চান কিংবা নয়টা-পাঁচটা অফিস বলয়ের নিগড়ে বন্দি থাকতে চান তার জন্য অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা জুতসই হবে না। তবে কেউ যদি চ্যালেঞ্জ নিতে ভালবাসেন অথবা সত্য উদঘাটন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় অবিচল থাকতে চান অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জগত তাকে স্বাগত জানায়। ব্যক্তিমাত্রই তার সংশ্লিষ্ট পেশার প্রতি অনুরাগ থাকতে হয়। তবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কাজের ধরনটাই এমন যে পেশাগত অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ত্যাগের মধ্য দিয়ে। এমন হতে পারে শুধু একটি নথির জন্য মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে। সেজন্য সময় ও শ্রমের নিক্তিতে কোনভাবেই এর যৌক্তিকতা নিরূপন করা সম্ভব হবে না। আবার সত্য উদঘাটনে মাঝপথে ছেড়ে দেয়ারও উপায় নেই সেখানেই এ গুণটি একজন সাংবাদিককে প্রাণ শক্তি যোগায়। বর্তমানে অনেকক্ষেত্রেই এ গুণটির অভাবে গণমাধ্যমে আমরা মানসম্পন্ন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন দেখতে পাই না। বিশেষ করে আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর সংবাদে এ প্রবণতা কোন কোন ক্ষেত্রে ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুসন্ধানী সাংবাদিককে হতে হবে পেশার প্রতি প্রবল অনুরাগী যাতে- দুর্নীতি রোধে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় যত বাধাই আসুক না কেন জনস্বার্থে তিনি যেন সত্যের সাথে আপোষ না করেন।

দৃষ্টিশীল

‘যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন’- এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিক মাত্রই দৃষ্টিশীল হবেন। স্থান, কাল কিংবা পাত্রভেদে এ সত্যের ব্যত্যয় ঘটে না। ভাল সাংবাদিক মাত্রই দৃষ্টিশীল। তবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকের বেলায় এটি আরো বেশি প্রযোজ্য। বলা হয়ে থাকে, গণমাধ্যমকর্মীর অন্যতম কাজ হল পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ তার চারপাশে ঘটে যাওয়া কিংবা ঘটতে পারে এমন সমস্ত জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি নিবিড় পর্যবেক্ষণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। দৃষ্টিশীলতা সেই যোগ্যতা যার মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিক বিন্দুর মাঝে সিন্ধুর গভীরতা আবিষ্কার করেন। অর্থাৎ একজন প্রকৃত অনুসন্ধানী সাংবাদিক দৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষাতীত ঘটনার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্যের উদঘাটনে ব্রতী হবেন। চলতি পথের অনেক ঘটনা, কথাবার্তা, ইঙ্গিত তার জন্য বড় কোন সংবাদের বীজ বপন করতে পারে। তিনি তার চলতি পথের কোন ঘটনাকেই তাই বাতিলের খাতায় ঠেলে দেবেন না। সাধারণের দৃষ্টি যেখানে গিয়ে শেষ হয় সেখান থেকেই অনুসন্ধানী সাংবাদিক দেখতে শুরু করবেন। কারণ আমাদের দেশে দুর্নীতির শেকড় আজ এতটাই শক্তিশালী যে, খালি চোখে এর গভীরতা চোখেই পড়ে না। উদাহরণ হিসেবে টিআইবি পুরস্কারপ্রাপ্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সংকলনটির প্রথম প্রতিবেদনটির কথাই বলা

যেতে পারে। প্রতিবেদনটির শিরোনাম "বোতলজাত পানি: মোড়কসর্বস্ব ব্যবসা" ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪ থেকে ৫ অক্টোবর ২০০৪ পর্যন্ত প্রকাশিত এই সিরিজ প্রতিবেদনটিতে প্রতিবেদক অনুসন্ধানের মাধ্যমে বের করে আনেন মনলোভা বিজ্ঞাপন দিয়ে বাজারজাত করা মিনারেল ওয়াটারের ৯৮ ভাগই বিশুদ্ধ নয়। অথচ সাধারণ মানুষ প্রতিদিনই মোড়ক সর্বস্ব এসব পানি কিনে প্রতারিত হচ্ছেন। মিনারেল ওয়াটারের এ বাণিজ্যে গলদ থাকার বিষয়টির অনুমান এবং পরবর্তীতে গবেষণা করে সত্যের উদঘাটন প্রতিবেদকের দৃষ্টিশীলতার পরিচয়। কারণ একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক সাধারণের মতো খালি চোখে কোন বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন না।

সংগঠন কুশলতা

অধিকাংশ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন যুক্তির কসরতের ফল। প্রতিবেদনে তথ্য এমনভাবে সাজানো হয় যেন তা থেকে সহজে একটি উপসংহারে পৌঁছানো যায়। প্রকৃত অনুসন্ধানী সাংবাদিক এমনভাবে তার প্রতিবেদন তুলে ধরেন যেখানে ঘটনার যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ পরম্পরা বজায় রাখা হয়। এক্ষেত্রে চিন্তা প্রতিবেদকের ভিত্তি; আবেগ নয়। কারণ চিন্তায় আবেগের সন্নিবেশ হলে ভাবনাগুলো বিশৃঙ্খলতার দোষে দুষ্ট হবে আর যার ছাপ পড়বে গিয়ে সংবাদ প্রতিবেদনে। সংগঠন কুশলী মন অনুসন্ধানের পরিকল্পনাকে ছকে সাজায় আর জটিল বিষয়কে সহজবোধ্য করে খণ্ডাংশে বিভক্ত করে। এই যোগ্যতাটি আয়ত্ত করার মাধ্যমে একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক তথ্য এবং তত্ত্বেও যৌক্তিক সংগঠন ঘটাতে পারেন। তথ্যের সংগঠনে কুশলী সাংবাদিক প্রথমেই একটি লক্ষ স্থির করেন তারপর যৌক্তিক পথে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছান। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে একজন সাংবাদিককে অসংখ্য তথ্য নিয়ে কাজ করতে হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে কোন তথ্যকে কীভাবে সাজাতে হবে সে বিষয়ে যদি সাংবাদিকের দখল না থাকে তাহলে তার হাজারো প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনকে এ কারণে অনেকেই 'শৈল্পিক কাজ' হিসেবে বিবেচনা করেন। কোন তথ্য কী প্রক্রিয়ায় সাজালে পাঠকের কাছে বিষয়টি খোলাসা হবে এটি সাংবাদিকের তথ্যের সংগঠন দক্ষতার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। অর্থাৎ তথ্য ও উপাত্তের বুনট যত পোক্ত হবে প্রতিবেদনে আবেদনও ততটাই শক্তিশালী হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, ক্রমাগত অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক এ গুণটি আয়ত্ত করতে পারেন।

দলগতভাবে কার্যসম্পাদনে পারঙ্গম

অনুসন্ধানী সাংবাদিককে দলগতভাবে কার্যসম্পাদনে পারঙ্গম হতে হয়। অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য যেকোন বিষয়েই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একজন সাংবাদিক যতই জ্ঞানের অধিকারী হোক না কেন তাকে বিষয়ের গভীরে প্রবেশের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞের দারস্থ হতে হয়। আর সেক্ষেত্রে দলগত কার্যসম্পদনের যোগ্যতাটি খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ প্রতিবেদক ও বিশেষজ্ঞের যৌথ প্রয়াসেই প্রতিবেদনটি পূর্ণতা পায়। বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা নিয়ে ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে হলে টিমের মাধ্যমে কাজ করলে সফলতা পাওয়া যায়।

অনুসন্ধিৎসা

অনুসন্ধানী সাংবাদিক হওয়ার পূর্বশর্ত এটি। কারণ অনুসন্ধিৎসু মন ছাড়া অনুসন্ধান কাজ করা যায় না। প্রতিবেদক যদি অনুসন্ধিৎসু না হন তবে তার মধ্যে প্রশ্ন করার ক্ষমতা নেই বলে ধরে

নিতে হয়। সেক্ষেত্রে অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার বটম লাইনে পৌঁছানো সাংবাদিকের পক্ষে সম্ভব হয় না। অনুসন্ধিৎসু মন খালি চোখে যা দেখা যায় না তাকেই খুঁজে বের করে আনে। প্রতিবেদক তার প্রবল অনুসন্ধিৎসা কাজে লাগিয়ে সত্যের একেবারে গভীরে প্রবিষ্ট হন। অন্যায়, অপরাধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কলম যুদ্ধে সাংবাদিক কেবল সাহস ও প্রত্যয়ের জোরে এগিয়ে যেতে পারেন না, তাকে হতে হয় অনুসন্ধান পিপাসু, ঘটনার পেছনের ঘটনাকে দেখার চোখ তার থাকতেই হবে নতুবা তার সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টা ফল হিসেবে বড়জোর পাওয়া যাবে একটি সাদামাটা প্রতিবেদন। প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রাথমিক চিন্তার খোরাক থেকে শুরু করে প্রতিবেদন তৈরির সমস্ত পর্যায়ে প্রতিবেদকের অনুসন্ধিৎসু মনে ছাপ থাকতে হবে। এমনকি প্রতিবেদন প্রকাশ কিংবা প্রচারের পরও সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন সম্পর্কে তিনি তার অনুসন্ধিৎসা বজায় রাখবেন। কেননা এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে নতুন কোন অনুসন্ধানের রসদ। তাই সব ব্যাপারেই তার একটা জানার আগ্রহ বা কৌতূহল থাকবে। কারণ কোন বিষয়ে প্রশ্ন না জন্মালে সে বিষয় সম্পর্কে তিনি পর্যবেক্ষণ বা বিশ্লেষণ করার আগ্রহও খুঁজে পাবেন না। সুতরাং অনুসন্ধানী সাংবাদিক মাত্রই অনুসন্ধিৎসু।

অকুতোভয়

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ঝুঁকি কেবল বিষয় ও সূত্র কেন্দ্রিক নয়। প্রতিবদেক নিজেও ঝুঁকির বৃত্তে আবর্তিত হতে থাকেন। কারণ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা মানেই বৈরী সূত্রের কাছ থেকে সংরক্ষিত তথ্য উদ্ধার। তাই অনুসন্ধানী সাংবাদিককে হতে হয় অকুতোভয়। প্রতিবেদনের জন্য সংবাদ সংগ্রহের কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে এমনও পরস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় যেখানে জীবননাশের আশংকাও থাকে। অনুসন্ধানী সাংবাদিক পরিণত হন দুর্নীতিবাজ পেশীশক্তির টার্গেটে। সুতরাং গড়পড়তা সাহসিকতা একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের কাজ করার জন্য মোটেও পর্যাপ্ত নয়। চাই মরণজয়ী সাহস। তাই ক্ষেত্র বিশেষে, বহুবিধ চাপের কারণে প্রতিবেদক নিজের মধ্যে এক ধরনের সেন্সরশিপ প্রয়োগ করতে পারেন, তবে এতে করে অনুসন্ধানের চেতনা ব্যাহত হওয়ার আশংকা থাকে। এ কারণে প্রতিবেদককে তিনি যা করছেন কিংবা করতে ইচ্ছুক তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হয় এবং একই সাথে তার কাজটি পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে হয়। এক্ষেত্রে পারিবারিক ও পেশাগত পরিসরে বিভিন্ন সহায়ক কাঠামো গড়ে নিতে হয়। যেমন, প্রতিবেদক এমন একটি বিষয় নিয়ে কাজ করছেন যেখানে তার জীবনের ঝুঁকি রয়েছে সেক্ষেত্রে পরিবারকে বিষয়টি অবহিত করার পাশাপাশি নিজ আইন উপদেষ্টা এবং সম্পাদককেও জানিয়ে রাখতে পারেন। সুতরাং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হল সাংবাদিকতার সেই ধারার যেখানে প্রতি পদে নানা চাপ আসে। কিন্তু মনে হতে পারে তুলনামূলক অনাকার্ষণীয়। এ কারণে Mark Hunter ও Luuk Sengers মনে করেন, "*While Investigative Journalism is tough, sometime dangerous and distinctly un-glamorous, it's one of the most rewarding areas of journalism to become involved in.*"[৩৬]

ধৈর্য্যশীলতা

ধৈর্য্য এমন একটি মানবীয় গুণ যা ছাড়া কোন পেশায় সফলতা সম্ভব নয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বেলায়ও বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য। অনুসন্ধান এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে লুকিয়ে থাকা, চাপিয়ে রাখা কিংবা খালি চোখে দেখা যায় না এমন তথ্যকে জনসমক্ষে

[৩৬] Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals, Chapter 1 http://www.investigative- journalism-africa.info/.

তুলে আনাকে নির্দেশ করে। আর এই পুরো প্রক্রিয়াটিই পরিচালনা করতে হয় অসীম ধৈর্য্য সহকারে। অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার কোন স্তরে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা বিফলে যেতে পারে। কারণ দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলে গেলেও কোন কোন ক্ষেত্রে কাঙ্খিত তথ্যটি হাতে না লাগতে পারে কিংবা যে সূত্রের ভিত্তিতে অনুসন্ধান সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা তারও দেখা না মিলতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রতিবেদককে ধৈর্য সহকারে কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বলা হয়ে থাকে, '*গুজব কখনও ভাল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে না*।'

দক্ষ প্রতিবেদন রচনাকারী

প্রতিবেদন রচনায় দক্ষতা অর্জনের জন্য একজন সাংবাদিকের যে একাডেমিক ডিগ্রি থাকতে হবে এমনটি নয় তবে প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার বিষয়টি এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত সংবাদসূত্র শনাক্তকরণ, প্রতিবেদন পরিকল্পনা ও গবেষণা, সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং নির্ভুল ও তথ্যবহুল প্রতিবেদন রচনার জন্য তাকে সাংবাদিকতার মৌল বিষয়সহের উপর দখল রাখতে হয়। কেবল অনুসন্ধান ও তথ্যের নিভুর্লতার মাধ্যমে একটি সফল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচিত হবে একথা সর্বাংশে সঠিক নয়। প্রতিবেদকের যদি সাংবদিকতার বুনিয়াদি বিষয়াদির ওপর দখল না থাকে তাহলে প্রতিবেদকের লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। যেমন সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় কিংবা নথি সংগ্রহ ও যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ায় যদি সাংবাদিকতার মৌল বিষয়সমূহের যথাযথ প্রয়োগ না ঘটে সেক্ষেত্রে প্রতিবেদনে অসঙ্গতি অনিবার্য।

ভাষাগত দক্ষতা

ভাষাগত দক্ষতা অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের ক্ষেত্রে অন্যতম যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়। ভাষাগত দক্ষতা মূলত লিখন, শ্রবণ, পঠন ও কথন এই চারটি গুণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ শুধু ভাল লিখতে পারলেই ভাষাগত দক্ষতা অর্জিত হয় এটা সঠিক নয়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনার প্রক্রিয়ায় একজন প্রতিবেদককে তথ্য সংগ্রহের জন্য যেমন সূত্রের সাথে কথা বলতে হয়, তেমনি বহু ধরনের নথি যাচাই-বাছাই করতে হয়। এক্ষেত্রে সব নথি যে বাংলায় পাওয়া যাবে এমনও নয়; কিছু নথি ইংরেজি ভাষায়ও থাকতে পারে। আবার অনুসন্ধানের সকল ধাপ পেরিয়ে একটি সুসংহত, সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামোয় প্রতিবেদনটিকে সাজাতে হয়। অর্থাৎ সকলক্ষেত্রেই প্রতিবেদকের ভাষাগত দক্ষতার প্রয়োজন আছে। ভাল অনুসন্ধানকারী হওয়ার পর অনেক ক্ষেত্রে উক্ত যোগ্যতার অভাবে প্রতিবেদন তার আবেদন হারাতে পারে। সুতরাং প্রতিবেদককে এই দক্ষতা অর্জনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হয়। আর এক্ষেত্রে অনুশীলনের বিকল্প নেই।

নমনীয়তা

নমনীয়তা বলতে যেকোন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে তার কর্মের প্রকৃতি অনুসারে এই গুণটি রপ্ত করতে হয়। কারণ একটি অনুসন্ধান প্রকল্প যেকোন মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত বাঁক নিতে পারে। এজন্য প্রতিবেদককে মানসিকভাবে সদা প্রস্তুত থাকতে হয়। অসুন্ধানের কোন কোন ধাপে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যা প্রতিবেদকের অনুমান সীমার মধ্যেই ছিল না। এক্ষেত্রে প্রতিবেদকের নমনীয়তা সামনে চলার পথ বলে দেয়। এজন্য প্রতিবেদককে সবসময় অনুসন্ধান প্রকল্পটি নিয়ে পুনরায় চিন্তা করা ও পুনঃ নকশাকরণের মানসিকতা ধারন করতে পারে। প্রতিবেদক যদি প্রাথমিক

চিন্তার ঘোরটোপে আটকে পড়েন তবে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে যেতে পারে।

বিচক্ষণতা

অনুসন্ধান প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে চূড়ান্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়। প্রতিবেদকের অসতর্কতার ফলে শুধু যে প্রতিবেদন ঝুঁকির মুখে পড়ে এমন নয় বরং প্রতিবেদকের ব্যক্তিগত ঝুঁকির আশংকাও থাকে। তাই অনুসন্ধানী সাংবাদিককে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তার অনুসন্ধান কাজটি পরিচালনা করতে হয়।

সাধারণ জ্ঞানের বিস্তৃতি ও গবেষণার দক্ষতা

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা মূলত গবেষণা নির্ভর সাংবাদিকতা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য তথ্য থেকে, তথ্যের জট থেকে সত্যকে মুক্তি দেন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক। এ কারণে যেকোন বিষয়ে তার কাম্যস্তরের জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া অনুসন্ধানের প্রেক্ষিত অনুধাবনের মধ্য দিয়ে প্রতিবেদক তার অনুসন্ধান কর্মটিকে ভুল পথে যাওয়ার বিপদ থেকে রেহাই দিতে পারেন। একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে অনেকক্ষেত্রে এমন বিষয় নিয়ে কাজ করতে হয় যার সাথে তিনি পরিচিত নন। এমন পরিস্থিতিতে ওই বিষয়ের মৌল ধারণাসমূহ প্রতিবেদককে দ্রুত আত্মস্থ করতে হয়। এক্ষেত্রে কার্যকরভাবে তথ্য খোঁজা, যথার্থ সূত্রের সাথে আলাপ, ইন্টারনেটে তথ্যের অনুসন্ধান, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাসঙ্গিক সাহিত্য সবই প্রতিবেদকের আমলে নিতে হয়। আর এজন্য প্রয়োজন বিস্তৃত সাধারণ জ্ঞান ও গবেষণার মৌলিক দক্ষতা।

নৈতিকতা

সাংবাদিকতায় নৈতিকতার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বেলায় বিষয়টি আরো বেশি প্রযোজ্য। কারণ এর সংবেদনশীলতা। অনুসন্ধনী প্রতিবেদন যেহেতু অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, সেক্ষেত্রে প্রতিবেদকের সামান্য নৈতিক বিচ্যুতি ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। আমাদের দেশে আজকাল কিছু সাংবাদিকই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন বলে একটি অভিযোগ প্রায়শই শোনা যায় যা অত্যন্ত নীতি বিবর্জিত কাজ। সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের বিশ্বস্ততায় ফাঁটল ধরলে সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যম যে তার জন্য আবেদন হারাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই অনুসন্ধানী সাংবাদিককে তার ব্যক্তিগত ও পেশাগত নৈতিকতা, দুটোই সমানভাবে মেনে চলতে হয়।

তথ্যসূত্র

Bruce Itule and Douglas Anderson (2007), News Writing and Reporting for Today's Media, 7th edition, McGraw Hill New York U.S.A.

Curtis D. MacDougall (1982), Interpretative Reporting, 8th ed., New York: Macmillan Publishing Co., Inc.

David L. Protess et al. (1991), The Journalism of Outrage: Investigative Reporting and Agenda-building in America, New York: The Guilford Press.

Derek Forbes (2005), A watchdog's guide to investigative reporting: A simple introduction to principles and practice in investigative reporting, Konrad Adenauer Stiftung Media Programme, Johannesburg, Republic of South Africa.

Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals, http://www.investigative-journalism-africa.info/.

Hugo de Burgh (2008), Investigative Journalism: Context and Practice, Routledge.

John, Ullman and Jan, Colbert (1991), The Reporter's Handbook: an Investigator's Guide to Documents and Techniques, New York: St. Martin's Press.

Lovell P. Ronald (1983), Reporting Public Affairs: Problems and Solutions, Belmont, Calif: Wadsworth.

Manual for Arab Journalists on Freedom of Information and Investigative Journalism (2007), Article 19, London, October 2007, www.article19.org.

Paul N. Williams (1978), Investigative Reporting and Editing, PRENTICE-HALL, INC., Englewood Cliffs, New Jersey.

Peter Benjaminson and David, Anderson (1990), Investigative Reporting, 2nd ed, Ames: Iowa State University Press.

Sheila S. Coronel (2009), Digging Deeper: A Guide for Investigative Journalists in the Balkans, Sarajevo, Balkan Investigative Reporting Network.

William C. Gaines (1998), Investigative Reporting for Print and Broadcast, 2nd ed., Belmont, CA: Nelson-Hall, Inc.

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/395831/muckraker.

অধ্যায়
৪

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

এ অধ্যায়ে থাকছে

- বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চালচিত্র
- বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা
- বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বাধাসমূহ

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চালচিত্র

অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বাংলাদেশের গণমাধ্যমের চেহারা এখন অনেক বেশি গতিময়। জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদপত্রের পাশাপাশি পঁচিশের বেশি টেলিভিশন চ্যানেল, এফ এম রেডিও চ্যানেলের সাথে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্ত হয়েছে অনলাইন সংবাদপত্র। সবমিলিয়ে সংবাদময় গণমাধ্যমের অবয়ব নিয়েছে বাংলাদেশ। তবে যে হারে গণমাধ্যমের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিকাশ ঘটেছে এই ভূখণ্ডে সে অনুপাতে বাড়েনি গণমাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পরিসর। এ প্রসঙ্গে ড. আলী রিয়াজ বলেন, "*বিভিন্ন সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে উল্লেখ করার মতো দু'একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন চোখে পড়ে বটে, কিন্তু তার কোনো ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় না। দীর্ঘদিন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি অথবা আমাদের দেশের সাংবাদিকতার মৌলিক দুর্বলতা, যে কোনো কারণেই হোক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নিয়ে খুব একটা আলাপ-আলোচনা চোখে পড়ে না। প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের সংবাদমাধ্যমগুলো এখনও গড়ে উঠতে পারেনি। এটিও আমাদের দেশে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের অনুপস্থিতির অন্যতম একটি কারণ। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম মালিকরা অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। অপরাপর ব্যবসার স্বার্থে অনেকে সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেন। ফলে ভালো সংবাদপত্রের যে সব চাহিদা সেগুলো এবং সংবাদপত্রের যে সামাজিক ভুমিকা সে বিষয়ে কোনো উৎসাহ মালিকদের ভেতরে লক্ষ্য করা যায়না।*"[৩৭]

প্রশ্ন হলো গণমাধ্যমে কেন নেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা? এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা এবং দেশের গণতান্ত্রিক চর্চার ম্রিয়মান বাস্তবতার ভেতরেই। সংবাদ হবে বস্তুনিষ্ঠ এবং শেষ বিচারে সংবাদ হয়ে উঠবে শুধুই পাঠক বা দর্শকের- এমন দর্শন আমাদের গণমাধ্যম জগতে এখন প্রায়ই শূন্যের কোঠায়। সংবাদের সাথে বিজ্ঞাপনের যৌথ অংশীদারিত্ব, সংবাদের ভেতরের স্বার্থ হাসিলে সক্ষম মতামতের অনুপ্রবেশ, কোন কোন ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মীর ঐকান্তিকতার অভাব সবমিলিয়ে খবরের পাতা কিংবা পর্দা থেকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা আজ উধাও। গণমানুষের মাধ্যম বলে গণমাধ্যমের কাছে গণমানুষের প্রত্যাশাও অনেক। যে দেশের গণমাধ্যম যত বেশি স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সে দেশের গণমাধ্যমের জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলনও বেশি ঘটে। কিন্তু বাংলাদেশের গণমাধ্যম বর্তমানে আপাত স্বাধীনতার যে মুখোশ নিয়ে সাংবাদিকতার চর্চা করছে তাতে নির্মোহভাবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা করা খুবই দুরূহ। কারণ এটি সাংবাদিকতার এমন এক ধারা যেখানে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সদিচ্ছার পাশাপাশি, সংবাদকর্মীর যথাযথ যোগ্যতা

[৩৭] আলী রিয়াজ (১৯৯৪), অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হ্যান্ডবুক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ-৩৪।

ও দক্ষতার এবং সংবাদমাধ্যমের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন। নতুবা প্রতিবেদকের দারুণ ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অনেক প্রতিবেদন শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনা।

বর্তমানে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের যে অপরিমিত বিকাশ তাতে করে উপজাত হিসেবে উৎপাদিত বাস্তবতার নাম বিজ্ঞাপন-সংবাদের যৌথ অংশীদারিত্ব। এতে করে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খোদ সাংবাদিকতাই। কোন অবস্থাতেই বিজ্ঞাপনের সাথে আপোসের সুযোগ বিদ্যমান গণমাধ্যম অর্থনীতিতে আর নেই। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাসজ্জা ও ট্রিটমেন্ট থেকে শুরু করে টেলিভিশন বুলেটিনের রান-ডাউন (সংবাদ ধারাক্রম) সবই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ধনতন্ত্রের ভরকেন্দ্র হয়ে ওঠা বিজ্ঞাপনের ইশারায়। যৌক্তিক আলোচনায় পাল্টা ভাবনা আসতে পারে, বিজ্ঞাপন যেহেতু গণমাধ্যমের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি সেহেতু বিজ্ঞাপনকে সাথে নিয়েই গণমাধ্যমের নিত্যদিনের পথচলা তৈরি করতে হবে। কিন্তু বিপত্তি দেখা দেয় তখনি যখন বিজ্ঞাপনের অসীম ভারে সাংবাদিকতার শুদ্ধ ও স্বাভাবিক পথচলায় বিঘ্ন ঘটে। এতো গেল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার হালচাল। অন্যদিকে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান নিজেও অনেকক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি উৎপাদন করে যেখানে সাংবাদিকতার এ বিশেষ ধারার চলাচল ব্যাহত হয়। যেমন ধরা যাক, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নীতি বা পলিসির কথা। একটি সংবাদ মাধ্যম কী পরিবেশন করবে বা করবে না তার পুরোটাই নির্ধারিত হয় সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যমের নীতিকে সামনে রেখে।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, হাতে গোনা কয়েকটি জাতীয় দৈনিক ও অনলাইন পত্রিকা এবং কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেল বাদে অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমই বর্তমানের ডে-ইভেন্ট এবং রুটিন সাংবাদিকতার বোতল বন্দি। রুটিন সাংবাদিকতা ও ডে-ইভেন্টের ক্ষেত্রে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো আবার অবলম্বন করছে 'টাচ এন্ড গো' নীতি অর্থাৎ বুলেটিনে কোনমতে খবর খানা ধরিয়ে ফের সংবাদের সন্ধানে দে-ছুট। এতে করে একদিকে অডিয়েন্স যেমন বঞ্চিত হচ্ছে সংবাদের নির্যাস থেকে অন্যদিকে সাংবাদিকতা নামে যা হচ্ছে তাতে কেবল ভিডিও এবং অডিওয়ের ভারসাম্যহীন প্রজেকশন বলা যেতে পারে। ফলে সবমিলিয়ে না হচ্ছে খবরের সন্ধান, না হচ্ছে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে। দেশের তারকা ক্রিকেটার সাকিব-আল-হাসানের বিষয়ে বিসিবি (বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড) এর শাস্তিমূলক সিদ্ধান্তের বিষয়ে দেশের গণমাধ্যম ফলাও করে সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার করেছে। নি:সন্দেহে সংবাদমূল্যের নিক্তিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। তবে এই ঘটনার সমস্ত প্রতিবেদনগুলো ভাষ্যকেন্দ্রিক সাদামাটা সংবাদ। সাকিবের দেশে ফিরে আসা, বিসিবি'র বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত, কোচের চিঠি ইত্যাদি। যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বক্তব্যকে সংবাদের সূত্র ধরে সংবাদ রচিত হয়েছে। কোন গণমাধ্যমেই এ সংক্রান্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন চোখে পড়েনি। বিশেষ অনাপত্তিপত্র ছাড়া একজন জাতীয় দলের ক্রিকেটার কিভাবে ইমিগ্রেশন পার হলেন। কোন প্রতিবেদকই এটি খতিয়ে প্রকৃত সত্য তুলে আনতে পারেননি। উক্ত ঘটনার পাশাপাশি সাম্প্রতিক নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের ঘটনার প্রতিবেদন প্রচার এবং প্রকাশের ক্ষেত্রেও চোখে পড়ার মতো কোন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নিদর্শন পাওয়া যায়নি। বরং এ ধরনের সংবেদনশীল ঘটনা প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু কিছু গণমাধ্যম দায়িত্বহীনতা ও নীতিহীনতার চরম পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ অভিযুক্ত নূর হোসেন এর দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে চটকদার মোড়কে নির্মিত সংবাদ শেষ বিচারে পুরুষীয় তুষ্টির খোরাক হয়েছে। এছাড়া অভিযুক্ত র‍্যাব

কর্মকর্তাদের সাথে অভিযুক্ত নুর হোসেনের ফোনালাপের হুবহু অনুলিপি সাংবাদিকতার কোন শ্রেণিতে পড়ে তাও বোধকরি একাডেমিক বিবেচনার দাবি রাখে। এ ছাড়া এ ধরনের সংবাদ লাইভ সম্প্রচারের ক্ষেত্রে প্রতিবেদক ও ক্যামেরাপার্সনদের যে ধরনের দায়িত্ববোধ ও সংবেদনশীলতা থাকা প্রয়োজন তাও ক্ষেত্রবিশেষে অনুপস্থিত ছিল। এতো গেল বুলেটিনভিত্তিক সংবাদক্ষেত্রের আলোচনা। দৃষ্টি দেয়া যাক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রামাণ্য অনুষ্ঠানগুলোর দিকে। দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে অনুসন্ধানী সংবাদ সাদামাটা সংবাদের তুলনায় বড়। বিশেষত টেলিভিশন সংবাদের ক্ষেত্রে প্যাকেজ সংবাদের গড় দৈর্ঘ্য দেড় থেকে আড়াই মিনিট। এমন বাস্তবতায় পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বুলেটিনে অন্তর্ভুক্ত না করে অনুসন্ধানী সংবাদ বিষয়ক আলাদা সংবাদ অনুষ্ঠান প্রচারের চল ইদানিংকার চ্যানেলগুলোর জনপ্রিয় প্রবণতা হিসেবে ধরা যেতে পারে। তালাশ (ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন), মুখোশ (মাই টিভি), সমীকরণ (একাত্তর), খোঁজ (এস এ টিভি), ৩৬০ ডিগ্রি (যমুনা টেলিভিশন) ইত্যাদি। প্রায়ই সবগুলো অনুষ্ঠানের বিষয় এবং পরিবেশনার ধরন একই রকম, যা এ ধরনের অনুষ্ঠানের বড় সীমাবদ্ধতা। এছাড়া আন্ডার কাভার রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে যে কৌশল ও নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন তাও অনেক ক্ষেত্রে আমলে নেয়া হয় না। এজন্য কোন কোন প্রতিবেদন বেশ আক্রমণাত্মক রূপে পরিগ্রহ হয়। যা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়।

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চালচিত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার পেশাদারিত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যে কোন পেশার উৎকর্ষতা ও বিকাশের জন্য পেশা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিষ্ঠা অপিরহার্য পাশাপাশি গুণগত পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকল্পে উক্ত পেশার জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা রাষ্ট্রের দায়িত্বও বটে। বিষয়টি অনেকটা দ্বি-মুখী যোগাযোগ প্রবাহের মতো। অর্থাৎ ব্যক্তি যেমন তার পেশার প্রতি নিষ্ঠাবান হবেন তেমনি রাষ্ট্রও উক্ত পেশার পেশাদারিত্ব রক্ষায় সম্ভব সবকিছু করতে প্রতিশ্রুত থাকবে। এ ব্যবস্থা একমুখী হলেই ঘটবে বিপত্তি। বাংলাদেশের সাংবাদিকতা শিক্ষার ৫০ বছর পার হলেও এখন পর্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাংবাদিকতা তার কাঙ্ক্ষিত পেশাদারিত্বের মাত্রা অর্জন করতে পারেনি। এর পেছনে একদিকে যেমনি কাজ করেছে বিভিন্ন সরকারের বিবর্তনমূলক নীতি, তেমনি কাজ করছে মালিকপক্ষের চরম উদাসীনতা। গুটি কয়েক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান বাদ দিলে সংবাদকর্মীদের বেতন এবং চাকুরীর নিশ্চয়তা যেটি যেকোন পেশার বুনিয়াদি শর্ত নিশ্চিত হয়নি। বেতন ছাড়া কর্ম মফস্বল সাংবাদিকতার অন্যতম চরিত্র। ফলে ‘করে খা’ নীতিতে বলীয়ান সংবাদ কর্মীরা অন্যের দুর্নীতির মুখোশ উম্মোচন না করে নিজেরাই ঢুঁ মারছেন দুর্নীতির চোরাগলিতে। যদিও একথা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তথাপি মোটাদাগে প্রান্তিক বলয়ের সাংবাদিকতা চরিত্র অনুধাবনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এ কারণে মফস্বলের দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা আটকে আছে, জনপ্রতিনিধিদের গম, টিন চুরির নিগড়ে। এ থেকে উত্তরণের জন্য সাংবাদিকদের যে ধরনের প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন তার যথাযথ কোন প্ল্যাটফর্ম নেই। ফলে একদিকে অর্থের হাহাকার অন্যদিকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দৈন্যতা সবমিলিয়ে ধুঁকছে প্রান্তিক অঞ্চলের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। তবে কেন্দ্রের বাস্তবতাও যে খুব একটা ভিন্ন তা জোর দিয়ে বলার উপায় নেই। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য যে ধরনের পরিশ্রম ও পেশাগত নিষ্ঠা বিনিয়োগ করা প্রয়োজন সে ধরনের বিনিয়োগে আগ্রহী নন এখনকার অধিকাংশ সংবাদকর্মী। অল্প পরিশ্রমে সেলিব্রেটির তকমার অনুসন্ধানী সংবাদকর্মীরা তাই অনুকূল পরিবেশ পেলেও সহজাত সীমাবদ্ধতার কারণে রচনা করতে

পারছেন না মানসম্মত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। এ ছাড়া মামলা মোকদ্দমার ভয়, প্রেস কাউন্সিলের সীমিত ক্ষমতা, পেশী শক্তির দাপট, প্রশাসনের অসহযোগিতা, সিন্ডিকেট ও ডেস্ক রিপোর্টিংয়ের প্রবণতা ইত্যাদির কারণে বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা কোনক্রমেই সন্তোষজনক নয়। এ সাংবাদিকতা যথাযথ নিশ্চিত করতে হলে তাই সাংবাদিকতার শিক্ষা, চর্চা ও দর্শনের মধ্যেই আনতে হবে আমূল পরিবর্তন। নিশ্চিত করতে সংবাদকর্মীদের পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ, তৈরি করতে হবে এই বিশেষ ধারার সাংবাদিকতার বৃহৎ নেটওয়ার্ক। এজন্য প্রয়োজন শক্তিশালী সমন্বিত গণমাধ্যম নীতিমালা। যা এ পেশার উৎকর্ষতা পাশাপাশি অনুসন্ধানীর সাংবাদিকতার জন্য এমন এক পরিসর বা পরিবেশ নির্মাণ করবে যেখানে প্রকৃত অর্থেই গণমাধ্যম গণমানুষের কথা বলবে এবং সাংবাদিকতাই হবে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার।

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সূচনাপর্ব থেকেই এ ধারার সাংবাদিকতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি একটি আলোচিত প্রপঞ্চ। মূলত দুর্নীতি, অনিয়মের মূল উৎপাটন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমুন্নত রেখে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি ঘোষিত যুদ্ধ হিসেবেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় বাজেটের অপচয়, সরকারী-বেসরকারী খাতের দুর্নীতি, দাপ্তরিক কেলেংকারী, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা ইত্যাদির উন্মোচন সুশাসনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। পাশাপাশি বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তন আনয়ন ও সংস্কার সাধনে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। এক্ষেত্রে অনুসন্ধানী সাংবাদিক সুচিন্তিতভাবে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় জনগণের এজেন্ডায় পরিণত করেন। এতে করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একদিকে যেমন জনমত তৈরি হয়, অন্যদিকে সুশীল সমাজ ও নীতি নির্ধারকদেরও টনক নড়ে। ফলে গণতন্ত্র ও সুশাসনের ভিত যেমন শক্তিশালী হয় তেমনি সর্বক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কাজটিও তরান্বিত হয়। এটিকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সমবেতকরণ মডেল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

গণমাধ্যম জনগণের জানা প্রয়োজন এমন বিষয় অবহিত করে

⇩

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জনগণই ঠিক করে কোন বিষয়ে সংস্কারের জন্য তারা সোচ্চার হবেন

⇩

নীতি নির্ধারকগণ জনচাপে সাড়া দেন এবং সংস্কার বা পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন

⇩

গণমাধ্যম নীতি নির্ধারকদের নেয়া পদক্ষেপের কথা পুনরায় জনগণকে অবহিত করেন

সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণের জানার সাথে গণতন্ত্র ও সুশাসনের একটি সহ-সম্পর্ক রয়েছে। উপরের আলোচিত গণমাধ্যমের সমবেতকরণ মডেলের যথাযথ বাস্তবায়ন হলে গণমাধ্যম তার অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালনে সফল হয়। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যদিও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জারি রাখার জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে, যেখানে ভোটারগণ পাঁচ বছরের জন্য কোন একটি দলের কাছে দেশের দায়িত্ব দিয়ে নাগরিক হিসেবে তার নৈতিক

দায়িত্বটি পালন করে বটে কিন্তু যাকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হল সে সরকার ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করছে কিনা এর তদারকির ব্যবস্থা কিংবা আরো স্পষ্ট করে বললে সরকারকে চোখে চোখে রাখার দায়িত্বটি গণমাধ্যমের উপরই বর্তায়। যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারকে জবাবদিহি করে তোলার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের ভূমিকাই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কথা কিন্তু বাংলাদেশের নিকট ইতিহাসে বিরোধী দল সে ধরনের প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে এমন কথা জোর দিয়ে বলার সুযোগ খুব একটা নেই। এ কারণে গণমাধ্যমকে বিরোধীদলের সেই ঘাটতিটুকুও পূরণ করতে হয়। আর গণমাধ্যম যেহেতু রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ তাই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মাধ্যমে গণমাধ্যম তার এই ভূমিকাটি সফলতার সাথে পালন করতে পারে।

তৃতীয় বিশ্বের যেকোন উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এখনও রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের দুর্নীতি, অনিয়মের ফিরিস্তি দখল করে রাখে সংবাদমাধ্যমের স্থান ও সময়। এমন বাস্তবতায় সুশাসন নিশ্চিত ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কেননা সুশাসনে সাথে একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাংলাদেশে গত চার দশকের উন্নয়নের ধারাকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও সুশাসনের বিষয়টি সরাসরি সম্পৃক্ত। ক্ষমতার সাথে ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়টি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। যিনি বা যারা ক্ষমতায় থাকেন তাদের কেউ কেউ ক্ষমতার অপব্যবহার করে, আইন ভঙ্গ করে, অর্থের পাহাড় গড়ে তোলার কর্মে লিপ্ত হন আর এতে শেষ বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জনগণ। তাই অনুসন্ধানী সাংবাদিককে সর্বদা এই ক্ষমতাকাঠামো চোখে চোখে রাখার কাজটি করে যেতে হয়। বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে জন রায় আদায়ে জনগণকে প্রতিশ্রুতি প্রদান, ক্ষমতায় আসার অতপর প্রতিশ্রুতি পূরণে উদাসীনতা এরকম একটি প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ জনপ্রতিনিধি বা সরকার অনেক সময় প্রকৃত সত্যকে গোপন করে জনদৃষ্টিকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার যে চেষ্টাটি করেন সেক্ষেত্রে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। যাবতীয় অন্যায়, অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ভাষাই হল অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। বর্তমান বাংলাদেশের বাস্তবতায় তাই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার গুরুত্বকে নতুন করে অনুভব করতে হবে।

সুতরাং যা-কিছু মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করতে পারে তার সবটুকু তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এগুতে থাকলে সবধরনের দুর্নীতি, শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্যমুক্ত একটি বাংলাদেশ নির্মাণ সহজ হবে।

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বাধাসমূহ

স্বাধীনতার ৪৩ বছর পার হলেও এখনো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের সীমা ছাড়িয়ে সামনে এগুতে পারেনি বাংলাদেশ। ফলে রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বস্তরের ন্যায় সাংবাদিকতাও সংগ্রামী বাস্তবতা নিয়ে পথ চলেছে এর শুরু থেকেই। বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বাধাসমূহ আলোচনার ক্ষেত্রে মূলত সাংবাদিকতার, আরো স্পষ্ট করে বললে স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রতিবন্ধকতাসমূহ প্রথমেই আলোচনার দাবি রাখে। সন্দেহাতীতভাবে একথা সত্য যে, কোন সাংবাদিকতাই অন্তিম নির্ণয়ে স্বাধীন নয়। তথাপি এটি যেহেতু জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিবিম্ব তাই একে ধারণ করতে হয় মুক্ত প্রকাশের চেতনা। নতুবা হাজার সংবাদের পসরা

নিয়েও জনআস্থার সংকটে ভুগতে হয় গণমাধ্যমটিকে। আলোচনার শুরুতেই বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতে প্রাথমিক প্রবেশের বাধা বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া যাক। বিপুল পরিমাণ অর্থের পাশাপাশি রাজনৈতিক সুবিধাভোগী অঞ্চলের না হলে এ বাজারে প্রবেশই হয়ে ওঠে দুরূহ। অর্থাৎ অর্থের বিশালত্ব এবং আমলাতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক জটিলতা এদেশে সাংবাদিকতা শুরুর প্রাথমিক বাধা হিসেবে বিবেচ্য। যদিও কাগজে কলমে বলা আছে, বাজার সবার জন্য উন্মুক্ত। এই চাপের কারণেই যারা বিকল্প কণ্ঠস্বরে ভিন্ন কিছু করার প্রত্যয় নিয়ে সামনে আসতে চান তাদের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় না। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বেগমান ধারা তৈরি ও তা জারি রাখার জন্য যে সাহসী পদক্ষেপ প্রয়োজন তা বাংলাদেশে গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থার কারণে এখনো গড়ে ওঠেনি।

দ্বিতীয়ত, বেসরকারী গণমাধ্যমের মালিকানায় কর্পোরেট বাণিজ্যের হাওয়া লেগেছে বেশ জোরেশোরে। মালিকানার শক্তিতে সামাজিক মূল্যবোধ, সম্পাদকীয় নীতি, বাজার সবখানেই সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। কর্মী নিয়োগ, ছাটাই, সাংগঠনিক নীতির ব্যবহার ইত্যাদি চর্চার মধ্য দিয়ে মিডিয়া ক্রমাগত কর্পোরেট চরিত্র ধারণ করছে। ফলে মুনাফার পিছে ছুটতে থাকায় মাত্রাতরিক্ত বিনোদন ও বাজারমুখীনতার গ্রাসে গণমাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতা লোপ পেতে বসেছে। যে কারণে বিজ্ঞাপনদাতার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন কোন সংবাদ সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমে প্রচার বা প্রকাশ পায় না। এ কারণে কর্পোরেট দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা তেমন একটা চোখে পড়ে না। বরং উল্টোচিত্রটি ঘটছে হরহামেশাই। অর্থাৎ কোন একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ কোন মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন না দিলে ক্ষেত্রবিশেষে উক্ত মিডিয়া সংবাদের মোড়কে এমন বিষয় প্রচার বা প্রকাশ করে যাতে বিজ্ঞাপন না দিয়ে উপায়ন্তর থাকে না প্রতিষ্ঠানটির। এভাবেই গণম্যাধম ও বিজ্ঞাপনের যৌথ অংশীদারিত্বের ফলে গণমাধ্যম বিজ্ঞাপনদাতার স্বার্থের বৈধতা দেয়। এরূপ অবস্থায় কোন কোন গণমাধ্যমের জন্য কর্পোরেট দুর্নীতির খবর প্রকাশ বা প্রচারের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, সংবাদ বিষয়ক যথাযথ জ্ঞানের অভাব অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। যে কোন সংবাদমাধ্যমের প্রধান কাজ সংবাদ পরিবেশন করা যা সংবাদ মাধ্যমগুলো ঐতিহাসিকভাবেই করে আসছে। তাহলে সংবাদ বিষয়ক জ্ঞানের ঘাটতি এলো কোথা থেকে? বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, সাংবাদিকতা তথ্যজ্ঞাপনের বাহনমাত্র কোনক্রমেই প্রচার-প্রচারণার মাধ্যম নয়। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে কখনো কখনো মনে হয়, কোন কোন সংবাদমাধ্যম এটিকে বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রচার-প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। অর্থাৎ সংবাদ ও সাংবাদিকতার মূল দর্শন থেকে সরে এসে সংবাদের নামে যা প্রচার বা প্রকাশ করছে তাতে সাংবাদিকতা বলার জো নেই। আর একারণেই পত্রিকার বা ওয়েবের পাতা কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় অনুসন্ধানী সংবাদের দেখা মেলে কালেভদ্রে। কারণ অনুসন্ধানী সংবাদ রচনার জন্য প্রয়োজন অনুসন্ধিৎসু সংবাদমনস্ক সংবাদকর্মীর, যারা খবরের পেছনের খবরকে তুলে আনবেন পাঠক-দর্শকের সামনে।

চতুর্থত, গণমাধ্যমের প্রাতিষ্ঠানিক উদাসীনতাকেও বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চার বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা একটি ব্যয়বহুল ও শ্রমসাধ্য কাজ। তাই এ ধরনের বিনিয়োগে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের বিশেষত মালিকের উদাসীনতা নিয়মিত পরিলক্ষিত হয়। ফলে প্রয়োজন থাকলেও আয়োজনের অভাবে এ সাংবাদিকতা কিছু

দূর গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। এছাড়া পুঁজিবাদের মৌল চরিত্র (কম বিনিয়োগে বেশি উৎপাদন ও মুনাফা অর্জন) ধারণ করা গণমাধ্যমও চান না তার খরচের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে মুনাফার চৌহদ্দি সীমিত করতে। অথচ গণমাধ্যমসমূহ ভুলে যান দুর্দান্ত একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন মুহূর্তেই পাল্টে দিতে পারে তাদের গণমাধ্যম অর্থনীতির ভূগোল।

পঞ্চমত, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায়। সাংবাদিকতা এমন এটি যজ্ঞ যেখানে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। কারণ এটি যতটা না সৃজনশীল তার ঢের বেশি মননশীল (ইন্টিলেকচুয়াল) কর্ম। একজন লেখক যেমন তার কল্পনার রঙ মিশিয়ে ঘটনা বয়ান করতে পারে সত্য বা বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি অনুগত থাকা তার জন্য বাঞ্চনীয় নয়, প্রকারান্তরে একজন প্রতিবেদককে সর্বদা সত্যনিষ্ঠ থাকতে হয়। সাংবাদিকতার প্রচলিত নীতিমালাকে অতিক্রম করে কাল্পনিক বা মন্তব্য মিশ্রিত কোন কিছু বয়ানের সুযোগ তার নেই ফলে ব্যক্তির ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাকাল্টি সমৃদ্ধ না হলে এবং বিশেষ কিছু পারঙ্গমতা না থাকলে তার পক্ষে অনুসন্ধানী সাংবাদিক হওয়া প্রায় অসম্ভব। সুতরাং এজন্য চাই যথাযথ প্রশিক্ষণ। যার সুযোগ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখনো সীমিত অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে অপ্রতুল। রাজধানী ঢাকার বাইরে সংবাদ মাধ্যমগুলোতে যারা কাজ করেন তাদের বেশির ভাগেরই সাংবাদিকতার একাডেমিক পড়াশোনা থাকেনা। ফলে কাজ চালিয়ে যাওয়া অথবা ঠেকে শেখা নীতিতে চালিত সাংবাদিকতায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার স্থানিক আবহ সংকুচিত হয়ে পড়ে। এজন্য ইন-হাউস প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বাড়াতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষানবিশ প্রতিবেদক হিসেবে একজন ব্যক্তি যখন কোন সংবাদ মাধ্যমে কাজ শুরু করবেন, তাকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে স্বল্পমেয়াদে হলেও এ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে কর্মক্ষেত্রে প্রথম থেকেই নিজ নিজ বিট সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সে বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়নে উক্ত প্রতিবেদক সক্ষম হন।

ষষ্ঠত, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হলেও এর আশানুরূপ সুফল পাচ্ছেন না সংবাদকর্মীরা। এটিও এ ধারার সাংবাদিকতা চর্চার অন্তরায় হিসেবে বিবেচ্য। চালু আছে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য দিতে অনিচ্ছুক, বিষয়টি অনেকাংশে সত্য। তবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও যে চাহিবামাত্র প্রাপককে তথ্য দেন এমন নয়। ফলে প্রতিবেদন প্রণয়নে তৈরি হয় দীর্ঘসূত্রতা। এজন্য প্রয়োজন তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন। এ ছাড়া আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে ধর্না দিয়ে তথ্য না পাওয়া গেলে, তথ্য কমিশনের দ্বারস্থ হওয়ার যে সুযোগ রয়েছে, সেখানে দ্রুত নিষ্পত্তির সুযোগ খুব একটা নেই। এজন্য জাতিগতভাবে আমাদের মধ্যে লুকোচুরির যে সংস্কৃতি চালু আছে তার বিলোপ সাধন করতে হবে সবার আগে।

সপ্তমত, সাংবাদিকের নিরাপত্তার বিষয়টিও এ আলোচনায় যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। চরিত্রের দিক থেকে অন্যান্য সাংবাদিকতার চেয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা যেহেতু অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং সেহেতু ঝুঁকির মাত্রাও এখানে অনেক বেশি। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অনেক সংবাদকর্মী অনুসন্ধানী সংবাদ প্রতিবেদন রচনা করতে গিয়ে নানা ধরনের হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন, ফলে নিঃসঙ্কোচে সাংবাদিকতা চর্চার এ ক্ষেত্র বা সংস্কৃতিটি বিস্তৃতরূপ নেয়নি কোনকালেই। জাতীয় পর্যায়ে এ সমস্যা প্রকট না হলেও আঞ্চলিক পর্যায়ে সাংবাদিক নির্যাতনের খবর চোখে পড়ে নিয়মিত বিরতিতে। একজন সংবাদকর্মী যেহেতু এ সমাজের মাটি, জল আর বায়ুতে বেড়ে ওঠা ফলে আয়ু কমানোর ঝুঁকিতে না যাওয়ার ব্যাপারে তিনিও থাকেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তারপরও

যে কোন কোন সংবাদকর্মী এসবের উর্ধ্বে উঠে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা করছেন না এমনটি নয়, তবে সেটিও কেবল অপরাধ বিষয়ক। অপরাধের বাইরের যে সংবাদ উপাদানের বিস্তৃত পরিসর যেমন, পরিবেশ, শিক্ষা, পর্যটন, অর্থ-বাণিজ্য, ক্রীড়া, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন খুব একটা চোখে পড়ে না।

সমাপনী প্রতিফলনে বলা যায়, আমাদের দেশে প্রেসের স্বাধীনতায় নানা মাত্রার বাধা, গণমাধ্যমসমূহ নৈতিক ও অনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হওয়া, দক্ষতা ও পরিপক্কতার অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা, পেশী শক্তির দৌরাত্ম্য, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, সাংবাদিকদের নিরাপত্তাহীনতা, দ্বিধাবিভক্ত ও আত্ম-খণ্ডিত সম্পাদকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি নানা প্রপঞ্চ বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে বিবেচ্য।

তথ্যসূত্র

আলী রিয়াজ (১৯৯৪), অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হ্যান্ডবুক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ঢাকা, ডিসেম্বর **১৯৯৪**।

অধ্যায়
৫

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া

এ অধ্যায়ে থাকছে

- পেয়াজের খোসা ছাড়ানো
- অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ার কাঠামো
- অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের স্তরসমূহ
- অনুসন্ধান পরিকল্পনা
- লার্স মোলারের মডেল-অনুসন্ধানী পরিকল্পনার চেকলিস্ট

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া (Intellectual Process)।[৩৮] অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা করার সময় ধারণা ও তথ্য সংগ্রহ এবং সংগৃহীত তথ্য বাছাইকরণ, নকশা গঠন, বিকল্পসমূহ বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি যুক্তি নির্ভর হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো জটিল ও দুরূহ কাজ একজন প্রতিবেদককে করতে হয়। তবে এতগুলো ধাপ অতিক্রমের সময় যে কোন প্রতিবেদককে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে হয়; নেয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতিও থাকতে হয়। অনুসন্ধানী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে একজন সাংবাদিককে অনেকগুলো ধাপ পার হতে হয়। প্রতিদিনকার রিপোর্টিংয়ের মতো কিংবা রিপোর্টিংয়ের নিত্য নৈমিত্তিক রুটিন কাজের মতো অনুসন্ধানী সংবাদ এইমাত্র ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয়। বরং এ ধরনের প্রতিবেদনগুলো সুসংগঠিত চিন্তাভাবনার ফসল এবং একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এ ধরনের প্রতিবেদনগুলো তৈরি করতে হয়। যথাযথ ও যাচাইকৃত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদক একটি সুনির্দিষ্ট ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন বলে একে লক্ষ্যভেদী প্রতিবেদনও বলা হয়। একটি ধারণা (Idea) থেকে এ ধরনের প্রতিবেদনের জন্ম হয়। এরপর ধারাবাহিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে কঠোর পরিশ্রমের ফলে এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরিতে সফলতা পাওয়া যায়। Sheila S. Coronel বলছেন, "*The important thing to remember is that investigative reporting is a process; the journalists go from one step to another as they investigate wrongdoing.*"[৩৯]

পেয়াজের খোসা ছাড়ানো

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়াকে অনেক সময় পেয়াজের খোসা ছাড়ানোর (Peeling the onion) সাথে তুলনা করা যায়। এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরিতে সঠিক তথ্য খুঁজে বের করতে বিভিন্ন ধরনের সূত্র বা উৎস এবং নানা রকমের গবেষণা কৌশলের মাধ্যমে কয়েক স্তরে তথ্য বের করে আনতে হয়। সাধারণত সাদামাটা প্রতিবেদনে ঘটনার উপরিতলের বা ভাসাভাসা তথ্য বের করে আনে। কিন্তু অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের কাজ হলো ঘটনার গভীরে

[৩৮] Paul N. Williams (1978), Investigative Reporting and Editing, PRENTICE-HALL, INC., Englewood Cliffs, New Jersey, p. 12.

[৩৯] Sheila S. Coronel (2009), Digging Deeper: A Guide for Investigative Journalists in the Balkans, Sarajevo, Balkan Investigative Reporting Network, p 35.

যাওয়া এবং ঘটনার সঙ্গে কে বা কারা কিভাবে ও কেন জড়িত তা খুঁজে বের করে আনা। এ কারণে একটি ভাল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন 'পেয়াজের খোসা ছাড়ানো'র উদাহরণের একটি ভাল চিত্রায়ণ।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য এ ধরনের প্রতিবেদন রচনার প্রক্রিয়াটি জানা একান্তই অত্যাবশ্যক। কারণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে অনেক সময় প্রতিবেদকের আন্তরিক প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে মাঠপর্যায়ের কাজ শুরুর আগেই এ পরিকল্পনা সাজাতে হয়। তাকে জানতে হয়, তিনি যে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির পরিকল্পনা করেছেন তা আসলে করতে তিনি সক্ষম কীনা, প্রাপ্য সম্পদ, সময় সহ সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে সে প্রতিবেদন করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত। একটি ভাল পরিকল্পনা তাকে রিসোর্স বা সম্পদের অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে। এটি পেশাগত জীবনে খুবই দরকার। কারণ অযথা সময় ও অর্থের অপচয় একজন প্রতিবেদকের মনে হতাশার জন্ম দিতে পারে।

একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া হিসেবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য একজন প্রতিবেদককে অনেকগুলো ধাপ বা স্তর পার হতে হয়। এই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়াটি কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে কোন যাদুকরি কাঠামো বা ম্যাজিক ফর্মুলা নেই। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এমন পদ্ধতি ব্যবহার করেন যার মধ্যে একটি কাঠামো থাকে, থাকে কার্যকরী পরিকল্পনা আর একটি রোডম্যাপ থাকে যেখানে অনেকগুলো ধাপ থাকে। সেসব ধাপের আলোকেই একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে তার পরিকল্পনা ঠিক করতে হয়। এই ধাপগুলোতে অনুসন্ধানী প্রতিবেদক তার অগ্রগতি নিরূপন করতে পারেন।[৪০] এই খসড়া পরিকল্পনা তৈরির জন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে তথ্যের উৎস বা সূত্র, সেসব সূত্রের কাছে পৌঁছানোর উপায়, তথ্য উদ্ধারের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হয়। অর্থাৎ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তর সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয়।

অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ার কাঠামো

Paul N. Williams তাঁর "Investigative Reporting and Editing" বইতে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়ার পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো তুলে ধরে একটি কাঠামো দিয়েছেন।[৪১] তাঁর মতে, এর প্রত্যেকটি ধাপই গুরুত্বপূর্ণ। একটি ধাপ পেরিয়ে মাঝপথে ঘটনার নতুন মোড় খুলে যেতে পারে। আবার বেশ কিছু ধাপ এগোনোর পর প্রতিবেদক হয়তো বুঝতে পারবেন, তাকে নতুন করে অনুসন্ধান করতে হবে। সে কারণে Paul N. Williams তাঁর এ কাঠামো সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটিকে বিভিন্ন পর্যায়ে রেখেছেন।

[৪০] Ibid, Paul N. Williams (1978), p.13-14.

[৪১] Ibid, p.13-15

Paul N. Williams-এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রক্রিয়া কাঠামো

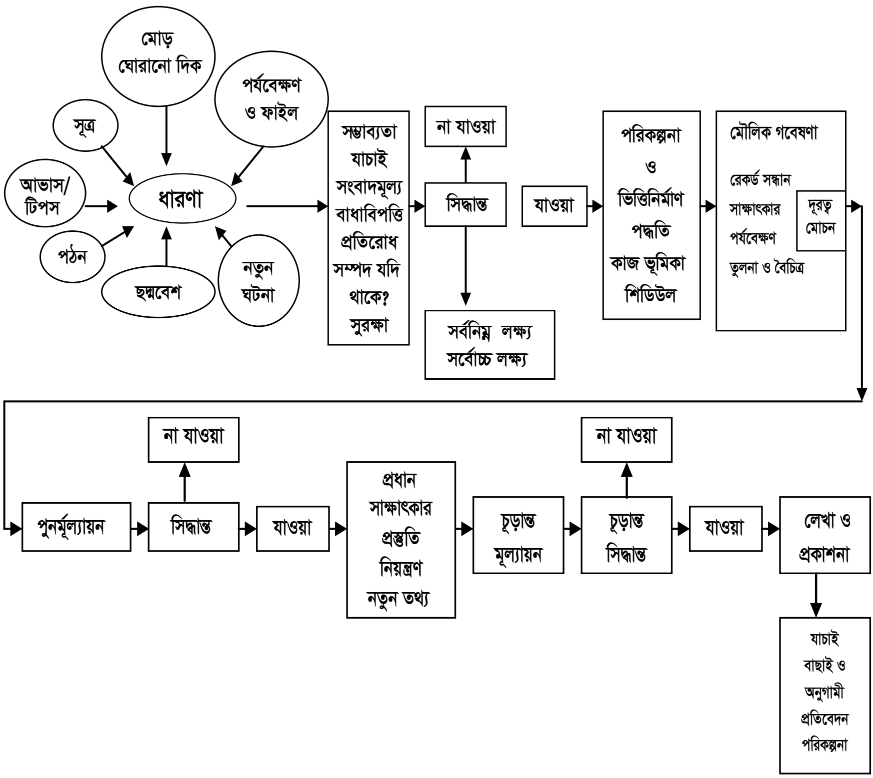

Paul N. Williams-এর মতে, সচেতন বা অচেতনভাবে, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক--যেভাবেই হোক না কেন একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে তার অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় উপরের প্রত্যেকটি স্তর অনুসরণ করতে হয় কিংবা পার করতে হয়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়াটি এতই জটিল যে, অনুসন্ধানে নামলে যে কোন সময় সিদ্ধান্তের গতিপথ পরিবর্তিত হতে পারে। সেজন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে প্রায়ই তার সিদ্ধান্ত মূল্যায়ন করতে হয়। তবে ১৯৭৮ সালে দেয়া Paul N. Williams-এর কার্যকারিতা এখনও থাকলেও বর্তমান সময়ের আলোকে এতে কিছু স্তরের অভাব অনুভূত হয়। যেমন বর্তমান সময়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পণ্ডিতরা মনে করেন যে, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য অনুমিতি বা হাইপোথিসিস গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কিন্তু Paul N. Williams-এর কাঠামোতে এ ধাপটি নেই। পরবর্তীতে আরো অনেক লেখক নানাভাবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়ার ধাপগুলো তুলে ধরেছেন। সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা ও পণ্ডিতগণের দেয়া মতামতের ভিত্তিতে এই বইতে অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ার নতুন একটি কাঠামো তুলে ধরা হলো:

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়া

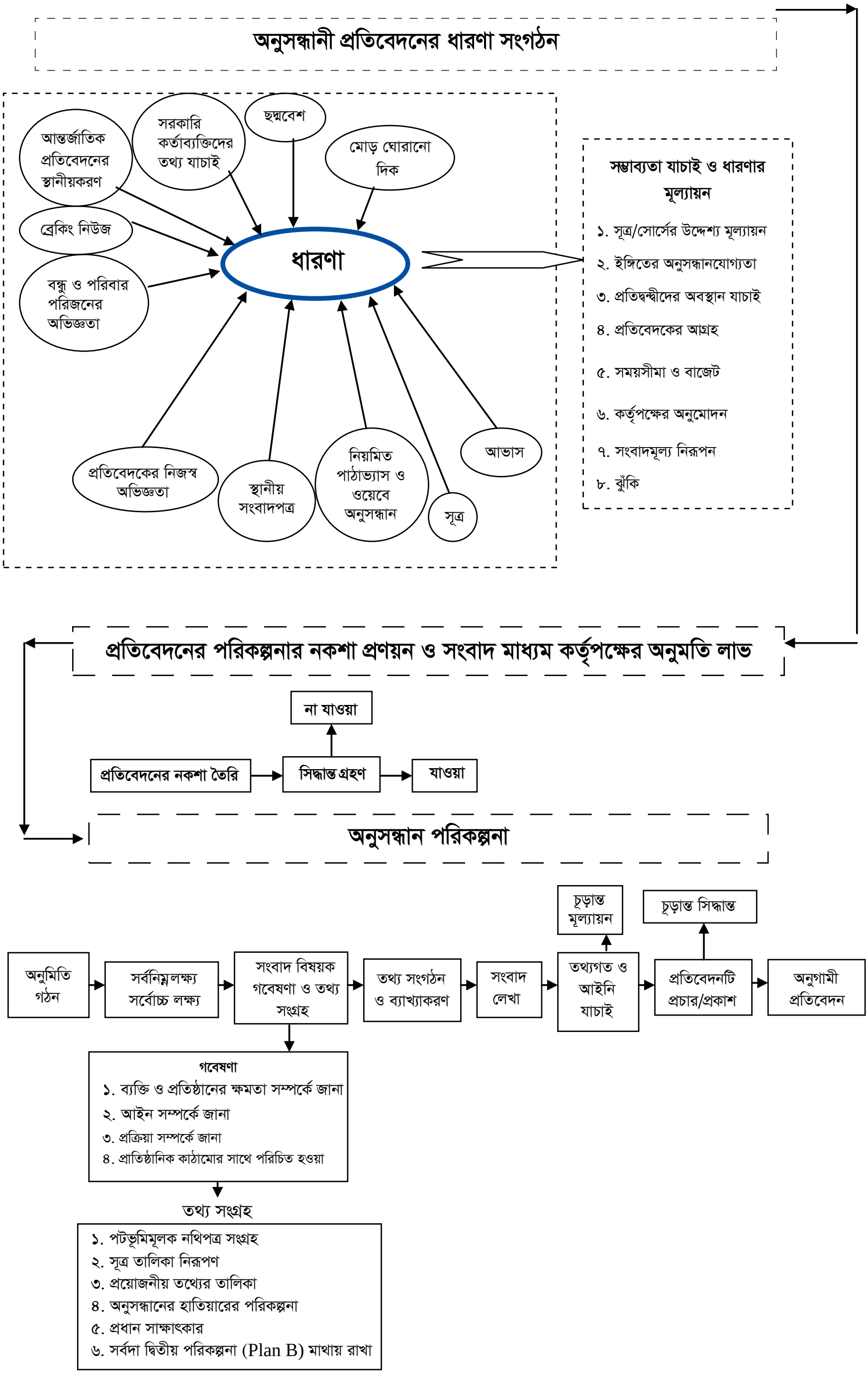

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের স্তরসমূহ

আগের পৃষ্ঠার কাঠামোটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়ায় তিনটি মূল স্তর রয়েছে। এসব স্তরে একাধিক ধাপ আছে। মূল স্তরগুলো হলো:

১. অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ধারণা সংগঠন;

২. অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পরিকল্পনা নকশা প্রণয়ন ও কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাভ; এবং

৩. অনুসন্ধান পরিকল্পনা।

প্রথম স্তর: অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ধারণা সংগঠন

শিক্ষানবিশ প্রতিবেদকরা প্রায়ই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে থাকেন, 'কিভাবে আপনি একটি খবর বা গল্প অনুসন্ধানের জন্য নির্বাচন করবেন?' আসলে খবরের রসদ সবখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শুধু কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করে আনার মানসিকতা থাকতে হয়। সমস্যা হলো দেখতে পাওয়া বা দেখার মতো চোখ না থাকা। এই দেখতে পাওয়ার প্রথম পদক্ষেপটি হলো কোন বিষয়ে ধারণা লাভ করা এবং সে ধারণা নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া। দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী সংবাদের গল্পের ধারণা নানা সূত্র থেকে পাওয়া যেতে পারে। হতে পারে কোন বন্ধুর সঙ্গে খোশগল্পে কিংবা রিকশাওয়ালার সাথে গল্পচ্ছলে অথবা দীর্ঘদিনের পরিচিত কোন সোর্স আপনাকে দিতে পারেন কোন ক্লু।

ধারণা যার কাছ থেকেই পাওয়া যাক না কেন একটি বিষয় পরিষ্কার যে, একটি ধারণা থেকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন শুরু হয়। 'কোথা থেকে শুরু করবেন'- এটিই অনুসন্ধানী সাংবাদিকের জন্য প্রথম চ্যালেঞ্জ। কারণ সংবাদের 'ধারণা' পাওয়া সহজ কাজ নয়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ধারণা যে কোন ক্ষেত্র থেকে আসতে পারে। মাঝে মাঝে কোন সোর্স বা সূত্র আপনাকে কোন প্রতিবেদনের বিষয়ে আভাস বা ইঙ্গিত দিতে পারেন, আপনার কোন বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতজনের কাছ থেকে এ ধরনের ইঙ্গিত পেতে পারেন, কখনও কখনও কোন উপাত্ত বা নথিপত্র থেকে আপনি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ধারণা পেতে পারেন, আবার কখনও কখনও প্রতিবেদক হিসেবে আপনার নিজস্ব অনুসন্ধিৎসু মনের ভাবনা থেকে এ ধরনের ধারণা বা ইঙ্গিত পেতে পারেন। যেমন, ধরুন আপনার কোন বন্ধু যিনি মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে কাজ করছেন তার কাছ থেকে আপনি জানতে পেরেছেন গরীব মানুষরা রক্ত বিক্রি করছে। মনে রাখতে হবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের টিপস বা ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন তারা বিস্তারিত তথ্য দিতে পারেন না। আপনার মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ বন্ধুটিও রক্ত বিক্রির বিষয়ে বিস্তারিত কোন তথ্য আপনাকে দিতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব অনুসন্ধিৎসু মনকে কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যেমন, মানুষ কেন রক্ত বিক্রি করছে? বিক্রিত রক্তগুলো কি সঠিকভাবে পরীক্ষা করা হয়? কারা এসব গরীব মানুষের রক্ত কিনছে? রক্ত ব্যবসা করে কারা লাভবান হচ্ছে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পরিকল্পনা করে নেমে পড়লেই বের হয়ে আসতে পারে মোক্ষম কোন রিপোর্ট।

দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে একটি বিষয় প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়- সাধারণত দুর্নীতি দমন কমিশন বা সরকারি কোন সংস্থা কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বা মামলা দায়ের করলে আমাদের দেশের গণমাধ্যমগুলো তা ফলাও করে প্রচার করে। কিন্তু এ ধরনের অভিযোগ বা মামলার খবর প্রচারে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমের নিজস্ব বিশেষ কোন কৃতিত্ব নেই। এটি লিক জার্নালিজম ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কারণ এ ধরনের খবর দিনের অন্যান্য ঘটনার মতোই সাদামাটা খবরের পর্যায়ে পড়ে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদক

শুধু সংস্থার প্রতিবেদন বা মামলার প্রাথমিক তথ্য বিবরণীর ওপর নির্ভর করেন না। বরং তিনি সম্ভাব্য সবগুলো সূত্র থেকে সব ধরনের উপাত্ত বা নথিপত্র সংগ্রহ করে, সংশ্লিষ্ট সকলের সাক্ষাৎকার নিয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করেন।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, ভাল সংবাদের ধারণা বলতে বড় সংবাদ বা বড় বড় ব্যক্তিদের নিয়ে সংবাদ রচনা করাকে বোঝায় না। অনেক সময় শিক্ষানবিশ প্রতিবেদকরা এই ভুলটি করে থাকেন। তারা মনে করেন, মন্ত্রী-এমপি কিংবা রাজনীতিবিদদের দুর্নীতিই শুধু বড় বড় শিরোনামের সংবাদ হতে পারে। মনে রাখতে হবে, যে বিষয় বা ঘটনা সমাজ বা আপনার সম্প্রদায়কে সমস্যায় ফেলবে কিংবা সম্প্রদায়ের মানুষরা প্রতিনিয়ত যে বিষয়টির জন্য ক্ষতির সম্মুখীন হবে এমন যে কোন সংবাদই উত্তম সংবাদ হতে পারে। Investigative Journalism Manuals-এ বলা হয়েছে, "*The best story ideas are not necessarily the biggest: the best story ideas are those that go to the heart of a real problem in the community or broader society where reporters work.*"[৪২]

কোন গুজব বা রটনা থেকেও অনুসন্ধানী প্রতিবেদক ধারণা পেতে পারেন। আবার কোন রেঁস্তোরা বা কফি হাউসে বন্ধুদের আড্ডা থেকেও এ ধরনের প্রতিবেদনের ধারণা পাওয়া যেতে পারে। একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক অনেক সময় নিজস্ব বিটের সোর্স যারা সরকারি কর্মকর্তা, আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্য, রাজনীতিবিদ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হতে পারেন; তাদের কাছ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পেতে পারেন। মোদ্দাকথা হলো, যে কোন সময়, যে কোন স্থান থেকে বা যে কোন ধরনের সোর্স থেকে একজন প্রতিবেদক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের দুর্দান্ত একটি ধারণা পেতে পারেন। প্রতিবেদকের কাজ হলো চোখ-কান খোলা রাখা। Sheila S. Coronel বলছেন, "*Journalists should keep their eyes and ears open everywhere they go, even when they are not at work. Story possibilities lurk everywhere, even in the least places.*"[৪৩] নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ধারণা লাভের ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরেছেন এভাবে, "*টেলিফোনে অচেনা-অজানা কণ্ঠস্বর, কোনো বন্ধুর আকস্মিক অসতর্কতায় বেরিয়ে আসা কোনো সংলাপ, বন্ধু প্রতিবেদকের কানে কানে আরেকজনের করা কোনো মন্তব্য, বাজারের কোনো গুজব, গুঁজ-গাজ-ফুঁস-ফাঁস, কোর্ট, সংসদীয় কমিটি কিংবা অন্য কোন পাবলিক দলিল-পত্তর ঘাঁটাঘাঁটি- একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে দিয়ে দিতে পারে গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ইঙ্গিত।*"[৪৪]

Investigative Journalism Manuals[৪৫]-এ অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ধারণা লাভের অনেকগুলো ক্ষেত্রের কথা তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি Paul N. Williams তাঁর অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ার কাঠামো ধারণা সংগঠনের ৭টি ক্ষেত্রের কথা তুলে ধরেছেন। সেগুলোর ভিত্তিতে নিচে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ধারণা লাভের ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরা হলো:

---

[৪২] Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals, Chapter three: Planning the Investigation, http://www.investigative-journalism-africa.info/.

[৪৩] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p 35.

[৪৪] নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী, (১৯৯৬) অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি), ঢাকা, জুলাই, ১৯৯৬, পৃ ১০১।

[৪৫] Ibid, Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals, Chapter two: Generating Story Ideas.

১. আভাস বা ইঙ্গিতের তদন্ত

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনিয়ম বা ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মৌলিক ভিত্তি হলো কোন একটি আভাস বা ইঙ্গিত অনুসরণ করা। এ ধরনের আভাস বা ইঙ্গিত যে কোন ব্যক্তি বা স্থান থেকে আপনি পেতে পারেন। কারণ প্রতিবেদক হিসেবে আপনি এই সমাজেরই একজন। আপনার বন্ধুবান্ধব, পরিচিতজন এমনকি আপনার বিটের সোর্সও এ ধরনের আভাস বা ইঙ্গিত আপনাকে দিতে পারেন। তারা সাংবাদিক হিসেবে ওই বিষয়ে আপনার মনযোগ আকর্ষণের জন্য এ ধরনের ইঙ্গিত বা আভাস দিবেন। আবার আপনার কিছু সোর্স আপনাকে 'অফ-দ্য-রেকর্ড' বলে এমন আভাস বা ইঙ্গিত দিতে পারেন। একজন প্রতিষ্ঠিত প্রতিবেদক এ ধরনের টিপস বা আভাস কিংবা ইঙ্গিত হরহামেশাই পেয়ে থাকেন। অনেক সময় এমন হতে পারে যে, কেউ হয়তো প্রতিবেদককে শুধু এটুকু বলবেন যে, 'যে চুক্তিটি হলো তা খতিয়ে দেখেন, ভয়ানক তথ্য পেয়ে যাবেন'। এমন আভাস বা ইঙ্গিত নাটকীয় সংবাদ বা খবরের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু সব ধরনের আভাস বা ইঙ্গিত সতর্কতার সাথে তদন্ত করতে হয় বা খতিয়ে দেখতে হয়। যার কাছ থেকেই আসুক না কেন, কিংবা যে ধরনের ইঙ্গিত বা আভাস আপনি পান না কেন, প্রতিবেদক হিসেবে আপনার কখনই তা অবজ্ঞা করা বা উড়িয়ে দেয়া উচিত নয়।

আপনার প্রথম কাজটি হলো প্রাপ্ত ইঙ্গিত বা আভাসের মূল্যায়ন করা। যে ইঙ্গিত বা আভাস আপনি পেয়েছেন তার খবর মূল্য যাচাই করা এবং জনস্বার্থে তা কতটুকু দরকারি তার মূল্যায়ন প্রতিবেদককে করতে হয়। দ্বিতীয়ত এ ধরনের আভাসের সত্যাসত্য নিরূপণ করা এবং সোর্স বা উৎসের কোন উদ্দেশ্য আছে কীনা তা খতিয়ে দেখতে হয় প্রতিবেদককে। কারণ অনেক সময় সোর্স বা ইঙ্গিতদাতা তার ব্যক্তিগত লাভের জন্য আপনাকে প্রলুব্ধ করতে পারেন। এ দিকটি বিবেচনা করে Paul N. Williams-এর পরামর্শ হলো, আভাস বা ইঙ্গিত পেলে তা দিয়েই কোনভাবে একজন প্রতিবেদক প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন না; বরং তার কাজ হলো সে ইঙ্গিত বা আভাসের চুলচেড়া মূল্যায়ন করা। এক্ষেত্রে কোন প্রতিবেদকেরই তাড়াহুড়ো করার সুযোগ নেই। কারণ তাড়াহুড়ো করে প্রতিবেদন তৈরি করলে তা তার জন্য মৃত্যুফাঁদ হতে পারে। Paul N. Williams সুন্দরভাবে বলেছেন, "*The investigator must always be skeptical. When it comes to tipster, that skepticism must include the operating principle that hardly anybody, ever, provides a tip without an ulterior motive. The motive will likely bias the tipster's version of whatever is going on.*"[৮৬] যেমন ধরুন, কোন একজন সোর্স আপনাকে একটি ভিডিও ফুটেজের টেপ দিয়ে বললো যে এখানে সরকারের একজন মন্ত্রী একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ঘুষের টাকা নেয়ার ভিডিও চিত্র আছে। আপনি কি এই ভিডিও চিত্র থেকেই প্রতিবেদন তৈরি করে ফেলবেন? যদি করেন, তাহলে তা হবে আপনার সাংবাদিকতা জীবনের বড় একটি কলঙ্ক। কারণ এ ফুটেজে যে টাকা নেয়ার চিত্র ধারণ করা হয়েছে তা অনুদানের টাকাও হতে পারে কিংবা হতে পারে ব্যক্তিগত পাওনা আদায়ের অর্থ।

অনেক সময় দেখা যায় নানা সূত্র থেকে আপনি যে আভাস বা ইঙ্গিত পেয়েছেন বাস্তবে ঘটছে ঠিক তার উল্টো। হল্যান্ডে ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল ইনভেসটিগেটিভ জার্নালিজম কনফারেন্সে সাংবাদিক মার্ক হান্টার একটি উদাহরণের কথা তুলে ধরেন। তিনি সূত্র থেকে

[৮৬] Ibid, Paul N. Williams (1978), p. 13-16.

এমন একটি আভাস পান যে, 'মার্কিন হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসকরা নবজাতকদের (premature babies) মেরে ফেলছেন'। অথচ হান্টার অনুসন্ধান করে দেখেন যে, চিকিৎসকরা আগের যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি নবজাতকের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হচ্ছেন। Investigative Journalism Manuals-এ একটি বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এ ম্যানুয়েলে বলা হয়েছে, সোর্স বা সূত্র এবং আভাস বা টিপস যখন সাংবাদিক ব্যবহার করবে তখন তা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হয় না; তা হয় লিক জার্নালিজম (Leak Journalism)[৪৭]

২. সূত্রের দেয়া তথ্য যাচাই

সূত্র বলতে আভাস বা ইঙ্গিতদাতা (Tipster)-কে বোঝায় না। সোর্স বা সূত্র হলো তারা যারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন দায়িত্বে থাকেন এবং তারা জানেন কি ঘটেছে ও কি ঘটতে যাচ্ছে। এসব সোর্স বা সূত্র হঠাৎ করে হয় না। দীর্ঘদিনের পেশাগত অভিজ্ঞতায় একজন প্রতিবেদকের জীবনে নানা ধরনের সোর্স বা সূত্রের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই সোর্স বা সূত্রই প্রতিবেদকের প্রাণ। Paul N. Williams বলেছেন, "*Sources are not tipsters. Sources are people who are in a position to tell you what is going on. They do not just show up on your doorstep or call you from a phone booth. Sources are acquired, developed, checked, and protected over a period of time.*"[৪৮] তিনি আরো বলেছেন, "*A tipster is essentially a gossip; a source is an expert with whom you have established mutual trust.*"[৪৯]

সাধারণত প্রতিবেদক যখনই কোন নতুন সংবাদ তৈরি করতে যান তখনই তার সাথে কিছু না কিছু নতুন সোর্স বা সূত্রের পরিচয় হয়। এভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিকদের সাথে নিত্য নতুন সোর্সের পরিচয় ঘটে, হয় বন্ধুত্ব। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ লেখক ও সাংবাদিক বলেছিলেন, '*Sir, I count it a day lost whenever I fail to make a new acquaintance.*' সাধারণভাবে বলা হয়, একজন সাংবাদিকের যতবেশি সোর্স থাকবে ততই তিনি নিত্য নতুন সংবাদগল্পের ধারণা পাবেন। শুধু তাই নয়, এ সংবাদ ধারণার মূল্যায়নের জন্য গবেষণা ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ সোর্সের কোন বিকল্প নেই। Paul N. Williams সোর্স বা সূত্রের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন এভাবে, "*An intelligent, discreet, and well-placed source is a help in story conception, an adviser in appraising tips, a guide to valuable research records, and a knowledgeable interpreter of your research.*"[৫০]

---

[৪৭] Ibid, Gwen Ansell (ed.), Chapter two: Generating Story Ideas.
[৪৮] Ibid, Paul N. Williams, 1978, p13-17
[৪৯] Ibid, 1978, p. 64
[৫০] Ibid, p.13-17

টিআইবি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিবেদনের শিরোনাম
‘ঘুষ–দুর্নীতির আখড়া জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ’

প্রতিবেদনটি ২০১০ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাপ্তাহিক শীর্ষ কাগজ এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এর অংশ বিশেষ প্রকাশিত হয় অনলাইন দৈনিক শীর্ষনিউজেও।

২০১০ সালের এ সময়ে আমি অনলাইন দৈনিক ‘শীর্ষ নিউজ’ এবং সহযোগী প্রকাশনা ‘সাপ্তাহিক শীর্ষকাগজে’র স্টাফ রিপোর্টার ছিলাম। দুর্নীতি দমন কমিশনের সংবাদ সংগ্রহের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি সেবাখাতের দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। সেসময় একদিন দুপুর বেলা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে পূর্ব পরিচিত চট্টগ্রাম জেলার এক লোকের সঙ্গে আমার দেখা। ব্যক্তিগত কুশলাদি বিনিময়ের এক পর্যায়ে তিনি রেগে আমাকে বললেন, কেমন আর থাকি? চারিদিকে ঘুষখোরের মেলা। এমন ক্ষোভের কারণ জিজ্ঞেস করতেই বললেন, সে অনেক কথা। বলে কি লাভ? আপনি কি করতে পারবেন? তাদের হাত অনেক লম্বা তারা অনেক শক্তিশালী। ক্ষমতার দাপটও অনেক বেশি। তারপরও শুনতে চাইলে পরে ওই ভদ্রলোক তার সমস্যার কথা খুলে বলেন।

ওই ভদ্রলোক বলেন, ‘আমার খরিদা সম্পত্তি এক ভাড়াটিয়া (আমি যার থেকে কিনেছি তার নামে জালিয়াতি দলীল তৈরি করে) জাল-জালিয়াত করে দীর্ঘদিন ধরে জোরপূর্বক দখলে নিয়ে এর মালিক বনে গেছেন। বরং জালিয়াতির মাধ্যমে তা বিক্রির প্রক্রিয়া করছেন। দলিল জাল-জালিয়াত থেকে শুরু করে সব অবৈধ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করছেন সম্পত্তির মূল মালিক জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ। তারা প্লটের প্রকৃত বরাদ্দ গ্রহীতার দলিল উপেক্ষা করে ভাড়াটিয়ার জালিয়াতির বিষয়টি জানার পরও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে আমি দীর্ঘদিন ধরে নিজের মালিকানা সম্পত্তি থেকে বিতাড়িত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছি।’

ভূক্তভোগী চট্টগ্রামের এই লোক আরো আক্ষেপ করে বলেন, ‘ভাড়াটিয়ার পক্ষে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারি জালিয়াতির দলিল গ্রহণ করে মিথ্যা তথ্যকে সত্য বানিয়ে ওই সম্পত্তি বিক্রির অনুমোদন দেয়ার তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। আর আমি প্রকৃত মালিক হয়েও কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যায় বিচার পাচ্ছি না।’ তিনি আরো বলেন, ‘অনেকদিন ধরে জাল জালিয়াতির বিষয়টি জানিয়ে প্রতিকারের জন্য আবেদন করা হলেও জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ নানাভাবে হয়রানি করতে থাকে। বরং জালিয়াত চক্রের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে বিষয়টি সুরাহা না করে ওই চক্রকে আদালতের দিকে ঠেলে দেয়। যাতে মামলার দীর্ঘসূত্রতার কারণে বিষয়টি আরো দীর্ঘদিনের জন্য ঝুলিয়ে রাখা যায়। এভাবে গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারি সিন্ডিকেটের ঘুষ কারবারের কারণে আমার একমাত্র সম্বলটি হাতছাড়া হয়ে যায়।’

তার কাহিনী শুনে আমার খুব কষ্ট লাগলো। ঘুষ-দুর্নীতি আর হয়রানির তথ্য দিতে তাকে অনুরোধ করি। পরের সপ্তাহে তিনি তার সমস্ত ডকুমেন্ট আমার কাছে নিয়ে আসেন। তাকে অনুরোধ করি, জাতীয় গৃহায়ণে বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে গেলে যেনো আমাকে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং আমার পরিচয় গোপন রাখতে বলি। পরে তার সঙ্গে আত্মীয় ছদ্মবেশে জাতীয় গৃহায়ণে যাওয়া শুরু করি। সেখানকার চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে অধস্তন কর্মচারির টেবিলে-টেবিলে ফাইলের স্তূপ জমিয়ে কাজ আটকে ঘুষের কাজ-কারবার আমার চোখে পড়ে। ওই সমস্যার উৎস এবং সমাধানের পথ খুঁজতে গিয়ে এভাবেই জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষে আমার অনুসন্ধনী সংবাদের পথচলা শুরু।

মোহাম্মদ নঈম উদ্দীন
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক মানবকণ্ঠ

৩. নিয়মিত পাঠাভ্যাস ও ওয়েবে অনুসন্ধান

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে হলে নিয়মিত পাঠাভ্যাসের বিকল্প নেই। পেশাদারিত্ব ও লিখন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রতিবেদককে নিজের বিটের সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা ও প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো নিয়মিত পড়তে হবে, "*If you're serious about your beat, accessing everything that is published about it is a professional duty. If you are not prepared to do this, investigative journalism is not the career for you.*"[৫১]

একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে শুধু সংবাদ বিজ্ঞপ্তি কিংবা বিবৃতি বা সাক্ষাৎকারের ওপর নির্ভর করলে চলে না; বরং ঘটনার গভীরে যাওয়ার জন্য বেশি কিছু জানতে হয়। এই গভীরে যাওয়ার প্রক্রিয়া হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞান। এ প্রসঙ্গে Investigative Journalism Manuals-এ বলা হয়েছে, "*Don't spend your time simply processing the information that happens to come your way – from press releases, statements and public events. Seek out new information to broaden your own knowledge base.*"[৫২]

সাংবাদিক এসব প্রতিবেদন পড়ার জন্যই শুধু পড়ে থাকেন। কিন্তু একটি চমৎকার সংবাদের উৎস হিসেবে তারা কখনই এগুলোকে বিবেচনা করেন না। কিন্তু শুধু প্রচ্ছদ পড়ে বা পড়ার জন্য না পড়ে একটু সতর্কভাবে এসব প্রতিবেদন পড়া উচিত। তাহলে অনেক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের উৎস হতে পারে এসব প্রতিবেদন।

বর্তমানে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এবং তথ্যের বড় উৎস ইন্টারনেট। তবে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে দুটি বিষয় মনে রাখা জরুরি। প্রথমটি হলো, ইন্টারনেট বা ওয়েবে কে বা কারা তথ্যটি দিয়েছেন। অর্থাৎ উৎসের গ্রহণযোগ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা কতটুকু তা নিরূপণ করা। সূত্রটি কতটুকু নির্ভরযোগ্য তা নিরূপণ করে সে তথ্য প্রতিবেদনে ব্যবহার করা উচিত। কারণ ওয়েবে যে কেউ যে কোন কিছু দিতে পারে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, যে তথ্যটি নেয়া হচ্ছে তা কবে ওয়েবে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যের ব্যাপারে এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে খেয়াল রাখা উচিত। কারণ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জিনিস ও তথ্য আবিষ্কার হচ্ছে। সেজন্য পশ্চাৎপদ কোন তথ্য ওয়েব থেকে সংগ্রহ করে সেটি পাঠক/দর্শককে দিলে তা বুমেরাং প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

৪. স্থানীয় সংবাদপত্র

স্থানীয় বা আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলো অনেক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের শস্যক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোতে অনেক ধরনের সরকারি বিজ্ঞাপন, খবর ছাপা হয় যেগুলোর সূত্র ধরে অনেক ভালো ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব। অধিকাংশ ভাল অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা প্রতিদিনই জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিকগুলো পড়েন। এটি তাদের নিয়মিত কাজের অংশ হওয়া উচিত।

৫. প্রতিবেদকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা

একজন সাংবাদিক সবসময়ই সাংবাদিক; তিনি কখনই অফ-ডিউটিতে থাকেন না। চোখ-কান খোলা রাখলে যে কোন সময় যে কোন ঘটনাই চোখে পড়তে পারে। যেমন, কোন একজন

---

[৫১] Ibid, Gwen Ansell (ed.), Chapter two: Generating Story Ideas

[৫২] Ibid

প্রতিবেদক নিয়মিত একটি সড়ক দিয়ে যাতায়াত করেন সে সড়কে দীর্ঘদিন ধরে একটি নোটিশ ঝুলছে - 'মেরামত কাজের জন্য সড়কটি বন্ধ'। এ ধরনের নোটিশ দীর্ঘদিন দেখলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে, 'এতদিন ধরে কেন সড়কের কাজ চলছে?'। অথবা একজন প্রতিবেদক হয়তো পাসপোর্ট বানানোর জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছেন, সেখানে দেখলেন নানা অনিয়ম কিংবা দালালদের দৌরাত্ম্য। এমন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ধারণা পেতে পারেন। আবার কোন প্রতিবেদক তার কোন আত্মীয়-স্বজনকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন; যেখানে প্রত্যক্ষ করলেন চিকিৎসকদের দুর্ব্যবহার। এমন অনেক ঘটনা প্রতিবেদক নিয়ত দেখছেন বা প্রত্যক্ষ করছেন নিজেই। এসব ঘটনা থেকে সহজেই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পরিকল্পনা করতে পারেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার, অনেক প্রতিবেদক আছেন উপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে প্রথম দিনেই অফিসে গিয়ে একটি সাদামাটা প্রতিবেদন তৈরি করে ফেলেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো প্রতিবেদন হয় না, এগুলো হয় মন্তব্যধর্মী কলাম। কারণ এসব ক্ষেত্রে কোন ধরনের অনুসন্ধান না করে শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিছু সাদামাটা সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। প্রতিবেদক ঘটনার অংশ হয়ে গিয়ে ব্যক্তিগত প্রতিশোধের জন্য প্রতিবেদন তৈরি করেন, যাতে থাকে না ঘটনার প্রকৃত কারণ ও সবপক্ষের মতামত।

৬. বন্ধু ও পরিবার-পরিজনের অভিজ্ঞতা

প্রতিবেদকের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কিংবা পরিবারের সদস্যরা প্রতিনিয়ত নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে পারেন যেগুলো থেকে প্রতিবেদক অনেক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের চমৎকার ধারণা পেতে পারেন। যেমন প্রতিবেদকের কোন আত্মীয় ঘুষ দিয়ে রেলের টিকিট সংগ্রহ করেছেন। এ অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিবেদক একটি প্রতিবেদন তৈরির জন্য অনুসন্ধানের পরিকল্পনা হাতে নিতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা একটি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে, কিন্তু তা কখনই পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের ভিত্তি হতে পারে না। এর জন্য দরকার একটি সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সব ধরনের তথ্য-উপাত্ত, নথিপত্র ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করা। এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার- যে বন্ধু বা পরিবারের সদস্য প্রতিবেদককে প্রতিবেদনের বিষয়ে আভাস বা ইঙ্গিত দিয়েছেন তার নাম প্রতিবেদনে ব্যবহার করা যাবে কীনা কিংবা তার নাম, পরিচয় ব্যবহার করে উদাহরণটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা যাবে কীনা তার জন্য ওই বন্ধু বা পরিবারের সদস্যের সম্মতি নেয়া প্রয়োজন। Investigative Journalism Manuals-এ বলা হয়েছে, "*Think first about how you use the people you know. And don't imagine that because someone is a friend or neighbour, they don't mind helping you out – it might make life difficult for them. Always get permission before you use someone's personal story.*"[৫৩]

[৫৩] Ibid.

টিআইবির পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম:
'দুর্নীতির বিষবৃক্ষ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল'

পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিবেদনটি ২০০৯ সালে সাতক্ষীরা থেকে প্রকাশিত দৈনিক দৃষ্টিপাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল খুলনা বিভাগের সর্ববৃহৎ একটি সরকারি চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র। মূলত: এ সেবা কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিতে গিয়ে প্রতারিত ও হয়রাণির শিকার ব্যক্তিদের কাছ থেকেই এ প্রতিবেদনের প্রাথমিক আইডিয়া/ধারণা পায়।

মুহাম্মদ নূরুজ্জামান
সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক প্রবাহ, খুলনা।

টিআইবি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম:
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালের হালচাল

২০১০ সালের ১১ জুলাই থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত ৭টি প্রতিবেদন দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠে প্রকাশিত হয়। ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালটি শুধু চাঁদপুর জেলায়ই নয়, পার্শ্ববর্তী শরীয়তপুর জেলাবাসীরও একমাত্র সবচে' বড় হাসপাতাল। সেজন্যে এই হাসপাতালে সবসময় প্রচুর রোগীর ভিড় লেগে থাকে। আর এসব রোগীর কাছ থেকে প্রায়ই অন্তহীন অভিযোগ শোনা যেতো। সেসব অভিযোগ পাওয়ার পর এ হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রম নিয়ে ধারাবাহিক নিউজ করার আমি ইচ্ছা পোষণ করি। সে থেকেই এই সিরিজ নিউজ করা।

এ এইচ এম আহসান উল্লাহ
বার্তা সম্পাদক, দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ

৭. অপ্রকাশিত/অনুগামী প্রতিবেদন/ব্রেকিং সংবাদ কাভারের মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান

প্রতিদিনই অনেক ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ঘটনা নিয়ে সাংবাদিকরা প্রতিবেদন তৈরি করেন। এসব ঘটনার মধ্যে নানা কারণে বেশ কিছু ঘটনার সংবাদমূল্য হয় আকাশচুম্বী। দক্ষ ও ঝানু সাংবাদিকরা এসব আকাশচুম্বী সংবাদমূল্য আছে এমন দিনের ঘটনায় শুধু সাদামাটা রিপোর্ট করে খুশি হন না। তারা ঘটনার পেছনের ঘটনা খুঁজে বের করেন। কেন ও কিভাবে অনিয়ম কিংবা দুর্নীতি হলো সেটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। আবার অনেক সময় পরে মূল ঘটনা নিয়ে ফলোআপ বা অনুগামী প্রতিবেদনও তৈরি করেন যা হয় অনুসন্ধান নির্ভর। তবে দিনের ঘটনা দিনে অনুসন্ধান করা সত্যিই দুরূহ ও কষ্টকর। একজন প্রতিবেদকের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এটি যে, দিনের ঘটনা ওই দিনের মধ্যে সুচারুভাবে অনুসন্ধান করা। সময়ই হলো এখানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। যেমন ধরুন, প্রায়ই পুলিশ ও আইনশৃংখলা বাহিনির সদস্য চোরাচালান সামগ্রী ও এর সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করে। পুলিশ ও আইনশৃংখলা বাহিনীর বিবৃতি কিংবা প্রেস ব্রিফিং অনুযায়ী গণমাধ্যমগুলো এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রচার করে থাকে। কিন্তু এ নিয়ে খুব কমই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন দেখা যায়।

ফলে কারা এর সাথে জড়িত; বিশেষ করে অপরাধী চক্র, রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তারা এর সঙ্গে জড়িত কিনা, চোরাচালানগুলো কোথা থেকে কোথায় যায়, কারা এর দ্বারা লাভবান হচ্ছে এসব বিষয় গণমাধ্যমে উঠে আসে না। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, কোন ব্রেকিং সংবাদের অনুসন্ধান কাজ ওইদিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

পাঠক/দর্শক জরিপগুলোতে দেখা যায়, পাঠক/দর্শক ফলোআপ বা অনুগামী প্রতিবেদন খুব পছন্দ করে। তারা জানতে চায় একটি প্রকাশিত/প্রচারিত ঘটনার পরবর্তীতে কি হয়েছে বা কি ঘটেছে কিংবা ঘটনার পেছনের ঘটনা কি। এজন্য কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনার মাধ্যমে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা যায়। এক্ষেত্রে প্রতিবেদককে একটি নতুন এঙ্গেল বা দিক খুঁজে বের করতে হয়। উগান্ডার সাংবাদিক Frank Nyakairu বলেছেন, অনুগামী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করার জন্য প্রতিবেদকের উচিত তার নোটবুকটি পুনরায় খতিয়ে দেখা। তিনি বলেছেন, "*প্রতিবেদক প্রথম দফায় প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারে এমন কিছু চমৎকার ও আকর্ষণীয় প্রশ্ন করেছেন যেগুলো হয়তো তিনি প্রথম দফার প্রতিবেদনে ব্যবহার করেননি। এসব প্রশ্নের উত্তর নতুন করে খুঁজে বের করে অনুগামী প্রতিবেদন তৈরি করা যেতে পারে যা হবে আকর্ষণীয় অনুসন্ধানী প্রতিবেদন*"।[৫৪] যেমন, নির্বাচনের সময় একটি প্রতিবেদন প্রায়ই আমরা দেখতে পাই; সেটি হলো ভোট কেনাবেচার খবর। এ ধরনের প্রতিবেদনে প্রার্থীদের ভোট কেনার খবর প্রকাশিত/প্রচারিত হয়। কিন্তু কেন ওই প্রার্থী ভোট কিনছেন বা তার জনপ্রিয়তা এত কম কেন সে বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন খুব কমই দেখা যায়।

২০০৯ সালে রিড ফার্মা নামের একটি ওষুধ কোম্পানির প্যারাসিটামল সিরাপ খেয়ে ২৭ শিশু মারা যায়। এ ঘটনা নিয়ে ফলোআপ প্রতিবেদন করার সময় অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির পরিকল্পনা করেন সাংবাদিক ইমরান হোসেন। পরে তিনি এ প্রতিবেদনগুলোর জন্য টিআইবি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পুরস্কার পান।

টিআইবি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রকাশিত প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল:
Justice delayed, justice denied

২০০৯ সালের ১১ নভেম্বর The Daily Star- এ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। ২০০৯ সালে ওষুধে ভেজালে শিশু মৃত্যুর পর অফিস আমাকে বিষয়টি অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু ১৯৯২ সালে ঘটে যাওয়া একই রকম একটি ঘটনা তখনও অনুন্মোচিত থেকে যায়। আমি দুই যুগ আগের সেই ঘটনা উন্মোচনের সিদ্ধান্ত নিই। আমি তখন ১৯৯২ সালের ঘটনাটি সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো সংগ্রহ করে পড়ে ফেলি। এতে ভেজালকারকদের সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানতে পারি, বিশেষ করে তাদের পরিণতি কি হয় সে সম্পর্কে জানার জন্য ভেজাল ওষুধ অপরাধের বিচার কাজ নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিই।

ইমরান হোসেন
স্টাফ রিপোর্টার, বিডিনিউজ২৪.কম

[৫৪] Ibid.

টিআইবি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম
ওষুধে অসুখ:

২০১০ সালে এনটিভিতে প্রতিবেদনটি প্রচারিত হয়েছিল। রিড ফার্মা নামের একটি ওষুধ কোম্পানির প্যারাসিটামল সিরাপ খেয়ে ২৭ শিশু মারা যায়। এই ঘটনা থেকে ওষুধ শিল্প নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করার ধারণা মাথায় আসে। ওষুধ শিল্পের সঙ্গে অনেক প্রভাবশালীরা জড়িত। তা সত্ত্বেও অফিস রাজি হলো। টেলিভিশনের জন্য এই রকম বিষয় নিয়ে কাজ করা এবং ভিজ্যুয়ালি বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করা একটু কঠিন। তাই হোমওয়ার্ক এবং লেগওয়ার্কের ওপর নির্ভর করে কাজে নেমে পড়ি।

সুলতানা রহমান
ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

৮. আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনের স্থানীয়করণ

অনেক সময় আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলোতে অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যার অনুকরণে স্থানীয় পর্যায়ে বিষয়টির অনুসন্ধান করা যায়। ঘানার সাংবাদিক ও গণমাধ্যম প্রশিক্ষক Edem Djokotoe তাঁর এক লেখায় এরকম দুটি বিষয়ের উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক ক্রীড়াবিদের ড্রাগস ব্যবহারের খবর গণমাধ্যমগুলোতে বেশ সাড়া ফেলে। এসব উদাহরণ ধরে আমাদের দেশের প্রতিবেদকরা এদেশের ক্রীড়াবিদদের ড্রাগস ব্যবহার বা ডোপ টেস্টের বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। আরেকটি উদাহরণের প্রসঙ্গ টানতে গিয়ে Edem Djokotoe বলেছেন, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে পোল্ট্রি শিল্পে পশু মোটাতাজাকরণ ওষুধের ব্যবহারের সংবাদ অনুসরণে তিনি জাম্বিয়াতে এ ধরনের ওষুধ ব্যবহার হচ্ছে কীনা তা খতিয়ে দেখেছেন।

৯. সরকারি কর্তাব্যক্তিদের তথ্য যাচাই

এটি আরেকটি পেশাগত বাধ্যবাধকতা। যখন সরকারি কোন দফতরে নতুন কোন কর্মকর্তা বা বস নিয়োগ দেয়া হয় তার জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত ও পেশাগত দক্ষতা কিংবা যখন কোন নতুন দফতর বা সংগঠন জন্ম নেয় তখন তার মূল ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া সংশ্লিষ্ট বিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিবেদকের একটি অত্যাবশকীয় কাজ। যেমন, এমন একজন ব্যক্তিকে জ্বালানি মন্ত্রী করা হলো যিনি কোন বেসরকারি তেল কোম্পানির অন্যতম কর্ণধার বা উপদেষ্টা। এক্ষেত্রে সহজেই প্রশ্ন জাগতে পারে এ নিয়োগ কি আইনসম্মত হয়েছে? যদি হয়েও থাকে, তাহলে এ নিয়োগ কি স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি করবে না? এ ধরনের সংশ্লিষ্টতা বের করতে পারলে তা ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের উৎস হিসেবে কাজ করবে।

১০. ছদ্মবেশ

অনেক সময় অনেক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির গোপন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে প্রতিবেদক ছদ্মবেশ

ধারণ করতে পারেন। বিশেষ করে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে প্রতিবেদক অনেক সময় ছদ্মবেশ ধারণ করে ওই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পারেন। এ ধরনের ছদ্মবেশ ধারণ করাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Legwork' আর যিনি ছদ্মবেশ ধারণ করেন তাকে বলা হয় 'Legman'। Paul N. Williams এই ছদ্মবেশীর ভূমিকা তুলে ধরেছেন এভাবে, "*A legman is a reporter on a loose leash. He gathers information by settling in where his antennae tell him tantalizing information lurks.*"[৫৫] রিপোর্টার বিল জোনস এরকমই এম্বুলেন্স চালক হিসেবে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়েছিলেন এবং ১৯৭০ সালে শিকাগো ট্রিবিউনে একটি সংবাদ প্রকাশ করেন। এ প্রতিবেদনের জন্য তিনি পুলিৎজার জিতেছিলেন। আবার অনেক সময় প্রতিবেদক অনিয়ম-দুর্নীতি তদন্তের জন্য নিজের পরিচয় গোপন করে নিজের নামেই সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র তৈরি করতে পারেন। যেমন ধরুন, কোন প্রতিবেদক জানতে পেরেছেন দালালদের টাকা দিলে যেকোন নামে পাসপোর্ট তৈরি করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতিবেদক নিজের ছবি দিয়ে অন্য কোন নামে একটি পাসপোর্ট দালাল দিয়ে বানিয়ে পুরো প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করতে পারেন। তবে এ কাজ করতে হবে অবশ্যই প্রতিবেদন তৈরির উদ্দেশে; অন্য কোন কাজে ব্যবহারের জন্য নয়।

১১. মোড় ঘোরানো দিক

অনেক সময় কোন বিষয় নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে প্রতিবেদকের চক্ষুচড়ক গাছ হওয়ার মতো অবস্থা হতে পারে। তিনি এমন কোন তথ্য বা নথিপত্র পেতে পারেন যা তার অনুসন্ধানের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে অথবা একেবারেই নতুন কোন তথ্য পেতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি নতুন করে অনুসন্ধান শুরুর ধারণা পেতে পারেন। Paul N. Williams বলছেন, "*There are times when, in the middle of one investigation, another story possibility is conceived, something that might be called the tangential angle.*"[৫৬]

টিআইবি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম:
গাজীপুরের বাইপাস বিশ্বরোড মোড়ের প্রকাশ্য চাঁদাবাজি

২০১০ সালের ১৭ আগস্ট এটিএন নিউজে প্রচারিত হয় প্রতিবেদনটি। এর কয়েক দিন আগে এই রাস্তাটি উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই রাস্তার অবস্থা নিয়ে রিপোর্ট করতে গিয়ে চাঁদাবাজির কথা জানতে পারি। স্থানীয়রাই আমাকে চাঁদাবাজির কথা জানান। বিষয়টি আচ করতে পেরে প্রথমে অনেক দূর চলে যাই। গাজীপুর থেকে পুবাইলগামী ট্রাক থামিয়ে তাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে জানতে চাই, চাঁদাবাজির খবর। তারা সবাই চাঁদা দেয়ার কথা স্বীকার করেন। পরে চিত্র ধারণের পরিকল্পনা করি।

মাশহুদুল হক
বিশেষ প্রতিনিধি, এটিএন নিউজ

[৫৫] Ibid, Paul N. Williams (1978), p. 102
[৫৬] Ibid, p. 19

সম্ভাব্যতা যাচাই ও ধারণার মূল্যায়ন কোন ইঙ্গিতকে অনুসরণ করাই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের প্রাথমিক ভিত্তি। একজন প্রতিবেদক যেখান থেকেই বা যেভাবেই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ধারণা পান না কেন সে ধারণা বা আভাসের মূল্যায়ন করতে হয়। এ ধারণা বা আভাস কতটা শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য তা মূল্যায়ন করতে হয়। Bob Greene-একে বলেছেন 'the sniff' বা গন্ধ শুঁকে দেখা। মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম হলো কোন বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে কিংবা সন্দেহের উদ্রেক হলে সে তার ইন্দ্রিয়সমূহ ব্যবহার করে সে বিষয়টি যাচাই করে নেয়। যেমন ধরুন, কোন খাবার আপনার কাছে বাসি বা পঁচা মনে হচ্ছে; তখন আপনি এর গন্ধ শুঁকে খাবারটি যাচাই করে নেন। সুধাংশু শেখর রায় বলেছেন, "*একটি ধারণা, সামান্য একটু তথ্যকণা কিংবা ছোট্ট একটা ঘটনা থেকেই অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের যাত্রা শুরু হয়ে থাকে। অজ্ঞাতপরিচয় কোন সূত্র কোন ঘটনার সামান্য একটি খেই ধরিয়ে দিতে পারে। রিপোর্টার যদি তাঁর কল্পনা শক্তি দিয়ে ওই সামান্য তথ্যকণা থেকেই বুঝতে পারেন যে এর পিছনে ঘটনার বিশাল ব্যাপ্তি বা নেটওয়ার্ক কাজ করছে এবং তিনি যদি বুঝতে পারেন এই তথ্যকণার প্রেক্ষিতে গবেষণার একটি সম্ভাবনা আছে ও তার রেশ ধরে আরো অনেকদূর এগোনো যায় তাহলে তিনি তাঁর অনুসন্ধান কাজে নেমে পড়তে পারেন। তিনি যদি মনে করেন প্রাপ্ত তথ্যের সূত্র ধরে তিনি কোন রহস্যাবৃত ঘটনাকে উন্মোচিত করতে পারবেন তাহলে তিনি তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারবেন।*"[৫৭]

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে ধারণা বা আভাস কিংবা ইঙ্গিত পাওয়ার পর প্রতিবেদককেও ওই ধারণা/আভাস/ইঙ্গিতটি যাচাই করে নিতে হয়। প্রাথমিক কিছু তথ্য যোগাড় কিংবা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবেদককে এই গন্ধ শোঁকার কাজটি করতে হয়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদক ইন্টারনেটে তথ্য ঘেঁটে, পুরাতন সংবাদ পড়ে কিংবা অন্য কোন উপায়ে অনুসন্ধানী প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা ও বাস্তবায়নযোগ্যতা নিরূপণ করেন। এই গন্ধ শোঁকার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা: 'এখানে কি এমন কোন সংবাদ আছে যেটি নতুন এবং যেটি গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করা যাবে?' এখানে অনুসন্ধান শুরুর আগে প্রতিবেদক নিজের কাছেই আরো কিছু প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন। সেগুলো হলো:

১. সূত্র/সোর্সের উদ্দেশ্য মূল্যায়ন

প্রথমত: প্রতিবেদককে অবশ্যই তথ্যের গ্রহণযোগ্য মূল্যায়ন করতে হয়; মূল্যায়ন করতে হয় সোর্সের উদ্দেশ্য। যে ইঙ্গিত বা আভাস সোর্স থেকে প্রতিবেদক পেয়েছে তা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য তা খতিয়ে দেখতে হবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে।

- প্রতিবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল অভিযোগ ও অন্যান্য তথ্যউপাত্ত কি গ্রহণযোগ্য?
- স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সোর্স আপনাকে যে ইঙ্গিত বা আভাস দিয়েছেন তাতে সোর্সের উদ্দেশ্য কি?
- এই সংবাদ প্রকাশ/প্রচার হলে সূত্রের কি ব্যক্তিগত কোন লাভ বা ফায়দা আছে?

২. ইঙ্গিতের অনুসন্ধানযোগ্যতা

সংবাদটির সক্ষমতা যাচাই করতে হবে। অর্থাৎ যে ইঙ্গিত বা আভাস পেয়েছেন তা আদৌ

[৫৭] সুধাংশু শেখর রায়, রিপোর্টিং, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃ-১৯৬।

প্রমাণ করা সম্ভব কীনা সে বিষয়টি প্রতিবেদককে যাচাই করতে হয়। এমন ইঙ্গিত বা আভাস অনেক সময় পাওয়া যায় যা সময় ও অর্থ এবং শ্রমের বিবেচনায় বাস্তবায়নযোগ্য নাও হতে পারে। সাধ থাকলেই হবে না সাধ্য ও সাধনার সংমিশ্রণে তা বাস্তবে রূপ দিতে পারতে হবে।

- ➢ অভিযোগটি কি প্রমাণযোগ্য?
- ➢ অনুসন্ধানের জন্য কি ধরনের তথ্য দরকার এবং সেসব তথ্য কি পাওয়া সম্ভব?
- ➢ উপাত্ত বা নথিপত্রগুলো কি সহজলভ্য? কোথায় পাওয়া যাবে এসব নথিপত্র?
- ➢ সোর্স বা সূত্রগুলো অন রেকর্ডে কথা বলতে কি আগ্রহী? যদি না হয়, তাহলে যথাযথভাবে সূত্র উল্লেখ না করে অভিযোগগুলো প্রমাণ করা যাবে কীনা?
- ➢ এ ধরনের প্রতিবেদন করার জন্য প্রতিবেদকের কাছে পটভূমি তথ্য ও বিশেষজ্ঞদের নাম-ঠিকানা আছে কীনা?

৩. প্রতিদ্বন্দ্বীদের অবস্থান যাচাই

তৃতীয়ত: আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম প্রতিষ্ঠান একই ধরনের প্রতিবেদন করছেন কীনা তার খোঁজ রাখা। মনে রাখতে হবে, সাংবাদিকতা এখন একটি প্রতিযোগিতামূলক শিল্প যেখানে সবাই চায় সবচেয়ে ভাল সংবাদ সবার আগে পাঠক ও দর্শক-শ্রোতার কাছে তুলে ধরতে। সে কারণে কোন একটি বিষয়ে আপনি হয়তো প্রতিবেদন তৈরির পরিকল্পনা করেছেন যেটি নিয়ে আপনার অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদক ইতিমধ্যে বেশ এগিয়ে গেছে এবং শিগগিরই প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারে। এমন অবস্থায় আপনি একই কাজে নতুন করে নামাটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কারণ আপনি কাজ করার সময়ই ওই প্রতিবেদক তার পত্রিকা বা টেলিভিশনে সংবাদ প্রকাশ/প্রচার করে দিতে পারেন যা আপনাকে হতাশাগ্রস্ত করতে পারে।

৪. প্রতিবেদকের আগ্রহ

চতুর্থত: প্রতিবেদককে অবশ্যই এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার যথেষ্ট ব্যক্তিগত ও পেশাগত আগ্রহ আছে। কারণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে প্রচুর শ্রমসাপেক্ষ। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় যথেষ্ট ধৈর্য্যেরও পরিচয় দিতে হয়। এজন্য দরকার কাজের প্রতি প্রতিবেদকের সুদৃঢ় অঙ্গীকার। অনেক সময় অফিসের চাপে কিংবা বিটের দায়িত্ব হিসেবে প্রতিবেদকের ওপর অনেক বিষয়ে অনুসন্ধানের দায়িত্ব বর্তায়। কিন্তু যদি প্রতিবেদকের ব্যক্তিগত ও পেশাগত আগ্রহ এবং একাগ্রতা না থাকে তাহলে কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া প্রতিবেদকের পক্ষে সম্ভব নয়।

৫. সময়সীমা ও বাজেট

পঞ্চমত: প্রতিবেদককে সময়সীমা এবং বাজেটও বিবেচনা করতে হয়।

➢ প্রতিবেদনটি তৈরি করতে কত সময়, কত টাকা এবং কি পরিমাণ লোকজন প্রয়োজন?

➢ বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য কি প্রতিবেদকের একটি টিম বা দল গঠন করা উচিত? না কি তিনি একাই এর অনুসন্ধান করতে পারবেন? যেমন, একজন প্রতিবেদক তার বিটের দায়িত্ব হিসেবে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কাভার করে থাকেন। এক্ষেত্রে তিনি সেতু বিভাগের কোন দুর্নীতির খোঁজ পেয়েছেন যার সাথে সরকারের অর্থ, পরিকল্পনা, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সংশ্লিষ্ট। এক্ষেত্রে দেখা যাবে, ওই প্রতিবেদকের সংবাদ মাধ্যমের পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা প্রতিবেদক অর্থ, পরিকল্পনা, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও দুর্নীতি দমন কমিশন কাভার করে থাকেন। প্রতিবেদক তার পরিকল্পিত প্রতিবেদনটি তৈরির জন্য ওইসব

বিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিবেদকদের সহযোগিতা দরকার কীনা তা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা উচিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, ভাল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন আসলে দলীয় প্রচেষ্টার ফসল।

➢ নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে নির্ধারিত সময়সীমা কি বাস্তবভিত্তিক?

৬. কর্তৃপক্ষের অনুমোদন

ষষ্ঠত: সংবাদ মাধ্যম কিংবা সংবাদ মাধ্যমের কর্তাব্যক্তিরা বিষয়টি অনুসন্ধানের অনুমতি দিবেন কীনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

➢ সব গণমাধ্যমেরই নানা দিক থেকে কিছু নীতিমালা থাকে। কিভাবে গণমাধ্যমগুলো তাদের এজেন্ডা নির্ধারণ করবে কিংবা কোন বিষয় প্রকাশ/সম্প্রচার হবে এবং কোন বিষয় প্রকাশ/প্রচার হবে না তা এই নীতিমালার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, মনে করুন আপনি এমন একটি প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির খবর পেয়েছেন যে প্রতিষ্ঠানটি আপনার সংবাদ মাধ্যমকে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞাপন দেয়। এক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির খবর আপনার সংবাদ মাধ্যম তুলে ধরবে কীনা তা আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং ওই প্রতিবেদন প্রকাশ/প্রচারের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের কিভাবে রাজি করাবেন সে বিষয়ে ভাবতে হবে।

৭. সংবাদ মূল্য নিরূপণ

সপ্তমত: প্রতিবেদককে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করতে হবে যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংবাদ মূল্য নিরূপণ করতে হবে। এটি আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। কারণ সংবাদ মূল্যের ভিত্তিতে খবরটির গুরুত্ব নির্ধারিত হয়। মনে রাখতে হবে, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন উদ্দেশ্যমূলক প্রতিবেদন যার মূল লক্ষ্য জনস্বার্থ। দুর্নীতি, অপরাধ, ক্ষমতার অপব্যবহারকারীরা সমাজবিরোধী এবং তারা সমাজের শত্রু। তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়াই দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মূল লক্ষ্য।

➢ এ প্রতিবেদনে জনস্বার্থের বিষয়টি কি?
➢ এ বিষয়টির সঙ্গে কি শক্তিশালী বা বড় কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিবর্গের জবাবদিহিতার প্রশ্ন জড়িত?
➢ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের ভাগ্য বা স্বার্থ কি এর সাথে জড়িত? কত সংখ্যক পাঠক/দর্শক এর সাথে জড়িত?

দ্বিতীয় স্তর: অনুসন্ধানী সংবাদের পরিকল্পনা নকশা ও কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাভ

শিক্ষানবিশ প্রতিবেদকরা যখন সাংবাদিকতায় যোগ দেন তখন তাদের মনে একটি স্বপ্ন থাকে- ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা তাকে নানা অপকর্ম সম্পর্কে তথ্য দিবেন, নথিপত্র সরবরাহ করবেন এবং তা দিয়ে তিনি ধামাকা একটি প্রতিবেদন তৈরি করবেন যা হবে লাল কালির ব্যানার শিরোনাম। সারাদেশের চায়ের টেবিল থেকে রাজনীতির মঞ্চ- সবখানে ওই প্রতিবেদন নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যাবে, বড় বড় পুরস্কার, প্রশংসা জুটবে তার কপালে। এমন স্বপ্ন প্রায় শিক্ষানবিশ প্রতিবেদকেরই থাকে। এমনটা হঠাৎ ঘটেও। যে রকম ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। একটি অজ্ঞাত সূত্র থেকে পাওয়া আভাস বা ইঙ্গিত থেকে তৈরি হওয়া প্রতিবেদন সারাবিশ্ব জুড়ে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল, যার প্রেক্ষিতে ক্ষমতাধর মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদত্যাগে

বাধ্য হন। কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাংবাদিকতা জগতে যেখানকার সংবাদকক্ষগুলো রিসোর্স বা সম্পদের দিক থেকে অনেক বেশি দুর্বল সেখানে এ ধরনের স্বপ্নপূরণ কদাচিৎই ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা কম। ওয়াটারগেটের মতো ঘটনা একেবারেই মৌলিক। সেজন্য ব্রেকিং সংবাদের ফলোআপ কিংবা নানা সূত্র থেকে ইঙ্গিত বা আভাস পাওয়ার উপরই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের কাজ সবসময় নির্ভর করে না। এখন সব ধরনের সংবাদ মাধ্যমে প্রায় প্রত্যেক প্রতিবেদকেরই এক বা একাধিক বিট থাকে। তিনি সংশ্লিষ্ট বিট বা বিটগুলোর জন্য দায়বদ্ধ থাকেন। ওইসব বিটে যেসব ঘটনা ঘটেছে, ঘটছে বা যেসব ঘটনা ঘটতে পারে সেগুলোর খবরাখবর দেয়া ওই প্রতিবেদকের মূখ্য কাজ। এক্ষেত্রে প্রতিবেদক তার বিটে কিংবা অন্য কোন বিটে পরিকল্পনার মাধ্যমেও অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করতে পারেন। একটি পরিকল্পিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য প্রতিবেদককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রচুর তথ্য-উপাত্ত জোগাড় করতে হয়।

ধারণা বা আভাস পাওয়ার অর্থ এই নয় যে, প্রতিবেদনটি তৈরি হয়ে গেল। অর্থাৎ একজন প্রতিবেদক সরাসরি ধারণা থেকে অনুসন্ধানে নেমে যেতে পারেন না। ধারণা পাওয়ার অর্থ হলো কাজ শুরুর একটা উপলক্ষ হাতে পাওয়া মাত্র। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সঙ্গে বিশাল সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন জড়িত, জড়িত নানা ধরনের আইনি ও নৈতিক প্রশ্ন। সে কারণে একটি বিশাল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি তৈরি করতে হয়। আবার অনুসন্ধানী প্রতিবেদক একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়াও বটে। একজনের পক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব নাও হতে পারে, দরকার হতে পারে দলীয় চেষ্টা। এসব কিছুর জন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনায় দরকার সুষ্ঠু ও সামগ্রিক পরিকল্পনা। পরিকল্পনা স্তরে প্রতিবেদক সংবাদ গল্পের ধারণা ও কিভাবে তিনি এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করবেন তার একটি কর্মপন্থা ঠিক করেন। বলা হয়, একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন যত্নসহকারে ও সুবিস্তৃত পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের ফসল। Leonard M. Kantumoya বলেছেন, *"An investigative story is painstakingly put together from a careful selection and weaving of disparate pieces of information gleaned from different sources, under varying conditions and circumstances. It cannot, therefore, be expected to take shape by a haphazard use of data and technique. An investigative story is the product of careful, detailed planning."*[৫৮]

একজন প্রতিবেদক হিসেবে যে প্রকল্পটি আপনি হাতে নিয়েছেন তা বাস্তবায়নযোগ্য, সক্ষমযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত কীনা তা নির্ণয় করার আগে আপনাকে একটি পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। এ পরিকল্পনা দুটি বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করবে। প্রথমত আপনার প্রতিষ্ঠানের সম্পদ বা রিসোর্সের অপচয় রোধ করবে। কারণ অনেক ইঙ্গিত বা আভাস পাবেন যেগুলো বাস্তবায়নযোগ্য নাও হতে পারে। যেমন ধরুন, আপনি ইঙ্গিত পেলেন কোন একজন মন্ত্রী কোন টেন্ডারের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে আপনার পক্ষে বাস্তবায়নযোগ্য নাও হতে পারে। বাস্তবায়নযোগ্য নয় এমন প্রতিবেদনের জন্য দিনের পর দিন একজন প্রতিবেদককে ব্যস্ত রাখলে আপনার প্রতিষ্ঠানের রিসোর্সের অপচয় হতে পারে। আবার এ বিষয়ে আপনার অন্য কোন সহকর্মীর সাহায্যও দরকার হতে পারে। কাদের ও কিভাবে

[৫৮] Leonard M. Kantumoya (2004), Investigative Reporting in Zambia: A Practitioner's Handbook, Transparency International Zambia, p. 23.

সাহায্য আপনার দরকার সে বিষয়টি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে আপনি ছক কষতে পারেন। দ্বিতীয়ত অনুসন্ধান প্রতিবেদনটি তৈরির জন্য প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিকল্পনা আপনাকে সাহায্য করবে। ভাল সংবাদ মাধ্যমে প্রতিদিন কিংবা সপ্তাহে রিপোর্টার্স মিটিং হয়ে থাকে। সেসব মিটিংয়ে রিপোর্টারকে প্রধান প্রতিবেদক কিংবা এসাইমেন্ট এডিটরের কাছে বিশেষ ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পরিকল্পনা জমা দিতে হয়। একটি বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিবেদনের পরিকল্পনার ছক যদি আপনি কষতে পারেন তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রধান প্রতিবেদক কিংবা এসাইনমেন্ট এডিটরের নানা প্রশ্নের উত্তর আপনার পক্ষে দেয়া সহজ হবে এবং এতে প্রতিবেদনটি করার জন্য আপনি অনুমোদন পাবেন। তাছাড়া এক্ষেত্রে আপনার প্রতিষ্ঠানের নীতিগত দিক থেকে কোন বিরোধ আছে কীনা তাও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ধারণা বা আভাস কিংবা ইঙ্গিতের মূল্যায়ন বা সম্ভাব্যতা যাচাই গবেষণার মধ্য দিয়ে এ দিকগুলো পরিষ্কার হয়ে ওঠা। এ স্তরে শুধু তা একটি ছকের মাধ্যমে প্রতিবেদককে তার সম্পাদকের কাছে তুলে ধরতে হয়। একে আমরা সংবাদগল্পের পরিকল্পনাও বলতে পারি। এখানে থাকবে অনুসন্ধান প্রকল্পের নকশার স্তর ও সেসব স্তরে প্রতিবেদক কি কি করবেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

সংবাদগল্পের পরিকল্পনা (Planning the Story)

সংবাদগল্পের পরিকল্পনা একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। একটি প্রকল্প প্রস্তাবনার (Project Proposal) মতই এটি হয়ে থাকে। মূলতঃ সংবাদ মাধ্যমের কর্তাব্যক্তিদের অনুমোদনের জন্য সংক্ষেপে এখানে সম্ভাব্য সংবাদের গ্রহণযোগ্যতা, প্রয়োজনীয়তা ও কিভাবে অনুসন্ধান কাজ সম্পাদন করা হবে তা তুলে ধরতে হয়।

Leonard M. Kantumoya বলেছেন, "*Story planning culminates into what looks like a project proposal in summary form. Story planning yields an outline of the important aspects of the potential story, showing what will or needs to be done to accomplish the exercise.*"[৫৯]

অনুসন্ধান প্রকল্পের নকশার স্তরসমূহ (The steps of designing an investigative project)

একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য যথেষ্ট সময় ও অর্থের দরকার। তাছাড়া বিষয়টি হতে পারে স্পর্শকাতর। এ কারণে এ বিষয়ে একজন প্রতিবেদককে তার অফিসের অনুমতি নিতে হতে পারে। এ অনুমতি নেয়ার জন্য প্রতিবেদক অনুসন্ধান প্রকল্পের একটি নকশা তৈরি করতে পারেন। প্রায়ই দেখা যায়, প্রতিবেদক নানা সূত্র থেকে ধারণা বা আভাস পেয়েছেন তা অনেক ব্যাপক একটি বিষয় এবং অনুসন্ধানের জন্য তার ব্যবস্থাপনা একটি জটিল প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে প্রথম কাজটি হলো সংবাদটির একটি সারমর্ম এক পাতায় লিখে ফেলা। এটি হতে পারে একটি অনুচ্ছেদে। এ অনুচ্ছেদ থেকেই আপনি তৈরি করতে পারেন সংবাদগল্পের নকশা। এ নকশা খুব বেশি বড় হবে না; এক থেকে দেড় পৃষ্ঠার মধ্যে এই নকশাটি তৈরি করতে হয়। একটি সম্ভাব্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের উদাহরণের সাহায্যে অনুসন্ধান প্রকল্পের নকশার স্তরসমূহ তুলে ধরা হলো:

[৫৯] Ibid.

অনুসন্ধানী প্রকল্পের নকশা

১. প্রকল্পের শিরোনাম
২. প্রয়োজনীয়তা
৩. প্রয়োজনীয় সম্পদ/রিসোর্স
    ক) বাজেট
    খ) জনশক্তি
৪. সূত্র/সোর্স
৫. পরিধি
৬. কৌশল/পদ্ধতি
৭. সময়সীমা
৮. প্রচার/প্রকাশ পদ্ধতি

১. বিষয়/প্রকল্পের শিরোনাম

- এই আউটলাইনটি মূলত শুরু হবে একটি শিরোনামের মাধ্যমে। এটি হবে একটি ক্যাচমার্ক বা নির্দেশনার মতো।
- এই শিরোনাম প্রকল্পের মূল বিষয়বস্তুকে তুলে ধরবে। এখানে প্রধান বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে এবং মূল প্রশ্নগুলো নির্দেশ করা হবে।

২. প্রয়োজনীয়তা/যৌক্তিকতা

- এটি প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরবে।
- কেন এ প্রতিবেদন তুলে ধরা দরকার তার পেছনে যুক্তি থাকবে।
- এখানে জনস্বার্থের বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে। কারণ জনস্বার্থের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলে সংবাদ মাধ্যমের কর্তাব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির জন্য অনুমোদন দিতে পারেন।

৩. প্রয়োজনীয় সম্পদ/রিসোর্স

প্রয়োজনীয় জনবল ও বাজেট পুরো অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার একটি অত্যাবশ্যকীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়া জটিল ও কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ হওয়ায় এটি আসলে একটি টিমওয়ার্ক বা দলীয় প্রচেষ্টার ফসল। আবার কোন ঘটনার নেটওয়ার্ক বিস্তৃত এলাকা বা বিষয় নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে। এ কারণে কি পরিমাণ জনবল বা অন্য কোন কোন বিটের সহকর্মীর সাহায্য এক্ষেত্রে দরকার তা পরিকল্পনা নকশায় তুলে ধরতে হবে। আবার কি পরিমাণ অর্থ খরচ হবে সেটিও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে হবে।

- প্রকল্পটি কার্যকরভাবে সম্পন্ন করতে কি ধরনের রিসোর্স বা সম্পদ প্রয়োজন তা বর্ণনা করতে হবে।
- একজন দিয়ে অনুসন্ধান করা যাবে নাকি একটি টিম দরকার?
- যদি টিম দরকার হয়, তাহলে কত সদস্যের টিম দরকার?
- পুরো সংবাদটি তৈরি করতে কত সময় দরকার এবং ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য খরচ

বাবদ কত টাকা দরকার তার একটি প্রাক্কলিত ব্যয় ধার্য করা। পুরো অনুসন্ধান কর্মটি পরিচালনা করতে কী পরিমাণ অর্থ খরচ হবে সেটির একটি খসড়া অবশ্যই তৈরি করতে হবে।

৪. সূত্র/সোর্স

সম্ভাব্য সূত্রের উল্লেখ করে তাদের কাছে কি ধরনের তথ্য পাওয়া যাবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকতে পারে।

- ➢ সম্ভাব্য সূত্রগুলোকে কোথায় পাওয়া যাবে? তাদের সঙ্গে পৌঁছানো সম্ভব?
- ➢ পটভূমি বিশ্লেষণের জন্য কোন কোন সোর্সের সাক্ষাৎকার নেয়া দরকার?
- ➢ গ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন ধরনের সেকেন্ডারি সোর্স থেকে কি ধরনের পটভূমি তথ্য দরকার?

৫. পরিধি

এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটি উপযুক্ত পরিধি নির্ধারণের মাধ্যমে আউটলাইন নির্ণয় করতে পারলে তা শুধু সংবাদের বিক্রয়মূল্য বাড়িয়ে দেয় না, সাথে সাথে প্রতিবেদককে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ণয়ে সাহায্য করে। এটি সব ধরনের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে প্রতিবেদককে এক ধরনের দিকনির্দেশনাও দেয়।

- ➢ কি অনুসন্ধান করা হবে?
- ➢ বিষয়ের কতটুকু গভীরে যাওয়া হবে?

৬. কৌশল/পদ্ধতি

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরিতে চারটি উপকরণ/হাতিয়ার ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো:

ক. উপাত্ত/নথিপত্র (Document) খ. সাক্ষাৎকার (Interview) গ. পর্যবেক্ষণ (Surveillance) এবং ঘ. জরিপ (Survey)।

- ➢ যেসব উপকরণের মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে সেগুলোর তালিকা এখানে তুলে ধরতে হবে।
- ➢ মূলত যেসব উপকরণ বা হাতিয়ারের মাধ্যমে প্রতিবেদন তথ্য সংগ্রহ করেন সেগুলোর নাম এখানে তুলে ধরতে হয়।

৭. সময়সীমা

ঘটনাটি অনুসন্ধান ও প্রতিবেদন শেষ করার জন্য একটি যৌক্তিক সময়সীমা উল্লেখ করতে হবে। সময়সীমা সামনে রেখে কাজ করা শৃঙ্খলার অংশ। এটি প্রতিবেদককে তাদের কাজের দিকে মনোনিবেশ করতে যেমন সাহায্য করে তেমনি অঙ্গীকারাবদ্ধ ও কাজের গতিবেগ ধরে রাখতে সাহায্য করে। একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করার সময় একজন প্রতিবেদককে অনেক কিছু খুঁজে বের করতে হয়। এক্ষেত্রে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা থাকলে প্রতিবেদক ধারাবাহিকভাবে কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন। সে কারণে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য সময়সীমা নির্ধারণ একটি কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। এজন্য Sheila S. Coronel বলছেন, "*With a timeline, a journalist is able to see how one event leads to another, to find patterns in the occurrences, or to find the gaps in his research. Timelines may help journalists understand why things happened the way they did.*"[৬০]

---

[৬০] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p. 49.

৮. প্রচার/প্রকাশ

➢ পাঠক ও দর্শকদের কাছে কিভাবে সংবাদটি উপস্থাপন করা হবে?

➢ এটি কি একটি সিরিজ প্রতিবেদন হবে নাকি একটি প্রতিবেদন করা হবে? এ স্তরে এটি সম্পূর্ণই অনুমান নির্ভর। অনেক সময় পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহের পর প্রতিবেদনের সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে।

➢ অনুসন্ধান থেকে কি ফলাফল বেরিয়ে আসবে?

এই আউটলাইনটি যদি যথোপযুক্ত হয়, তাহলে প্রতিবেদকের কাজ সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত হয়। এর ফলে একজন সম্পাদক জানেন তিনি কি চান আর একজন প্রতিবেদকও জানেন কিভাবে তাকে কাজ করতে হবে। তবে আমাদের দেশে এ ধরনের ছক করে প্রতিবেদকরা পরিকল্পনা জমা দেন না। প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যাস না থাকলেও প্রতিবেদক ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করলে এ থেকে উপকার পেতে পারেন।

William C. Gaines তাঁর বইতে (১৯৯৮)[৬১] এ রকম একটি কাল্পনিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের কাল্পনিক নকশার কথা তুলে ধরেছেন। এ নকশায় অবশ্য প্রয়োজনীয় জনবল এবং সময়ের কোন নির্দেশনা ছিল না। নিচে সেটি তুলে ধরা হলো।

ক. শিরোনামঃ মহাসড়ক।

খ. বিষয়ঃ নতুন মহাসড়কের জন্য সরকার ভূমি অধিগ্রহণ করছে।

গ. প্রয়োজনীয়তাঃ সড়ক ও জনপথ বিভাগ শহরের উত্তর দিকের নতুন মহাসড়ক প্রসারিত করার জন্য জমি অধিগ্রহণ করছে। জায়গা কেনার বিষয়ে সড়ক ও জনপথ বিভাগের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ আছে, তারা জমির বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি দামে কিনেছে। অর্থাৎ মহাসড়ক প্রসারিত করার নামে এখানে সরকারি টাকার নয়ছয় হচ্ছে। এ সংবাদটি তৈরি করলে দুর্নীতি চিহ্নিত করা যাবে এবং জনগণের করের অর্থ বাঁচানো যাবে।

ঘ. পরিধিঃ এই অনুসন্ধান জমি অধিগ্রহণ ও এর মূল্য পরিশোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এ অনুসন্ধানে অবকাঠামো কাজের চুক্তিগুলো পরীক্ষা বা যাচাই-বাছাই করে দেখবো না। যেহেতু মহাসড়কটি দরকার তাই আমরা এই মহাসড়কের কারণে জনগণের বাস্তুচ্যুত হওয়া কিংবা পরিবেশের ক্ষতির বিষয়টি নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করব না। সরকার অধিগ্রহণ করেনি আশপাশের এমন জমির দরও আমরা যাচাই-বাছাই করে দেখবো।

ঙ. পদ্ধতিঃ এ সংবাদের অধিকাংশ তথ্য আসবে স্থানীয় ভূমি রেজিস্ট্রি অফিসের নথিপত্র থেকে এবং জমির মালিকদের সাক্ষাৎকার থেকে। আমরা অন্য মহাসড়কগুলো জমি অধিগ্রহণ করে যে দাম দেয়া হয়েছিল তার সাথে এ মহাসড়কের জমির দামের তুলনা করবো। আমরা পুরো খরচ হিসাব করে দেখাবো যে, ইতিমধ্যে কিভাবে এ মহাসড়ক নির্মাণের প্রাক্কলিত খরচ অতিক্রম করে ফেলেছে।

চ. সূত্রঃ আমরা সড়ক ও জনপথ বিভাগ থেকে জমির মালিকদের একটি তালিকা পাবো। যদি তা পেতে দেরি হয় তাহলে স্থানীয় ভূমি রেজিস্ট্রি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। প্রত্যেক

[৬১] William C. Gaines (1998), Investigative Reporting for Print and Broadcast/ Nelson-Hall Publishers, 2nd edition, p. 51-54.

মালিকের একটি তালিকা তৈরি করে তার ভিত্তিতে গবেষণা করতে হবে। সাবেক ও বর্তমান মালিকদের তালিকা তৈরি করা হবে। তারা অতীতে এ জমি কত দিয়ে কিনেছিল আর বর্তমানে সরকারের কাছে কত দিয়ে বিক্রি করছে তা খুঁজে বের করা হবে। এক্ষেত্রে জমির মালিকদের সাথে সরকারি কর্মকর্তাদের কোন সম্পর্ক আছে কীনা তা বেরিয়ে পড়বে।

ছ. উপস্থাপন: এ বিষয়ে সংবাদপত্রের জন্য কয়েকটি সিরিজ প্রতিবেদন করা হবে। মানচিত্র, পার্শ্বচিত্র ইত্যাদির সাহায্যে প্রতিবেদনটি তুলে ধরা হবে। যদি আমরা দেখি যে, অন্যান্য মহাসড়কেও এমন দুর্নীতি করা হয়েছে তাহলে একটি অতিরিক্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হবে।

এই রকম একটি নকশার সাহায্যে আপনার পরিকল্পনা তুলে ধরুন আপনার সম্পাদক কিংবা প্রধান প্রতিবেদক কিংবা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিদের কাছে। দেখবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত খবরটির বিষয়ে তারা অনেক বেশি মনযোগী হবেন এবং অধিকাংশ সময়ে আপনাকে প্রতিবেদনটি তৈরি করতে উৎসাহ দিবেন। কারণ এ ধরনের নকশার মাধ্যমে কাজে নামার অর্থ হলো আপনি শৃংখলিত পদ্ধতিতে একটি বিষয়ে অনুসন্ধানে নামছেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সময়ই প্রতিবেদকের কাছে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটির ভবিষ্যত পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তার এই ধারণার প্রতিফলন ফুটে ওঠে কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়া প্রতিবেদনের পরিকল্পনা নকশায়। এ পর্যায়ে সম্পাদক ও প্রতিবেদক যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেন তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে। এক্ষেত্রে সামনে এগোনোটা যদি উদ্দেশ্যসাধক হয় তাহলে তারা এগিয়ে যাবেন। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, প্রতিবেদক ও সম্পাদক কিংবা কর্তৃপক্ষের কাছে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার হতে হবে। কারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো পরিষ্কার হলে প্রতিবেদক ও সম্পাদকের পক্ষে পরবর্তী ধাপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া অনেক সহজ হয়। এক্ষেত্রে প্রতিবেদককে একটি কথা মাথায় রাখতে হবে, সম্পাদক যদি মনে করেন সম্ভাব্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটির ধারণা খুব ভাল, এর তথ্য-উপাত্ত পাওয়া সম্ভব, এর জন্য যে রিসোর্স ব্যয় করতে হবে তার বিনিময়ে লাভ হবে ঢের বেশি এবং এর ফলে যে ঝুঁকি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা আছে তা তিনি ও তার প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব- তাহলে তিনি পরবর্তী ধাপে এগিয়ে 'যাওয়া'র সিদ্ধান্ত দেন। আর এসব বিষয়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি অস্পষ্ট কিংবা এসব বিষয়ে প্রতিবেদক সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারেন তাহলে সম্পাদক আর এগিয়ে 'না যাওয়া'র সিদ্ধান্ত দেন।

তৃতীয় স্তর: অনুসন্ধান পরিকল্পনা

পরিকল্পনা ছাড়া অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা এক অলীক স্বপ্ন। আজ পর্যন্ত বিশ্বে এমন কোন প্রতিবেদনের উদাহরণ কেউ দেখাতে পারেননি যে তিনি পরিকল্পনা না করে কোন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হবে, সেসব তথ্য কিভাবে সংগঠিত করা হবে এবং সেসব তথ্যের ভিত্তিতে কিভাবে প্রতিবেদনটি লিখতে হবে, আইন এবং নৈতিকতার মাপকাঠিতে যাচাই-বাছাই শেষে কিভাবে সংবাদটি পাঠক/দর্শকদের কাছে তুলে ধরতে হবে- এসব বিষয় পরিকল্পনার স্তরে একজন প্রতিবেদককে জানতে হয়। কারণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন একটি সুচিন্তিত, সুবিস্তৃত ও দীর্ঘ সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়। প্রাথমিক প্রস্তুতি থেকে শুরু করে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির পথ অনেক দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য। কারণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন গভীরতাসম্পন্ন

ও গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন। এ প্রতিবেদন দৈনন্দিন সাধারণ প্রতিবেদন নয়, নয় কোন সাধারণ চোখে দেখা প্রতিবেদন। এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রতিবেদককে অনেকগুলো ধাপ পার হতে হয়। এর প্রত্যেকটি ধাপের জন্য দরকার সুশৃঙ্খল কৌশল। Leonard M. Kantumoya বলেছেন, "*An investigative story is the product of careful, detailed planning.*"[৬২]

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়াটি একটি হিজিবিজি গেমের মতো। এর জন্য দরকার পদ্ধতিগত সুষ্ঠু একটি প্রক্রিয়া যা নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্যগুলোকে প্রয়োজনের নিরিখে সংগ্রহ করে ঘটনার একটি বৃহৎ চিত্র তুলে ধরতে সাহায্য করবে। একটি অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ায় উত্তম পরিকল্পনা কত দরকার তা সহজেই বোঝা যায় Leonard M. Kantumoya -এর এ কথা থেকে, "*A plan puts all the major project elements into focus. The more detailed the plan, the better. A good plan anticipates both constraints and opportunities and, therefore, enables you to proceed in a smooth and systematic manner. A good plan is itself usually the product of some preliminary research done to determine the desirability and feasibility of the investigative story project.*"[৬৩] Derek Forbes বলেছেন, "*An investigation is like a jigsaw puzzle: it requires the methodical fitting together of apparently unrelated pieces to reveal the big picture. Similarly, thorough and systematic piecing together of issues, resources, techniques and sources is needed to assemble an investigative assignment. For this a plan is needed. A plan is a practical yet flexible scheme that outlines the steps required to access information needed to support the investigation's claims. It will allow you to examine the field of play, assess available resources, pinpoint possible problems and identify ways to get around them.*"[৬৪]

মনে রাখতে হবে অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা সংবাদগল্পের নকশার বা এর পরিকল্পনার চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত ও চিন্তাশীল একটি প্রক্রিয়া। এটিকে কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা বলা যায়, যার মধ্য দিয়ে প্রতিবেদক তার সুনির্দিষ্ট কাজগুলো নির্ধারণ করবেন এবং সেগুলো কিভাবে সম্পাদন করবেন তার গতিধারা নিরূপণ করবেন। তবে এ পরিকল্পনা কোনভাবেই একটি জগদ্দল পাথর নয়। এটি এমনভাবে করতে হবে যাতে অনুসন্ধান কাজের সময় প্রাপ্ত তথ্যগুলো খাপ খাইয়ে নেয়া যায়। Investigative Journalism Manuals-এ বলা হয়েছে, "*However, a plan is never set in stone. As you'll see from what follows, it has to have sufficient flexibility to cope with the new information and new directions your investigation will uncover.*"[৬৫]

---

[৬২] Ibid, Leonard M. Kantumoya (2004), p. 23.

[৬৩] Ibid, p. 30.

[৬৪] Derek Forbes (2005), A watchdog's guide to investigative reporting: A simple introduction to principles and practice in investigative reporting, Konrad Adenauer Stiftung Media Programme, Johannesburg, Republic of South Africa, p. 21.

[৬৫] Ibid, Gwen Ansell (ed.), Chapter three: Planning the Investigation.

প্রথম ধাপ

ধারণা থেকে অনুমিতি (From Idea to hypothesis)

রিপোর্টাররা প্রায়ই একটা অনুযোগ করেন যে, সম্পাদক সাহেব তার ধামাক্কা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ধারণাটি বাতিল করে দিলেন। এমনটা হয় বা ঘটে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, সম্পাদক আসলে যা বাতিল করে দেন তা আদৌ সংবাদ ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, আপনি হয়তো আপনার সম্পাদককে বললেন, 'আমি দুর্নীতি অনুসন্ধান করতে চাই'। এমন বক্তব্যে আপনার সম্পাদকের পক্ষে কখনই হ্যাঁ সূচক সম্মতি দেয়া সম্ভব নয়। এটি সত্যি যে, বিশ্বের সর্বত্রই দুর্নীতি আছে। আপনি যদি পর্যাপ্ত সময় দেন, তাহলে হয়তো আপনার পক্ষে কিছু দুর্নীতির খবর বের করে আনা সম্ভব। কিন্তু দুর্নীতি কোন সংবাদগল্প নয়, এটি একটি বিষয়। একজন সাংবাদিক কোন বিষয়ে লেখেন না, তিনি একটি সংবাদগল্প তুলে ধরেন। আপনি যদি একটি সংবাদগল্পের দিকে না ছুটে একটি বিষয়ের পেছনে ছুটেন তাহলে হয়তো আপনি সে বিষয়ের ওপর অভিজ্ঞ হতে পারেন। কিন্তু তার জন্য প্রচুর সময়, অর্থ আর শ্রম নষ্ট হবে। যে কারণে আপনার সম্পাদক আপনাকে অবলীলায় 'না' বলে দেবেন। যদি আপনি বলেন, 'স্কুল ব্যবস্থায় দুর্নীতি পিতামাতার আশাকে ধ্বংস করছে'। এখানে আপনি একটি নির্দিষ্ট সংবাদগল্পের ধারণা দিয়েছেন আপনার সম্পাদককে এবং এটি এখন আগেরটির তুলনায় অনেক বেশি আকর্ষণীয়। মজার বিষয় হলো, আপনি জ্ঞাতসারে করুন বা অজ্ঞাতসারেই করুন, এ ধারণার মধ্য দিয়ে আপনি একটি অনুমান গঠন করেছেন। কারণ আপনি ইতিমধ্যেই অনুমান গঠন করেছেন– স্কুল ব্যবস্থায় দুর্নীতি বিদ্যমান এবং তা পিতামাতা ও শিশুদের ওপর প্রভাব ফেলছে।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ধারণা সম্পর্কিত অধ্যায়ে আমরা দেখেছি একজন প্রতিবেদক নানা সূত্র বা মাধ্যম থেকে একটি প্রতিবেদনের ধারণা, ইঙ্গিত বা আভাস পেয়ে থাকেন। এ ইঙ্গিত বা আভাস থেকেই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হলেও এ ধরনের ধারণা, ইঙ্গিত বা আভাস পেয়ে গেলেই তিনি অনুসন্ধানে নেমে যেতে পারেন না। ইঙ্গিত বা আভাস কিংবা ধারণা লাভের অর্থ হলো ওই বিষয়টি সম্পর্কে খুঁটিয়ে দেখা দরকার। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সাথে বিরাট সামাজিক দায়বদ্ধতা, অনেক আইনগত ঝুঁকি জড়িত। সে কারণে অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি সমন্বিত কর্মপন্থা হাতে নিতে হয়। এর জন্য দরকার হতে পারে একটি ভাল টিমওয়ার্ক। আবার অনুসন্ধানী প্রতিবেদক যে ধারণা বা ইঙ্গিত পেয়েছেন তা অনেক বিস্তৃত একটি ধারণা বা বিষয়। অনুসন্ধানের জন্য সে বিষয়টির মূল কেন্দ্রবিন্দু নির্ণয় করতে হয়। মূলত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন যেহেতু একটি সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা সে কারণে প্রতিবেদককে তাদের কাজের সুবিধার্থে সে ধারণা বা ইঙ্গিত সম্পর্কে কিছু অনুমিতি তৈরি করতে হয়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে অনুমিতি হলো প্রতিবেদক যাকে ভেতরের সত্য বলে মনে করছেন। আলী রিয়াজ বলেছেন, "*কোনো বিষয়ের ভেতরে প্রবেশের দরজাই হলো এই অনুমিতি*"।[৬৬] এসব অনুমিতি অনুসন্ধানের পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করে এবং প্রতিবেদক যা খুঁজে বেড়াচ্ছেন বা যেসব তথ্য উদঘাটনের জন্য কাজ করছেন সেসব বিষয় এসব অনুমিতি ধারাবাহিকভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়, "*A hypothesis is a theory or premise that guides the investigation.*"[৬৭] এর মাধ্যমে অনুসন্ধানী প্রতিবেদক তাদের

[৬৬] আলী রিয়াজ (১৯৯৪), অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হ্যান্ডবুক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ-১৮।

[৬৭] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p. 38.

কাজের পরিধি নির্ধারণ করেন। অর্থাৎ এ অনুমিতির ভিত্তিতে তিনি এমন একটি সীমারেখা তৈরি করেন যার মধ্যে তিনি অনুসন্ধান প্রক্রিয়া চালাবেন। Sheila S. Coronel খুব চমৎকারভাবে বলেছেন, "*Formulating a hypothesis is like drawing a line around the area that a journalist wants to examine.*"[৬৮] একইভাবে ডাচ অনুসন্ধানী সাংবাদিক Luuk Sengers বলেছেন, "*It is marking out your field of investigation.*"[৬৯] এ কারণে অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে অবশ্যই তাদের সামর্থ ও সক্ষমতার কথা বিবেচনা করে অনুমিতি নিরূপণ করা উচিত। অর্থাৎ তিনি যেটুকু তথ্য উন্মোচন করতে পারবেন বা যা প্রমাণ করতে পারবেন তার মধ্যেই অনুমিতি সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবী তাদের কাজের সুবিধার্থে অনুমিতির ভিত্তিতে কাজ শুরু করেন। যেমন পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কোন হত্যাকাণ্ড বা অপরাধের তদন্তে, বিজ্ঞানীরা কোন নতুন সূত্র আবিষ্কারে, সমাজবিজ্ঞানী তাদের নতুন কোন গবেষণায় সবসময়ই অনুমিতির ভিত্তিতে কাজ শুরু করেন। অনুমিতি তৈরির বিষয়টি বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে অনেকেই এটিকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে বিবেচনা করে থাকেন। অনুসন্ধানী প্রতিবেদককেও কাজ শুরুর আগে অনুমিতি গঠন করতে হয়। তিনি কি অনুসন্ধান করতে চান, কি বিষয় প্রমাণ করতে চান সে সম্পর্কে অনুমিতি গঠনের মাধ্যমে কাজ শুরু করতে হয়। অনুমিতি গঠনের অর্থ হলো প্রতিবেদক তার অনুসন্ধানের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন তৈরি করেন। এগুলো হলো:

১. কি ঘটেছিল? তাতে কি হয়েছে? (পাঠক/দর্শক কেন এই প্রতিবেদনটি গ্রহণ করবে?)
কি ঘটেছিল- এ বিষয়ের উত্তর খোঁজার মধ্যে ঘটনার সংবাদমূল্য নিহিত থাকে। প্রতিবেদককে প্রথমেই ঘটনার আদ্যপ্রান্ত জানতে হয়। তাতে কি হয়েছে– এর মধ্য দিয়ে প্রতিবেদক পাঠক/দর্শক কেন ঘটনাটি জানতে চায় বা পাঠক/দর্শকের কাছে এর গুরুত্ব কি তা বোঝার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ তিনি যে প্রতিবেদনটি তৈরি করতে যাচ্ছেন তার আবেদন দর্শক/পাঠকের কাছে কতটুকু সে সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা থাকতে হয়। এ ঘটনার সঙ্গে জনস্বার্থের বিষয়টি কতখানি সম্পৃক্ত বা জড়িত সে বিষয়টি প্রতিবেদককে নিরূপণ করতে হয়।

২. কে/কারা এটি করেছে? এর পরিণতি/ফলাফল কি?
দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধান প্রতিবেদন তৈরির জন্য এ দুটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা খুব জরুরি। এসব প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে প্রতিবেদন তার অনুসন্ধান কাজের গাইডলাইন তৈরি করতে পারেন। এর মাধ্যমে তিনি তার প্রতিবেদনের জন্য সোর্স ম্যাপ তৈরি করতে পারেন। এ ঘটনা বা বিষয়ের সাথে শক্তিশালী বা ক্ষমতাধর ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান জড়িত কীনা কিংবা তারা তাদের কর্তব্য কাজে গাফলতি করেছে কীনা- সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতে হবে প্রতিবেদককে। এ গাফিলতির কারণে ব্যাপক সংখ্যক জনগোষ্ঠী ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে কীনা তাও খুঁজে বের করা অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের কাজ।

---

[৬৮] Ibid.
[৬৯] Luuk Sengers' account of formulating an investigative hypothesis is in Project Management for Journalists, a handout prepared for the Centre for Investigative Journalism Summer School. It is also in www.luuksengers.nl.

৩. কি অনিয়ম/দুর্নীতি হয়েছিল? কিভাবে এ অনিয়ম/দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে? কে/কারা এর জন্য দায়ী? এর পরিণতি/ফলাফল কি?

আটলান্টা জার্নাল কন্সটিটিউশন কর্তৃক মার্কিন সংবাদপত্রের ওপর পরিচালিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকল্পের সহকারী ব্যবস্থাপনা সম্পাদক থমাস অলিভার[৭০] মনে করেন, এ প্রশ্নগুলো প্রতিবেদককে ঘটনার গভীরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে এবং তিনি এসব প্রশ্নের ভিত্তিতে পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারেন। তাই অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় তাকে এসব প্রশ্নের উত্তরই খুঁজতে হয়। এসব প্রশ্নের ভিত্তিতে তথ্য উপাত্ত যোগাড় করতে হয়।

৪. যৌক্তিকতা কি? (কেন প্রতিবেদক এই সংবাদ তৈরি করবেন?)

যুক্তিগুলো পরীক্ষা করার মধ্য দিয়ে সংবাদ প্রতিবেদক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটির সংবাদমূল্য নির্ণয় করতে পারেন। এখানে প্রতিবেদককে জনস্বার্থের দিকটি বিবেচনা করতে হয়। এখানে তিনি কতগুলো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পারেন:

ক প্রতিবেদনটি তৈরি হলে কে/কারা লাভবান হবে ও ক্ষতিগ্রস্থ হবে?
খ. কে/কারা এই সংবাদকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারে?
গ. এই ইস্যু/বিষয়টি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?
ঘ. এ সংবাদে কি পুরো ব্যবস্থা/অবস্থার চিত্র তুলে ধরবে?
ঙ. এ সংবাদে এমন কি নতুন তথ্য বেরিয়ে আসবে যা আগে কখনও প্রকাশিত হয়নি?
চ. এর আগে কি এ বিষয়ে কোন সংবাদ প্রকাশিত/প্রচারিত হয়েছিল?

পুরো অনুসন্ধান প্রক্রিয়াটিতে পদ্ধতিগতভাবে প্রতিবেদক তার অনুমিতির সত্যাসত্য যাচাই করেন। প্রতিবেদকের মনে যে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খায় সেগুলোর উত্তর খোঁজার জন্যই তিনি মাঠে নেমে পড়েন। সেজন্য Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists-এ বলা হয়েছে, "*Your hypothesis defines specific questions that must be answered if you want to find out whether or not it makes sense. This happens through a process in which we take apart the hypothesis and see what separate, specific claims it makes. Then, we can verify each of those claims in turn.*"[৭১]

অনুমিতি গঠনের সময় একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে: এমন কোন অনুমিতি গঠন করা যাবে না যা প্রমাণযোগ্য নয় বা প্রতিবেদকের পক্ষে প্রমাণের ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ অনুমিতিটির পরিচালনযোগ্যতা নির্ণয় করতে হবে প্রতিবেদককে। বিজ্ঞানীরাও এমনটা করেন। বিজ্ঞানীরা এমন অনুমিতি গঠন করেন যা তারা পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন; কিন্তু পরীক্ষাযোগ্য নয় এমন কোন অনুমিতি কোন বিজ্ঞানী গঠন করেন না। একইভাবে সাংবাদিককেও এমন অনুমিতি গঠন করতে হয় যা তিনি নথিপত্র কিংবা মানবীয় বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে কিংবা পর্যবেক্ষনসহ অন্য কোন পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণ করতে পারবেন। সে কারণে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মতোই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে অনুমিতির ভিত্তি হবে তথ্য ও অভিজ্ঞতা নির্ভর।

---

[৭০] Ibid, Gwen Ansell (ed.), Chapter three: Planning the Investigation.

[৭১] Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists, chapter two: Using hypotheses: The core of investigative method, p. 13.

আলী রিয়াজ বলেছেন, "যে কোনো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের প্রাথমিক তথ্য প্রাপ্তির পর অনুমিতি তৈরী করতে হবে তা পারা যাবে কিনা সেটা বিবেচনা করে। প্রাপ্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে প্রশ্ন তুলতে হবে; এখানে খবরটি কি? আমার/আমাদের পক্ষে তা খুঁজে বের করা কি সম্ভব? এই সব হিসেব না করে ঝাঁপিয়ে পড়ার অর্থ সাঁতার না জেনে জলে ডুবন্ত অন্যকে বাঁচানোর চেষ্টা করা– তাতে কেবল সমস্যাই বৃদ্ধি পায়, সমাধান হয় না।"[৭২] উদাহরণস্বরূপ, আপনি একটি সংবাদের অনুমিতি গঠন করেছেন যে, এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী বাজারে যেসব বিশুদ্ধ পানি বিক্রি করছে সেগুলো পানযোগ্য নয় এবং এগুলোতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ আছে। এ অনুমিতির সত্যাসত্য যাচাই করতে হলে অবশ্যই ওই সব পানীয় পরীক্ষাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে কোন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ আছে কীনা তা খুঁজে বের করতে হবে। এ কারণে Sheila S. Coronel বলেছেন, "*Journalists should limit their hypothesis to what they can prove.*"[৭৩] অনেক সময় মূল ঘটনাটি প্রমাণ করতে না পারলে তার পরবর্তী ঘটনাটি যদি প্রমাণযোগ্য হয় তাহলে তার ভিত্তিতেই অনুমিতি গঠন করতে হবে। তেমনি একটি ঘটনা নিচে তুলে ধরা হলো[৭৪]:

এস্ত্রাদা'র প্রাসাদ স্বর্গ

২০০০ সালে ফিলিপাইন সেন্টার ফর ইনভেসটিগেটিভ জার্নালিজম-এর প্রতিবেদকগণ দেশটির প্রেসিডেন্ট ও সাবেক চিত্রনায়ক জোসেফ এস্ত্রাদা সম্পর্কে একটি তথ্য পান। তথ্যটি হলো প্রেসিডেন্ট এস্ত্রাদা সরকারের সঙ্গে চুক্তি করার জন্য একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছেন। প্রতিবেদকগণ জানতেন ঘুষ নেয়ার ঘটনাটি তারা কোনভাবে প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ ঘুষ নেয়ার সময় অন্য কেউ ছিল না কিংবা সে সম্পর্কে কোন ডকুমেন্ট বা নথিপত্র ছিল না। বরং তারা অপেক্ষা করলেন এবং প্রমাণ করলেন প্রেসিডেন্টের অকল্পনীয় সম্পদ বা সম্পদের পাহাড় ছিল; যার মধ্যে তিনি তার চার স্ত্রীর জন্য চারটি প্রাসাদ স্বর্গ বানিয়েছেন। রিপোর্টাররা এ অর্থের উৎস কি বা কোথা থেকে এ অর্থ এসেছে তা অনুসন্ধান করেননি। বরং তারা নজর দিয়েছিলেন কিভাবে এ অর্থ খরচ করা হয়েছে এবং তারা প্রেসিডেন্টের এমন খরচের অর্থের উৎস জানতে চেয়েছেন।

অনুমিতি: এক্ষেত্রে রিপোর্টারদের পূর্বানুমান ছিল ১৯৯৮ সালে নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেয়া আয়ব্যয়ের হিসেবে এ প্রাসাদ স্বর্গগুলোর কথা উল্লেখ ছিল না এবং এ প্রাসাদ স্বর্গগুলো তৈরির পর তার আয়ব্যয়ের হিসেবে এ চারটি প্রাসাদ স্বর্গের কথা তুলে ধরেননি যা প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় তিনি বানিয়েছেন।

একটি বিষয় এখানে মনে রাখা দরকার, অনুমিতি একটি সাময়িক সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হতে পারে। এমনকি অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত বাতিলও হতে পারে। নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী বলেছেন, "এই সাময়িক সিদ্ধান্ত বা অনুমিতি ঘটনার আপাতত ব্যাখ্যা প্রদান এবং অনুসন্ধানের নির্দেশনা পাওয়ার জন্য গঠন করা হয়।"[৭৫]

[৭২] প্রাগুক্ত, আলী রিয়াজ (১৯৯৪), পৃ-১৮-১৯।
[৭৩] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p. 40.
[৭৪] The investigation of Estrada is described in L Moller and J Jackson, Journalistic Legwork that Tumbled a President: A Case Study and Guide for Investigative Journalists, published by the World Bank Institute. www.worldbank.org
[৭৫] প্রাগুক্ত/ নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী (১৯৯৬), পৃ ১০৩।

এখন একটি কাল্পনিক উদাহরণের ভিত্তিতে অনুমিতি তুলে ধরবো।

"দুর্নীতি" বলতে আপনি ঠিক কি বুঝাচ্ছেন? ঘুষ, পক্ষাপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি? যদি স্কুলে তা থাকে, তাহলে কিভাবে তা কাজ করছে?

কোন ধরনের পিতা মাতা দুর্নীতির শিকার হয়েছেন? তাদের কি আশা ছিল?

যা ঘটছে সে সম্পর্কে কি শিশুরা জানে? জানলে তাদের কিভাবে তা প্রভাবিত করছে?

স্কুল ব্যবস্থায় দুর্নীতি ধ্বংস করছে পিতামাতার আশা

কি ধরনের স্কুলে দুর্নীতি আছে? কত স্কুলে আছে? প্রত্যেক স্কুলে কি একইভাবে দুর্নীতি সংঘটিত হয়? দুর্নীতি ঠেকাতে কি ধরনের আইন আছে? সেগুলো কাজ করছে না কেন?

কি ধরনের লোকজন এর সঙ্গে জড়িত? এমন দুর্নীতির মাধ্যমে কারা লাভবান হচ্ছে?

অনুমিতির ভিত্তিতে অনুসন্ধান পরিচালনার সুবিধা (The advantages of hypothesis driven investigation)

১. অনুমিতি যাচাই-বাছাইয়ের হাতিয়ার

এ অনুমিতি গঠনের অর্থ এই নয় যে, প্রতিবেদক কোন গোপন তথ্য উন্মোচন করে ফেললেন। কিন্তু এ অনুমিতি গঠনের মাধ্যমে তিনি সেই গোপন তথ্য উন্মোচনের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যগুলো পরখ করে দেখতে পারেন। কারণ মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রকৃতি হচ্ছে কোন ভাল কারণ ছাড়া কেউই গোপন কোন তথ্য দিতে চায় না। অনুমিতি গঠন করে কাজে নামলে অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের কাছে সেই কারণগুলো পরিষ্কার হয়ে উঠে। প্রতিবেদক যখন নিজেই নিজের কাছে পরিষ্কার হন কেন তিনি এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করছেন, তখন যে কাউকে এর গ্রহণযোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোঝাতে সক্ষম হবেন।

২. অনুমিতি গোপনীয় তথ্য উদঘাটনের সম্ভাবনা বাড়ায়

গোপন তথ্য বলতে আমরা সেই তথ্যকেই বুঝি যেটি এখনও প্রকাশিত হয়নি এবং যা নিয়ে এখনও কেউ কোন প্রশ্ন করেনি। অনুমিতির মাধ্যমে আসলে একজন প্রতিবেদক সেসব প্রশ্নেরই অবতারণা করেন। ফরাসী অনুসন্ধানী প্রতিবেদক Edwy Plenel বলেছেন, "*If you want to find something, you have to be looking for it.*"[৭৬]। এর সাথে Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists-তে যোগ করা হয়েছে, "*If you're really looking for something, you'll find more than you were looking for.*"[৭৭] এই বেশি কিছুর খোঁজার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপটিই হলো অনুমিতি গঠন।

৩. অনুমিতি অনুসন্ধান প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা অনেক সহজতর করে

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির শুরুতেই যদি একজন প্রতিবেদকের কাছে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকে এবং তিনি যে বিষয়ে অনুসন্ধান করতে চান সে বিষয়ে তথ্য কোথায় পাবেন সে সম্পর্কে ধারণা থাকে তাহলে অনুসন্ধানের জন্য কি পরিমাণ সময় দরকার বা কত দিনে তিনি এ অনুসন্ধান কাজ শেষ করতে পারবেন সে সম্পর্কে তার পক্ষে অনুসন্ধানের

[৭৬] Ibid, Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), p. 14
[৭৭] Ibid.

প্রাথমিক পর্যায়ে ধারণা করা সহজ হয়। মূলত অনুমিতিই প্রথম ধাপ যেখানে প্রতিবেদক বুঝতে পারেন তিনি এ অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শেষ করতে পারবেন কীনা বা তার পক্ষে আদৌ এটি বের করা সম্ভব কীনা।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য কাজে নেমে একজন প্রতিবেদক অনেক ধরনের তথ্য সংগ্রহ করেন। এত বেশি তথ্য অনেক সময় তার কাছে এসে যায় তাতে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়। এক্ষেত্রে গুছানো পদ্ধতিতে কাজ করার বড় হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে পূর্বানুমান, "*Journalists compile a mass of information. Without a hypothesis to guide them, they could get lost in the avalanche of data they have gathered.*"[৭৮]

৪. অনুমিতি এমন একটি হাতিয়ার যা প্রতিবেদক বারবার ব্যবহার করতে পারেন

অনুসন্ধানের যে কোন পর্যায়ে আপনি একটি অনুমিতি ব্যবহার করতে পারেন। অনুমিতি প্রতিবেদককে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়, তিনি কি বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন এবং কি খুঁজে বের করতে চান, "*A hypothesis guides the investigation: it is a constant reminder of what the journalist is looking for.*"[৭৯]

৫. অনুমিতি তথ্যের সমাহার নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ সংবাদ তৈরির নিশ্চয়তা দেয়

Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists-এ বলা হয়েছে, "*A hypothesis virtually guarantees that you will deliver a story, not just a mass of data.*"[৮০] অর্থাৎ অনুমিতি গঠনের অর্থ হলো প্রতিবেদকের মূল লক্ষ্য একটি অনুসন্ধান প্রতিবেদন তৈরির জন্যই তিনি কাজ শুরু করেছেন। অনুমিতি অনুসন্ধান কাজের ফলাফলের সম্ভাবনা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। অনুমিতি গঠিত হলে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য (Maximum and Minimum Goal) সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের কাছে তার সম্পাদক অনুসন্ধান কাজ শেষ করার একটি সুনির্দিষ্ট সময় ও প্রয়োজনীয় সম্পদ/রিসোর্সের পরিমাণ জানতে চাইতে পারেন। অনুমিতি গঠন করা হলে প্রতিবেদক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন অর্জন বা ফলাফল সম্পর্কে ধারণা থাকে। সে কারণে তিনি আগে থেকেই বুঝতে পারেন পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্য অর্জনে তাকে কি করতে হবে।

অনুমিতি বিপজ্জনকও হতে পারে (Hypotheses can be dangerous)

অনেক সময় শিক্ষানবিশ প্রতিবেদকের ক্ষেত্রে এই বিপত্তি ঘটতে পারে। কারণ অনুমিতি সবসময় সত্য হবে এমন ধারণা থাকা ঠিক নয়। অনুমিতি মিথ্যা প্রমাণিতও হতে পারে। যদি প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণকে অস্বীকার করে কোন প্রতিবেদক নিজের অনুমিতিকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তবে তার মতো নির্বোধ আর একটিও নেই। তিনি হয়ে যাবেন দুনিয়ার সেরা মিথ্যাবাদীদের একজন। Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists-এ বলা হয়েছে, "*If you merely try to prove at any cost that a hypothesis is true, regardless of the evidence, you will join the ranks of the world's*

[৭৮] Ibid, p. 38.
[৭৯] Ibid.
[৮০] Ibid, Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), p. 15

professional liars – the crooked cops who condemn the innocent, the politicians who sell wars as if they were soap."[৮১] এক্ষেত্রে অবশ্যই একজন প্রতিবেদককে সচেতন থাকতে হবে। কারণ সত্য অনুসন্ধানের জন্য তিনি অনুমিতি গঠন করেছেন। অনুসন্ধানের পর সত্যকে অস্বীকার করার অর্থ হলো মিথ্যার মাঝে তিনি নিজেই নিজের কবর রচনা করেছেন, "*Hypothesis-based investigation is a tool that can dig up a lot of truth, but it can also dig a deep grave for the innocent.*"[৮২] আলী রিয়াজ বলেছেন, "*কোনো অনুমিতি তৈরী করার অর্থ এই নয় যে, যেন তেন প্রকারে তাকে সঠিক প্রমাণ করতেই হবে। যে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যেমন, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনেও তেমনি অনুমিতিটি সঠিক প্রমাণিত হতে পারে আবার ভুলও প্রমাণিত হতে পারে। যে কোনো সম্ভাবনাকে মেনে নেয়ার মতো খোলা মনে কাজ করতে হবে। কোনো অনুমিতি ভুল প্রমাণিত হলেই যে প্রতিবেদনটি খারাপ হবে তা নয়, মনে রাখতে হবে অনুমিতিকে ভুল প্রমাণিত করেও ভালো প্রতিবেদন তৈরী হতে পারে। রিপোর্টারের অনুমিতিকে সমর্থন করে না – এই কারণে কোনো প্রমাণ/উৎস/তথ্যকে কম গুরুত্ব দেয়া যাবে না। যে বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে তার সব দিককে সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।*"[৮৩]

দ্বিতীয় ধাপ

সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সংবাদ নির্ধারণ (Setting the minimum and maximum story)

একজন প্রতিবেদক যখন অনুসন্ধান কাজ শুরু করেন তখনও তিনি জানেন না তার জন্য কি ফলাফল অপেক্ষা করছে। যদিও তিনি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেন। এখানে পেশাদারিত্বমূলক মনোভাবের ভাল উদাহরণ হচ্ছে দুই ধরনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করা। একটি হলো সর্বনিম্ন সংবাদ প্রাপ্তির লক্ষ্য আরেকটি সর্বোচ্চ সংবাদ প্রাপ্তির লক্ষ্য। যেমন ধরুন, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় কোন একটি বিশেষ এলাকায় মুরগীর খামার করার লক্ষ্যে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করেছে। কিন্তু যে এলাকায় এই মুরগীর খামারগুলো করা হবে সেখানে পানির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অথচ মুরগীর খামারের জন্য পানির সরবরাহ যথেষ্ট হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে একজন প্রতিবেদক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য দুটি লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন লক্ষ্যটি হতে পারে যথেষ্ট পানির সরবরাহ না থাকা সত্ত্বেও ওই এলাকায় মুরগীর খামার করার অনুমতি দেওয়া এবং তাতে অর্থের অপচয় হওয়ার আশঙ্কা। আর সর্বোচ্চ লক্ষ্যটি হতে পারে কেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এমন অনুমতি দিলো তার কারণ খুঁজে বের করা। এক্ষেত্রে অবৈধভাবে কোন আর্থিক লেনদেন হয়েছে কীনা কিংবা ওই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা অন্য কোন কর্মকর্তার সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটির কোন সম্পর্ক আছে কীনা তা খুঁজে বের করা।

সর্বনিম্ন প্রাপ্তি হলো প্রতিবেদকের জন্য একেবারেই নিম্ন পর্যায়ের অর্জন। তবে এটিও নতুন তথ্য এবং এ তথ্য আগে কখনও প্রচার/প্রকাশ হয়নি। অনেক সময় প্রতিবেদকের এমন মন্দভাগ্য হতে পারে। কারণ তিনি হয়তো নানা সূত্র থেকে অনেক তথ্য পেয়েছেন; কিন্তু সেগুলো সংশ্লিষ্ট নথিপত্র বা সাক্ষাৎকারের অভাবে তিনি প্রমাণ করতে পারছেন না। তখন যেটুকু তথ্য প্রমাণ করা গেছে তা দিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। অন্যদিকে সর্বোচ্চ

---

[৮১] Ibid.
[৮২] Ibid.
[৮৩] প্রাগুক্ত, আলী রিয়াজ (১৯৯৪), পৃ-১৮।

সংবাদগল্প হলো প্রতিবেদকের সাফল্যের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ; অনুসন্ধান কাজে তার সেরা অর্জন। এর জন্য দরকার সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রমাণ এবং এ সংবাদে সর্বনিম্ন সংবাদের চেয়ে অনেক বেশি তথ্য থাকবে। কাজ শুরুর আগে প্রতিবেদককে দু ধরনের সংবাদের উদ্দেশ্য ঠিক করতে হয়। কারণ কাজ শুরুর আগে তার পক্ষে বোঝা মুশকিল তিনি আসলে কতটুকু তথ্য উদঘাটন করতে পারবেন। তাই দু ধরনের উদ্দেশ্য ঠিক করা থাকলে তা হবে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। Sheila S. Coronel বলেছেন, "*The maximum story required a higher level of proof and far more information than the minimum story. The maximum story set a higher goal; the minimum story, a more realistic one, given that the journalist was not sure that he could document both the organised crime network and official involvement in it.*"[৮৪] বিশেষ করে শিক্ষানবিশ প্রতিবেদকরা প্রায়ই কাজ শুরুর আগে অতিরিক্ত আশাবাদী হন। তাদের জন্য অনুসন্ধান শুরুর আগেই তাই দু ধরনের সংবাদের উদ্দেশ্য ঠিক করা একান্ত অত্যাবশ্যকীয়।

তৃতীয় ধাপ

সংবাদ বিষয়ক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ (Reporting and researching the story)

একজন ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে Jim Polk-এর একটি কথা সবসময় মনে রাখতে হয়- '*Responsible for the truth of every word.*'। আর এই সত্যাসত্য নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপটি মৌলিক গবেষণা করা। এখানে প্রতিবেদককে বইপত্র পড়তে হয়, বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে হয় আর ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষদর্শী বা অভিজ্ঞতা অর্জনকারীদের সঙ্গে কথা বলতে হয়।

এ স্তরে প্রথম কাজটি হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইতিমধ্যে প্রকাশিত প্রতিবেদন সম্পর্কে জানা। কারণ কোনভাবেই যা কিছু প্রকাশিত হয়ে গেছে তা আবারো প্রকাশ করা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হতে পারে না। অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে খুঁজে বের করতে হবে এর আগে কতটুকু কাজ হয়েছে। তার ভিত্তিতে তাকে সংবাদের নতুন আঙ্গিক খুঁজে বের করতে হবে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে Sheila S. Coronel বলেছেন, '*working from the outside in*'[৮৫] বা বাইরের তথ্য ভেতরে আনার প্রক্রিয়া। এর অর্থ হলো সাংবাদিকরা তাদের অনুসন্ধান শুরু করেন সেকেন্ডারি সোর্সের ভিত্তিতে। সেকেন্ডারি সোর্স থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে ধীরে ধীরে কাঙ্ক্ষিত অনুসন্ধানের দিকে পৌঁছে যান। সেকেন্ডারি সোর্স বা ইতিমধ্যে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদক তার গবেষণা শুরু করেন। এ পর্যায়ে তারা সংশ্লিষ্ট বইপত্র ঘেঁটে দেখেন এবং সংবাদপত্র আর্কাইভে ঢু মারেন। পাশাপাশি তাদের ইন্টারনেটেও তল্লাশি চালাতে হয়। তারপর প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও দরকারি সাক্ষাৎকারদাতাদের তালিকা তৈরি করতে হয়।

দুর্নীতি বিষয়ক সংবাদের গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে বেশ কয়েকটি কাজ করতে হয়। সেগুলো হলো:

১. ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা সম্পর্কে জানা

নিয়মানুযায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তার অপব্যবহারের কারণে ঘটে

[৮৪] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p. 41.
[৮৫] Ibid, p. 43.

অনিয়ম বা দুর্নীতি। সে অনিয়ম/দুর্নীতি তদন্তের জন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা করতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার বলয় সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয়। এর জন্য প্রতিষ্ঠানটির গঠন কাঠামো ও সংশ্লিষ্ট আইন এবং নিয়মকানুন সম্পর্কে জানতে হয়।

২. আইন সম্পর্কে জানা

অনিয়ম বা দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে অবশ্যই একজন সাংবাদিককে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা আইন ও নিয়মকানুন ভঙ্গ করেছেন কীনা তা খতিয়ে দেখতে হয়। এজন্য সাংবাদিকদের অবশ্যই ওই প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আইন ও নিয়মকানুনগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় সংসদের সদস্যদের আইন পাশের ক্ষমতা ও এখতিয়ার আছে। কিন্তু এ ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিশেষ কোন দল বা গোষ্ঠীকে সুবিধা দিতে গিয়ে যদি সংসদ সদস্যরা নতুন আইন পাশ করে তাহলে অনুসন্ধানী প্রতিবেদক এ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। এ ধরনের অপব্যবহার ও অনিয়মের বিষয়ে খবর তৈরি করতে গেলে সাংবাদিককে অবশ্যই প্রথমে সংসদ সদ্যদের ক্ষমতা, স্বার্থের দ্বন্দ্বের সংক্রান্ত নিয়মকানুন সম্পর্কে জানতে হবে। পাশাপাশি জানতে হবে সংসদ সদস্যদের আচরণবিধি যার ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের এমন আইন পাশ করাকে নৈতিকতার দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারবেন প্রতিবেদক। এ কারণে যে আইন ও নিয়মকানুন দ্বারা একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে সে প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে কোন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে গেলে অবশ্যই ওই প্রতিষ্ঠানের এসব আইন ও নিয়মকানুনের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। কেননা ওই প্রতিষ্ঠানের যে বা যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে অনিয়ম করুক না কেন ওই ক্ষমতা আইন দ্বারা সীমিত। বিষয়টিকে Sheila S. Coronel ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, "*The power that a government official or agency wields is mandated by law, and power is always prone to abuse despite the best-crafted law.*"[৮৬]

তাই সরকারি যে কোন সংস্থা বা ব্যক্তির অনিয়ম সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির ক্ষমতা, তাদের কর্মপরিধি সংশ্লিষ্ট আইন এবং নিয়মকানুন জানতে হয়। যেমন বিআরটিসির লাইসেন্স প্রদানে দুর্নীতি, পুলিশের অন্যায়ভাবে কাউকে গ্রেপ্তার বা ছেড়ে দেয়া, কারো সাথে অনিয়মের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন এমন ধরনের খবর নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে গেলে অবশ্যই প্রতিবেদককে প্রত্যেক বিষয়ে আলাদা আলাদা আইন ও নিয়মকানুনগুলো জানতে হবে। অনুসন্ধান কাজের সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আইনগুলো পাঠ করলে তা সাংবাদিককে ওই প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার উপশাখা এবং এর সাথে জড়িত বিভাগগুলোর বিভিন্ন স্তর এবং তাদের কর্মপরিধি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। কিন্তু এই সরকারি সংস্থা বা বিভাগ সম্পর্কে জানার পাশাপাশি সাংবাদিককে অবশ্যই দুর্নীতিবিরোধী আইন সম্পর্কে জানতে হবে। এ আইন তার অনুসন্ধান কাজে সহায়তা করবে।

৩. প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা

যে বিষয়ে প্রতিবেদক অনুসন্ধান চালাবেন সে বিষয়টির পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাকে অবশ্যই ভালভাবে জানতে হবে। যেমন ধরুন, কেউ যদি কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারের কোন বিভাগ বা সংস্থার নিয়ম বহির্ভুতভাবে কোন চুক্তির বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে চান তাহলে অবশ্যই ওই প্রতিবেদককে চুক্তি কিভাবে সম্পাদিত হয়েছে তার পুরো প্রক্রিয়াটি জানতে হবে। পুরো প্রক্রিয়াটি জানলেই তবেই তিনি ওই চুক্তির ক্ষেত্রে সন্দেহজনক তথ্য বের করতে

[৮৬] Ibid, p. 47.

পারবেন। নিয়মানুযায়ী যে সময় ও শর্ত পূরণ করে চুক্তি সম্পাদন করতে হতো সেটার ব্যত্যয় ঘটলেই অনিয়ম হওয়ারই আশঙ্কা বেশি থাকে। সে কারণে ওই প্রতিষ্ঠান এবং কাজের নিয়ম মাফিক প্রক্রিয়াটি অবশ্যই প্রতিবেদককে জানতে হবে। Sheila S. Coronel বলছেন, "*Deviations from established procedures are red flags, clues that wrongdoing has taken or is taking place.*"[৮৭] সরকারি যে কোন ধরনের চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে গেলে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলো সাংবাদিককে অবশ্যই দরপত্রের বিষয়ে খোঁজ নিতে হবে। এখানে নিয়মানুযায়ী দরপত্রের আহ্বান করা ও বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল কীনা, দরপত্র সবাই শান্তিপূর্ণ ও নিয়মানুযায়ী জমা দিতে পেরেছিল কীনা, সব শর্ত পূরণকারীকে নির্বাচিত করা হয়েছিল কীনা। এসবই আসলে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পথনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রক্রিয়াগত ত্রুটি বা কিভাবে প্রক্রিয়ার ব্যতয় ঘটানো হয়েছে তা খুঁজে বের করতে পারলে অনেক ভাল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা যায়।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সাথে পরিচিত হওয়া

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ কাঠামো, এর বিভিন্ন কর্মকর্তা, তাদের পদবী এবং তাদের ক্ষমতা বিন্যস্ত থাকে। হঠাৎ করে এসব পদবী ও ক্ষমতার পরিবর্তন দুর্নীতির পূর্বাভাস বয়ে আনতে পারে। যেমন ধরুন, কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী এর কোন টেন্ডার প্রক্রিয়া স্থানীয় পর্যায়ে হওয়ার কথা। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির শীর্ষ ব্যক্তি যদি হঠাৎ করে ঘোষণা দেয়া এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন তিনি। তাহলে এ ধরনের এ ধরনের সিদ্ধান্ত সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। এ কারণে অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাঠামো সম্পর্কে লব্ধ জ্ঞান ওই প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দুর্নীতির তথ্য উদঘাটনে সাহায্য করে। Sheila S. Coronel বলেছেন, "*Having an organisational chart of an agency can help a journalist find out where the power lies and where corruption or abuse may be taking place* "[৮৮] আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক চার্ট থেকে প্রতিবেদক জানতে পারবেন কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এ প্রতিষ্ঠানের ভেতরে তথ্যের প্রবাহটা কেমন করে চলে, কে কোন বিষয়ে জানার মত অবস্থান বা পদমর্যাদায় রয়েছেন- এসব বিষয়ও প্রতিবেদক জানতে পারেন।

তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করার সাথে সাদামাটা প্রতিবেদনের জন্য তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির বিরাট ফারাক আছে। কোন ঘটনায় অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে গেলে অনেক ডকুমেন্ট বা নথিপত্র এবং প্রত্যক্ষদর্শী দরকার হয়। এসব নথিপত্র এক জায়গায় প্রতিবেদকের জন্য গোছানো থাকে না। নানা জায়গায় নানা জনের কাছে ছড়ানো ছিটানো থাকতে পারে। সে কারণে তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের বেশ কিছু পরিকল্পনা করতে হয়:

ক. পটভূমিমূলক নথিপত্র সংগ্রহ

প্রতিবেদককে পটভূমিমূলক নথিপত্র ও তথ্য খুঁজে বের করার পরিকল্পনা করতে হবে। এসব নথিপত্রের মাধ্যমে যে শুধু তিনি পরবর্তী পথনির্দেশ পাবেন তা নয়, প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে পাঠকের ঘটনার প্রেক্ষিত বোঝানোর জন্য এসব তথ্য ব্যবহার করতে পারবেন।

[৮৭] Ibid, p. 48.
[৮৮] Ibid, p. 49.

২. সূত্র তালিকা নিরূপণ

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি একটি সোর্স বা সূত্রভিত্তিক কার্যক্রম বা পন্থা। প্রতিবেদকের অনুসন্ধান কাজে কারা মূখ্য ভূমিকা পালন করবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক কি এটি খুঁজে বের করার পরিকল্পনা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে সম্পর্কের একটি চিত্র নিরূপণ করে কার কাছে গেলে কি ধরনের তথ্য পাওয়া যাবে এবং কিভাবে কার কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যাবে তার পরিকল্পনা প্রতিবেদককে করতে হবে। এক্ষেত্রে অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের দু'ধরনের সূত্রের দরকার হয়।

ক. প্রাথমিক সূত্র (Primary Sources)

প্রত্যক্ষ, সুনির্দিষ্ট প্রমাণ কিংবা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই হলো এ ধরনের সূত্র। এসব সূত্রের তালিকা তৈরির পাশাপাশি তাদেরকে যাচাই করার পরিকল্পনা অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের থাকতে হয়।

খ. সেকেন্ডারি সূত্র (Secondary Sources)

সাধারণত প্রকাশিত প্রতিবেদন, দলিল-দস্তাবেজই হলো এ ধরনের সূত্র। এ ধরনের সূত্র ঘটনার প্রেক্ষিত বোঝার জন্য এবং পটভূমিমূলক তথ্য উপস্থাপনের জন্য এ ধরনের সূত্র কার্যকরী।

শিক্ষানবিশ প্রতিবেদকের মাঝে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, সেটি হলো- তারা সহজে প্রাপ্য সূত্রগুলোর ওপর নির্ভর করে যেনতেনভাবে প্রতিবেদন তৈরি করে দেন। কিন্তু এটি তার ক্যারিয়ার ও প্রতিষ্ঠানের জন্য সমূহ বিপদ ডেকে আনতে পারে। কেননা সহজে প্রাপ্ত সূত্র থেকে অনেক সময় সঠিক তথ্য পাওয়া নাও যেতে পারে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে তার কাজের শুরুতেই সূত্রের একটি তালিকা তৈরি করতে হয় যাকে ইংরেজিতে বলা হয়, 'Source Mind-mapping'[৮৯]। Investigative Journalism Manuals-এ বলা হয়েছে, প্রতিবেদককে একটি বড় কাগজ নিতে হবে এবং তার মাঝখানে তার অনুমিতিটি লিখতে হবে। তার চারপাশে প্রয়োজনীয় সূত্রগুলোকে তুলে ধরতে হবে। অনুমিতি একাধিক থাকলে একাধিক চিত্রের মাধ্যমে এ চিত্রটি তৈরি করা যেতে পারে।

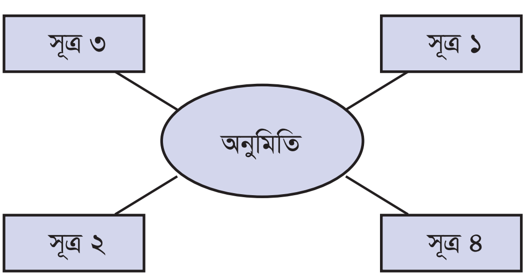

অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে সূত্র উপাদানের ধরনগুলো সম্পর্কে পরিকল্পনা বা চিন্তাভাবনা করতে

[৮৯] Ibid, Gwen Ansell (ed.), Chapter three: Planning the Investigation.

হয়। সাধারণত তিন ধরনের সূত্র উপাদান সাংবাদিকতায় ব্যবহৃত হয়। সেগুলো হলোঃ মানবীয়, নথিপত্র বা লিখিত কাগজ ও ডিজিটাল (ওয়েব)। এসব বিষয়ে সোর্স-ম্যাপিং অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

গ. প্রয়োজনীয় তথ্যের তালিকা

অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে তার অনুমিতি প্রমাণের কি ধরনের তথ্য দরকার কিংবা ঘটনার গভীরে যাওয়ার জন্য কি ধরনের গবেষণা করা প্রয়োজন এবং কিভাবে তথ্যের নির্ভুলতা যাচাই করা হবে সে ব্যাপারে পরিকল্পনা করতে হবে। এখানে সকল বিশেষজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য সূত্র এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের তালিকা তৈরি করতে হবে। সম্ভাব্য সব ধরনের প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি সোর্স খুঁজে বের করার পরিকল্পনা করতে হবে প্রতিবেদককে। মাহফুজউল্লাহ বলেছেন, "*অনুসন্ধান এমন সব তথ্যের ভিত্তিতে হওয়া উচিত যা প্রমাণ সাপেক্ষ। তাই সব সময়ই প্রমাণ সংগ্রহের ওপর জোর দিতে হবে। কিন্তু এসব তথ্য উন্মোচনের কারণে যদি আইনগত ব্যবস্থা এবং অপরাধীর অপরাধ অস্বীকারের সম্ভাবনা থাকে তাহলে বাড়তি সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে।*"[৯০]

৪. অনুসন্ধান হাতিয়ারের পরিকল্পনা

অনুসন্ধান প্রতিবেদককে তার পূর্বানুমান প্রমাণের জন্য এবং অনুসন্ধান কাজ পরিচালনার জন্য একাধিক হাতিয়ার বা পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। আগেই বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে চারটি পদ্ধতি বা হাতিয়ার বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধানী প্রতিবেদকরা ব্যবহার করে থাকেন- ক. ডকুমেন্ট বা নথিপত্র; খ. সাক্ষাৎকার; গ. পর্যবেক্ষণ; এবং ঘ. জরিপ। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে শুধু একটি হাতিয়ার বা পদ্ধতি ব্যবহার করে ভাল অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। এ কারণে প্রতিবেদককে কখন কোন হাতিয়ার বা পদ্ধতি ব্যবহার করে কোন ধরনের তথ্য বের করে আনতে হবে সে পরিকল্পনা করে রাখতে হয়। Derek Forbes বলেছেন, "*Like a jigsaw puzzle, this section of the plan works best if you begin with the surrounding details (the 'sides' and 'corners' of the puzzle) before working on the image at the centre.*"[৯১] আবার এক্ষেত্রে কোন নৈতিকতার প্রশ্ন জড়িত থাকলে সে বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হয় প্রতিবেদককে। অনুসন্ধানী হাতিয়ার শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

৫. সর্বদা দ্বিতীয় পরিকল্পনা (Plan B) মাথায় রাখতে হয়

অনুসন্ধানের হাতিয়ার বা পদ্ধতির পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সম্ভাব্য বিপত্তি ও সেসব বিপত্তি মোকাবিলায় চিন্তাভাবনা করা। একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত নথিপত্রটি নাও পেতে পারেন, খুব দরকারী ব্যক্তিটি সাক্ষাৎকার দিতে অসম্মতি জানাতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে দ্বিতীয় পরিকল্পনা মাথায় রাখতে হয়। কিভাবে তিনি বিকল্প পদ্ধতিতে বিকল্প একটি নথিপত্র সংগ্রহ করবেন যার ভিত্তিতে অনুসন্ধানের বিষয়টি প্রমাণ করা যাবে সে পরিকল্পনা প্রথম থেকেই করে রাখলে মাঝপথে রণভঙ্গ দেয়ার আশঙ্কা কমে যায়।

---

[৯০] মাহফুজউল্লাহ, 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা', অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও মানবাধিকার (সম্পাদনা- ফিলিপ গাইন), বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ ও প্রাইভেট রুরাল ইনিসিয়েটিভস্ প্রোগ্রাম, ঢাকা।
[৯১] Ibid, Derek Forbes (2005), p. 23.

চতুর্থ ধাপ

তথ্য সংঘটন ও ব্যাখ্যাকরণ (Organising and analysing the information)

সংগৃহীত তথ্যগুলো একটি কাঠামোর মধ্যে আনা এবং পূর্বানুমানের ভিত্তিতে সেসব তথ্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। Derek Forbes বলেছেন, "*It is here that the pieces of the puzzle are put together. A solution to your hypothesis is provided through the detailed exposition of prima facie and circumstantial evidence gathered from multiple sources during the research phase.*"[৯২]

তথ্য সংগ্রহের পর অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে কিছু কাঠামোতে তা সংগঠিত করতে হয়।

- কিছু সাংবাদিক বক্স আকারে, বর্ণানুক্রমিক কিংবা ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ফাইলে তথ্যগুলো সাজিয়ে রাখতে পছন্দ করেন। ঘটনার ধারাক্রম অনুযায়ী তথ্য সাজিয়ে রাখলে লেখার সময় তা বাদ পড়ার আশঙ্কা থাকে কম।
- কিছু সাংবাদিক বিষয় অনুসারে কিংবা ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নামানুসারে তথ্যগুলো সাজিয়ে রাখতে পছন্দ করেন।
- মাঝে মাঝে আপনি স্প্রেডশিট ব্যবহার করতে পারেন। এটি দ্রুত তথ্য খুঁজে বের করার জন্য সহায়ক। পরে যখন আপনি কোন তথ্য বাদ পড়েছে কীনা বা আরও কিছু সংগ্রহ করা দরকার কীনা তা খুঁজে বের করতে যাবেন তখন এ স্প্রেডশিট খুবই কার্যকরী।

তথ্য সংগঠনের পর অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের কাজ হলো সংগৃহীত তথ্যের ব্যাখ্যা করা। প্রতিবেদন লিখতে বসার আগে এটি খুবই জরুরি কাজ। অর্থাৎ তিনি যা সংগ্রহ করেছেন বা যেসব তথ্য পেয়েছেন তার একটি সারমর্ম দাঁড় করাতে হয়। এর মাধ্যমে তিনি একটি চমৎকার সংবাদ সূচনা তৈরি করতে পারেন। এখানে কিছু প্রশ্নের উত্তর প্রতিবেদককে খুঁজে বের করতে হয়। সেগুলো হলোঃ

- সংগৃহীত তথ্যগুলোর অর্থ কি?
- সংগৃহীত তথ্যগুলো কি প্রমাণ করছে?
- সংগৃহীত তথ্যগুলো থেকে কি প্রমাণ হয় না?
- আর কি কি তথ্য সংগ্রহ করা দরকার?
- সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য অনিয়ম/দুর্নীতি কি ধরা পড়ে?
- একটি গ্রহণযোগ্য অনিয়ম/দুর্নীতি প্রমাণ সম্ভব হতো যদি আরো তথ্য সংগ্রহ করা যেত?
- যদি পূর্বানুমান প্রমাণিত না হয় তাহলে কি অন্য ধরনের সংবাদ করা যায়, যে সংবাদ অপেক্ষাকৃত কম প্রভাব ফেলবে কিন্তু এখনও যা গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ?
- দুর্নীতি/অনিয়মের সাথে কে/কারা জড়িত?
- গবেষণায় কি কোন ফাঁক রয়ে গেছে যা পূরণ করা দরকার?

প্রাতিষ্ঠানিক বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের দুর্নীতি তদন্তের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের আচরণও পর্যালোচনা হয়। এ ধরনের দুর্নীতির ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই প্রতিষ্ঠান একইভাবে দুর্নীতি সংগঠনের সাথে জড়িত। ফিলিপাইনের সাংবাদিকরা প্রেসিডেন্ট এস্ত্রাদার চার স্ত্রীর জন্য ৪টি প্রাসাদ স্বর্গ নিয়ে অনুসন্ধানের সময় দেখেছেন, একই কণ্ট্রাক্টর একই ডিজাইনার দিয়ে প্রেসিডেন্ট এস্ত্রাদা চারটি বাড়িই বানিয়েছিলেন। এসব বাড়ি বানানোর

[৯২] Ibid, p.25.

পেছনে একই ব্যক্তিবর্গ ও একই ল ফার্ম জড়িত ছিল।[৯৩] এজন্য অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে নিয়মিত বিরতিতে ঘটনার সত্যাসত্য নিশ্চিত করতে সবগুলো দিকের তথ্য উন্মোচন করতে হয়। এক্ষেত্রে তিনি যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তুলে ধরা সম্ভব কীনা তাও যাচাই করে দেখতে হয়। সেগুলো হলো:

- ➢ সংবাদগল্পে কি নানা দিক ভালভাবে উপস্থাপিত হবে?
- ➢ যদি না হয়, আর কার সাক্ষাৎকার নেয়া দরকার?
- ➢ সংবাদগল্পের পূর্ণতার জন্য এখনও কার/কাদের মতামত নেয়া দরকার?

পঞ্চম ধাপ

সংবাদ লিখন (Writing the story)

নানা পদ্ধতি ও হাতিয়ার ব্যবহার করে একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক তথ্য সংগ্রহ করেন। এরপর তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আকর্ষণীয় ও নির্ভুলভাবে সংবাদ লেখা। সাধারণত একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক যা তথ্য পেয়েছেন তার সবগুলোই প্রতিবেদনে তুলে ধরতে চান। এ কারণে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রায়ই বড় বা দীর্ঘ হতে দেখা যায় যা পাঠক বা দর্শকের জন্য সমস্যা তৈরি করে। বেশি বড় বা দীর্ঘ প্রতিবেদন পাঠক কিংবা দর্শকের পক্ষে পড়া-দেখা-শুনা কষ্টকর। বিশেষ করে টেলিভিশন বা রেডিও'র ক্ষেত্রে দর্শক-শ্রোতা বড় কিংবা দীর্ঘ প্রতিবেদন দেখতে ও শুনতে এতটাই অপছন্দ করেন যে তারা চ্যানেল ঘুরিয়ে অন্যত্র চলে যান। এজন্য দেখা যায়, একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক যিনি গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ খুব চমৎকারভাবে করেছেন কিন্তু শুধু লিখন দক্ষতার অভাবের কারণে তার প্রতিবেদনটি কাঙ্ক্ষিত ফল পায় না। সেজন্য Sheila S. Coronel এর কথাটি এখানে প্রণিধানযোগ্য, "*Even the best-researched story falls flat if it is not well told.*"[৯৪]

অনুসন্ধানী প্রতিবেদক লেখার ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যার মুখোমুখি হন। একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রতিবেদককে সপ্তাহ, মাস এমনকি বছরব্যাপী সময় ব্যয় করতে হয়। এতদিন ধরে কাজ করার কারণে তিনি ঘটনাটির সঙ্গে মানসিকভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং এর সাথে এর প্রতি প্রতিবেদকের একটি আবেগ তৈরি হয়। এ কারণে তিনি অনেকসময় আবেগগত ও পেশাগত দূরত্বের সীমারেখার কথা ভুলে যান। অনেক সময়ই দেখা যায়, প্রতিবেদক আবেগের বশবর্তী হয়ে প্রতিবেদনে এমন অনেক শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করেন যা দেখে মনে হতে পারে এটি কোন সাংবাদিকের প্রতিবেদন নয়, বরং কোন হত্যা বা অপরাধের মামলা সংক্রান্ত রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর প্রতিবেদন। এজন্য Sheila S. Coronel অনুসন্ধানী প্রতিবেদকদের কঠোর ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন- "*Telling the facts as they are often suffices; strong language should be used sparingly.*"[৯৫] একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক দীর্ঘদিন কষ্ট করে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেসব তথ্য দিয়ে সংবাদ উপস্থাপনের সময় তাকে পাঠক/দর্শকের আগ্রহের দিকটির প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। সেজন্য অনেক সময় মানবীয় আবেদন সম্পন্ন সংবাদও তৈরি করতে হয়। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, পাঠক/দর্শকের পক্ষে বিমূর্ত কোন বিষয় বা ধারণা অনুধাবন করা সম্ভব নাও হতে পারে। সেজন্য একে অবশ্যই মানবীয় রূপ দিতে হবে। সেজন্য

[৯৩] পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টটি পড়তে দেখুন www.pcji.org
[৯৪] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p. 45.
[৯৫] Ibid.

ঘটনার সঙ্গে জড়িত বা সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের মুখ দিয়ে ঘটনাটি বলার চেষ্টা করতে হবে এবং যারা এ ঘটনার ভুক্তভোগী তাদেরকে প্রতিবেদনে তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে। প্রতিবেদককে এমনভাবে প্রতিবেদনটি লিখতে হবে যাতে তা জীবনঘনিষ্ট বা জীবনসম্পৃক্ত হয়। সে কারণে তাকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও স্থানগুলোকে ঘনিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। Sheila S. Coronel বলেছেন, "*A story needs to be humanised. It can be told through the lives and words of real people that play a role in the story, or who suffer from the wrongdoing that is being exposed. Journalists should also put in colour and detail that will make the story come to life. This means they should observe people and places closely.*"[৯৬] শুধু কি ঘটেছে তা তুলে ধরলেই চলবে না, বলতে হবে কিভাবে ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড, অন্যদের প্রতি তাদের আচরণগুলো তুলে ধরতে হবে। পাঠক/দর্শকের কাছে ঘটনার গুরুত্ব তুলে ধরতে ঘটনাটিকে অবশ্যই আকর্ষণীয় করে তুলে হবে। সেজন্য প্রতিবেদকের থাকতে হবে আকর্ষণীয় করে তোলার চোখ বা অর্ন্তদৃষ্টি। কারণ দর্শক/পাঠক কেন আপনার প্রতিবেদনটি পড়বেন তা পরিষ্কার করে তুলতে না পারলে কোনভাবেই এ প্রতিবেদনের পেছনে যে শ্রম ব্যয় করা হয়েছে তার সফলতা আসবে না।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার সময় আরেকটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। সেটি হলো, সামগ্রিক ও বৃহৎ চিত্র যাতে হারিয়ে না যায়। আপনি হয়তো কোন একটি ইউনিয়ন বা গ্রাম কিংবা থানা পর্যায়ের দুর্নীতির প্রতিবেদন তৈরি করেছেন, সেটি যে সারাদেশের অন্য জায়গায়ও ঘটছে বা অন্য জায়গারও চিত্র তা প্রতিবেদনে তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে। প্রতিবেদনে মানবীয় আবেদন সৃষ্টির জন্য এদিকে নজর দেয়া ভাল।

ষষ্ঠ ধাপ

তথ্যগত ও আইনি যাচাই (Fact and legal check)

এ স্তরে প্রতিবেদককে তার সংবাদটির চূড়ান্ত মূল্যায়ন করতে হয়। যখন একটি প্রতিবেদন লেখা হয় তখন এর নির্ভুলতা অবশ্যই যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে প্রথমেই তার আসল নথিপত্র ও সাক্ষাৎকারের ট্রানস্ক্রিপ্টে ফেরত যেতে হবে। এসব নথিপত্র ও সাক্ষাৎকারের দলিলের সঙ্গে যাচাই করে দেখতে হবে তিনি যেসব তথ্য-উপাত্ত এবং মন্তব্য ব্যবহার করেছেন তা শতভাগ ঠিক কীনা এবং সেগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কীনা। কোন ধরনের ছবি ব্যবহার করা হলে সেগুলো ঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কীনা এবং তার ক্যাপশনগুলো নির্ভুল কীনা তা যাচাই করে দেখতে হবে। টেলিভিশন কিংবা রেডিও'র ক্ষেত্রে কোন সাক্ষাৎকারের (সাউন্ডবাইট) অনুবাদ বা ব্যাখ্যা দেয়া হলে সেগুলোর নির্ভুলতাও যাচাই করে দেখতে হবে। Paul N. Williams বলেছেন, "*Your name and reputation, as well as the credibility of the paper, are at stake. Check the headlines to see they reflect the sense of the story. Look at the photos to see that no one has crooped out an important element or emphasized the wrong element. Check the graphs to see the artists have the correct numbers on the appropriate bars, that the wording of the legend is properly spelled. Read the cutlines. Read the galley proof and the page proof. Read the very first copy of the paper as it comes off the press.*"[৯৭] তথ্যের নির্ভুলতা যাচাইয়ের পর অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের কাজ হলো আইনগত দিক

[৯৬] Ibid.
[৯৭] Ibid, Paul N. Williams (1978), p. 32.

যাচাই-বাছাই করা। বিশেষ করে অনুসন্ধানের বিষয়টি যদি বিতর্কিত হয় তাহলে উত্তম পন্থা হলো একজন আইনজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ বা আলোচনা করা। এক্ষেত্রে কিছু প্রশ্নের সুরাহা প্রতিবেদককে করতে হয়। সেগুলো হলো:

- এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত/প্রচারিত হলে প্রতিবেদক ও তার প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন ধরনের শারীরিক ও আইনগত ঝুঁকি থাকে কীনা?
- এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত/প্রচারিত হলে প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে কি মানহানি, ব্যক্তিগত গোপনীয় লঙ্ঘন বা অন্য কোন অভিযোগে মামলা হতে পারে?
- যদি মামলা হয়, তাহলে প্রতিবেদক কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবেন? এখানে নিজেকে রক্ষা করার মতো পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ কি আছে যা তিনি আদালতে উপস্থাপন করতে পারবেন?

সপ্তম ধাপ

প্রতিবেদনটি প্রচার/প্রকাশ (Airing or publishing the report)

এ ধাপে প্রতিবেদককে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের তখনই তার প্রতিবেদনটি প্রচার/প্রকাশ করা উচিত যখন এর তথ্যগত ও আইনি দিকগুলোর নির্ভুলতা যাচাই হয়। এখানে তাড়াহুড়োর কোন সুযোগ নেই। মনে রাখতে হবে, তাড়াহুড়ো করলেই বিপদ আসন্ন। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, 'Make hasten, less speed.' অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি প্রচার/প্রকাশের আগে প্রমোশনাল প্রমোও প্রচার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদনটির বিষয়বস্তুর সারমর্ম তুলে ধরে কখন ও কবে প্রতিবেদনটি প্রচার/প্রকাশ করা হবে তার জন্য কয়েকদিন ধরে বিজ্ঞাপন প্রচার করা যেতে পারে। এতে প্রতিবেদনটি সম্পর্কে পাঠক ও দর্শকদের আগ্রহ তৈরি হবে।

অষ্টম ধাপ

অনুগামী প্রতিবেদন (Follow up)

একটি ভাল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রায়ই পাঠক/দর্শকের মনে বিরাট প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। পাঠক/দর্শকদের কেউ কেউ স্বেচ্ছায় ওই বিষয়ে নতুন ধারণা ও তথ্য দিতে পারেন, যা নিয়ে নতুন করে অনুসন্ধান শুরু করা যেতে পারে। এসব নতুন ধারণা ও তথ্যের মধ্যে সংবাদমূল্য আছে এমন তথ্যগুলো নিয়ে প্রতিবেদক একটি অনুগামী প্রতিবেদন তৈরির কাজ শুরু করতে পারেন। আবার অনেক সময় একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচার/প্রকাশের পর সরকার কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন কিংবা আইন ও নীতিমালা পরিবর্তন করেন। এ ধরনের সরকারি ব্যবস্থাগুলো নিয়ে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদককে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। কারণ এসবই ঘটেছে তার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটির জন্য, এটি তার প্রতিবেদনেরই সাফল্য।

লার্স মোলারের মডেল-অনুসন্ধানী পরিকল্পনার চেকলিস্ট (Lars Moller's model- Checklist for the investigative Synopsis)

লার্স মোলার একজন ডেনিশ অনুসন্ধানী সাংবাদিক। তিনি অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য একটি চেকলিস্ট তৈরি করেছেন, যা অনুসন্ধান শুরুর আগেই প্রতিবেদককে মাথায় রাখতে হয়। এই চেকলিস্টে তিনি ৭০টি প্রশ্নের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। তিনি মনে করেন, এই ৭০টি প্রশ্ন যদি একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক মাথায় রাখেন তাহলে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা প্রক্রিয়ায় এসব প্রশ্ন অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দু, অনুসন্ধান প্রক্রিয়া, সূত্র ও পদ্ধতি সম্পর্কে

প্রতিবেদককে চিন্তা করতে সাহায্য করবে। এ প্রশ্নগুলো হলো:

১. প্রতিবেদকের মূল পূর্বানুমানটি কি?

- প্রতিবেদক কি বলতে চান?
- প্রতিবেদক কোন উপায়ে বলতে চান?
- সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সংবাদ কি? (শিরোনাম বা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা)
- প্রতিবেদক কেন এটি বলতে চান?
- প্রতিবেদকের উদ্দেশ্য কি (পেশাগত ও ব্যক্তিগত)?
- কার জন্য এ সংবাদ গুরুত্বপূর্ণ?

২. এই ঘটনা/বিষয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো কি কি?

- প্রতিবেদক কি জানেন এবং কি বুঝতে পেরেছেন?
- প্রতিবেদককে অবশ্যই কি খুঁজে বের করতে হবে:
  - আইন ও নীতিমালা সম্পর্কিত?
  - আদর্শ ও সাধারণ অভ্যাস সম্পর্কিত?
  - ইতিহাস সম্পর্কিত?
  - পরিসংখ্যান সম্পর্কিত?
  - নৈতিকতার বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত?

৩. গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করা।

৪. যাচাই ও সত্যাসত্য নিশ্চিত করতে হবে এমন তথ্যগুলোর তালিকা তৈরি করা (কে যাচাই করবে)?

৫. অংশীদার কারা?

ক. প্রতিবেদকের সংবাদের সাফল্যে আগ্রহী এমন প্রত্যেকের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে।
খ. সংবাদটি প্রচার/প্রকাশ হোক না যারা চায় তারা কারা (প্রতিবেদকের অফিসের ভেতরে ও বাইরে)?
গ. এই প্রতিবেদন প্রচার/প্রকাশ হলে কে প্রতিবেদকের শত্রু হয়ে যেতে পারে (বিপদগুলো কি এবং কিভাবে প্রতিবেদক নিজেকে এসব বিপদ থেকে রক্ষা করবে)?
ঘ. তথ্য উদঘাটনে প্রতিবেদনের সম্ভাব্য সহযোগী কারা?

অ. প্রতিবেদকের কি অভ্যন্তরীণ কোন তথ্যদাতা দরকার?
আ. প্রতিবেদক কিভাবে ও কোথায় তাদের খুঁজে পাবেন?

ঙ. কিভাবে দর্শক/পাঠক এ তথ্যগুলো ব্যবহার করবেন?

অ. কাঙ্ক্ষিত দর্শক/পাঠক কারা?
আ. কাঙ্ক্ষিত দর্শক/পাঠকরা কিছু করতে পারেন?

৬. তথ্য সংগঠন ও ব্যাখ্যাকরণ

- তথ্যগুলো সংজ্ঞায়িত করা ও গুরুত্ব নির্ধারণ করা।
- তথ্যগুলো যাচাই-বাছাই করা।
- প্রতিবেদক যা সংগ্রহ করেছেন তা নিয়ে সম্পাদক ও অভিজ্ঞ সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করা।

৭. কিভাবে সংবাদটি উপস্থাপিত হবে?

- দর্শক/পাঠকের কি জানা দরকার ও কিভাবে তারা এটি খুঁজে পাবে?
- অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া, নথিপত্র, মানবীয় আগ্রহ ও সম্পাদকীয় নীতি প্রতিবেদক কিভাবে স্পষ্টভাবে পাঠক/দর্শকের কাছে তুলে ধরবেন?

- ছবি, চার্ট বা জরিপসহ কিভাবে তথ্যগুলো উপস্থাপন করা উচিত?
- প্রতিবেদক কি একটি নাকি একাধিক রিপোর্টের মাধ্যমে ঘটনাটি তুলে ধরবেন?
- প্রতিবেদক কি সবগুলো স্টোরি প্রকাশ/প্রচারের আগে লেখা শেষ করেছেন?
- ক্যাম্পেইন সাংবাদিকতার জন্য এই সংবাদটি উপযুক্ত?
- বিশেষ লোগো, সাইডবার কিংবা সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে এই সংবাদটি কি উপস্থাপন করা যেতে পারে?

৮. কত সময় ও অর্থ দরকার?

- কি পরিমাণ সময় প্রতিবেদকের দরকার (প্রাক্কলিত সময় নির্ধারণ করা ও কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করা)?
- কি পরিমাণ ব্যক্তিগত গবেষণা প্রতিবেদকের করতে হবে?
- কি পরিমাণ দলীয় প্রচেষ্টা দরকার (দলীয় সদস্য সংখ্যা ও তাদের ভূমিকা নির্ধারণ)?
- ফটোগ্রাফার ও ক্যামেরা ক্রুর সাহায্য কি পরিমাণ এবং কখন প্রতিবেদকের দরকার?
- অন্য গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের কোন সহকর্মীর সাহায্য কি প্রতিবেদকের দরকার?
- গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের বাইরে কি পরিমাণ বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রতিবেদকের দরকার?

৯. প্রতিবেদকের গবেষণা কৌশল কি?

- ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজনীয় সকল কর্মকাণ্ডের একটি তালিকা তৈরি করা।
- সকল কর্মকাণ্ডের জন্য একটি সময়সীমার শিডিউল করা।
- সকল পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের জন্য সময় বরাদ্দ করা।

১০. সূত্রগুলো সংগঠিত করা

১০.১ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সকল মৌখিক সূত্রের তালিকা তৈরি করা।

- প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি সোর্স/সূত্রগুলো চিহ্নিত করা।
- সোর্সগুলোকে নিম্নোক্ত ভিত্তিতে সাজানো:
  - মানবীয় আগ্রহ/ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা
  - অংশীদারিত্ব
  - স্বাধীন বিশেষজ্ঞ জ্ঞান
- কাজের দিক থেকে সম্ভাব্য সহযোগী, নিরপেক্ষ ও শত্রু হিসেবে সূত্রগুলোর তালিকা করা।
- কখন, কিভাবে ও কোথায় এসব সোর্সকে পাওয়া যাবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- এসব সোর্স ব্যবহারে সম্ভাব্য আইনি ও নৈতিকতার সমস্যাগুলো পরীক্ষা করা।
- যদি সোর্সের সুরক্ষা দরকার হয় তাহলে প্রতিবেদক কিভাবে সে সুরক্ষা দিবেন সে বিষয়ে চিন্তা করা।

১০.২ নথিপত্রমূলক/লিখিত সোর্স/সূত্রের তালিকা তৈরি করা।

ক. পটভূমিমূলক নথিপত্র নাকি মূল নথিপত্র সে হিসেবে নথিপত্রগুলো চিহ্নিত করা।

খ. প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে কতটুকু কষ্টসাধ্য সে ভিত্তিতে নথিপত্রগুলোকে বিভাজিত করা (সহজেই প্রাপ্য-পাওয়া কঠিন)।

গ. ইন্টারনেটের মাধ্যমে কি ধরনের তথ্য/নথিপত্র পাওয়া যাবে?

ঘ. যেসব নথিপত্র পাওয়া কঠিন সেগুলো কিভাবে পাবেন?

ঙ. কি ধরনের আইনি বা নৈতিক প্রশ্ন এর সাথে জড়িত?

১০.৩ তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ স্থানগুলোর তালিকা তৈরি করা।

ক. স্থানগুলো কি প্রবেশযোগ্য? কিভাবে প্রতিবেদক সেখানে যাবেন?

খ. প্রতিবেদক কি ছবি (মুদ্রণ মাধ্যমের জন্য), পরিষ্কার শব্দ (রেডিও'র জন্য) বা সজীব চিত্র (টেলিভিশনের জন্য) পাবেন?

গ. কি ধরনের আইনি বা নৈতিকতার সমস্যা আছে, যদি থাকে?

ঘ. অন্য সহকর্মীদের সহযোগিতা, সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনা এবং আইনি উপদেষ্টার সঙ্গে সভা ও স্বাধীন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শের জন্য পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দের পরিকল্পনা।

১১. গবেষণা প্রক্রিয়ায় প্রতিবেদকের আরো দরকার হতে পারে:

➢ মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা করা:

- এমন তথ্য যা একসময় ছিল ধারণা কিন্তু এখন তথ্যে রূপ নিয়েছে।
- এমন তথ্য যা বিভ্রান্তিরোধে ব্যবহার করা যাবে।
- এমন তথ্য যা তথ্য-ফাঁক মোচনে সহায়ক।
- এমন তথ্য যা নতুন প্রশ্নের জন্ম দিবে।
- এমন তথ্য যা এখনও যাচাইয়ের প্রয়োজন আছে।

➢ মূল সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতিগ্রহণ:

- সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর একটি তালিকা তৈরি করা।
- সত্যাসত্য নিশ্চিত করা এমন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর তালিকা তৈরি করা।
- সাক্ষাৎকারের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা।
- সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য নিরূপণ করা।
- সাক্ষাৎকার নিয়ন্ত্রণের পথ নিরূপণ করা।
- কোথায়, কখন এবং কিভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে তার ব্যবস্থা করা।

১২. সংবাদটি প্রচার/প্রকাশের পর কি ঘটবে?

➢ কি ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রতিবেদক আশা করছেন?

➢ এরপর আপনি কি করবেন?

তথ্যসূত্র

Derek Forbes (2005), A watchdog’s guide to investigative reporting: A simple introduction to principles and practice in investigative reporting, Konrad Adenauer Stiftung Media Programme, Johannesburg, Republic of South Africa.

Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals, Chapter three: Planning the Investigation, http://www.investigative-journalism-africa.info/.

Leonard M. Kantumoya (2004), Investigative Reporting in Zambia: A Practitioner's Handbook, Transparency International Zambia.

Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists.

Paul N. Williams (1978), Investigative Reporting and Editing, PRENTICE-HALL, INC., Englewood Cliffs, New Jersey.

Sheila S. Coronel (2009), Digging Deeper: A Guide for Investigative Journalists in the Balkans, Sarajevo, Balkan Investigative Reporting Network.

William C. Gaines (1998), Investigative Reporting for Print and Broadcast/ Nelson-Hall Publishers, 2nd edition.

আলী রিয়াজ (১৯৯৪), অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হ্যান্ডবুক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৪।

নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী, (১৯৯৬) অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি), ঢাকা, জুলাই, ১৯৯৬।

মাহফুজউল্লাহ, ‘অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা’, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও মানবাধিকার (সম্পাদনা- ফিলিপ গাইন), বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ ও প্রাইভেট রুরাল ইনিসিয়েটিভস্ প্রোগ্রাম, ঢাকা।

অধ্যায়
৬

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ

এ অধ্যায়ে থাকছে

- অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে গবেষণা
- অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তথ্য আহরণের কৌশল ও গতিধারা
- অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার
- গতিধারা ও হাতিয়ারের সমন্বয়

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে গবেষণা

অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের কাজ হলো তার অনুমিতি বা সন্দেহগুলো প্রমাণের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য যোগাড় করা। একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে বিভিন্ন রকমের তথ্য যোগাড় করতে হয়। এসব তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়। অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কিত পটভূমিমূলক তথ্য যোগাড় ও এর জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিতে হয়, প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও রেকর্ড যোগাড় করতে হয় এবং সবশেষে এসব নথিপত্রের আলোকে প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই করে ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল ক্রীড়ানকদের সাক্ষাৎকার নিতে হয়। প্রাপ্ত নথিপত্রগুলোর ত্রুটি-বিচ্যুতি, গলদ, ফাঁক, অসম্পর্কহীনতাকে খতিয়ে দেখতে হয়। দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে একজন প্রতিবেদক কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যবস্থার অনিয়ম, দুর্নীতি কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে তদন্ত করেন। সেজন্য এ ধরনের সাংবাদিকতায় একজন প্রতিবেদককে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা বিষয়টি কিভাবে কাজ করছে কিংবা কাজ করেছিল সে প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে হবে। এক্ষেত্রে তাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে:

- কিভাবে প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থাটি কাজ করেছে?
- এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে কে, কখন ও কিভাবে জড়িত?
- এ প্রক্রিয়াটি বোঝার জন্য/প্রমাণের জন্য কি ধরনের রেকর্ড বা নথিপত্র আছে?
- কিভাবে ও কার কাছে এসব রেকর্ড পাওয়া যাবে এবং এগুলোর সত্যাসত্য যাচাই করা যাবে?

একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে মনে রাখতে হবে, তিনি যতটা সমন্বিতভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে পারবেন ততই শক্তিশালীভাবে অনিয়ম বা দুর্নীতির ঘটনাটি প্রমাণ করতে পারবেন। এর মাধ্যমেই মূলত তিনি নিখুঁতভাবে দুর্নীতির চিত্র পাঠক/দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে পারবেন।

চিত্রঃ অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের মডেল

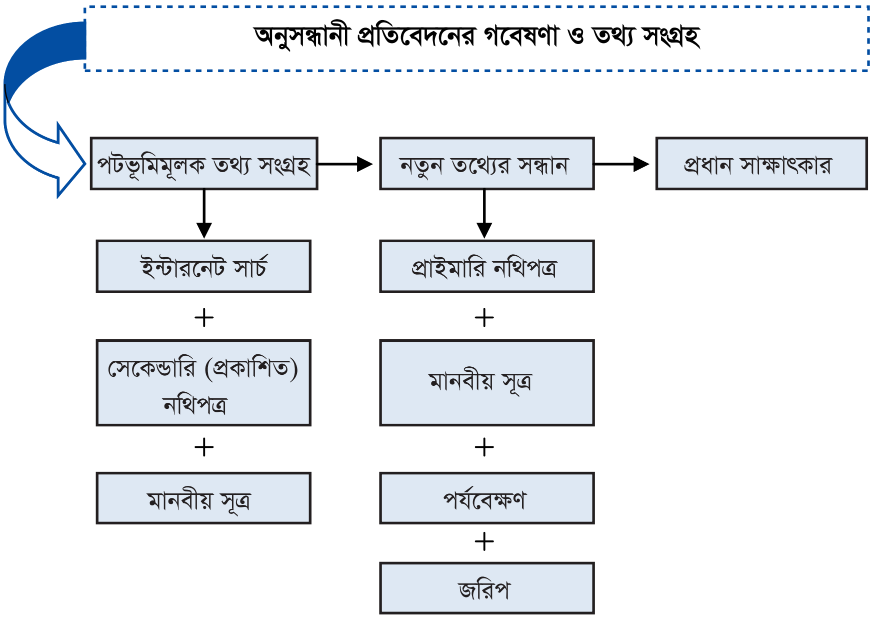

উপরের মডেল থেকে দেখা যায়, অনুসন্ধানী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার শুরুটাই হয় মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে। এ গবেষণা কাজের মধ্য দিয়ে তিনি প্রথমেই ঘটনা বা বিষয় সংশ্লিষ্ট পটভূমিমূলক তথ্যগুলো যোগাড় করেন। এ ধরনের গবেষণা তাকে পুরো প্রক্রিয়াটি বুঝতে সাহায্য করে। এরূপ গবেষণায় প্রতিবেদককে পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় দিতে হয়। কারণ পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পটভূমিমূলক তথ্য সংগ্রহ করতে না পারলে তিনি ঘটনা বা বিষয়ের নতুন দিক বের করতে পারবেন না। মূলত একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করতে হয় গবেষণার মধ্য দিয়ে। The Los Angeles Times-এর সাংবাদিক Louis B. Fleming বলেছেন, "*Exhaustive, tireless research is essential in any yarn looking at a subject for the first time. It is terrifyingly easy to come up with the wrong answer if you short-cut on preparation.*"[৯৮] স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গবেষণা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে কতটা দরকার তা তুলে ধরতে গিয়ে University of Nebraska'র শিক্ষক Neale Copple বলেছেন, "*No matter what kind of research the reporter does, if it is complete, he ends up knee-deep in facts. Those facts can make gray out of black and white.*"[৯৯]

এ গবেষণার প্রথম কাজই হলো পটভূমি সংক্রান্ত বা প্রাসঙ্গিক তথ্য ও নথিপত্র যোগাড় করা। এ কাজটিকে বলা হয়, পটভূমিকরণ (Backgrounding)। প্রতিবেদক যে বিষয় বা ঘটনা নিয়ে অনুসন্ধান করতে চান সে বিষয় ও ঘটনা সম্পর্কে, এর প্রেক্ষিত ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ

[৯৮] Neale Copple (1964), Depth Reporting: An Approach to Journalism, Prentice-Hall, Inc. New Jersey, p. 47.
[৯৯] Ibid, p. 52.

করতে হয়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে জানতে হয় তিনি কি বিষয়ে অনুসন্ধান করতে চান আর কোথা থেকে শুরু করতে চান। এ ধারণা লাভের জন্য তাকে কিছু প্রাসঙ্গিক বা পটভূমিমূলক তথ্য যোগাড় করতে হয়। ধরুন, কোন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক কোন মন্ত্রী কিংবা সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে ঘটনার তদন্ত করছেন। এ ধরনের অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে প্রথমেই প্রতিবেদককে মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যের আচরণ বিধি ও আইনানুযায়ী অর্পিত ক্ষমতা কতটুকু সে সম্পর্কে জানতে হবে। ধরুন, কোন প্রতিবেদক কোন সিটি মেয়রের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে টেন্ডার দেয়া ও পছন্দের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করা নিয়ে অনুসন্ধান করতে চান। এক্ষেত্রে প্রথমেই প্রতিবেদককে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে হবে। এজন্য তাকে টেন্ডার আহ্বানের নিয়মকানুন ও সে সম্পর্কিত আইন এবং নিয়মকানুনগুলো পড়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কখনই ওই প্রতিবেদক কোন ঠিকাদার বা সংশ্লিষ্ট কারো অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন না; ওই প্রতিবেদককে অবশ্যই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে হবে। কারণ তা না জানলে কোথায় নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা তৈরি হতে পারে না। আবার ধরুন, কোন প্রতিবেদক কোন চিকিৎসকের পেশাগত অসদাচরণ নিয়ে অনুসন্ধান করতে চান। এক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে প্রথমে চিকিৎসকের পেশাগত আচরণবিধি সম্পর্কে জানতে হবে যা চিকিৎসকরা পেশার ক্ষেত্রে মেনে চলতে বাধ্য। দুর্নীতি কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমেই নিয়ম বা ক্ষমতা পরিধি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। কারণ এ ধারণা প্রতিবেদককে কোথায় ও কি অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা দিবে। এ ধরনের ধারণা ছাড়া অনুসন্ধানের পরিণতি কি হতে পারে তা Leonard M. Kantumoya তুলে ধরেছেন এভাবে, "*Without a clear understanding of what constitutes corruption, you may think you are investigating corruption and find out, half-way down the road that you are dealing, instead, with a case of misallocation of funds!*"[১০০]

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ মডেলে দেখা যায়, প্রতিবেদক তিনটি সূত্র বা উৎসের মাধ্যমে পটভূমিমূলক তথ্য সংগ্রহ করেন। এগুলো হলো, ইন্টারনেটে সার্চের মাধ্যমে, সেকেন্ডারি বা প্রকাশিত নথিপত্রের মাধ্যমে আর মানবীয় সূত্রের মাধ্যমে। এই পটভূমিমূলক তথ্য সংগ্রহের পর প্রতিবেদক তার অনুমিতি বা পূর্বানুমান প্রমাণের জন্য নতুন তথ্যের সন্ধান করেন। এগুলো এমন তথ্য যার জন্য প্রতিবেদক কাজে নেমেছেন এবং এসব তথ্যই তার অনুসন্ধানের মূল দিক। মডেলে দেখা যাচ্ছে, একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক সূত্র ও হাতিয়ার/কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তার কাঙ্ক্ষিত তথ্যগুলো বের করে আনেন। এখানে একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক প্রাইমারি বা অপ্রকাশিত নথিপত্র, মানবীয় সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। আবার অনেক সময় সরেজমিনে পরিদর্শন বা পর্যবেক্ষণ এবং জরিপ কৌশল প্রয়োগ করেও তিনি তথ্য সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি এসব সূত্র ও হাতিয়ার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তিনি প্রাপ্ত তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই করেন। সবশেষে তিনি ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল ক্রীড়ানকের সাক্ষাৎকার নেন।

[১০০] Leonard M. Kantumoya (2004), Investigative Reporting in Zambia: A Practitioner's Handbook, Transparency International Zambia, p. 36.

মডেলটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে তার গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ স্তরে তথ্যের উৎস বা সূত্র খুঁজে বের করতে হয়। অর্থাৎ কোথায় কিংবা কার কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো পাওয়া যাবে সে বিষয়ে একটি নকশা প্রতিবেদককে ঠিক করতে হয়। একে আমরা 'সূত্র নকশাকরণ' (source mapping) বলতে পারি। এই নকশাকরণে দুটো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত: সূত্র থেকে তথ্য আহরণের কৌশল এবং গতিধারা (Strategy & Trail) ও সূত্র/সোর্স থেকে তথ্য আহরণের হাতিয়ার (Tools)।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তথ্য আহরণের কৌশল ও গতিধারা

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ মডেলটি থেকে একটি বিষয় পরিস্কার যে, অনুসন্ধানী প্রতিবেদক তার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি সমন্বিত ধারা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। পটভূমিমূলক তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সব ধরনের নতুন তথ্য যোগাড় ও মূল ক্রীড়ানকের সাক্ষাৎকার পর্যন্ত তিনি এ ধারাটি অনুসরণ করেন। সে কারণে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন মূলত নিম্নোক্ত কৌশলের সমাহার। অর্থাৎ নিচের কৌশলগুলোর ভিত্তিতেই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এগুলো হলো:

- ইলেকট্রনিক গতিধারা: গবেষণা ও প্রতিবেদনের জন্য কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার (The Electronic Trail: The use of computers and the Internet for research and reporting)
- কাগুজে গতিধারা: নথিপত্র (The Paper Trail: Documents)
- মানবীয় গতিধারা: সাক্ষাৎকার (The Human Trail: Interviews)
- মাঠকর্ম (Field Work)

চিত্র: অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তথ্য সংগ্রহের গতিধারা

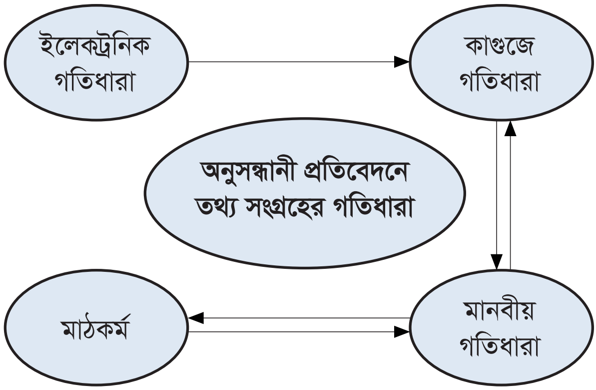

উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে, একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক তার তথ্য সংগ্রহ শুরু করেন ইলেকট্রনিক গতিধারা বা ইন্টারনেট সার্চের মাধ্যমে। পাশাপাশি নথিপত্রও সংগ্রহ করেন। এরপর প্রয়োজনীয় মানবীয় সূত্রগুলো থেকে তথ্য ও নথিপত্র সংগ্রহ করেন। কখনও কখনও আগে সংগৃহীত নথিপত্রের সত্যাসত্য যাচাই করেন এসব মানবীয় সূত্রের কাছে। পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে অর্থাৎ সরেজমিনেও পর্যবেক্ষণ করেন।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের মডেলটি বিশ্লেষণ করতে গেলে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করতে হয়। সেটি হলো, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার (Tools)। অনুসন্ধানের পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, অনুসন্ধানের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য একজন প্রতিবেদককে কিছু হাতিয়ার বা টুলস ব্যবহার করতে হয়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির অর্থ হলো সাপের গর্তে হাত ঢুকিয়ে লুক্কায়িত সাপটি বের করে আনা। অর্থাৎ ঘটনার গভীরে গিয়ে লুক্কায়িত তথ্য খুঁজে বের করে তা জনসমক্ষে তুলে ধরার নামই হলো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। এ কাজের জন্য একজন প্রতিবেদককে কিছু কৌশল বা পদ্ধতি কিংবা হাতিয়ার ব্যবহার করতে হয়। মূলত এ হাতিয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রেই প্রতিবেদকের দক্ষতা আর মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে। কারণ হাতিয়ার থাকলেই তা যথেচ্ছভাবে কিংবা যেনতেনভাবে ব্যবহার করা যায় না। হাতিয়ারের প্রয়োগ ও ব্যবহারের নিয়মকানুন জানতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল নথিপত্রের সন্ধান, মানবীয় সূত্রগুলো খুঁজে বের করে তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং ক্ষেত্রবিশেষে বুদ্ধিদীপ্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এখানে প্রতিবেদককে সারতে হয়। তবে এক্ষেত্রে প্রতিবেদককে প্রচুর বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এজন্য দরকার অনুশীলন আর বারবার ব্যবহারে অর্জন করতে হয় নৈপুণ্য। William Gaines বলেছেন, "*Interviews, documents, surveillance and surveys are the tools of the investigative reporter. The reporter learns which to use at a certain time, like a golfer who knows which club to use under different conditions as he or she progresses through a course. The best investigators during the course of their investigation may draw on all of the tools at one time or another.*"[১০১]

প্রধানত পাঁচটি হাতিয়ার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ব্যবহৃত হয়। সেগুলো হলো:

ক. ইন্টারনেট (Internet)
খ. নথিপত্র (Document)
গ. সাক্ষাৎকার (Interview)
ঘ. পর্যবেক্ষণ (Surveillance)
ঙ. জরিপ (Survey)

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ক রচিত বেশিরভাগ বইতে অনুসন্ধানী হাতিয়ার হিসেবে চারটি হাতিয়ারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্টারনেট ও কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তার কথা বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করা হলেও বেশিরভাগ পণ্ডিতই একে অনুসন্ধানের হাতিয়ারের মধ্যে

[১০১] William C. Gaines (1998), Investigative Reporting for Print and Broadcast, Nelson-Hall Chicago, 2nd Edition, p. 17.

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার

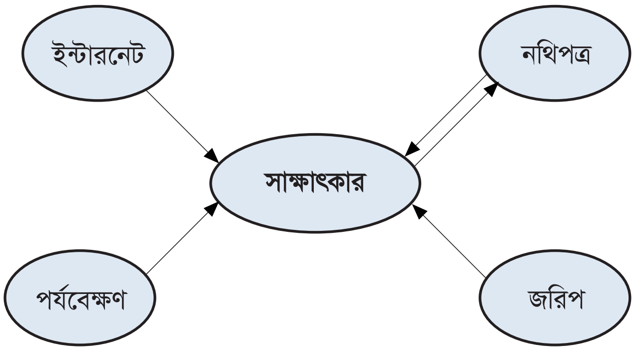

এ যাবৎ অন্তর্ভুক্ত করেননি। কিন্তু বর্তমান সময়ে পটভূমিমূলক তথ্য সংগ্রহের জন্য সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হাতিয়ার হলো ইন্টারনেট। তাছাড়া সংগৃহীত তথ্য সংগঠনের জন্য বড় হাতিয়ার হলো কম্পিউটার। সে কারণে ইন্টারনেট ও কম্পিউটারকে বর্তমান বইতে অনুসন্ধানের হাতিয়ার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ পাঁচটি হাতিয়ার বা কৌশলের সবগুলোই যে একসাথে একটি প্রতিবেদনে ব্যবহার করতে হবে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ঘটনার পরিধি, প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি এবং অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করবে প্রতিবেদক কখন, কোন পদ্ধতি কিভাবে ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করবেন। তবে সাদামাটা প্রতিবেদন যেমন একটি মাত্র হাতিয়ার ব্যবহার করে তৈরি করা সম্ভব তেমনি শুধু একটি হাতিয়ার বা কৌশল ব্যবহার করে কোনভাবেই একটি ভাল ও মানসম্মত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব নয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির উপযুক্ত নির্বাচন ও সেগুলোর কার্যকর ব্যবহারের ওপরই সাফল্য নির্ভর করে।

গতিধারা ও হাতিয়ারের সমন্বয়

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তথ্য সংগ্রহের গতিধারা ও হাতিয়ারের দুটি চিত্র থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তথ্য সংগ্রহের গতিধারা ও হাতিয়ার পরস্পর আন্তঃসম্পর্কিত। এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের গতিপথে পাঁচটি হাতিয়ার ব্যবহার করতে হয়। এ পাঁচটি হাতিয়ার সমন্বিতভাবে কিংবা আলাদা আলাদাভাবে ব্যবহার করে প্রতিবেদককে প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথিপত্র খুঁজে বের করতে হয়, সেসব তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই করতে হয়। পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে এসব হাতিয়ার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরব।

তথ্যসূত্র

Leonard M. Kantumoya (2004), Investigative Reporting in Zambia: A Practitioner's Handbook, Transparency International Zambia.

Neale Copple (1964), Depth Reporting: An Approach to Journalism, Prentice-Hall, Inc. New Jersey.

William C. Gaines (1998), Investigative Reporting for Print and Broadcast, Nelson-Hall Chicago, 2nd Edition.

অধ্যায়
৭

কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

এ অধ্যায়ে থাকছে

- কম্পিউটার এসিসটেড রিপোর্টিং
- সংগৃহীত তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি করা
- অনলাইনে নথিপত্র খোঁজা

"*Because communication is the essence of human activity, all domains of social life are being modified by the pervasive uses of the Internet...*"[১০২]

কম্পিউটার-এসিসটেড রিপোর্টিং (Computer-assisted reporting)

কম্পিউটার-এসিসটেড রিসার্স ও রিপোর্টিং (কম্পিউটারের সহয়তায় পরিচালিত গবেষণা ও রিপোর্টিং) ছাড়া কোন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাই পূর্ণতা পেতে পারে না। সংক্ষেপে একে কার (CAR) বলে। এর গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে Justin Mayo I Glenn Leshner বলেছেন, "*If the media in general act as a searchlight on society, then CAR gives the individual reporter a high-powered, hand-held flashlight.*"[১০৩]

মার্কিন লেখক Margaret De Fleur বলেছেন, তিন ধরনের কম্পিউটার এসিসটেড রিপোর্টিং আছে। প্রথমত, তথ্য সংগ্রহ এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (World Wide Web) এর মাধ্যমে অনলাইন ডাটাবেজ থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করা। দ্বিতীয়ত, এসব সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদককে নিজস্ব ডাটাবেজ তৈরি করতে হয়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংবাদ কাহিনীর জন্য প্রতিবেদক আলাদা আলাদা তথ্যভাণ্ডার তৈরি করেন তার কম্পিউটারে। তৃতীয়ত, কম্পিউটারের সাহায্যে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য একটি ডাটাবেজ তৈরি করা; যাকে বলেছেন *computer-aided investigative reporting (CAIR)*।[১০৪] আর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় CAIR-এর গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে James Aucoin বলেছেন, "*Instead of focusing on isolated abuses of power and wrong-doing, today's investigative reporter's look for wide-ranging failures of public policy, governmental neglect, corporate scheming and threats to democracy, using computer analysis to help them.*"[১০৫]

অনেক সরকারি রেকর্ড জাতীয় ও স্থানীয় সংস্থাগুলো পাবলিক রেকর্ড হিসেবে ডাটাবেজে সংরক্ষণ করে। এ ধরনের রেকর্ড খোঁজার মধ্য দিয়ে পরিচালিত রিপোর্টিংকেই কম্পিউটার এসিসটেড জার্নালিজম বা রিপোর্টিং বলে। সাধারণত CAR বলতে ডাটাবেজ ব্যবহার করাকে বুঝায়। তবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে সূত্র বা উৎস, তথ্য, নথিপত্রের সন্ধান করাকেও CAR বলে। একজন প্রতিবেদক সরকারি ডাটাবেজ নিজের কম্পিউটারে ডাউনলোড করে প্রয়োজন

---

[১০২] Manuel Castells (2001), The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society, New York: Oxford University Press, p.275.

[১০৩] Justin Mayo & Glenn Leshner (2000), Assessing the credibility of computer-assisted reporting, Newspaper Research Journal, Vol. 21, No. 4, Fall 2000.

[১০৪] Margaret De Fleur (1997), Computer Assisted Investigative Reporting, Erlbaum Associates. New Jersey, p. 73.

[১০৫] James Aucoin (1993), The New Investigative Journalism, Writer Digest, March, p. 22-27.

অনুযায়ী সাজানো এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহের পর্যায়ে কম্পিউটারের সব ধরনের সাহায্য নেয়াকেই CAR বলে। তবে আমাদের দেশে এখন প্রায় সব সংবাদ প্রতিষ্ঠানেই সাংবাদিকরা কম্পিউটারের মাধ্যমে তাদের রিপোর্ট কম্পোজ করেন। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, এ ধরনের শুধু কম্পোজ করাকেই CAR বলে না। বরং ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য অনুসন্ধান, গবেষণা, প্রাপ্ত তথ্যগুলো ডাটাবেজ হিসেবে সংরক্ষণ করার পুরো প্রক্রিয়াই হলো এর অংশ। Neil H. Reisner মনে করেন CAR হলো প্রথাগত বা প্রচলিত রিপোর্টিংয়ের বিপরীতধর্মী রিপোর্টিং বা সাংবাদিকতা। তিনি বলেছেন, "*The technique, in a way, turns traditional reporting on its head: Normally, reporters collect anecdotes and from them deduce trends. CAR lets reporters find trends, then collect the anecdotes to illustrate them.*"[১০৬] Miami Herald পত্রিকার কম্পিউটার এসিসটেড রিপোর্টিং বিশেষজ্ঞ ১৯৯৭ সালে এক সেমিনারে CAR-এর ভূমিকা কী আর কী নয় তা পরিষ্কার করতে বলেছিলেন, "*Computer-assisted reporting does not, in itself, make better stories. It does let us ask better questions so we can write better stories.*"[১০৭]

Poynter Institute- এর পক্ষ থেকে Pat Stith কম্পিউটার-এসিসটেড রিপোর্টিংয়ের একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছেন।[১০৮] সেখানে তিনি বলেছেন, তিনটি কারণে ইন্টারনেট ও কম্পিউটারের ব্যবহার অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় অত্যাবশ্যকীয় হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

১. CAR-এর ব্যবহারের মাধ্যমে সাংবাদিকরা এমনভাবে পাঠক/দর্শকের কাঙ্ক্ষিত সংবাদটিকে উপস্থাপন করতে পারেন যা পাঠক/দর্শক অন্য কোথাও পাবেন না।

২. এর মাধ্যমে প্রতিবেদককে সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে তার তথ্যগুলো সংরক্ষণ করতে পারেন। যা পরবর্তীতে তথ্যের ব্যাখ্যাকরণ ও উপস্থাপনে যারপরনাই সাহায্য করে।

৩. এর মাধ্যমে এমন শক্তিশালী ডাটাবেজ তৈরি করা সম্ভব যার মাধ্যমে প্রতিবেদক সব ধরনের তথ্য যাচাই-বাছাই করতে পারেন এবং ঘটনার গভীরে যেতে পারেন। এটি প্রতিবেদককে প্রহরীর বা ওয়াচডগ ভূমিকা পালনে সাহায্য করে।

সংগৃহীত তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি করা

একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক দীর্ঘদিন অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে প্রচুর তথ্য, নথিপত্র ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নানাজনের বক্তব্য সংগ্রহ করেন। এক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ডাটাবেজ তৈরির মাধ্যমে তিনি তথ্যগুলো সংগঠিত করতে পারেন। শুধু তাই নয়, অনুসন্ধানের অনুমিতি গঠনের সময় থেকেই তিনি এ ধরনের ডাটাবেজ তৈরি করতে পারেন। বিশেষ করে সম্ভাব্য সূত্রগুলোর নাম ও তাদের যোগাযোগের ঠিকানা, অভিজ্ঞজনদের সম্পর্কিত তথ্যও সংরক্ষণ করতে পারেন এ ডাটাবেজে। তথ্য সংগ্রহের সময় ধারাবাহিকভাবে ঘটনা ও তথ্যগুলো ডাটাবেজে সংরক্ষণ করতে পারেন। এ ধরনের ডাটাবেজ তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুসন্ধানী সংবাদ লিখন অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। পরিসংখ্যান ও সংখ্যা সংরক্ষণের জন্য

[১০৬] Neil H. Reisner (1995), On the Beat, American Journalism Review, March 1995, p. 47.
[১০৭] NetMedia 97, City University, London 3–4 July 1997.
[১০৮] http//www.poynter.org/content/content_print.asp?id=83

একজন প্রতিবেদক তার কম্পিউটারে স্প্রেডশিট তৈরি করতে পারেন। আর সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত বক্তব্যসহ অন্যান্য তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডাটাবেজ তৈরি করতে পারেন। যেমন সরকার বা প্রতিষ্ঠানের বাজেট, আর্থিক বিবরণী, সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন, অপরাধের হার, জরিপ ও আদমশুমারীর তথ্যগুলো সংরক্ষণের জন্য স্প্রেডশিট তৈরি করতে পারেন।

অনলাইনে নথিপত্র খোঁজা

'*The Internet is this big, big thing*'-- Bill Gates

যে কোন অনুসন্ধানের মূল হলো তথ্য এবং প্রত্যেক অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের মূল কাজ তথ্য খুঁজে বের করা, সেগুলো মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা করা এবং এসব তথ্য বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে তুলে ধরা। এক্ষেত্রে সাংবাদিকের জন্য প্রথম সমস্যাটি হলো সঠিক সূত্র থেকে সঠিক তথ্যটি বের করে আনা। বর্তমান সময়ে তথ্য অনুসন্ধানের প্রাথমিক কার্যকরী সূত্র বা উৎস হলো ইন্টারনেট। University of Miami-এর শিক্ষক Bruce Garrison ১৯৯৭ সালে এক গবেষণা শেষে মন্তব্য করেছেন, "*The Internet is not just a new distribution vehicle for journalists. It has become a highly valuable resource for news gathering and, in time, the World Wide Web, electronic mail, and other Internet tools most often used will take their place at all newspapers alongside other time-tested resources of news rooms, such as reference books and the telephone.*"[১০৯]

কয়েক বছর আগেও ইন্টারনেটকে আলাদা কোন অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তথ্য সংগ্রহের জন্য আলাদা কোন টুলস বা হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করা হতো না। উন্নত দেশগুলোতে গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকে একে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার একটি প্রাথমিক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে আসছে। আমাদের দেশেও বর্তমানে ইন্টারনেট একটি প্রধান গবেষণা ও রিপোর্টিং টুল বা হাতিয়ার এবং এটি বর্তমানে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় মৌলিক গবেষণার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। Alan Knight তাঁর 'Online investigative journalism' নিবন্ধে বলেছেন, "*The Internet offers investigative journalists new tools for reporting; qualified access to global communities of interests which may provide alternate sources to those in authority.*"[১১০] Sheila S. Coronel বলেছেন, "*The Internet has emerged as a prime research and reporting tool and is now often the first stop in a journalistic investigation.*"[১১১]

বর্তমানে সাংবাদিকতায় ইন্টারনেটের গুরুত্ব কতখানি তা খুব সহজে বোঝানোর জন্য Business Week-এর রাজনৈতিক প্রতিবেদক Lorraine Woellert- এর এই কথাটি তুলে ধরা যায়, "*The Internet today is what the fax machine was for me in the late 1980s. Back then, I couldn't imagine doing my job without the fax; now I can't imagine how reporters functioned without the Internet.*"

[১০৯] Bruce Garrison (1997), Online news gathering trends in American newspapers, On the Internet at http://gehon.ir.miami.edu/com/car/stpete.htm .

[১১০] Alan Knight, Online investigative journalism, p. 2, http://www.ejournalism.au.com

[১১১] Sheila S. Coronel (2009), Digging Deeper: A Guide for Investigative Journalists in the Balkans, Sarajevo, Balkan Investigative Reporting Network, p. 65.

দ্রুতগতিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশ্বব্যাপী এখন সবচেয়ে প্রবেশযোগ্য মাধ্যম বা হাতিয়ার হলো ইন্টারনেট। Derek Forbes বলেছেন, "*The Internet provides an additional means to gather many forms of information from across the world – if strategically used, it is a journalist's most accessible tool for swift searches, tracing and crosschecking information.*"[১১২] ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনুসন্ধানে নেমে একজন প্রতিবেদক পূর্ণ মাত্রায় তথ্য খুঁজতে পারেন। তার নির্ধারিত বিষয়টি নিয়ে ব্যাপকমাত্রায় জ্ঞানার্জন, পটভূমিমূলক তথ্য সংগ্রহ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানাজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। John LaPlante সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ভূমিকা তুলে ধরেছেন খুব চমৎকারভাবে, "*The Internet makes lazy reporters lazier and energetic reporters more productive.*"

তবে একজন প্রতিবেদক তার গবেষণার জন্য ইন্টারনেটকেই সর্বেসর্বা কিংবা একমাত্র ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন না। এটি দিয়ে শুরু করা যায় মাত্র। বিশেষ করে বাংলাদেশে এখনও বেশিরভাগ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র ও তথ্য ডিজিটাইজড হয়নি। সে কারণে আমাদের দেশের অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত কোথায় পাওয়া যাবে সে বিষয়ে ইন্টারনেট সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে মাত্র। তাছাড়া আমাদের দেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার এখনও এত সীমিত যে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়া আরো গতি পেতে অনেক সময় লাগবে। তা সত্ত্বেও এ মাধ্যমটি এত বেশি বিস্তার লাভ করছে একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের পক্ষে ইন্টারনেটের ব্যবহার ছাড়া এখন ভাল ফল পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ইন্টারনেটে নতুন গ্রুপ, ব্লগ কমিউনিটি ও তাদের সরবরাহকৃত তথ্য থেকে প্রতিবেদক অনেক কিছুই জানতে পারেন। তাছাড়া ইমেইলের মাধ্যমে এখন অনেক সাক্ষাৎকার সহজেই নেয়া সম্ভব। বিশেষ করে কোন জটিল বিষয়ে দূরদূরান্তে বা প্রবাসে বসবাসকারী বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য ইমেইল সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা। সেজন্য আজকের যুগে অবশ্যই একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের ইন্টারনেট সাক্ষরতা বা এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ এটা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে, ইন্টারনেট সাংবাদিকের অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার গতি তরান্বিত করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের নানাবিধ ভূমিকার কথা Stephen Ohlemacher তুলে ধরেছেন এভাবে, "*The basic principles of journalism apply to the Internet, same as for other aspects of our jobs—double-check information, and always consider the source.*" ইন্টারনেটের ব্যাপক ভূমিকার কারণে ফ্রিল্যান্স অনুসন্ধানী সাংবাদিক Evelyn Groenink এখন ইন্টারনেটকে কোন একক সোর্স হিসেবে দেখছেন না; বরং অনেক সোর্সের সমাহার থাকে বলে ইন্টারনেটকে তিনি বলেছেন একটি কার্যকরী হাতিয়ার- "*The internet is not a source in itself since many sources put out things on the internet – it is, however, a very handy tool.*"[১১৩] আবার ইন্টারনেটে এখন এত বেশি তথ্য পাওয়া যায় যাতে মাঝে মাঝে সেসব তথ্য থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য বাছাই করে নেয়াও কষ্টকর হয়ে যায়। এই দিকটি বিবেচনা করে Chris Frost বলেছেন, "*Indeed, the major problem these days is not finding out information, but in narrowing down the amount you will find to a torrent you can cope with.*"[১১৪]

---

[১১২] Derek Forbes (2005), A watchdog's guide to investigative reporting: A simple introduction to principles and practice in investigative reporting, Konrad Adenauer Stiftung Media Programme, Johannesburg, Republic of South Africa, p. 35.
[১১৩] Ibid, Derek Forbes (2005). p. 36.
[১১৪] Chris Frost (2010), Reporting for Journalists, 2nd edition, Routledge, New York. p. 52.

একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক যখন তার অনুসন্ধানের বিষয়ে ইন্টারনেটে সার্চ করেন তখন তাকে একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। এ প্রক্রিয়ার ধাপগুলো হলো:

১. প্রতিবেদক ইন্টারনেটের মাধ্যমে কি খুঁজে পেতে চান?
২. কাঙ্ক্ষিত তথ্যের জন্য একটি সার্চ পরিকল্পনা করতে তৈরি করা।
৩. সার্চিংয়ের জন্য উপযুক্ত হাতিয়ার নির্বাচন (সাবজেক্ট ডিরেক্টরিস বা সার্চ ইঞ্জিন)।
৪. সুশৃংখল পদ্ধতিতে তথ্য খোঁজা।

সুশৃংখলভাবে ও গোছানোভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেতে এ প্রক্রিয়াটি অনুসরণের জন্য প্রতিবেদকের কিছুটা অনুশীলন করা প্রয়োজন।

বিশ্বব্যাপী তথ্য, পরিসংখ্যান, পটভূমিমূলক তথ্য, একাডেমিক গবেষণা, এনজিও প্রতিবেদনসহ অন্যান্য নথিপত্রের জন্য সহজে প্রাপ্য একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র হলো ওয়েব। তবে অনেকে ওয়েবকে ইন্টারনেট বলে ভুল করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ওয়েব ইন্টারনেটের একটি উপশাখা; যেমন এফটিপি। ওয়েবের বড় সুবিধা হলো একজন প্রতিবেদক এখানে খুব সহজেই তার প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য পেতে পারেন। এর জন্য খুব বেশি দক্ষতারও প্রয়োজন পড়ে না। খুব সাধারণভাবে Google or Yahoo এর মতো সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে প্রতিবেদক তার প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজ্যের প্রকাশিত তথ্য পেতে পারেন। এক্ষেত্রে ইউনেস্কো ও থমসন ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে Martin Huckerby এর রচিত '*The Net for Journalists: A practical guide to the Internet for journalists in developing countries*'[১১৫] বইটির সাহায্য নিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক Julian Sher 'JournalismNet'[১১৬] শীর্ষক একটি বই লিখেছেন যেখানে রিপোর্টারদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু লিঙ্কের সাইট দেয়া হয়েছে এবং পাশাপাশি ওয়েব সার্চের বিষয়েও নির্দেশনা আছে। ওয়েব সার্চের বিষয়ে নির্দেশনা পেতে 'The Poynter Institute'[১১৭] এর নির্দেশিকা বেশ কার্যকরী। যুক্তরাজ্যের ইন্টারনেট গুরু Phil Bradley সাংবাদিকদের বেশ কিছু সহজ ও কার্যকরী সার্চ ইঞ্জিনের তালিকা দিয়েছেন।[১১৮]

সার্চ ইঞ্জিন

ইন্টারনেটে কোন কিছু খোঁজার সবচেয়ে সহজ ও কার্যকরী উপায় হলো সার্চ ইঞ্জিনের সহায়তা নেয়া। কারণ সকল সার্চ ইঞ্জিন হলো এক বিশাল ডাটাবেজ। এজন্য সার্চ ইঞ্জিনকে ইন্টারনেটের লাইব্রেরিয়ান বলা হয়। সাধারণত একজন লাইব্রেরিয়ান লাইব্রেরিতে রাখা সব বই সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখেন। কোন গ্রাহক যদি কোন বিষয়ে কোন বই চান তবে লাইব্রেরিয়ান তাকে ওই বই সম্পর্কে ধারণা দিতে পারেন। একইভাবে সার্চ ইঞ্জিনও ইন্টারনেটের জন্য সুদক্ষ লাইব্রেরিয়ানের কাজ করে থাকে। মূলত সার্চ ইঞ্জিন হলো এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগাম এটিকে ইন্টারনেটের একটি সফটওয়্যারও বলা যায় যা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন তথ্যকে তার নিজের ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করে রাখে এবং পরবর্তীতে ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুসারে তথ্য প্রদর্শন করে। অনলাইন গবেষণার ক্ষেত্রে একজন প্রতিবেদক দুই ধরনের সার্চ ইঞ্জিনের সহায়তা নিতে পারেন।

---

[১১৫] Available in www.pressclub.ch/doc/The_net_for_journalists.pdf
[১১৬] http://journalismnet.com
[১১৭] www.poynter.org
[১১৮] Available in www.philb.com/whichengine.htm

১. Crawler-based সার্চ ইঞ্জিন; যেমন, www.google.com; www.yahoo.com।

২. Human-powered directories; যেমন, Open Directory |

Open Directory - dmoz.org

Google Directory - directory.google.com

কোন গ্রাহক ইন্টারনেটে কোন বিষয় সম্পর্কে যখন তার জিজ্ঞাসার জন্য 'কিওয়ার্ড' প্রদান করে তখন সার্চ ইঞ্জিন সেই 'কিওয়ার্ড'টিকে খুঁজতে একটি সার্চ স্পাইডারকে পাঠিয়ে দেয় ডকুমেন্টকে সংগ্রহ করার জন্য। পাশাপাশি এডভান্স সার্চও করা যায়। সাধারণত " " চিহ্নের মধ্যে 'কিওয়ার্ডটি লিখে খুঁজলে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া সম্ভব। তবে স্পষ্টভাবে কিওয়ার্ড তুলে ধরে উচিত। যেমন, আপনি হয়তো বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বিষয়ে কোন কিছু খুঁজছেন; সেক্ষেত্রে "প্রধানমন্ত্রী" নয়, "শেখ হাসিনা" লেখা ভাল। এক্ষেত্রে একাধিক কিওয়ার্ড থাকলে পরপর কিওয়ার্ডগুলো লিখে সার্চ করলেই চলে; কোন ধরনের সংযুক্ত শব্দ; যেমন এবং, ও ইত্যাদি লেখার দরকার পড়ে না। গুগলে এখন বাংলাতেও সার্চ করা যায়। সেক্ষেত্রে ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই সার্চ করলে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন। দেশীয় ভিত্তিতেও তথ্য অনুসন্ধানের জন্য সার্চ ইঞ্জিনগুলোকে ব্যবহার করা যায়।

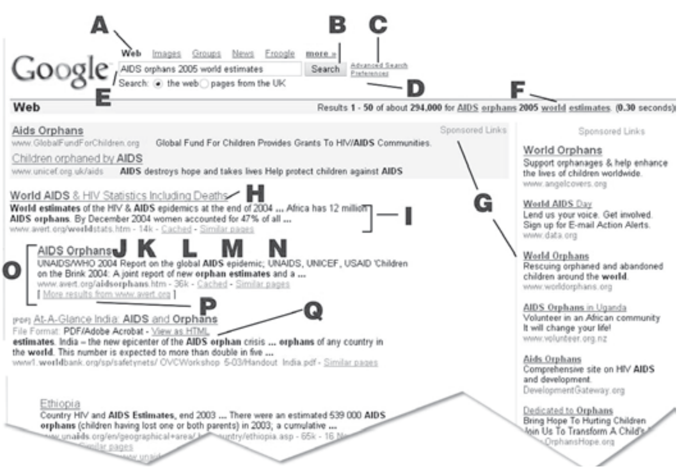

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, অনলাইন সেকেন্ডারি রেকর্ডের জন্য এখন সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। এমনকি বই, ভিডিও-অডিও, ছবি, মানচিত্র ইত্যাদির চেয়ে অনলাইন এখন অনেক বেশী কার্যকরী মাধ্যম। কিন্তু অনলাইন থেকে সেকেন্ডারি রেকর্ড বা নথিপত্র কিংবা তথ্য সংগ্রহ করার সময় যত্নের সাথে এগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা, নির্ভুলতা যাচাই করতে হবে। কারণ ইন্টারনেটে গুজব, গল্পের সমাহারও থাকে। ছলনা, ধোঁকাবাজমূলক তথ্যও থাকে ইন্টারনেটে। সে কারণে একজন সাংবাদিককে অবশ্যই ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো যাচাই করে নিতে হবে। The Poynter Institute ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাইয়ের জন্য ১০টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নির্দেশ করে চেকলিস্ট প্রদান করেছেন। Johns Hopkins Sheridan Libraries[১১৯] ও একটি ভাল চেকলিস্ট তৈরি করেছেন যার মাধ্যমে ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করা যায়। একটি বিষয় এখানে খেয়াল রাখা উচিত, প্রাতিষ্ঠানিক সাইটগুলোর চেয়ে ব্যক্তিগত সাইটগুলো তুলনামূলকভাবে কম বিশ্বাসযোগ্য হয়। তবে কোন কোন বিশেষজ্ঞের সাইটে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। ইন্টারনেটের তথ্য যে সাইট থেকে নেয়া হোক না কেন সোর্সের বিশ্বাসযোগ্যতা অবশ্যই নিরূপন করতে হয়। ইন্টারনেটে প্রকাশিত তথ্য যাচাইয়ের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল করতে হয়:

১. তথ্যের প্রকাশক কে বা কারা? ডোমেইনটি কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য?
২. কতটা নিয়মিতভাবে তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে?
৩. ব্যাকরণ, বানান, তারিখসহ অন্যান্য বিষয়ে কী ধরনের ভুল আছে?

তথ্যসূত্র

Alan Knight, Online investigative journalism, http://www.ejournalism.au.com.
Bruce Garrison (1997), Online news gathering trends in American newspapers, On the Internet at http://gehon.ir.miami.edu/com/car/stpete.htm.
Chris Frost (2010), Reporting for Journalists, 2nd edition, Routledge, New York.
Derek Forbes (2005), A watchdog's guide to investigative reporting: A simple introduction to principles and practice in investigative reporting, Konrad Adenauer Stiftung Media Programme, Johannesburg, Republic of South Africa.
James Aucoin (1993), The New Investigative Journalism, Writer Digest, March.
Justin Mayo & Glenn Leshner (2000), Assessing the credibility of computer-assisted reporting, Newspaper Research Journal, Vol. 21, No. 4, Fall 2000.
Manuel Castells (2001), The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society, New York: Oxford University Press.
Margaret De Fleur (1997), Computer Assisted Investigative Reporting, Erlbaum Associates. New Jersey.
Neil H. Reisner (1995), On the Beat, American Journalism Review, March 1995.
NetMedia 97, City University, London 3-4 July 1997.
Sheila S. Coronel (2009), Digging Deeper: A Guide for Investigative Journalists in the Balkans, Sarajevo, Balkan Investigative Reporting Network.
http://journalismnet.com
www.library.jhu.edu/researchhelp/general/evaluating/
www.philb.com/whichengine.htm
http//www.poynter.org/content/content_print.asp?id=83
www.pressclub.ch/doc/The_net_for_journalists.pdf

[১১৯] www.library.jhu.edu/researchhelp/general/evaluating/

অধ্যায়
৮

নথিপত্র

এ অধ্যায়ে থাকছে
- কাগুজে গতিধারা (চিহ্ন-রেখা) অনুসরণ
- নানারকম নথিপত্র
- নথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
- নথিপত্র মূল্যায়ন

কাগুজে গতিধারা (চিহ্ন-রেখা) অনুসরণ

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য তথ্য সংগ্রহ পর্যায়ে যে চারটি গতিধারা (চিহ্ন-রেখা) অনুসরণ করতে হয় তাদের মধ্যে অন্যমত গুরুত্বপূর্ণ হলো কাগুজে গতিধারা (Paper Trail) অনুসরণ। এর অর্থ হলো নথিপত্র খুঁজে বের করা। একটি নথিপত্র আরেকটি নথিপত্রের সন্ধান দেয়। নথিপত্রগুলো সম্ভাব্য মানবীয় সূত্রগুলোরও সন্ধান দিয়ে থাকে। সাংবাদিকের কাজ হলো এসব প্রয়োজনীয় ও দরকারি নথিপত্র সংগ্রহ করা, সেগুলো পড়া ও মমার্থ উদ্ধার করা এবং অন্যান্য নথিপত্রের সাথে যাচাই-বাছাই করা। এক্ষেত্রে সাংবাদিককে কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়। সেগুলো হলো: নথিপত্রগুলোতে কী বলা আছে? নথিপত্রগুলো কী প্রমাণ করছে? অভিযোগটি প্রমাণের জন্য প্রাপ্ত নথিপত্র ছাড়া আর কি কি তথ্য দরকার? Investigative Journalism Manuals-এ 'কাগুজে গতিধারা'কে রূপকার্থে বিদ্যালয়ের দৌড় প্রতিযোগিতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। স্কুলে দৌড় প্রতিযোগিতায় একজন দলনেতা থাকেন যিনি তার হাতে থাকা কাগজের টুকরোগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন এবং তাকে অনুসরণকারী দলগুলো ওই কাগজের টুকরোগুলো সন্ধান করে। এজন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের জন্য নির্দেশনা হলো, "*If you think about the metaphor, you can see in your head what a `paper trail' means in investigative journalism too.*"[১২০]

Paul N. Williams তাঁর বইয়ের একটি অধ্যায়ের শুরুটা করেছেন এভাবে, "*THE FIRST and great commandment of investigative reporting is this: get the record.*"[১২১] নথিপত্রের একটি বড় কাজ হলো পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা। একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের গবেষণা স্তরে প্রতিবেদককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য যোগাড়ের জন্য নথিপত্র সংগ্রহ করতে হয়। এসব নথিপত্র প্রতিবেদককে ঘটনার প্রেক্ষিত ও পরিধি বোঝার জন্য সহায়তা করে। এসব নথিপত্র থেকে বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে প্রতিবেদক যান মানবীয় সূত্রের কাছে। কার্যত অনুসন্ধান কর্মটি কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেয় এই নথিপত্র। অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের করণীয় সম্পর্কে ক্লু দেয় বা পথ দেখায় নথিপত্র। তাছাড়া এ ধরনের পটভূমি সংক্রান্ত নথিপত্রের মাধ্যমে প্রতিবেদক তার প্রয়োজনীয় মানবীয় সূত্রগুলোরও সন্ধান পান। অর্থাৎ একটি প্রতিবেদন নিয়ে কোন কোন ব্যক্তির কাছে কী কী তথ্যের জন্য যেতে হবে, কারা এ বিষয়ে ভালো বলতে

[১২০] Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals, Chapter six: Basic research -- skills and tools/ http://www.investigative-journalism-africa.info/

[১২১] Paul N. Williams (1978), Investigative Reporting and Editing/ PRENTICE-HALL, INC., Englewood Cliffs, New Jersey, p. 37.

পারবেন- এমন মানবীয় সূত্রগুলোর হদিস দেয়ার বড় হাতিয়ার হলো নথিপত্র।

একটি ভাল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে গেলে প্রতিবেদককে জানতে হয় নথিপত্র কোথায় ও কীভাবে পাওয়া যাবে। এখানে 'ডকুমেন্ট/নথিপত্র' শব্দটি বলতে শুধু প্রকাশিত রেকর্ডকেই বোঝায় না। এর অর্থ আরো বিস্তৃত যার মধ্যে যে কোন বস্তু যাতে স্থায়ীভাবে তথ্য সংরক্ষিত থাকে। Leonard M. Kantumoya সেজন্য নথিপত্রকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, "*The term "document" is not limited to the printed record. The definition is broad enough to include any physical object used to hold information in some permanent form.*"[১২২]

ফাইল, যে কোন ধরনের রেকর্ড, চুক্তি, সমঝোতা স্মারক, রেজিস্ট্রার, রসিদ ও ইনভয়েস, অডিও এবং ভিডিও টেপ, চার্ট, ছবি, ফিল্ম, চিঠিপত্র এবং কম্পিউটার ডিস্ক। বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে নথি'র অর্থ হলো 'সুতা দিয়ে গাঁথা কাগজপত্রের তাড়া, কোনো বিষয় সংক্রান্ত কাগজের তাড়া, ফাইল (মোকাদ্দমার নথি)'।[১২৩] এসব নথিপত্র বা প্রামাণ্য দলিল প্রতিবেদকের সংবাদটিকে অকাট্য বা সত্য বলে প্রমাণ করবে। দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে নথিপত্র হলো সেই দলিল যার মাধ্যমে প্রতিবেদক অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রমাণ বের করতে পারেন।

কোন ব্যক্তি সঠিক স্বাক্ষর সম্বলিত কোন চিঠি বা চেক, দুষ্কৃতিকারী দলের গোপন বৈঠকের ছবি, সংশ্লিষ্ট কারো ধারণকৃত বক্তব্যের রেকর্ড, দিনক্ষণসহ কোন বিমানের টিকিট, বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, আদালতের রেকর্ড, মেডিকেল রেকর্ড, কাস্টমস ইনভয়েস, পরিচয়পত্র, ব্যক্তিগত ডায়েরি, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সনদ ইত্যাদি দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার অনুসন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র হিসেবে কাজ করে। প্রতিবেদককে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, সরকারি কিংবা বেসরকারি যাই হোক না কেন যে কোন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি তদন্তের জন্য অবশ্যই সে সংক্রান্ত রেকর্ড ঘাটতে হবে। কারণ সব ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডেরই প্রাতিষ্ঠানিক রেকর্ড থাকে। এই রেকর্ড বা নথিপত্রই গোপন কর্মকাণ্ডের সাক্ষী; কিন্তু প্রতিবেদকের জন্য এ ধরনের নথিপত্র সহজলভ্য নয়। এজন্য প্রতিবেদককে এক্ষেত্রে কৌশলী হতে হয়। Leonard M. Kantumoya বিষয়টি তুলে ধরেছেন এভাবে, "*Documents containing crucial, damning information are nearly always kept concealed in inaccessible places off limits to reporters and members of the public. What this means is that the reporter must exercise diplomatic skills to cultivate and maintain the sources s/he needs both for tips, quotable eye-witness accounts, and to negotiate access to hidden documents.*"[১২৪]

ডকুমেন্ট বা নথিপত্র নির্ভরযোগ্য। এটিই নথিপত্রের সবচেয়ে বড় সুবিধা। কারণ ডকুমেন্ট বা নথিপত্রে যা থাকে সেসব আধেয় পরিবর্তন করা যায় না। মানুষের মতো এরা মিথ্যে বলে না। এদের পরিচয় স্পষ্ট এবং প্রয়োজনবোধে এদের সনাক্ত করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার বা মানবীয় সূত্রের চেয়েও নথিপত্র অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। কারণ মানবীয় সূত্রের মতো যখন-তখন

---

[১২২] Leonard M. Kantumoya (2004), Investigative Reporting in Zambia: A Practitioner's Handbook, Transparency International Zambia, p. 32.

[১২৩] বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (২০১১), ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১৭, জানুয়ারি ২০১১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৬৫৯।

[১২৪] Ibid, Leonard M. Kantumoya (2004), p. 35.

এটি পাল্টে যায় না কিংবা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলে না। অনেক সোর্স প্রতিবেদককে সাক্ষাৎকার দিয়ে পরে নানা চাপে পড়ে তা অস্বীকার করতে পারে। উল্টো এসব ক্ষেত্রে ভুলভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে বলে প্রতিবেদকের ওপর দোষ চাপানো হয়। Sheila S. Coronel বলেছেন, "*Unlike a human source, a document does not change its mind; it cannot deny or alter what it states.*"[১২৫] Leonard M. Kantumoya বলেছেন, "*They are not like human beings who, when they are bribed or when the heat is turned on, may change their statement and say you misquoted them. The point about documents, however, is that they do not, by themselves, tell the whole story.*"[১২৬] আবার অনেক সাক্ষাৎকারে পাওয়া তথ্য যাচাই-বাছাই করার জন্য নথিপত্র কাজে লাগে। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ কোন সূত্র বা সোর্স প্রতিবেদককে ব্যবহার করার জন্য কোন ধরনের মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন কি না তা যাচাই করার সবচেয়ে বড় অস্ত্রটি হলো ওই সংক্রান্ত নথিপত্র।

ডকুমেন্ট বা নথিপত্র অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি সত্যাসত্য প্রমাণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হাতিয়ার। এটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের প্রাণ। কোনো দুর্নীতি/অনিয়ম/অপব্যবহারের অভিযোগ সম্পর্কে যাচাই করতে গেলে অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের সবচেয়ে যুৎসই প্রমাণের উৎস হলো নথিপত্র বা ডকুমেন্ট। সে কারণে অনুসন্ধানী প্রতিবেদক বা সাংবাদিকের সবচেয়ে ভাল বন্ধুটি হলো এই ডকুমেন্ট বা নথিপত্র। কারণ এই ডকুমেন্ট বা নথিপত্রই দরকারি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোর উৎস। একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক যে দুর্নীতি বা অনিয়ম কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহারের ঘটনা অনুসন্ধান করছেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ যোগায় নথিপত্র। কোন ধরনের নথিপত্র ছাড়া একটি সাদামাটা প্রতিবেদন সহজেই তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু একেবারেই কোন ধরনের নথিপত্র ছাড়া একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। বিশেষ করে দুর্নীতি সংক্রান্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য নথিপত্র সংগ্রহের অন্য কোন বিকল্প হতে পারে না। Sheila S. Coronel বলেছেন, "*Documents are crucial to most investigations. Without them, journalists will find it difficult to find proof of wrongdoing.*"[১২৭] নথিপত্র ছাড়া অনুসন্ধানী প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ ও আইনগত দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। কারণ কোন ধরনের অভিযোগ কিংবা গুজব প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণের সবচেয়ে বড় শর্ত হলো নথিপত্রের মাধ্যমে তা প্রমাণ করা। Leonard M. Kantumoya বলেছেন, "*For, an investigative story is incomplete, and legally perilous, if it is merely a publication of allegations and rumours not supported by eyewitness accounts and/or documentary evidence.*"[১২৮] তবে একটি নথিপত্রে যা লেখা থাকে ঠিকভাবে তার পাঠোদ্ধার করতে হয়। এক্ষেত্রে ভুল হলে পুরো প্রতিবেদনটিই প্রশ্নবিদ্ধ হবে। নথিপত্রের আরেকটি সীমাবদ্ধতা আছে। প্রতিবেদক নথিপত্রকে প্রশ্ন করতে পারেন না; কারণ নথিপত্রের মুখ নেই বা ভাষা নেই। এ কারণে কোনো প্রশ্নের উত্তর জানতে কিংবা নথিপত্র যাচাই করতে হলে প্রতিবেদককে নথিসংরক্ষক কিংবা নথিপত্রের রচয়িতার ভাষ্য গ্রহণ করতে হয়। এজন্য নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী বলেছেন, "মানবীয় সূত্রহীন নথিকে

---

[১২৫] Sheila S. Coronel (2009), Digging Deeper: A Guide for Investigative Journalists in the Balkans, Sarajevo, Balkan Investigative Reporting Network, p. 55.
[১২৬] Ibid, Leonard M. Kantumoya (2004), p. 33.
[১২৭] Ibid, Sheila S. Coronel, 2009, p. 58.
[১২৮] Ibid, Leonard M. Kantumoya, 2004, p. 35.

অবশ্যই যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়, সংযুক্ত করতে হয় বিশেষজ্ঞ মতামত।"[১২৯] অনেক বাংলাদেশী প্রতিবেদক অভিযোগ করে থাকেন, তারা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ঠিকভাবে করতে পারেন না সরকারি রেকর্ড বা নথিপত্র সহজে পাওয়া না যাওয়ার কারণে। একটি কথা মনে রাখতে হবে, অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের কাজ হলো যা মানুষ গোপন করতে চায় সেসব তথ্য বের করে আনা। ফলে স্বাভাবিকভাবে অনিয়ম বা দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য দুর্নীতিপরায়ণরা গোপন করে রাখবেন। কিন্তু তা বের করে আনার কৌশল প্রতিবেদককে রপ্ত করতে হবে। প্রতিবেদককে অনুসন্ধান কাজে নেমে মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকটি বিষয়ের পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক রেকর্ড বা নথি কোথাও না কোথাও আছে। তার কাজ হলো সেটি খুঁজে বের করা। এ খোঁজার ক্ষেত্রে তিনি শুধু সরকারি বা জনসংশ্লিষ্ট প্রকাশিত দলিল-দস্তাবেজ বা নথিপত্র খুঁজলে হবে না। কোন একটি বিষয়ে একক বা খণ্ডিত কোন দলিল বা নথিপত্র কখনই অনুসন্ধান কাজের জন্য পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিতে পারে না। সেজন্য একটি ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের তথ্য প্রতিবেদককে খুঁজে বের করতে হবে। Paul N. Williams বলেছেন, "*... no single record -- public or private -- is certain to be complete or accurate for his purposes. ... At the very best, a document is a record of a situation point in time, usually from a single viewpoint, and for a single reason. So the investigative reporter explores all records pertaining to his story.*"[১৩০] তিনি মনে করেন, এভাবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদক তার অনুসন্ধানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের নথিপত্র খুঁজে বের করতে পারলে প্রতিবেদক গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করতে পারেন। কারণ একটি নথিপত্র নতুন নথিপত্রের পথ দেখায়। নতুন আঙ্গিক ও সূত্রের সাথে পরিচয় ঘটায় পুরাতন নথিপত্র।

মার্কিন অনুসন্ধানী সাংবাদিক Bill Gaines মনে করেন, একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে সবসময় নথিপত্রের কথা মাথায় রাখতে হবে। সোর্স বা সূত্রগুলোর সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়ার সময়ই শুধু নথিপত্রের কথা চিন্তা করলে হবে না, বরং অনুসন্ধানের পরিকল্পনার সময় থেকেই এ কথা মাথায় রাখতে হবে। Bill Gaines একে বলছেন, 'documents state of mind'[১৩১]। অভিজ্ঞ অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা জানেন, একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে সাক্ষাৎকার শুরুর আগেই নথিপত্রের একটি স্তূপ গড়ে তুলতে হয়, যেখান থেকে তিনি নানাজনের রেফারেন্স পাবেন যাদের সাক্ষাৎকার বা মতামত নেয়ার দরকার পড়বে। এমনকি সম্ভাব্যতা যাচাই-বাছাই বা এ সংক্রান্ত গবেষণা স্তর থেকেই কার্যত একজন প্রতিবেদকের নথিপত্র যোগাড়ের দিকে মনযোগ দিতে হয়। এ সময় থেকেই তাকে বিবেচনা করতে হয় কী ধরনের নথিপত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদ্যমান বা থাকতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করতে হয়। যখন প্রকাশিত নথিপত্র দিয়ে ঘটনা বা বিষয়টি প্রমাণ করা যাবে না তখন তাকে অপ্রকাশিত নথিপত্র/ব্যক্তিগত নথিপত্র যোগাড়ের দিকে মনোনিবেশ করতে হয়।

নানারকম নথিপত্র

উৎসের দিক থেকে নথিপত্র দুই ধরনের হয়। প্রথমটি প্রাইমারি সোর্স ও দ্বিতীয়টি সেকেন্ডারি সোর্স। যে কোন ধরনের প্রকাশিত তথ্য তা বই আকারে কিংবা অনলাইনে হোক না কেন এগুলো সেকেন্ডারি সোর্স হিসেবে বিবেচ্য। আর যেসব তথ্য প্রকাশিত হয়নি সেগুলো প্রাইমারি ডকুমেন্ট হিসেবে বিবেচিত হয়।

---

[১২৯] নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী (১৯৯৬), অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি), ঢাকা, জুলাই, ১৯৯৬, পৃ ৯৫।

[১৩০] Ibid, Paul N. Williams (1978), p. 38.

[১৩১] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p. 55.

প্রাইমারি রেকর্ড/সোর্স (Primary Sources)

প্রাইমারি বা প্রাথমিক সোর্স হলো অপ্রকাশিত নথিপত্র যা পাওয়া কঠিন। যেমন, সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন, ব্যাংক রেকর্ড, আয়কর নথি, ঋণপত্র, মেডিকেল প্রতিবেদন ইত্যাদি। প্রাইমারি রেকর্ড বা নথিপত্রে অনুসন্ধানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য নথিপত্র হিসেবে অবশ্যই একজন প্রতিবেদককে প্রাইমারি সোর্স যোগাড় করতেই হবে, "*Primary sources are a must for corruption investigations, for profiling individuals or companies, and for finding proof of just about any wrongdoing.*"[১৩২]

সেকেন্ডারি রেকর্ড/সোর্স (Secondary sources)

প্রকাশিত বই, প্রতিবেদন, আর্টিকেল ইত্যাদি; যা সহজেই পাওয়া যায়। সাধারণত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি রেকর্ড সহজলভ্য হয়। এক্ষেত্রে প্রতিবেদকের মূখ্য কাজ হলো কোন ধরনের সেকেন্ডারি রেকর্ডগুলো অনসুন্ধানের বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা খুঁজে বের করা।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা স্বভাবত ইতিমধ্যে প্রকাশিত অর্থাৎ সেকেন্ডারি নথিপত্র খোঁজার মধ্যে দিয়ে তাদের গবেষণা কাজ শুরু করেন। প্রকাশিত নথিপত্র উন্মোচনের মাধ্যমে একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক তার অনুসন্ধান কাজের দ্বার উন্মোচন করেন। কারণ এসব রেকর্ড সহজলভ্য। Sheila S. Coronel বলেছেন, "*Given the amount of information that has been published, there is never a shortage of secondary records available to enterprising journalists on just about any subject they choose to investigate. The key is finding out which secondary sources are relevant to the reporter's probe and which are likely to yield the information that is key to unlocking the investigation.*"[১৩৩]

আজকাল ইন্টারনেটের মাধ্যমে এ ধরনের গবেষণা কাজ শুরু হয়। একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের উচিত এসব রেকর্ডগুলো প্রথমেই পড়ে নেয়া। কারণ ঘটনা/বিষয়ের পটভূমি ও প্রেক্ষিত সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য তিনি যেসব ব্যক্তির কাছে যাবেন তাদের কাছে যাওয়ার আগে এ সংক্রান্ত রেকর্ড বা নথিপত্রগুলো পড়ে নিলে তাদের কাছ থেকে বেশি তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনুসন্ধানের বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সেকেন্ডারি নথিপত্রগুলো প্রচুর তথ্যের যোগান দিয়ে থাকে। এই ধরনের সেকেন্ডারি বা প্রকাশিত নথিপত্রগুলো ঘটনা বা বিষয়ের পরিধি, প্রকৃতি, কাজের ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য জোগায়। পাশাপাশি সেকেন্ডারি নথিপত্র এমন সব পটভূমিমূলক তথ্য সরবরাহ করে থাকে যা একজন প্রতিবেদক তার মূল প্রতিবেদনেও উপস্থাপন করতে পারেন যার ভিত্তিতে তার প্রতিবেদনটি পূর্ণাঙ্গতা পায়। Sheila S. Coronel বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন এভাবে, "*Apart from being a source of important background information that gives journalists more solid grounding on the subject they are investigating, secondary sources can also provide detailed information that is needed to complete a story.*"[১৩৪]

---

[১৩২] Ibid, p. 67.
[১৩৩] Ibid/ p. 64.
[১৩৪] Ibid, p. 64.

উদাহরণস্বরূপ, একজন প্রতিবেদক সিটি করপোরেশনের একটি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি নিয়ে হয়তো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করছেন। তার সোর্স/সূত্র তাকে জানিয়েছেন, চুক্তিকারী প্রতিষ্ঠানটির মালিক সিটি মেয়রের বাল্যবন্ধু হওয়ায় তাকে অবৈধ কিছু সুবিধা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্কুলের স্মরণিকা বা বার্ষিক প্রকাশনায় তিনি তথ্য পেলেন যে, চুক্তিকারী প্রতিষ্ঠানটির মালিক ও সিটি মেয়র ক্লাসমেট এবং বাল্যবন্ধু। আবার প্রকাশিত নথিপত্র বিশেষ করে ডাইরেক্টরি থেকে প্রতিবেদক অনেক প্রয়োজনীয় ফোন নাম্বার, ঠিকানা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন যার মাধ্যমে প্রতিবেদক যাদের সাক্ষাৎকার নিতে চান তাদের সহজেই খুঁজে পেতে পারেন।

এছাড়া প্রকাশিত নথিপত্র হিসেবে সংবাদপত্রের আর্কাইভ একটি বড় মজুদ। এছাড়া বিশেষজ্ঞ জার্নাল ও কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ইন্টারনেটে প্রকাশিত তথ্য ব্যাপকভাবে প্রতিবেদককে সাহায্য করতে পারে।

জনসংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও অপ্রকাশিত নথিপত্র (পাবলিক ও নন-পাবলিক রেকর্ডস)

সাধারণত প্রকাশিত নথিপত্র যেগুলো খুব সহজেই পাওয়া যায় সেগুলোকে পাবলিক ডকুমেন্ট বা নথিপত্র বলে। যেমন কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন রেকর্ডস। এখন সরকারি ওয়েবসাইটগুলোতে এ ধরনের রেকর্ড বা তথ্য পাওয়া যায়। পাবলিক রেকর্ডস হচ্ছে এমন সব নথিপত্র ও দলিল দস্তাবেজ যা জনসাধারণ চাইলে সরকার বা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, দফতর বা কর্তৃপক্ষ দিতে বাধ্য। আমাদের দেশে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, পাবলিক রেকর্ডস মানে গোপনীয়। এটি ঠিক নয়। তবে কিছু সরকারি নথিপত্র থাকে যেগুলো গোপনীয় বা কনফিডেনশিয়াল। যেমন আয়কর বিবরণী একটি গোপনীয় নথি। বিশ্বব্যাপী আয়কর বিবরণী সরকার বা সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতর সংরক্ষণ করে থাকে কিন্তু এগুলো কখনই সরকার উন্মুক্ত করে না। একইভাবে সামরিক বাহিনীর নথিপত্র কিংবা আইনশৃংখলা বাহিনীর তদন্ত প্রতিবেদনের ক্ষেত্রেও একইভাবে সরকার গোপনীয়তা রক্ষা করে চলে। পাবলিক রেকর্ডসের বাইরে থাকে কোনো ব্যক্তিগত কিংবা অপ্রকাশিত নথিপত্র।

Mark Lee Hunter বিষয়টিকে একটি সিনেমায় একটি দৃশ্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[১৩৫] তিনি 'Harper' নামক একটি সিনেমার কথা তুলে ধরেছেন। এ সিনেমায় নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন Paul Newman, যিনি সিনেমাটিতে একজন গোয়েন্দার ভূমিকায় অভিনয় করেন। সিনেমাটির একটি দৃশ্যে দেখা যায়, নায়ক ও আরেকটি বাচ্চা একটি কক্ষে আছেন যার দরজা বন্ধ। বাচ্চাটি দরজাটি খোলার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করছে। নায়ক নিউম্যানের কাছে বাচ্চার আবদার, 'দয়া করে আমাকে দরজা খুলে যেতে দিন'। নায়ক উত্তর দিল, 'নিশ্চয়'। এরপর বাচ্চাটি সজোরে দরজায় ধাক্কা দিল এবং এতে তার কাঁধ প্রায় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হলো। এ দেখে নায়ক দরজার কাছে গিয়ে তার এবং হাতল ঘুরিয়ে দরজাটি খুলে বেরিয়ে গেলো। Mark Lee Hunter এ উদাহরণ টেনে বলছেন, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ে তাঁর শিক্ষকতা ও রিপোর্টিংয়ের অভিজ্ঞতায় তিনি প্রচুর লোক দেখেছেন যারা সিনেমাটির এই বাচ্চা বা শিশুটির মতো আচরণ করে যারা এমনভাবে বাধা অতিক্রম করতে চায় যা আদৌ বাধা ছিল

[১৩৫] Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists, chapter three; Verification- Using the Open Doors: Backgrounding and deduction, p. 26

না কিংবা অতটা অনতিক্রম্য বাধা ছিল না যা অতিক্রম করা সত্যিই কষ্টসাধ্য। Mark Lee Hunter বলছেন, "এ ধরনের প্রতিবেদকরা এক ধরনের বিভ্রমে ভোগেন: তারা মনে করেন যা গোপনীয় নয়, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সে কারণে তারা তাদের সময় খরচ করে এমন তথ্যের পেছনে ছোটে যাকে মানুষ গোপনীয় বলে আখ্যায়িত করে।"[১৩৬] কিন্তু একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের যেসব নথিপত্র দরকার হয় তার সবটাই যে গোপনীয় দলিল-দস্তাবেজ এমন ধারণা করা বোকামি। Mark Lee Hunter বলছেন, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য দরকারি অধিকাংশ নথিপত্রই উন্মুক্ত উৎস/সূত্র বা 'Open Source'।[১৩৭] তবে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সাংবাদিকরা প্রায়ই অভিযোগ করেন এ ধরনের উন্মুক্ত উৎস/সূত্রের যথেষ্ট অভাব রয়েছে এবং যা পাওয়া যায় সেগুলোরও মান খুব একটা ভাল নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ কথা সত্যি হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায়, প্রতিবেদকদের মধ্যে এ ধরনের উন্মুক্ত সূত্র/উৎসগুলো ব্যবহার করার প্রবণতা খুবই কম।

যেসব নথিপত্র বা দলিল-দস্তাবেজ উন্মুক্ত সেগুলো থেকে প্রতিবেদক খুব সহজেই তথ্য পেতে পারে। অনেক শিক্ষানবিশ প্রতিবেদক এ ধরনের নথিপত্রগুলোকে পুরাতন এবং কার্যকারিতাহীন বলে মনে করে থাকেন। এসব দলিল-দস্তাবেজ থেকে অনেক সময় বিস্ফোরক তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে, প্রতিবেদক পেতে পারে কোন মানবীয় সূত্রের ইঙ্গিত কিংবা অনুসন্ধানের নতুন কোন দিকনির্দেশনা। যারা এসব দলিল-দস্তাবেজকে পুরাতন ও অকার্যকর মনে করেন তাদের জন্য Mark Lee Hunter পরামর্শ দিয়েছেন এভাবে, "*Do not assume that because it is open to the public, this information is old, worthless, already known. Just as often, it may have explosive implications that no one ever considered. Do not just look for specific pieces of information; that's what amateurs do. Instead, look for types of sources and approaches that you can use again and again. Your ability to use this material will be a crucial factor in your reputation.*"[১৩৮]

'উন্মুক্ত' উৎস/সূত্রসমূহ

সাম্প্রতিক বিশ্বে উন্মুক্ত সূত্র বা উৎসের পরিধি অসীম ও অপার। অর্থাৎ এর পরিধি বিশাল। এগুলো এমন প্রকাশিত তথ্য যেগুলো সহজে পাওয়া যায়। এ ধরনের তথ্য সাধারণত কোন লাইব্রেরি কিংবা গণমাধ্যমের আর্কাইভ থেকে পাওয়া যায়:

- সংবাদ (সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, টিভি, রেডিও, ইন্টারনেট)
- বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রকাশনা (ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল, বাণিজ্যিক সমিতি ইত্যাদি)
- একাডেমিক প্রকাশনা বা গবেষণা প্রতিবেদন
- স্টেকহোল্ডার মিডিয়া (ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ফোরাম, আর্থিক বিশ্লেষক, বিভিন্ন সংস্থার নিউজলেটার বা ম্যাগাজিন ইত্যাদি)

শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার

বিভিন্ন পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, মেডিকেল কলেজ, ব্যবসায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রন্থাগার।

[১৩৬] Ibid, p. 26
[১৩৭] Ibid.
[১৩৮] Ibid.

সরকারি সংস্থার প্রতিবেদন

অন্য যে কোন সূত্র বা উৎস থেকে বেশি তথ্যের আধার হতে পারে এই সরকারি সংস্থার প্রতিবেদনগুলো। এমনকি যেসব দেশে তথ্যের অবাধ স্বাধীনতা নেই সেসব দেশের জন্যও একথাটি সত্যি। কোন ঘটনা সম্পর্কে প্রতিবেদন, তদন্ত প্রতিবেদন কিংবা সরকারি দফতরে জমা পড়া জনসাধারণের অভিযোগ থেকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদক খুঁজে পেতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

সরকারি গ্রন্থাগার

জাতীয়ভাবে এবং মিউনিসিপ্যাল পর্যায়ের গ্রন্থাগারগুলো থেকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদক অনেক তথ্য পেতে পারেন। এছাড়া জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগার কিংবা কিছু কিছু মন্ত্রণালয়ের গ্রন্থাগার থেকেও তথ্য পেতে পারেন।

তদন্তকারী সংস্থা ও আদালত

সরকারি বিভিন্ন তদন্ত সংস্থার মাধ্যমেও অনুসন্ধানী প্রতিবেদকরা নথিপত্র সংগ্রহ করতে পারেন। আবার তদন্ত শেষ হয়ে গেলে যখন তা আদালতের কাছে চলে যায় সেখান থেকেও এ ধরনের নথিপত্র সংগ্রহ করা যায়। আদালতে দুইপক্ষের আইনজীবীর সাথে সুসম্পর্ক থাকলে এ ধরনের নথিপত্র পাওয়া অনেক বেশি সহজ হয়।

মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং সংগঠন মাসিক ও বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশ করে। এসব প্রতিবেদন থেকে প্রতিবেদক অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতিবেদন

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাদের পর্যবেক্ষন প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

নথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক যাই করুক না কেন, যখনই একটি নথিপত্র হাতে পাবেন, তখন তার কাজ হলো তা সংগ্রহ করা। সবচেয়ে ভাল পন্থা হলো, প্রত্যেক নথির একটি করে ফটোকপি করা। হুবহু ওই নথির মূল কপির একটি ফটোকপি করে রাখলে সবচেয়ে ভাল হয়। অনেকে সোর্সের কাছ থেকে নথিপত্রে উল্লেখিত তথ্যগুলো টুকে নিয়ে আসেন। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এটি যতই কম করা যায় ততই ভালো। কারণ অনুসন্ধানের প্রথম দিকে প্রতিবেদক ভালো করে বুঝে উঠতে পারেন না কোন তথ্য বা কোন ক্লু পরে কোন কাজে লাগবে বা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিবে। কোন তথ্য প্রতিবেদক টুকে নিতে ভুলে গেছেন অথবা প্রথম দিকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন কিন্তু পরে দেখা গেলো ওই বাদ দেয়া তথ্যটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তখন ওই নথিপত্র আবার নাও পাওয়া যেতে পারে কিংবা ওই সোর্স ওই পদে বহাল নাও থাকতে পারেন। এজন্য অভিজ্ঞ অনুসন্ধানী প্রতিবেদকরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সব নথিপত্রের একটি করে কপি নিজের কাছে রেখে দেন।

নথিপত্র চুরি করা

সাধারণভাবে বলা যায়, সাংবাদিকদের নথিপত্র চুরি করা উচিত নয়। কারণ নথিপত্র চুরি করা একটি অপরাধ। এর মাধ্যমে তিনি আইনগত জটিলতায় পড়তে পারেন, যা তার ও তার

অফিসের ভোগান্তির কারণ হতে পারে। Sheila S. Coronel বলেছেন, "*Journalists should not steal documents. Stealing documents is a crime than can get them into serious trouble, especially in restrictive regimes.*"[১৩৯] Sheila S. Coronel বলেছেন, শুধু একটিমাত্র ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের নথিপত্র চুরি করা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। সেটি হলো যদি কখনও এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে ওই ঘটনার সঙ্গে জনস্বার্থের বিষয়টি ব্যাপকভাবে জড়িত এবং এর মাধ্যমে কারো জীবন রক্ষা করা যাবে কিংবা কোন অপরাধ সংঘটন থেকে বিরত রাখা যাবে। এক্ষেত্রে তিনি প্রথমে অনুসন্ধানী সাংবাদিককে তার সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদকের সাথে আলোচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ এই নথিপত্র চুরির সাথে প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নটিও জড়িত।

মাঝে মাঝে সাংবাদিকরা একটি নির্দিষ্ট নথিপত্র পাওয়ার জন্য তার সোর্সকে বিনিময়ে অন্য কিছু তথ্য সরবরাহ করে থাকেন। এ ধরনের বিনিময় পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তি হয়ে থাকলেও এখানে নৈতিকতার বৈপরীত্য আছে। উদাহরণস্বরূপ, ওই সোর্স যেসব তথ্য সাংবাদিকের কাছ থেকে নিয়েছেন তা কী কাজে ব্যবহার করবেন? সেই তথ্যগুলো কি মানুষের জন্য ক্ষতিকর? সে তথ্যগুলো কি অন্য সোর্সদের বিপদে ফেলতে পারে? যদি এ ধরনের আশঙ্কা থাকে তাহলে কোন সাংবাদিকেরই এ ধরনের বিনিময়ে যাওয়া উচিত নয়। তবে এ ধরনের নৈতিকতার প্রশ্নে কোন সোজাসাপ্টা উত্তর দেয়া কঠিন। এখানে ভাল পন্থা হলো সাংবাদিকের উচিত তার সম্পাদকের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা এবং তিনি যে অস্বাভাবিক একটি পথ অবলম্বন করছেন সে ব্যাপারে জানানো ও সম্পাদকের মতামত নেয়া।

নথিপত্র মূল্যায়ন

নথিপত্র যদিও অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য কিন্তু সতর্কতা অবলম্বনের জন্য সাংবাদিকের মনে রাখা উচিত কোন নথিপত্রই সবসময় শতভাগ নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো, একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক যে নথিপত্র পেয়েছেন তা অন্য কোন নথিপত্রের সাহায্যে কিংবা মানবীয় সূত্রের সাহায্যে যাচাই-বাছাই করে নেয়া। কারণ আপনি হয়তো কোন পিয়ন বা ক্লার্কের কাছ থেকে নথিপত্রটি পেয়েছেন যিনি আপনাকে অজ্ঞাতসারেই কোন নাম বা সংখ্যা ভুল দিতে পারেন। অথবা কোন সূত্র একেবারেই ইচ্ছাকৃতভাবে আপনাকে ভুল নথিপত্র দিতে পারে। আবার আপনি অসম্পূর্ণ নথিপত্রও পেতে পারেন। এ ধরনের অসম্পূর্ণ নথিপত্র দিয়ে সংবাদ তৈরি করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আবার কোন কোন নথিপত্র খুবই পুরাতন ও সেকেলে হতে পারে বা এ কার্যকারিতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে। সেজন্য নথিপত্র পাওয়ার পর তা পরখ করে নিতে হয়।

আপনি কি নথিপত্রগুলো বিশ্বাস করেন?

সরকারি নথি/রেকর্ড যাচাইয়ের জন্য কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়ঃ

- নথিপত্রের রচয়িতা কে?
  নথিপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেই হোক না কেন যিনি এই নথিপত্রের রচয়িতা বা লেখক তার মূল্যায়ন খুব জরুরি। এক্ষেত্রে একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর সাহায্যে এর মূল্যায়ন করতে পারেন।
- নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোর বিবেচনায় লেখককে মূল্যায়ন করা যায়:

[১৩৯] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p. 62.

■ **বিশ্বাসযোগ্যতা:** নির্ভুলতা, সততা ও সরলতার দিক থেকে লেখকের কি সুনাম আছে?

■ **নির্ভরযোগ্যতা:** নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল তথ্য সরবরাহের দিক থেকে লেখকের কি ভাল ট্র্যাক রেকর্ড আছে?

■ **স্বচ্ছতা:** যে বিষয়ে লেখক প্রতিবেদন বা রিপোর্ট দিচ্ছেন সে বিষয়ে কি দখল আছে? (যেমন একজন বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ যদি ফরেনসিক মেডিসিনের ওপর মতামত দেন তাহলে সেটি প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।

■ **নথিপত্রটি কি প্রমাণীকৃত?**

➢ মানবীয় সূত্র দ্বারা এ নথির সত্যতা যাচাই করা যাবে যে, এটি ঠিক নথি, কিংবা ভুয়া বা বিকল্প কোন নথি নয়?

■ **এটি কি যাচাইযোগ্য?**

➢ অন্য কোন নথিপত্র কিংবা কোন মানবীয় সূত্র দ্বারা এই নথিটি কি প্রমাণ/যাচাই করা যাবে?

■ **নথিটি কি নির্ভুল?**

➢ এই নথিতে ব্যবহৃত সংখ্যা, তারিখ, তথ্য ও পরিসংখ্যানগুলো কি যাচাই করা হয়েছে? বৈষম্যগুলো কি ব্যাখ্যাযোগ্য নয়? এই নথিতে কি কোন পরস্পরবিরোধী তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে?

➢ নথিটি কি পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ? নথির কোন কিছু কি কাটাছেঁড়া করা হয়েছে? কোন কিছু বাদ দেয়া হয়েছে?

■ **এই নথি কতটা সাম্প্রতিক?**

➢ এই নথিতে একেবারে নতুন তথ্য কি সংযোজিত হয়েছে?

➢ এই নথিটি কি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রযোজ্য বা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কি এর কার্যকারিতা থাকবে?

■ **এ নথিতে কি কোন মতামত বা পক্ষ আছে?**

➢ নথিটি কি এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছে যাদের নিজস্ব এজেন্ডা বা মতামত আছে? যদি তা হয়, এ এজেন্ডা বা মতামত কি এই নথিপত্রের আধেয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে?

তথ্যসূত্র

Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals, http://www.investigative-journalism-africa.info/

Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists.

Paul N. Williams (1978), Investigative Reporting and Editing/ PRENTICE-HALL, INC., Englewood Cliffs, New Jersey.

Sheila S. Coronel (2009), Digging Deeper: A Guide for Investigative Journalists in the Balkans, Sarajevo, Balkan Investigative Reporting Network.

নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী (১৯৯৬), অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি), ঢাকা, জুলাই, ১৯৯৬।

বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (২০১১), ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১৭, জানুয়ারি ২০১১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

অধ্যায়
৯

মানবীয় সূত্র ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

এ অধ্যায়ে থাকছে

- সূত্রের নকশাকরণ
- নানারকম মানবীয় সূত্র
- সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা পরিমাপ
- সূত্রের গোপনীয়তা রক্ষা

সূত্রের নকশাকরণ (Source mapping)

অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ও পরিকল্পনার সময় আমরা দেখেছি, একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে সূত্রের নকশা বা ম্যাপিং করতে হয়। অর্থাৎ কোন কোন সূত্রের কাছে তার যেতে হবে, কার কাছে কী তথ্য চাইতে হবে সে সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা আগে থেকে থাকতে হয়। এসব সূত্রের বরাত দিয়ে প্রকাশিত/প্রচারিত প্রতিবেদনে ঘটনা/বিষয়টি তুলে ধরতে হয়। সেকেন্ডারি সোর্সের মাধ্যমে প্রতিবেদক যে গবেষণা করেছেন সেখান থেকেই তিনি মানবীয় সূত্রগুলোর একটি তালিকা তৈরি করতে পারেন। তবে এ সূত্রনকশা কেমন হবে সে বিষয়ে বাধা-ধরা কোন নিয়ম নেই। তাছাড়া এটি একটি অনুমানভিত্তিক নকশা; অনুসন্ধান কাজ শুরুর পর নতুন নতুন সোর্স বা সূত্র যোগ হতে পারে। আবার সূত্রনকশা তৈরি করার সময় একটি ঘটনা/বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্ক/সংশ্লিষ্টতা পরিমাপ করতে হয়। কারণ কোন একজন কাঙ্ক্ষিত সোর্সকে যদি পাওয়া না যায় কিংবা তিনি যদি কথা বলতে অপারগ হন তাহলে বিকল্প সোর্স খুঁজে বের করতে হবে। Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists-এ বলা হয়েছে, "*When you make a source map, use it to show the relationships between the actors of the story, so that if one source is blocked, you can go to another source who can see past the obstacle. When the people in one part of your map accept you, your chances of acceptance elsewhere on the map go up.*"[১৪০]

যে কোন প্রতিবেদকের মূখ্য কাজ হলো তিনি যেই তথ্যই পান না কেন তা গ্রহণ করা এবং অর্থপূর্ণভাবে নানা প্রসঙ্গে তা ব্যবহার করা। প্রতিবেদককে এসব তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই-বাছাই করতে হয়। এ কাজের জন্য প্রতিবেদকের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন তথ্যের সোর্স বা সূত্র কিংবা উৎস। সোর্স বা সূত্র কিংবা উৎস হলো যে কোন প্রতিবেদকের পেশাগত প্রাণভোমরা। Richard Keeble-এর কথায় সেটাই ফুটে উঠে, "*At the heart of journalism lies the source. Becoming a journalist to a great extent means developing sources.*"[১৪১]। Allan Bell বলেছেন, "*The ideal news source is also a news actor, someone whose own words make news.*"[১৪২]

---

[১৪০] Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists, chapter four; Using human sources/p. 36.

[১৪১] Richard Keeble (2006), The Newspapers Handbook, Fourth edition, Routledge New York, p. 51.

[১৪২] Allen Bell (1991), The Language of News Media, Oxford: Blackwell, p. 193-194.

সাংবাদিক Mark Potter তো তাঁর ৭ ইঞ্চি/৯ ইঞ্চি সোর্স বুকটাকে বলতেন বাইবেল।[১৪৩] খবরের জন্য সোর্স কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা Sigal-এর এই কথা থেকে সহজেই ফুটে উঠে, "*News is, after all, not what journalists think, but what their sources say, and is mediated by news organizations, journalistic routines and conventions, which screen out many of the personal predilections of individual journalists.*"[১৪৪] মূলত সোর্স থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই প্রতিবেদক তার প্রতিবেদন তৈরি করেন। অর্থাৎ সোর্স একটি সংবাদ কাহিনীর অবকাঠামো গড়ে দেয়। সেজন্য বলেছেন, "*News becomes a construction, and the interaction of reporters and sources is how that construction comes to be.*"[১৪৫]

একটি ভাল সোর্স বা সূত্র একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের পথ নির্দেশক। তিনি শুধু প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথিপত্রের সন্ধান দেন না, অনুসন্ধানের প্রতিবন্ধকতাগুলোও বাতলে দেন। Paul N. Williams বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন এভাবে, "*A good source can tell you where to find the chink in the protective wall around your target.*"[১৪৬] কিন্তু অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সূত্র বা তথ্যের উৎসগুলো প্রতিবেদকের দরজায় আপনা আপনি এসে হাজির হয় না কিংবা সংবাদ-কাহিনী তৈরির জন্য দরকারি তথ্যগুলো সঙ্গে করে নিয়ে আসেন না। প্রতিবেদককেই এই সূত্রগুলো চিহ্নিত করতে হয় এবং এই সূত্রগুলোর সহযোগিতা পেতে তাদের সাথে সম্পর্ক গড়তে হয়।

কাগুজে সূত্রগুলো কিংবা প্রাপ্ত নথিপত্রগুলো যাচাই করার জন্য দরকার মানবীয় সূত্র। কারণ কাগুজে নথিপত্রের মুখ নেই, নিজস্ব কোন ভাষা নেই। তাই কাগুজে নথিপত্রগুলোকে জীবন্ত করে তোলার জন্য প্রতিবেদককে মানবীয় সূত্রের সন্ধান করতে হয়। নথিপত্রের একটি বড় দুর্বলতা হলো আপনি একে প্রশ্ন করতে পারবেন না কিংবা নথিপত্র আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। সেজন্য প্রতিবেদককে খুঁজে নিতে হবে এ নথিপত্রের মালিককে কিংবা রচয়িতাকে। নথিপত্রের সত্যাসত্য যাচাইয়ে অবশ্যই তাই মানবীয় সূত্রের খোঁজ করতে হয়। আলী রিয়াজ বলেছেন, "*কাগজের সূত্র হলো একটি শরীরের মূল কাঠামো– হাড় মাত্র; রক্ত মাংস না দিলে তা পূর্ণাঙ্গ হয় না। তা ছাড়া কাগজ পত্রে অনেক কিছুই সাজানো সম্ভব হয়। কখনো কখনো কাগজ হয়ে ওঠে বিভ্রান্তিকর ও অস্পষ্ট। এই বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা মোকাবেলা করতে রিপোর্টারকে শরণাপন্ন হতে হয় বিশেষজ্ঞদের। কোন দলিলের ভুল ব্যাখ্যা আর কোনো ব্যক্তিকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করা সমপরিমাণে দোষনীয়। আর এই আশঙ্কা সবসময়ই উপস্থিত থাকে। দলিলে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অনুপস্থিতি সহজেই দৃষ্ট। দলিলের কাজ হলো ঘটনার 'কী' অংশ তুলে ধরা 'কেন' অংশ নয়। এই 'কেন' এর জন্য শরণাপন্ন হতে হয় মানুষের।*"[১৪৭] নথিপত্র প্রচুর থাকে। শুধু প্রতিবেদককে জানতে হয় কোথায় বা কার কাছ থেকে সেগুলো পাওয়া যাবে। অর্থাৎ নথিপত্রের গেটকিপার কিংবা নিয়ন্ত্রক কে তা প্রতিবেদককে খুঁজে বের করতে হয়। বিশেষ করে তথ্যপ্রাপ্তির অবাধ স্বাধীনতা যেখানে বাধাগ্রস্ত কিংবা সীমিত সেখানে

[১৪৩] Carole Rich (2010), Writing and Reporting News: A Coaching Method, Sixth edition, Wardsworth, USA, p. 87.
[১৪৪] Sigal, L., Who? Sources make the news, In R. Manoff & M. Schudson (Eds.), Reading the news., New York: Pantheon Books., p. 29.
[১৪৫] Ericson, R. (1999), How journalists visualize fact., The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 560(1), p. 83–95.
[১৪৬] Paul N. Williams (1978), Investigative Reporting and Editing, PRENTICE-HALL, INC., Englewood Cliffs, New Jersey, p. 64.
[১৪৭] আলী রিয়াজ (১৯৯৪), অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হ্যান্ডবুক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি), ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ২৪-২৫।

এ ধরনের নিয়ন্ত্রককে বিশ্বস্ত সূত্র হিসেবে তৈরি করা প্রতিবেদকের একটি বড় অর্জন। একটি বিশ্বাসযোগ্য ও ভাল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য মানবীয় সূত্রের কোন বিকল্প নেই। যত বেশি মানবীয় সূত্রের সঙ্গে প্রতিবেদকের যোগাযোগ ঘটবে ততই তার প্রতিবেদনের ভিত্তি মজবুত হবে। মানবীয় সূত্রগুলো অনুসন্ধানের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর পাশাপাশি এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত, তথ্য-উপাত্তের জীবন্ত ব্যাখ্যা জুড়ে দেয়া যায়। Derek Forbes বলেছেন, "*Human sources always add a face, credibility and colour to the investigative piece. Human sources can also provide expert testimony, elaborate on the statements of other sources, explain evidence, provide opinion and confirm or corroborate what you already know.*"[১৪৮] মানবীয় সূত্রের গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, "*People are nearly always the key to a good story. They are the reason why a story is interesting, they are why people want to read it, and they provide the best support for a story – good witness statements or quotes – that explain how the people involved feel about the issue. A personal account not only adds to the strength of a story, but it is usually the best part.*"[১৪৯]

একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করার সময় মানবীয় সূত্রের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার পেছনেই সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। কিন্তু কোনভাবেই একে সময় নষ্ট বা বৃথা চেষ্টা বলে মনে করা যাবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ লেখক ও সাংবাদিক স্যামুয়েল জনসন একবার বলেছিলেন, "*Sir, I count it a day lost whenever I fail to make a new acquaintance.*"[১৫০]

নানারকম মানবীয় সূত্র

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য সূত্র হিসেবে কাজ করে নানান ধরনের মানুষ। মানবীয় সূত্র একদিনে বা হঠাৎ করে তৈরি হয় না। সাধারণত প্রতিবেদকগণ অনেকদিন ধরে একটি বিট বা বিষয় কাভার করতে করতে তাদের অনেক মানবীয় সূত্র বা সোর্স গড়ে উঠে। এসব সোর্স ওই বিটের কোন বিষয় বা ঘটনা অনুসন্ধানের সময় প্রতিবেদককে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। তাদের মধ্যে হয়তো অনেক সোর্স বা সূত্রের কথা প্রকাশিত/প্রচারিত প্রতিবেদনে থাকেই না কিংবা তাদের উদ্ধৃতি বা মন্তব্য দেয়া হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ওই অনুসন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ ধরনের মানবীয় সূত্রগুলো হতে পারে নিম্নরূপ:

পক্ষপাতমূলক সূত্র (Partisan Source)

এরাও পেশাজীবী তবে অনুসন্ধানের বিষয়টির সাথে তারা সংশ্লিষ্ট কিংবা ওই বিষয়টির সঙ্গে তাদের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। যেমন রাজনীতিবিদ, এনজিও, শ্রমিক ইউনিয়ন ইত্যাদি। এমনও হতে পারে এসব সোর্স বা সূত্র একই বিষয়ে গবেষণা বা অনুসন্ধান করছেন। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির সময় অনেক ক্ষেত্রেই স্বল্পতম সময়ে প্রতিবেদককে নতুন নতুন সূত্র তৈরি করতে হয় এবং তাদের ব্যবহার করতে হয়। এরকম পরিস্থিতিতে সবচেয়ে সহজ উপায়টি

---

[১৪৮] Derek Forbes (2005), A watchdog's guide to investigative reporting: A simple introduction to principles and practice in investigative reporting, Konrad Adenauer Stiftung Media Programme, Johannesburg, Republic of South Africa, p. 27.

[১৪৯] Chris Frost (2010), Reporting for Journalists, 2nd edition, Routledge, New York, p. 98.

[১৫০] Reuters Foundation (2006), Reuters Foundation Reporters handbook, p. 29.

হলো অনুসন্ধানের বিষয় বা ঘটনার সঙ্গে যাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে তাদের কাজে লাগানো। তবে এজন্য প্রতিবেদককে ঠিকভাবে বুঝতে হবে কিংবা অনুধাবন করতে হবে কার/কাদের সঙ্গে এ ধরনের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। একটা স্বাভাবিক ধারণা এরকম যে, সাধারণত ক্ষতিগ্রস্ত, পরাজিত কিংবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ তার প্রতিপক্ষের ক্ষতি করতে চান। এসব ক্ষতিগ্রস্ত, পরাজিত কিংবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে সূত্রকে এমন ধারণা দেয়া কখনই ঠিক হবে না যে, প্রতিবেদক তার প্রতিপক্ষের ক্ষতি করতে নেমেছেন। কারণ শুধু ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে কথা বলার জন্য প্রতিবেদক প্রতিবেদনটি তৈরি করছেন না। এজন্য সূত্রকে নিরীক্ষা করে তার বক্তব্য ও তথ্য যাচাই-বাছাই করে তুলে ধরতে হবে। নিম্নোক্ত ধরনের পক্ষপাতমূলক সূত্রগুলো থেকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

ক. সরকারি মুখপাত্র

আধুনিক সাংবাদিকতায় এমন কোন প্রতিবেদক বা রিপোর্টার পাওয়া যাবে না যিনি জুতা সেলাই থেকে চণ্ডিপাঠ অর্থাৎ সব বিট কাভার করেন। প্রত্যেক প্রতিবেদকেরই দু'একটি নির্দিষ্ট বিট থাকে। এ বিট বা বিটগুলোতে প্রতিনিয়ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সব রিপোর্টারই কিছু না কিছু কর্মকর্তা কিংবা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বরত ব্যক্তির সাথে কথা বলেন। এসব ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের বা অফিসিয়াল ভাষ্যটাই তুলে ধরেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, শুধু অফিসিয়াল সোর্সের ওপর নির্ভর করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা যায় না। এতে প্রতিবেদনে একপক্ষের ভাষ্য উঠে আসবে, যা দিয়ে কখনই একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব নয়। একটা ঘটনা বা বিষয়ের বিভিন্ন দিক থাকে। একজন ভাল প্রতিবেদকের দায়িত্ব ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবগুলো দিক তুলে আনা। এজন্য তার দরকার হয় মূখ্য তথ্যদাতা; যে/যারা সরাসরি ওই ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিংবা ওই ঘটনা বা বিষয়ের কারণে ভুক্তভোগী।

এদেরকে বলা হয় কর্তৃপক্ষীয় সূত্র। সরকার বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গুণগানই এরা গণমাধ্যমে দেখতে চায়। কর্তৃপক্ষীয় সূত্রগুলো ঘটনার ব্যাপারে তাদের ভাষ্য গণমাধ্যমে প্রচার/প্রকাশের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকেন। বর্তমানে বিশ্বে প্রায় সব দেশের সরকারই গণমাধ্যমের ব্যাপারে সচেতন থাকে। সরকারের জন্য বিব্রতকর এমন যে কোন খবরকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে সব সরকারের পক্ষ থেকে একটা চেষ্টা থাকে। এ কারণে সরকারগুলোকে এখন বলা হয় '*Masters of Spin*' (মোড় ঘোরানোর ওস্তাদ) বা '*Spin Doctor*'। একই কথা বর্তমান সময়ে বিভিন্ন কর্পোরেট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, রাজনীতিবিদ ও বড় বড় তারকাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সে কারণে বর্তমান সময়ের সাংবাদিকদের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হলো অফিসিয়াল সোর্স/সূত্রগুলো যে সমস্ত তথ্য দিয়ে থাকেন সেগুলো থেকে মোড় ঘোরানো তথ্যগুলোকে আলাদা করা কিংবা চিহ্নিত করা। সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র যারা থাকেন তারা যদি সত্যি ও নির্ভুল তথ্য তুলে ধরেন তাহলে সাংবাদিকদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবে ঘটে এর ঠিক উল্টোটাই। তার আসল তথ্যটি গোপন করেন এবং মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে সাংবাদিকদের বিপদে ফেলেন। Sheila S. Coronel এদের সম্পর্কে বলেছেন, "*If these persons were genuinely willing to release information to the public and to answer questions regardless of the consequences for their employers, then investigative journalists would not have to work so hard. Unfortunately, the reverse is often true: the job of these people is often to conceal*

rather than reveal, and to mislead journalists rather than to guide them towards the truth."[১৫১] সে কারণে শুধু অফিসিয়াল সোর্সের ওপর নির্ভর করে প্রতিবেদন তৈরি করাকে Sheila S. Coronel আত্মহননের শামিল বলেছেন- "*While they cannot avoid interviewing official sources at some point in their reporting, reliance on such sources is lethal for investigative journalists.*"[১৫২] তাই একটি ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সোর্সের কাছে একজন প্রতিবেদককে যেতে হয়, তাদের সাক্ষাৎকার নিতে হয়। সাংবাদিকতার একটি সাধারণ নিয়ম হলো, 'তথ্য অবশ্যই নানা সূত্রের মাধ্যমে যাচাই করতে হবে'। এ নিয়মের ব্যত্যয় কখনই ঘটানো যাবে না। এ যাচাই-বাছাই যেমন নথিপত্রের মাধ্যমে করা যায়, তেমনি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও সম্ভব।

খ. অভ্যন্তরীণ লোকজন ও হুইসেল-ব্লোয়ার্স

এরাই সম্ভবত সবচেয়ে কার্যকরী সোর্স বা সূত্র। কারণ তারাই সবচেয়ে প্রকৃত তথ্যটি সাংবাদিককে দিতে পারেন। যে কোন প্রতিষ্ঠান, তা সে সরকারি কিংবা বেসরকারি হোক না কেন ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী কিংবা প্রতিষ্ঠানের যে কোন ব্যক্তি যিনি ঘটনা বা বিষয়টির সাথে নিজে জড়িত তিনিই সবচেয়ে ভাল ও নির্ভুল তথ্যটি দিতে পারবেন। পাশাপাশি তারা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সোর্সদের কথাও বলতে পারেন, সরবরাহ করতে পারেন পটভূমি ও প্রেক্ষিতমূলক তথ্য। অভ্যন্তরীণ লোকজন Insiders বা সোর্স হিসেবে খুবই মূল্যবান কারণ তারা যে কোন তথ্যের লিখিত রূপ ও পুরো প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত প্রতিবেদককে সরবরাহ করতে পারেন। অনেক প্রতিষ্ঠানে এমন লোক থাকে যারা স্বেচ্ছায় সাংবাদিকদের ওই প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও দুর্নীতির খবর দিয়ে থাকে। Manual for Arab Journalists on Freedom of Information and Investigative Journalism-এ বলা হয়েছে, "*Whistleblowers are of officials who, in good faith, release information about wrongdoing in the institution that they work for.*"[১৫৩]

Sheila S. Coronel বলেছেন, "*Whistle-blowers are well-placed insiders who, usually of their own volition, approach journalists or other investigators with information about a crime or other form of wrongdoing.*"[১৫৪] তিনি মনে করেন, এরা যেন সাংবাদিকদের জন্য স্বর্গ থেকে পাঠানো দূত কারণ তারা অনাহূত কিন্তু মূল্যবান তথ্য ও প্রমাণ সরবরাহ করেন। কিন্তু তাদের দেয়া তথ্যগুলো যাচাই করতে হয়, এসব সূত্রের উদ্দেশ্য ও তথ্যের সত্যনিষ্ঠতা যত্নের সাথে পরখ করে দেখতে হয়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ লোকজন যারা স্বেচ্ছায় সাংবাদিককে তথ্য ও নথিপত্র সরবরাহ করেছেন তাদের উদ্দেশ্য, তাদের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণ করতে হয়। কারণ অনেকেই তার প্রতিপক্ষের ওপর হিংসার বশবর্তী হয়ে এ ধরনের কাজ করতে পারেন। অনেক হুইসেল-ব্লোয়ার আছেন যারা সুনাম অর্জন ও জনগণের মনযোগ আকর্ষণের জন্য তথ্যটি সরবরাহ করে থাকেন।

---

[১৫১] Sheila S. Coronel (2009), Digging Deeper: A Guide for Investigative Journalists in the Balkans, Sarajevo, Balkan Investigative Reporting Network, p. 138.
[১৫২] Ibid, p. 139.
[১৫৩] Manual for Arab Journalists on Freedom of Information and Investigative Journalism (2007), Article 19, London, October, 2007, p. 12.
[১৫৪] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p. 140.

এক্ষেত্রে যেসব সোর্স শুধু জনস্বার্থে কিংবা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে তথ্য দিয়ে থাকেন সেসব হুইসেল-ব্লোয়ারদের নিরাপত্তা বা সুরক্ষা দিতে হবে। যদি তাদের পরিচয় উন্মোচন করলে বিপদে পড়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তাদের বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, অনেক হুইসেল-ব্লোয়ার থাকেন যারা নিজেরাই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। ভাগ-ভাটোয়ারা নিয়ে বচসা থেকেই হয়তো তিনি প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করতে প্রতিবেদককে তথ্য দিচ্ছেন। এসব ক্ষেত্রে আইনগত কোন জটিলতা আছে কিনা তা প্রতিবেদককে ভেবে দেখতে হবে কিংবা এক্ষেত্রে একজন আইনবিদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে পারেন। যে সমস্ত হুইসেল-ব্লোয়ার স্বেচ্ছায় নিজের নাম উন্মোচন করতে চান না তাদের পরিচয় গোপন রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবেদককে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। কারণ তারা পরিচয় গোপন রাখার স্বার্থে প্রতিবেদককে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করেছেন। এক্ষেত্রে তার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো অন্য কোন সোর্সের মাধ্যমে যাচাই করে নিতে হবে।

সরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানে এমন অনেকেই আছেন যারা সাংবাদিকদের তথ্য যুগিয়ে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের ভেতরকার অনিয়ম আর দুর্নীতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে এদের অনেকেই এ কাজটি করে থাকেন। অনেকেই আবার ক্ষমতার বলয় থেকে ছিটকে পড়ে তাদের সহকর্মী ও বসদের শায়েস্তা করে তথ্য সরবরাহ করে থাকেন। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ লোকজন ও হুইসেল-ব্লোয়ারদের বিশ্বাস অর্জন করতে হয় প্রতিবেদককে। সাংবাদিকদের অবশ্যই তার সোর্সকে দেয়া কথা রাখতে হবে। যদি সোর্সকে তার পরিচয় গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, তাহলে অবশ্যই যে কোন মূল্যে তাদের পরিচয় গোপন রাখতে হবে; এমনকি বন্ধু কিংবা সহকর্মীকেও তাদের পরিচয় বলা যাবে না। এসব সোর্সের পরিচয় শুধু প্রয়োজন সাপেক্ষে সম্পাদকের কাছে বলা যাবে। কারণ সম্পাদক এ ধরনের স্পর্শকাতর তথ্যের সূত্র যাচাইয়ের জন্য তা জানতে চাইতে পারেন। এদের পরিচয় গোপন রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবেদককে এতটাই সচেতন হতে হবে যে, শুধু অনুসন্ধানের সময় কিংবা প্রকাশিত প্রতিবেদনে তাদের পরিচয় গোপন রাখলেই হবে না; বরং অনুসন্ধান শেষ হয়ে গেলেও পরিচয় গোপন রাখতে হবে। যেমন ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীতে 'ডিপথ্রোট'-এর পরিচয় প্রতিবেদকদ্বয় গোপন রেখেছিলেন। সেজন্য নোট নেয়ার ক্ষেত্রে ও রেকর্ড রাখার ক্ষেত্রেও সচেতন থাকতে হবে। যদি কোন কারণে সাংবাদিকের রেকর্ড কেউ পরীক্ষা করে তাহলে কোনভাবেই যেন এসব অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি কিংবা হুইসেল-ব্লোয়ারের নাম ধরা না পড়ে। এসব নোট ও রেকর্ডে এমন কোন ক্লু রাখা যাবে না যাতে এসব সোর্সের পরিচয় ধরা পড়ে। এজন্য সাংবাদিককে কোড বা সংকেত ব্যবহার করতে হবে কিংবা কম্পিউটারে তথ্য রাখলে পাসওয়ার্ড দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। Sheila S. Coronel বলেছেন, "*Anonymity agreements should be respected even long after the investigations are finished.*"[১৫৫]

গ. বর্তমান সহকারী/সহকর্মী

যখন কোন ব্যক্তির দুর্নীতি কিংবা অনিয়ম তদন্ত করা হয় তখন তার সহকর্মী কিংবা সহকারীরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারেন। কারণ তাদের সাথে ঘটনার মূল ক্রীড়ানকের সম্পর্ক থাকে। তবে এ ধরনের সোর্স থেকে তথ্য পেতে হলে প্রতিবেদককে অনেক বেশি কৌশলী হতে হয়।

---

[১৫৫] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p. 141.

কারণ বেশিরভাগ সময়ে নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে তারা তথ্য দিতে চান না। তবে অফিসের যেসব সহকর্মী অবসরের অপেক্ষায় আছেন তারা অনেক সময় নির্বিঘ্নে তথ্য দেয়। ব্যাঙ্কক পোস্ট পত্রিকার সাবেক প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক বলেছেন, "*পুরনো লোক যারা আর জীবনে এগোনোর জন্য লড়ছে না বরং তারা অবসর নেবার অপেক্ষায় তৃপ্তই আছে তারা আপনার জন্যে ভালো সংবাদসূত্র। ওরা আপনাকে বিভিন্ন লোক, নীতি ও ঘটনা সম্পর্কে প্রচুর পটভূমি বা নেপথ্য সংবাদ দিতে পারে। এই লোকগুলো যেহেতু আর উচ্চাভিলাষী নয়, সেজন্য এদের কাছ থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যাবে তার নেপথ্যে তাদের নিজের কোনো মতলব যতদূর সম্ভব না থাকারই কথা।*"[১৫৬]

ঘ. 'সাবেক'-কর্মকর্তা-কর্মচারী/স্ত্রী/আত্মীয়

যখন সাংবাদিকের পক্ষে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় কাজ করে এমন কারো কাছ থেকে তথ্য পাওয়া কঠিন হয়, কিংবা তারা তথ্য দিতে ভয় পান বা গড়িমসি করেন; সেক্ষেত্রে সাংবাদিককে অন্য উপায় বের করতে হয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল হলো ওই প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় কাজ করতেন এমন কোন সাবেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে খুঁজে বের করা। সাবেক এইসব কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রায়ই তথ্যের ভাল উৎস হন। কারণ তারা ওই প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচিত এবং তারা সচ্ছন্দে কথা বলতে পারেন। কারণ তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। এমনকি বর্তমানে প্রতিবেদক যে বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করছেন হুবহু সে বিষয়ে তাদের জ্ঞান না থাকলেও প্রতিবেদককে তারা সাহায্য করতে পারেন। প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরন, আগে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতি এসব বিষয়ে পটভূমিমূলক তথ্য ও আভাস তারা সাংবাদিকদের দিতে পারেন। যখন কোন প্রতিবেদক একজন ব্যক্তি বিশেষের দুর্নীতি তদন্ত করবেন তখন ওই ব্যক্তির কোন সাবেক সহকারী কিংবা সাবেক সহকর্মী বা সাবেক স্ত্রী খুব কার্যকরভাবে প্রতিবেদককে সাহায্য করতে পারবেন। ওই ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের অনেক অজানা তথ্য তিনি প্রতিবেদককে দিতে পারবেন।

ঙ. বন্ধু ও শত্রু

প্রতিবেদক যখন কোন ব্যক্তির ভাল-মন্দ নিয়ে অনুসন্ধান করবেন তখন ওই ব্যক্তির বন্ধু ও শত্রুরা তথ্যের ভাল উৎস হতে পারে। এক্ষেত্রে বন্ধুরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভাল দিকগুলো আর শত্রুরা খারাপ দিকগুলো তুলে ধরেন। শুধু যে ব্যক্তি বিশেষের ভাল-মন্দ তদন্তের ক্ষেত্রে বন্ধু ও শত্রু তথ্যের ভাল উৎস হবে তা শুধু নয়; প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন ধরুন, দুর্নীতি দমনের সাথে জড়িত সংস্থাগুলো সরকারের বিভিন্ন তদন্ত সংস্থার ভাল বন্ধু হলেও দুর্নীতিবাজদের শত্রু। কোন পরিবেশবাদী সংসদ সদস্য পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর বন্ধু কিন্তু শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর শত্রু হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

চ. রাজনীতিবিদ

রাজনীতিবিদ, সংসদ সদস্য এবং রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থে অনেক অপ্রকাশিত দলিল-দস্তাবেজ সাংবাদিকদের দিয়ে থাকেন।

মানবীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সূত্র

যারা ওই ঘটনা বা বিষয়ের দ্বারা সরাসরি ভুক্তভোগী তারাই এ ধরনের সূত্র বা সোর্স। তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ওই ঘটনার পরিধি ও প্রকৃতি বোঝাতে ব্যবহার করা যায়।

[১৫৬] আফতাব হোসেন (অনুবাদ), এশিয়ান রিপোর্টার: প্রতিবেদন কৌশল স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদনা গেরি গিল, বাংলা একাডেমী, পৃ- ২১৪।

ক. ভুক্তভোগী ও বঞ্চিত

সরকারি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি বা অনিয়মের অভিযোগ তদন্তের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী বা বঞ্চিতদের খুঁজে বের করার সোজাসাপ্টা পথটি হলো সরকারের নীতি বা সিদ্ধান্তের কারণে কিংবা সরকারি চুক্তির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা। ধরুন কোন প্রতিবেদক সরকারি কোন টেন্ডার ও চুক্তি প্রক্রিয়ার অনিয়ম নিয়ে তদন্ত করছে। সেক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের অনিয়মের কারণে অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এমন দরপত্র জমাদানকারী প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের কাউকে খুঁজে বের করতে হবে। তারা চুক্তি সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সরকারি কর্মকর্তাদের কোন গোপন সম্পর্ক আছে কিনা কিংবা কোন লেনদেন হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে তথ্য দিতে পারবে। তাছাড়া টেন্ডার প্রক্রিয়া কিভাবে আহ্বান করা হয়েছিল, দরপত্র জমা দেয়ার পর তা আইনানুযায়ী বাছাই করা হয়েছিল কিনা সেসব প্রক্রিয়া সম্পর্কে তারা ধারণা দিতে পারবে। এ ছাড়া অন্যায়ভাবে অযোগ্য বিবেচিত হওয়া প্রতিষ্ঠানের আইনজীবীরা হয়তো মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন- তা থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া সম্ভব। তবে এসব পরাজিত পক্ষ কিংবা ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে তথ্য নেয়ার সময় তা সরল চোখে গ্রহণ না করে একটু বাঁকা চোখে যাচাই-বাছাই করতে হবে।

সরকারি তহবিলে বা অর্থায়নে যেসব কাজ হয়, সেসব কাজের অনিয়ম বা দুর্নীতির তদন্তের ক্ষেত্রে ওই কাজের বা প্রকল্পের ফল ভোগকারী জনগণের সাথেও প্রতিবেদক কথা বলতে পারেন। কারণ ওইসব জনগণ প্রকল্পটির অনিয়ম বা দুর্নীতির কারণে কী দশা হয়েছে বা তারা তাদের দুর্ভোগের কথা বলতে পারবেন। পাশাপাশি তারা ঠিকাদারের পরিচয় জানেন এবং ঠিকাদারের সাথে সরকারি কর্মকর্তাদের যোগসাজশের বিষয়টিও তুলে ধরতে পারবেন।

যদি সাংবাদিক কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান নিয়ে অনুসন্ধান করেন তাহলে সেক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠানের শ্রম অসন্তোষের ক্ষেত্রে বহিষ্কৃত কর্মকর্তা-কর্মচারী; ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদন বিষয়ে ভোক্তা; অন্যায়ভাবে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে সরবরাহকারী ভুক্তভোগী হিসেবে সাংবাদিকের সোর্সের ভূমিকা পালন করতে পারে।

খ. অপরাধী/দুর্নীতিবাজ

কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপরাধী বা দুর্নীতিবাজরাও তথ্য দিতে পারে। নানা কারণে তারা এমনটি করতে পারে। অনেক সময় দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি চলতে থাকলে অনেকেই তাতে বিরক্ত হয়ে যান এবং একপর্যায়ে নিজে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেও দুর্নীতির কথা সাংবাদিকদের জানিয়ে দেন। তবে এসব ক্ষেত্রে তারা চান যেন তাদের নাম প্রকাশ করা না হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে যারা ঘুষ দেন তারা ঠিকমত ফল না পেয়ে সে সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। আবার অনেক সময় অনেকে অনুশোচনা থেকেও এ ধরনের কাজ করতে পারেন। অনেকে আবার নিজেদের কাজের যৌক্তিকতা তুলে ধরতেও এমনটি করে থাকেন। ১৯৯৯ সালে সার্বিয়ান সেনাবাহিনী কর্তৃক কুস্কার আলবেনিয়ান গ্রামে ৪১ জন নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিককে হত্যার বিষয়ে মার্কিন সাংবাদিক মিশেল মন্টগোমেরি এবং স্টিফেন স্মিথ প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন। এই প্রতিবেদনে তারা ওই গণহত্যায় বেঁচে যাওয়া নাগরিক এবং এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। এ প্রতিবেদনে হত্যাকারীরা শিকার করেছে কীভাবে তারা নারী-পুরুষ-শিশুদের হত্যা করেছে ও তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে।[১৫৭] এসব দুর্নীতিবাজ বা অপরাধীদের বক্তব্য ধারণ করা উচিত যদিও তাদের পরিচয় উন্মোচন করা উচিত নয়।

[১৫৭] The report, Massacre at Cuska, was aired by National Public Radio in the USA in February 2000 and is available in http://americanradioworks.publicradio.org/features/kosovo/massacre.htm.

গ. প্রত্যক্ষদর্শী

সাংবাদিকতায় বহুল ব্যবহৃত একটি সোর্স বা সূত্র হলো প্রত্যক্ষদর্শী। সাধারণত কোন অপরাধের ঘটনা, কোন দুর্যোগ, কিংবা ঘুষ দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য গ্রহণ করা হয়। যে কোন ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শী বা যিনি ঘটনাটি সরাসরি দেখেছেন বা সাক্ষী ছিলেন তিনি সেই ঘটনা বা বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনের জন্য বড় সোর্স হিসেবে কাজ করে। সাংবাদিকদের জন্য এমন সোর্সই সবচেয়ে ভাল তথ্য দিতে পারে। কারণ তিনি ফার্স্ট-হ্যান্ড তথ্যই দিতে পারেন। ধরুন, কোন প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনে সরকারি কোন বৈঠকের কথা উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে যিনি ওই বৈঠকে ছিলেন তার বক্তব্যই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে যিনি ওই বৈঠকের কথা অন্যজনের কাছ থেকে শুনেছেন এমন কারো চেয়ে। অনেক সময় সাংবাদিকরা সেকেন্ড ও থার্ড হ্যান্ড তথ্য পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে এসব সেকেন্ড ও থার্ডহ্যান্ড সোর্সের কাছ থেকে ফার্স্ট হ্যান্ড সোর্সের নাম জেনে নেয়া উচিত এবং প্রাপ্ত তথ্যগুলো অবশ্যই ফার্স্টহ্যান্ড সোর্সের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে নেয়া উচিত। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, সেকেন্ড-হ্যান্ড তথ্য কখনও কোন অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মূল ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হতে পারে, যা প্রতিবেদককে আরো বেশি অনুসন্ধানের পথ বাতলে দিবে কিংবা ফার্স্ট-হ্যান্ড তথ্য কার কাছে পাওয়া যাবে সে বিষয়ে সাহায্য করবে। কারণ সেকেন্ড-হ্যান্ড তথ্য মানেই হলো ওই ব্যক্তি আরেকজনের কাছ থেকে যা শুনেছেন তাই বলছেন। প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে কিছু বলার আগে অবশ্যই তিনি সত্যিকার অর্থে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন কিনা সেটা যাচাই করে নিতে হবে।

ঘ. তথ্য সংরক্ষক/নিয়ন্ত্রক (গেটকিপার)

গেটকিপার হন সাধারণত কর্মচারী, প্রশাসক কিংবা সচিব। এদের কাছে মূলত সরকারি তথ্যগুলো কিংবা তথ্যের ফাইলপত্র সংরক্ষিত থাকে। ব্যাংক রেকর্ড, মেডিকেল রিপোর্ট, আয়কর হিসাব, কোম্পানি নথিপত্র ইত্যাদি মূল্যবান প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত নথিপত্রগুলো এদের কাছে গচ্ছিত থাকে। বিশেষ করে অপ্রকাশিত নথিপত্র কিংবা নন-পাবলিক ডকুমেন্টের ক্ষেত্রে এদের সাহায্য খুব জরুরি ও প্রয়োজনীয়। এমনকি আপনার কাছে বিশেষ দরকারী ও কৌতূহলোদ্দীপক রেকর্ড ও দলিল কোথায় পাওয়া যেতে পারে তার খোঁজও সংগঠনের এসব মধ্য ও নিম্নস্তরের লোকেরা দিতে পারে। অনেক সময় আবার তথ্য কোথায় পাওয়া যেতে পারে তা বলতে না পারলেও কে বলতে পারে সে কথা জানাতে পারে। এজন্য এ ধরনের কর্মচারী, প্রশাসক কিংবা সচিবদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলা জরুরি।

ঙ. এনজিও

বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন ধরনের বেসরকারি সংগঠন বা এনজিও কাজ করে। এরাও গুরুত্বপূর্ণ সোর্স হতে পারে। এনজিও থেকে শুধু পটভূমিমূলক তথ্য পাওয়া যায় না; বরং এর পাশাপাশি ভুক্তভোগী এবং প্রত্যক্ষদর্শীর মতো অনেক মানবীয় সূত্রেরও সন্ধান মেলে। কারণ এনজিওগুলো মাঠপর্যায়ে কাজ করে বলে তারা বিভিন্ন ইস্যুতে স্থানীয় জনগণের সাথে সাংবাদিকদের মেলবন্ধন ঘটাতে পারে। বিশেষ করে মানবাধিকার লঙ্ঘন, নারী ও শিশু নির্যাতন, পাচার, শিশু শ্রম ইত্যাদি ইস্যুতে সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ সোর্সের সন্ধান দিতে পারে এনজিওগুলো। আবার অনেক এনজিও'র নিজস্ব ডাটাবেজ থাকে, থাকে নিজস্ব গবেষণা দল। এর মাধ্যমেও সাংবাদিকরা প্রচুর তথ্য পেতে পারেন। আবার দুর্নীতি প্রতিরোধে অনেক

এনজিও কাজ করে যাদের নিজস্ব অনুসন্ধানী সেল থাকে। এদের কাছ থেকেও সাংবাদিক তথ্য পেতে পারেন।

বিশেষজ্ঞ সূত্র (Expert Source)

এরা হন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক। এরা ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত নন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত দেয়ার মতো এদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকে। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজীবী কিংবা অন্য কোন পেশাজীবী। যে কোন অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। অনুসন্ধানের মাধ্যমে যেসব তথ্য পাওয়া যায় প্রতিবেদকের পক্ষে তার সবটা বোঝা বা অনুধাবন করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই এসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেয়াই উচিত। শুধু তাই নয়, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনার সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনেক নতুন নতুন দিক সম্পর্কে প্রতিবেদক ধারণা পেতে পারেন।

ঘটনা বা বিষয়ের প্রেক্ষিত ও গুরুত্ব তুলে ধরতে এ ধরনের সোর্সের মন্তব্য বা মতামত খুব দরকার। এরা সাধারণত নিরপেক্ষ হন। যেমন ধরুন, কোন দুর্নীতির বিষয়ে আইনজীবী, হিসাবরক্ষক ও হিসাব নিরীক্ষকের সঙ্গে প্রতিবেদক কথা বলতে পারেন। আইনজীবীরা প্রতিবেদককে অনুসন্ধানের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আইনগত দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন, কোথায় আইনের ব্যত্যয় ঘটেছে এবং কীভাবে তাতে আইনের লঙ্ঘন হয়েছে তা তুলে ধরতে পারবেন। আবার যেসব আইনজীবী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন পক্ষের হয়ে আদালতে লড়ছেন তারা নথিপত্র ও পটভূমিমূলক তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন।

হিসাবরক্ষক ও নিরীক্ষকগণ আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অডিট রিপোর্ট ও পরিসংখ্যানগত বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারেন। আর্থিক বিষয়ের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞমূলক মন্তব্যের জন্য এ ধরনের সোর্সের দরকার হয়। এছাড়া সরকারি বাজেট ও ক্রয়সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ সাবেক সরকারি অডিটর কিংবা কোন ব্যবসায়িক উপদেষ্টাও পটভূমিমূলক তথ্যের জন্য সহায়ক সূত্র হিসেবে কাজে লাগতে পারে। বিশেষজ্ঞ সোর্সদের মধ্যে কর বিশেষজ্ঞও দুর্নীতি সংক্রান্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সোর্স হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানী বিষয়ে অভিজ্ঞ একাডেমিশিয়ান এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিশেষজ্ঞ সোর্স হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক ও প্রধান নিয়মটি হলো, যখনই প্রতিবেদক কোন বিষয় অনুসন্ধানের জন্য নির্বাচন করবেন তখন সে বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ সন্ধান করবেন যিনি তাকে ওই বিষয়ে সাহায্য করতে পারবেন। তবে বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলার আগে অবশ্যই প্রাথমিক গবেষণার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এতে প্রতিবেদকের পক্ষে বিশেষজ্ঞকে প্রশ্ন করা যেমন সহজ হয় তেমনি আলোচনাও ফলপ্রসু হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কোন বিশেষজ্ঞ যদি এমন কোন মত দেন যা প্রতিবেদকের অনুমিতির বিপক্ষে যায় তাহলে কোনভাবেই সে মতকে পাল্টিয়ে লেখা যাবে না। এক্ষেত্রে ভাল পন্থা হলো, একাধিক বিশেষজ্ঞের মতামত নেয়া। এতে মতামতের বৈচিত্র্য আসে। তবে সব বিশেষজ্ঞের মতকে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে যাতে দর্শক ও পাঠক সহজে তা বুঝতে পারেন। Investigative Journalism Manuals-G বলা হয়েছে, "*Including the diversity of opinions in your story shows you have an open mind, and may prompt other experts with different views to come forward.*"[১৫৮]

[১৫৮] Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals, Chapter four: Sources and spin doctors, http://www.investigative-journalism-africa.info/

সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা পরিমাপ

একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য অবশ্যই কিছু না কিছু মানবীয় সূত্র/উৎস দরকার। কিন্তু এই মানবীয় সূত্রের কিছু অসুবিধাও আছে। সব সোর্স বা উৎস সমান নয়। সব উৎস যে সমান নির্ভরযোগ্য হবে এমন ধারণা পোষণ করা বোকামি। সেজন্য মানবীয় সূত্রের ওপর পুরোপুরি নিজেকে সপে দিলে সেটা হয় নির্বুদ্ধিতা। মানবীয় সূত্র মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে প্রতিবেদককে বিপদে ফেলতে পারেন। শত্রুপক্ষকে শায়েস্তা করতে গিয়ে প্রতিবেদককে ব্যবহার করতে পারেন। একজন প্রতিবেদক যে ধরনের বা যে রকমের উৎস বা সোর্স খুঁজে পান না কেন তাকে সেই সোর্সকে গুরুত্বের সাথে ও যত্নসহকারে যাচাই-বাছাই করতে হবে। এক ধরনের সন্দিগ্ধ মন নিয়ে বিচার করতে হবে। সোর্সের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করে দেখতে হবে। বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ সূত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরতে Bell বলেছেন, "*News is what an authoritative source tells a journalist.*"[১৫৯]

শুধু মিথ্যা তথ্য নয়; চাপ, ভীতি, লোভ, প্ররোচনা ও স্মৃতিভ্রমজনিত কারণেও মানবীয় সূত্র বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। যে কোন মানবীয় সূত্র যে কোন সময় তার দেয়া বক্তব্য বদলে ফেলতে পারে। সেজন্য মনে রাখতে হবে যে কোন মানবীয় সূত্রই সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। সোর্স যতই পুরানো কিংবা পরিচিত হোক না কেন অনুসন্ধানের সময় প্রতিবেদককে মনে রাখতে হবে তিনি একটি স্পর্শকাতর ও গোপনীয় বিষয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। এক্ষেত্রে যে কেউ তাকে বিপদে ফেলতে পারে। কারণ সোর্স/সূত্র জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভুল বলতে পারেন কিংবা ভুল তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করতে পারেন। সোর্স/সূত্র পক্ষপাতমূলক হতে পারেন। কিংবা সোর্স তার নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্য কারো বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেন। ১৯৬৮ সালে পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিবেদক George Biss তাঁর সংবাদের সোর্সগুলো সম্পর্কে বলেছেন, "*What I found over there were a few honest people and a lot of crooks, and I used them all. I can go to one trustee, I have something on him, and he'll blow the whistle on the other trustee to get me off his back....*"[১৬০] এরকম পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রতিবেদকের একটিই হাতিয়ার- সতর্কতা। প্রতিবেদককে প্রত্যেকটি সূত্র পরখ করে দেখতে হবে, যাচাই করে নিতে হবে। একজন সোর্স বা সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা পরিমাপের জন্য একজন প্রতিবেদককে অবশ্যই সে সোর্স বা সূত্রের ট্র্যাক রেকর্ড যাচাই করে দেখতে হবে। অর্থাৎ অতীতে তিনি কী ধরনের সঠিক তথ্য সরবরাহ করেছেন তা ঘেঁটে দেখতে হবে। তিনি যেসব প্রত্যক্ষদর্শী ও অন্যান্য সোর্সের নাম বলেছেন তাদের মাধ্যমেও সোর্সের দেয়া তথ্যগুলো যাচাই করে দেখতে হবে। সূত্রের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য Herbert J. Gans তাঁর 'Deciding What's News' শীর্ষক নিবন্ধে নিম্নোক্ত ছয়টি বিষয় যাচাইয়ের সুপারিশ করেছেন।[১৬১] সেগুলো হলো:

১. অতীত উপযোগিতা

কোন সূত্রের দেয়া তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাইয়ের প্রথম শর্ত এটি। প্রতিবেদক যে সূত্র বা উৎস থেকে নতুন স্পর্শকাতর তথ্যটি পেলেন সে সূত্র বা উৎস কি নিকট অতীতেও এমন নির্ভরযোগ্য তথ্য দিয়েছেন, যেটি ছিল নির্ভুল ও নিখাদ।

---

[১৫৯] Ibid, Allen Bell (1991), p. 191-192.
[১৬০] Ibid, Paul N. Williams (1978), p. 65.
[১৬১] Howard Tumber (edited) (1999), News: A Reader, Oxford University Press, New York, p. 245-246.

২. সক্ষমতা

সূত্রকে তাদের তথ্য সরবরাহের সক্ষমতা দিয়ে যাচাই করতে হয়। যে ধরনের তথ্য বা নথিপত্র তিনি সরবরাহ করছেন তা দেয়ার আদৌ ক্ষমতা তার আছে কিনা সেটি প্রতিবেদককে খতিয়ে দেখতে হয়। তার কাছে এমন তথ্য কী করে আসলো সেটিও বিবেচনায় নিতে হয়।

৩. নির্ভরযোগ্যতা

একজন অনির্ভরযোগ্য সূত্র প্রতিবেদকের সাংবাদিকতার গ্রহনযোগ্যতা নিমিষেই ধ্বংস করে দিতে পারে। এজন্য সূত্র বা উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য আদৌ নির্ভরযোগ্য কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। কোনভাবেই নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিলে সে তথ্য ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ উৎস যা বলেছেন তার পুরোটাই সত্যি কিনা তা খতিয়ে দেখতে হয়। Herbert J. Gans বলেছেন, "*When reporters can explicitly attribute information to a source, they do not have to worry about reliablity (and validity), the assumption being that once a story is `sourced', their responsibilty is fulfilled, and audiences must decide whether the source is credible.*"[১৬২]

৪. বিশ্বাসযোগ্যতা

প্রতিবেদকে সূত্রের সততা পরিমাপ করতে হয়। উৎস কোন নির্দিষ্ট এজেন্ডা তুলে ধরছেন কীনা বা এমন কোন এজেন্ডামূলক তথ্য তুলে ধরছেন যাতে প্রতিবেদকের সংবাদকে কলুষিত করতে পারে এসব বিষয় যাচাই করতে হয়।

৫. দখলদারিত্ব

সূত্র যেসব নথিপত্র কিংবা তথ্যউপাত্ত প্রতিবেদককে সরবরাহ করেছেন তার আসল মালিক কে বা কারা; এসব নথিপত্রের রচয়িতা কে বা কারা; এসব তথ্য সংগঠন ও সংরক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কে বা কারা; কীভাবে এসব নথিপত্র ওই সূত্র বা উৎসের কাছে এলো কীভাবে ইত্যাদি বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে হয়। Leon V. Sigal বলেছেন, "*All other things being equal, journalists prefer to resort to sources in official positions of authority and responsibility.*"[১৬৩]

৬. গ্রন্থি সংযোজন

প্রতিবেদককে সূত্র যেসব তথ্য দিয়েছেন তার উৎস ঠিকভাবে বলছেন কিনা তা দেখতে হবে। কারণ এসব উৎস সম্পর্কে ধারণা দিতে না পারলে সে সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। আবার এসব রেফারেন্স বাদে প্রতিবেদক তথ্যগুলো তার প্রতিবেদনে ব্যবহার করতে পারবেন না। আবার অনেক সময় সোর্সের ট্র্যাক রেকর্ডে মিথ্যা তথ্য দেয়ার অভিযোগ না থাকলেও শুধু স্মৃতি বিভ্রমের কারণে তিনি ভুল তথ্য দিতে পারেন। নিচে Joann Byrd রচিত Poynter Institute এর 'A Guide for Evaluating Sources' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে উৎসের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হলো:

---

[১৬২] Ibid, p. 246.

[১৬৩] Leon V. Sigal (1973), Reporters and Officials: The Organization and politics of Newsmaking, Lexington, Mass.: D. C. Heathe, p. 69-70.

১. সোর্সের অতীতের নির্ভরযোগ্যতার রেকর্ড কেমন?
২. সোর্স তার সমকক্ষদের প্রতি কেমন অবস্থান নেন?
৩. তাদের মতামত কেমন প্রতিনিধিত্বশীল?
৪. সংশ্লিষ্ট বিষয়টি কতটা মানুষ জানে?
৫. সোর্স কী ধরনের প্রমাণ দিচ্ছেন (ইমেইল, ভয়েসমেইল, নথিপত্র)?
৬. কীভাবে এসব তথ্য যাচাই করা যাবে?
৭. সোর্স যেসব তথ্য দিচ্ছেন সেসব তথ্য দেয়ার ক্ষমতা কি তার আদৌ আছে?
৮. ঘটনা/বিষয়ের সঙ্গে সোর্সের সংশ্লিষ্টতা কেমন?
৯. কীভাবে সোর্স এসব বিষয় জানেন?
১০. সোর্স কি নিজেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নাকি অন্য কারো কাছ থেকে শুনেছেন বা জেনেছেন?
১১. সোর্স ঘটনা/বিষয়টি সাংবাদিকের কাছে তুলে ধরতে কতটা আন্তরিক?
১২. সংবাদটি প্রচার/প্রকাশের পর তারা কি তা অস্বীকার করতে পারেন?
১৩. এক্ষেত্রে সোর্স কি আইনের আশ্রয় নিতে পারে?
১৪. যদি মানুষ এ তথ্যের উৎস জানে, তাহলে সে উৎসকে কি তারা বিশ্বাস করবে?
১৫. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই সোর্সই কি সর্বোত্তম কর্তৃপক্ষ?

একক সূত্র বর্জন

কোনভাবেই শুধু একজন সোর্স বা সূত্রের ওপর ভিত্তি করে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা যেতে পারে না। এটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সেজন্য যে কোন তথ্য কমপক্ষে দুটি সোর্স থেকে যাচাই-বাছাই করেই তা প্রকাশ/প্রচার করা উচিত। FJ Mansfield বলেছেন, "*The good reporter is able to ... find at least two good stories during a twopenny bus ride.*"[১৬৮]

তথ্য বিনিময়

অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও তদন্ত কমিশনের সঙ্গে চমৎকার সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিবেদক এমনভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এক্ষেত্রে তথ্য বিনিময় করে প্রতিবেদক নতুন নতুন তথ্য পেতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় প্রতিবেদককে খেয়াল রাখতে হবে, তিনি তথ্য বিনিময় করার সময় কোনভাবেই যেন সোর্স বা সূত্র উন্মোচন না করেন। সূত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা প্রতিবেদকের অন্যতম প্রধান একটি নৈতিক কর্তব্য। থেহ চোংখাদিকিজ এই ধরনের তথ্য বিনিময়ের ব্যাপারে চমৎকার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, "*কোনো কোনো সময়, সাংবাদিক ও সূত্রের মধ্যেকার সম্পর্ক বলতে কম বেশি একটি নিরবচ্ছিন্ন তথ্য বিনিময় প্রক্রিয়াকে বুঝিয়ে থাকে। খোদ সূত্রেরই সাংবাদিকের তরফ থেকে তথ্যের দরকার হতে পারে। কারণ সাংবাদিক তার অবস্থানগত মর্যাদার কারণে ঐসব তথ্য করায়ত্ত করার যোগ্যতা রাখেন। এ বিষয়ে তেমন কোন ধরা বাঁধা নিয়ম কানুন নেই। তবে সাংবাদিকেরা সাধারণত এই দুই তরফ লেনদেনের ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্য রক্ষা করেন। এতে বিপদ অবশ্যই রয়েছে। একদিন হঠাৎ তিনি হয়তো আবিষ্কার করতে পারেন যে, খোদ তিনি নিজেই তাঁর সূত্রের জন্য কার্যত একজন গুপ্তচর হয়ে গেছেন, আর এটি যদি জানাজানি হয়ে*

---

[১৬৮] Tony harcup (2005), Journalism: Principles and Practice, 2nd edition,Vistaar Publication, New Delhi, p. 47.

যায়, তিনি তাঁর সব বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবেন। অথবা এমনও হতে পারে, তার সূত্র সাংবাদিককে কোনো এক ধরনের কনসালট্যান্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এটি সাধারণত তখনই হয় যখন সূত্র তাঁর পদে অল্পদিনের জন্য এসেছেন। অথচ ঐ প্রতিবেদক বা সাংবাদিক সংশ্লিষ্ট বিষয় কাভার করছেন বহুকাল ধরে। এ পরিস্থিতি রীতিমত সাংবাদিক সাহেবকে তেল যোগানোর মত হতে পারে। তবে যে প্রতিবেদক এই ভূমিকার জুতোয় পা গলান তিনি নিরপেক্ষতা হারান। নিরাসক্ত পর্যবেক্ষক থাকেন না।"[১৬৫]

সূত্রের গোপনীয়তা রক্ষা

একজন সাধারণ প্রতিবেদকের চেয়ে একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে অনেক বেশি যত্নশীল হয়ে সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। কারণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে ভুলে গেলে চলবে না সঠিক মানবীয় সূত্র চিহ্নিত করার ওপরই শুধু অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সাফল্য নির্ভর করে না; বরং সেসব সূত্রের সঙ্গে একটি আস্থাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা এবং তার কাছ থেকে নির্ভুল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা ও মোক্ষম প্রশ্নের মোক্ষম উত্তর বের করে আনতে হয়। সূত্রের সঙ্গে সাংবাদিকের সম্পর্কের তুলনা করতে গিয়ে Herbert J. Gans তাঁর 'Deciding What's News' শীর্ষক নিবন্ধে নাচের সাথে তুলনা করেছেন। দুইজন ব্যক্তির নাচে যেমন দুজনেরই লক্ষ্য থাকে সঙ্গীতের সঙ্গে তাল মেলানো তেমনি সূত্র ও সাংবাদিকের লক্ষ্য থাকে ঘটনার সঙ্গে তাল মেলানো-"*The relationship between sources and journalists resembles a dance, for sources seek access to journalists, and journalists seek access to sources. Although it takes two to tango, either sources or journalists can lead, but more than often than not, sources do the leading.*"[১৬৬]।

এমনিতেই রিপোর্টারদের সাথে তাদের নির্দিষ্ট বিটের কিছু সোর্সের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ থাকে। কিন্তু অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের বিষয়টি অনেক বেশি স্পর্শকাতর হওয়ায় এর জন্য অনেক নতুন নতুন সোর্স/উৎস দরকার হতে পারে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তাতে গল্পচ্ছলে সূত্রের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। এসব অনুষ্ঠানে নতুন নতুন সূত্রের সাথে পরিচয় হওয়ার পর তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা। আবার অনেক সময় সোর্সের পরিচিতজনের মাধ্যমেও এক ধরনের যোগসূত্র ঘটতে পারে। যেভাবেই হোক না কেন একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিককে সূত্র বা সোর্সের চাষ করতে হয়। এ চাষের ফলন কতটা ভাল হবে তা নির্ভর করে ওই সাংবাদিক সূত্রের কতটা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছেন তার ওপর। তবে সংবাদসূত্রের লালন ও রক্ষণাবেক্ষনের কোন নির্ধারিত নিয়মকানুন নেই। নিতান্তই মানবীয় সম্পর্কের পরিবেশে প্রতিবেদককে সংবাদসূত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও পেশাদারি যোগাযোগ এবং সম্পর্ক গড়ে তোলার সর্বোত্তম প্রয়াস চালাতে হয়। থেহ চোংখাদিকিজ বলেছেন, "*সূত্র হতে পারে এমন ব্যক্তিদের কাছে মর্যাদা অর্জন করতে হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি আপনি সম্ভবত করতে পারেন তা হচ্ছে ওদের চোখে আপনাকে সৎ, বস্তুনিরপেক্ষ, বিশ্বস্ত ও ন্যায়বান হতে হবে।*"[১৬৭]

---

[১৬৫] প্রাগুক্ত, আফতাব হোসেন (অনুবাদ), পৃ- ২২০।
[১৬৬] Ibid, Howard Tumber (edited) (1999), p. 239.
[১৬৭] প্রাগুক্ত, আফতাব হোসেন (অনুবাদ), পৃ- ২১৯।

‘লাদেনের সহযোগীরা বাংলাদেশে কাজ করেছে’

২০০৪ সালে ইরাকে মার্কিন হামলার আগের ঘটনা। তখন আমি দৈনিক প্রথম আলোতে কাজ করি। হঠাৎ করে একজন সোর্স থেকে একটি কাগজ পেলাম। ওই সোর্স আগে থেকেই জানতেন আমি জঙ্গিবাদ ও বোমা হামলা এগুলো নিয়ে দুই বছর ধরে কাজ করছি। কাগজটিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি নির্দেশ, যেখানে বলা ছিল এনাম আরনাউট নামে ওসামা বিন লাদেনের একজন ঘনিষ্ট সহযোগীর ব্যাংক একাউন্ট বাংলাদেশে আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছিল গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কোনো তদন্ত ছাড়াই প্রতিবেদন দিয়ে দেয় এই ধরনের কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্ট বাংলাদেশে নেই। কিন্তু একই ধরনের নির্দেশ অর্থমন্ত্রণালয়ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে পাঠায়। সেখান থেকে আমি ইন্দোস্যুজ ব্যাংকে এনাম আরনাউট এবং আরও তিন ব্যক্তির একটি যৌথ ব্যাংক একাউন্ট বাংলাদেশে আছে বলে জানতে পারি। এমনকি তাদের পাসপোর্ট নম্বর, কোথায় থাকে, কতদিন ধরে থাকে সবই জানতে পারি। কিন্তু সে ঠিকানায় যাব কীভাবে? তারা যেখানে থাকতেন উত্তরার সেই বাড়িটির আশপাশে দু’একদিন ঘুরেও আসলাম। কিন্তু উপায় পেলাম না। শেষে পুলিশের একটি গোয়েন্দা শাখার তৎকালীন ঢাকা সিটি প্রধানের শরণাপন্ন হলাম। দুই সপ্তাহের আলোচনায় তিনি বিষয়টি নতুন করে তদন্ত করার জন্য (যদিও সংস্থাটি আগে রিপোর্ট দিয়েছিল ওই নামে কোন ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্ট ও অস্তিত্ত্ব দেশে নেই) রাজি হোন। পরবর্তীতে তিনি ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন, সেই বাড়ি থেকে উদ্ধার করা এনাম আরনাউট আর লাদেনের ছবি আমাকে দিয়েছিলেন যেটি প্রথম আলোতে রিপোর্টের সঙ্গে ছাপা হয়েছিল। আমাকেও ওই বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার প্রাপ্ত তথ্যগুলোর সত্যতা যাচাই বা ক্রসচেকের জন্য পর্যবেক্ষন/সরেজমিনে তদন্ত করতে গিয়ে ওই পুলিশ কর্মকর্তার সাহায্য ছাড়া যুৎসই কোন বিকল্প তখন আমার কাছে ছিল না। কিন্তু তিনি যৌথভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে দুটি শর্ত দিয়েছিলেন, ১. প্রতিবেদনটি ছাপা হওয়ার আগে তাকে জানাতে হবে; ২. প্রতিবেদনে কখনই তার পুনঃতদন্তের কথা লেখা যাবে না কিংবা তার নাম ব্যবহার করা যাবে না। তার দুটি শর্তই আমি রেখেছিলাম। পরবর্তীতে তিনি আরো বেশ কিছু বিষয়ে আমাকে সাহায্য করেছিলেন।

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অনুসন্ধানের সময় অনেক সূত্র অফ-দ্য-রেকর্ড অনেক কিছু বলতে পারেন। তবে অফ-দ্য-রেকর্ড বলতে সূত্র কী বোঝাচ্ছেন তা পরিষ্কার হতে হবে। এ বইয়ের অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকার অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অফ-দ্য-রেকর্ড যে কোন তথ্যই প্রতিবেদকের ধর্তব্যের মধ্যে নেয়া উচিত। কারণ এতে তিনি নতুন কোন ধারণা পেতে পারেন। এক্ষেত্রে তথ্যটি নতুন কোন সূত্রের বা নথিপত্রের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রকাশ/প্রচার করা যেতে পারে। কিন্তু কোনভাবেই কোন সূত্রের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন করা যাবে না। বিশেষ করে, একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে মনে রাখতে হবে তিনি একটি স্পর্শকাতর ও গোপনীয় বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করছেন। তাকে যারা তথ্য দিয়ে সাহায্য করছেন তাদের পরিচয় ফাঁস হয়ে পড়লে সেসব সূত্রের জন্য তা বিপদের কারণ হতে পারে। এক্ষেত্রে চরম একটি বিপদের আশঙ্কা হলো, একজন সূত্রের পরিচয় ফাঁস হয়ে পড়লে পর্যায়ক্রমে প্রায় সব সূত্রেরই পরিচয় ফাঁস হয়ে যেতে পারে। অনুসন্ধানী সাংবাদিক Jack Tobin এজন্য সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "*If you deal with people [sources] in public places or in public positions, you have to keep their identity absolutely consecrated. Because once you burn [that source] you will burn every other guy in his line of communications, and pretty soon you cannot get to first base.*"[১৬৮] Paul N. Williams -এর পরামর্শ হলো সোর্সের জামাটিতে যেন কোনভাবে দাগ না লাগে সে ব্যবস্থা করা; অর্থাৎ তাকে নিষ্কণ্টক রাখা- "*A source is someone who secretly helps you be an investigative reporter. And keeps his (or her) skirts clean.*"[১৬৯]

সূত্র বা সোর্সের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সূত্রের সঙ্গে পরিচয় থেকেই সচেতন থাকতে হবে। কোনভাবেই তার সাথে এমন কোন স্থানে সাক্ষাৎ করা যাবে না যাতে কেউ দেখলে সন্দেহ করতে পারে। নোট নেয়ার সময় এসব সূত্রের নাম লেখা যাবে না কিংবা কম্পিউটার বা অন্য কোথাও তাদের নাম সংরক্ষণ করা উচিত নয়। কারণ কোন কারণে প্রতিবেদনটি প্রচার/প্রকাশের পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনি অভিযান চালালে এসব নাম তাদের হাতে চলে যেতে পারে। আবার ইদানিংকালে ইমেইল ও টেলিফোন হ্যাক হয়; সে কারণে এসব গোপনীয় সূত্রের সঙ্গে ইমেইল ও টেলিফোনে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর আলাপ করা উচিত নয়।

সোর্সের গোপনীয়তা রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় প্রতিবেদককে কারাবরণও করতে হয়। ২০০৫ সালে নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক জুডিথ মিলারকে আদালত ৮৫ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছিলেন তার প্রতিবেদনে ব্যবহৃত সোর্সের নাম প্রকাশ না করায়। পরে সোর্স মিলারকে তার নাম প্রকাশের অনুমতি দিলে আদালতের কাছে তা জানিয়ে জেল থেকে ছাড়া পান। সাংবাদিক মিলার তখন আদালতকে তাঁর নীতির কথা তুলে ধরেছেন এভাবে, "I *do not make confidential pledges lightly, but when I do, I keep them.*"[১৭০]।

[১৬৮] Ibid, Paul N. Williams (1978), p. 64.
[১৬৯] Ibid.
[১৭০] Ibid, Carole Rich (2010), p. 90.

তথ্যসূত্র

Allen Bell (1991), The Language of News Media, Oxford: Blackwell.
Carole Rich (2010), Writing and Reporting News: A Coaching Method, Sixth edition, Wardsworth, USA.
Chris Frost (2010), Reporting for Journalists, 2nd edition, Routledge, New York.
Derek Forbes (2005), A watchdog's guide to investigative reporting: A simple introduction to principles and practice in investigative reporting, Konrad Adenauer Stiftung Media Programme, Johannesburg, Republic of South Africa.
Ericson, R. (1999), How journalists visualize fact., The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 560(1).
Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals,
http://www.investigative-journalism-africa.info/
Howard Tumber (edited) (1999), News: A Reader, Oxford University Press, New York.
Leon V. Sigal (1973), Reporters and Officials: The Organization and politics of Newsmaking, Lexington, Mass.: D. C. Heathe.
Manual for Arab Journalists on Freedom of Information and Investigative Journalism (2007), Article 19, London, October, 2007.
Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists.
Paul N. Williams (1978), Investigative Reporting and Editing, PRENTICE-HALL, INC., Englewood Cliffs, New Jersey.
Reuters Foundation (2006), Reuters Foundation Reporters handbook.
Richard Keeble (2006), The Newspapers Handbook, Fourth edition, Routledge New York.
Sheila S. Coronel (2009), Digging Deeper: A Guide for Investigative Journalists in the Balkans, Sarajevo, Balkan Investigative Reporting Network.
Sigal, L., Who? Sources make the news, In R. Manoff & M. Schudson (Eds.), Reading the news., New York: Pantheon Books.
Tony harcup (2005), Journalism: Principles and Practice, 2nd edition,Vistaar Publication, New Delhi
আফতাব হোসেন (অনুবাদ), এশিয়ান রিপোর্টার: প্রতিবেদন কৌশল স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদনা গেরি গিল, বাংলা একাডেমী।
আলী রিয়াজ (১৯৯৪), অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হ্যান্ডবুক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি), ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৪।

অধ্যায়
১০

অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকার

এ অধ্যায়ে থাকছে

- সাক্ষাৎকার
- সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য
- সাদামাটা ও অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের সাক্ষাৎকারের পার্থক্য
- অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের দশ ধাপ
- সাক্ষাৎকারের ৯টি 'আর'
- অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের ছয় বিপত্তি

গিডিওন রুফারো (Gideon Rufaro), আফ্রিকার একটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের অনুসন্ধানী দলে সদ্য যোগ দিয়েছেন। তার ম্যাগাজিন পত্রিকাটি দেশটির সরকারের গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির তদন্ত করছিল। গাড়ি বিক্রেতার বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযোগ তারা পেয়েছিল। কোন ধরনের টেন্ডার ছাড়া তারা চুক্তি করেছে এবং খুবই বেশি দামে গাড়ি সরবরাহ করছে। গিডিওনের ওপর দায়িত্ব বর্তায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার নেয়া। গিডিওনের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ ছিল, যেগুলো বিভিন্ন সূত্র থেকে তিনি পেয়েছেন এবং যথেষ্ট সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ আছে কীভাবে অতিরিক্ত বা বেশি দামে গাড়ি কেনা হয়েছিল। সাক্ষাৎকারটি নিম্নোক্তভাবে তিনি নিয়েছিলেন[১৭১]:

গিডিওন: জনাব মন্ত্রী, সুপ্রভাত, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সম্মত হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যমকে বলেছেন যে, সরকারি যান সরবরাহের জন্য সিডর মটরের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে 'অনভিপ্রেত কিছুই' হয়নি। কিন্তু আমাদের সোর্স বলছে যে, সিডরের দেয়া দাম অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও আপনি সিডরকে চুক্তির জন্য বিবেচনা করেছেন। আপনি কি দয়া করে এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানাবেন?

মন্ত্রী: এসব সোর্স কারা? একজনের নাম বলুন!

গিডিওন: আপনি জানেন, আমরা আমাদের সোর্সের পরিচয় উন্মোচন করি না। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, আপনার অফিসের জন্য যে লিমুজিন গাড়ি কিনেছেন সিডর মটর থেকে তার দাম বাজারে ৩০% কম........

মন্ত্রী: যদি আপনি বলতে চান যে, আমি মিথ্যে বলছি, তাহলে তা নিয়ে এ সাক্ষাৎকারে কোন আলোচনা হবে না। আপনি জানেন, সরকারি গাড়ির অতিরিক্ত কিছু বিষয় থাকে, যেমন- নিরাপত্তার বিষয়টি দেখতে হয়। যাহোক, আপনার পত্রিকা কি করে, আমার মতো পদমর্যাদার একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য আপনার মতো কম বয়সের একজনকে পাঠালো?

গিডিওন: সত্যি, মাননীয় মন্ত্রী! আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি আমি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় মাস্টার্স পাস করেছি।

---

১৭১ Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals, Chapter five: Invetigative Interviewing, http://www.investigative-journalism-africa.info/

মন্ত্রী: আহ! আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের একজন চাকর! আপনি যে আমাকে ফাঁদে ফেলবেন এতে আমি বিস্মিত হচ্ছি না।

গিডিওন: আমরা যদি আমাদের বিষয়ে ফিরে যাই .... সরকার কি এ অভিযোগের বিষয় খতিয়ে দেখছে? সরকারের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কমপক্ষে তিনটি দরদাতা থাকা দরকার বা বিবেচনা করতে হয়। সেক্ষেত্রে আপনি কীভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন যেখানে কোন টেন্ডারই আহ্বান করা হয়নি?

মন্ত্রী: আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে চাই যে, আমরা কোন ধরনের আজগুবি গুজবে বিচলিত নই। সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রত্যেকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

গিডিওন: তাহলে কে ....

মন্ত্রী: আমার বক্তব্যে বাধা দেবেন না। আপনার মতো ছোট্ট হায়নার কাছ থেকে আমি সর্বনিম্ন মৌলিক ভদ্রতা প্রত্যাশা করি।

গিডিওন: মন্ত্রী সাহেব, আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট ভদ্র নন..........

মন্ত্রী: আপনার সাহস কত! যা হোক আপনার অবশ্যই জানা উচিত যে, আমাদের সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ধারিত সময় পাঁচ মিনিট এবং সে সময় পার হয়ে গেছে। এরকম অথর্ব বিষয়ে নষ্ট করার মতো মূল্যবান সময় আমার নেই। (রিং বাজলো)। আমার সেক্রেটারি আপনাকে পথ দেখিয়ে দেবেন।

গিডিওন: কিন্তু মন্ত্রী সাহেব .... !

গিডিওন এই সাক্ষাৎকার থেকে খুব বেশি তথ্য পেলেন না এবং তিনি জানেন যে, তার সম্পাদক এতে সন্তুষ্ট হবেন না। এখানে কি তিনি এমন কিছু করতে পারতেন যা দিয়ে আরো ভালভাবে সাক্ষাৎকারটি নেয়া যেতো?

আমরা এই অধ্যায়ের শেষে এই সাক্ষাৎকারের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

সাক্ষাৎকার

অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের তথ্য আহরণের কৌশলটা অনেকটা পেঁয়াজের মতো, যেখানে একটি কেন্দ্র ও ক্ষুদ্রতম চক্র থাকে; আর এ চক্রকে আবর্তে একটি বহিঃস্থ চক্র বা আউটার রিং থাকে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে উপাত্ত হলো সেই কেন্দ্র আর সাক্ষাৎকার হলো সেই মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে সমৃদ্ধ করে, গড়ে তোলা একের পর এক বহিঃস্থ চক্র।[১৭২] কাউন্সেলিং মনোবিজ্ঞানী কাল রজার্স ও তাঁর সহযোগী এফ. জে. রোয়েথলিসবার্গার তাঁদের 'Barriers and Gatewyas to Communication' নিবন্ধে মানবীয় যোগাযোগ সফল করার জন্য দু'টি তত্ত্বের কথা বলেছেন।[১৭৩] প্রথম তত্ত্বটি হলো: প্রথম পক্ষ যদি দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে এ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে যে, প্রথম পক্ষ যা বলছে তা সত্যি; তাহলেই যোগাযোগ সফল হয়। দ্বিতীয় তত্ত্বটি হলো: প্রথম পক্ষ যা বলছে তা সত্য হিসেবে মানুক আর না মানুক; দ্বিতীয় পক্ষ যা ভাবছে তা যদি প্রথম পক্ষের কাছে উপস্থাপনের সুযোগ পায় তবেই যোগাযোগ সফল হয়। এ দ্বিতীয় তত্ত্বটির উপর ভিত্তি করেই সাংবাদিকতায় সাক্ষাৎকার নেয়া হয়।

[১৭২] Itule Bruce and Anderson Douglas (2008), News Writing and Reporting for Today's Media, McGraw Hill, New York U.S.A.

[১৭৩] Carl R, Rogers, and F. J. Roethlisberger (1952), "Barriers and Gateways to Communication.", Harvard Business Review, July-Aug, 1952, p-46.

প্রতিবেদনের বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য কিংবা চিন্তাভাবনা এখানে জরুরি; কোনভাবেই প্রতিবেদকের ভাবনা বা চিন্তা নয়। সে কারণে অন্য যে কোন ধরনের যোগাযোগের মতোই সাক্ষাৎকার একটি দ্বিমুখী যোগাযোগ। এটি সাংবাদিকতার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একে সাংবাদিকতার মেরুদণ্ড বলা হয়, "*Interviewing is the bedrock of journalism.*"[১৭৪] এস এম আলী বলেছেন, "সাক্ষাৎকারগ্রহণের কলাকৌশল আগেরকালের ভদ্রতা ও নম্রতা সহকারে কাউকে কোনো কিছুতে রাজি করানোর কৌশলের মতোই অনেকটা।"[১৭৫] বর্তমান যুগে সাংবাদিকতায় সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনীয়তার কথা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন Sally Adams I Wynford Hicks। তারা বলেছেন, "*Reporting is incomplete without interviews: readers want to know how bystanders, eye-witnesses, participants reacted to what happened, what they thought and felt about it.*"[১৭৬]

যে কোন ধরনের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার একটি বড় হাতিয়ার এ সাক্ষাৎকার। অগণিত অজ্ঞাত পাঠক-দর্শক-শ্রোতার পক্ষ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কথোপকথন বা আলাপচারিতায় হলো সাক্ষাৎকার। বলা হয়, "*The interview is a conversation designed to elicit (or exchange) information onbehalf of an unseen audience.*"[১৭৭]

সংবাদ সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে আজকের গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা মূলতঃ মার্কিন গণমাধ্যমের উদ্ভাবন। বর্তমানে আমেরিকায় সাংবাদিকরা ৭৫-৮০ ভাগ তথ্য সংগ্রহ করেন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে।[১৭৮] মার্কিন সংবাদপত্রের ইতিহাস সোয়া তিনশ' বছরের হলেও গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকারের ব্যবহার খুব বেশি দিনের নয়। তবে ঠিক কখন থেকে গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকারের ব্যবহার শুরু হয় তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। একদল ঐতিহাসিক বলেন, নিউইয়র্ক হেরাল্ডে জেমস গর্ডন ব্যান্নেট ১৮৩৬ সালে প্রথম সাক্ষাৎকারকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। অন্য একদল ঐতিহাসিকের মতে, ১৮৫৯ সালে নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে হোরেস গ্রিলি সাক্ষাৎকার ব্যবহার করেন। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক মনে করেন, গ্রিলি সাক্ষাৎকারভিত্তিক সংবাদকে একটি ভিন্নমাত্রা দিয়েছেন অথবা তিনিই প্রথম সাক্ষাৎকারভিত্তিক সংবাদকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি ১৮৫৯ সালে উতাহের সল্ট লেক সিটিতে মর্মন দলের নেতা ব্রিংহাম ইংয়ের ভিয়েতনামের বিষয়ে সাক্ষাৎকার নেন। দু'ঘন্টাব্যাপী এই সাক্ষাৎকারের পর তিনি প্রশ্ন-উত্তর ধারায় তার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেন। তখন থেকে সংবাদে সাক্ষাৎকার একটি ভিন্নমাত্রার রূপ পায়। সিন্ডার ও মরিস বলছেন, "*Greely probably didn't write the first interview story, but he was first to do it well and establish it as a journalistic practice.*"[১৭৯] সাক্ষাৎকারের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক যাই থাকুক, ১৮৬০ এর দশকে যে গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকারের ব্যবহার শুরু

---

[১৭৪] Hugh C. Sherwood (1969), The Journalistic Interview, First Edition, Haroer & Row Publishers, New York, p. 110.
[১৭৫] আফতাব হোসেন (অনুবাদ), এশিয়ান রিপোর্টার: প্রতিবেদন কৌশল স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদনা গেরি গিল, বাংলা একাডেমী, পৃ- ১৮১।
[১৭৬] Sally Adams & Wynford Hicks (2009), Interviewing for Journalists, Second edition, Routledge New York, P-8.
[১৭৭] Ken Metzler (1999), Creative Interviewing: The Writer's Guide to Gathering Information By Asking Questions, 3rd ed., USA: Allyn & Bacon, p. 9.
[১৭৮] Ibid, p. 11.
[১৭৯] Louis L. Snyder and Richard B. Morris (1962), A Treasury of Great Reporting, 2nd edition, New York: Simon and Schuster, p. 106.

হয় তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই।[১৮০] গ্রিলির সময় থেকে সাক্ষাৎকারের ধরন অনেক উন্নত হয়েছে। সাংবাদিকতায় যেসব ধরনের সাক্ষাৎকার ব্যবহৃত হয় সেগুলো হলো:

ক. রুটিন বা সংবাদভিত্তিক সাক্ষাৎকার
খ. ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার
গ. সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকার

কী ধরনের সাক্ষাৎকার বা কার সাক্ষাৎকার নেয়া হবে তা সম্পূর্ণই সংবাদের ধরনের ওপর নির্ভরশীল। অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকার সংবাদভিত্তিক সাক্ষাৎকার বটে; তবে তা রুটিন সাক্ষাৎকার নয়। একটি সংবাদভিত্তিক সাক্ষাৎকারের জন্য তাদেরই সাক্ষাৎকার নেয়া হয় যারা বিষয়ের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পর্কিত। যেমন: ধরুন, একজন প্রতিবেদক সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে একটি সংবাদ তৈরি করবেন। এক্ষেত্রে তিনি বিশেষজ্ঞ হিসেবে একজন প্রকৌশলীর সাক্ষাৎকার নিতে পারেন। পাশাপাশি তাকে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরও সাক্ষাৎকার নিতে হবে। হয়ত তিনি এ বিষয়ে তেমন কিছুই জানেন না, তারপরও যেহেতু তার অধীনস্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে তাই এ বিষয়ে তার সাক্ষাৎকার নেওয়া জরুরি।

সাক্ষাৎকার এমন একটি দক্ষতা ও যোগ্যতা যা অবশ্যই একজন প্রতিবেদককে অর্জন করতে হয়। একজন পেশাদার প্রতিবেদক সাক্ষাৎকারের দক্ষতা অর্জন ও উন্নয়নে তার পুরো ক্যারিয়ার ধরেই চেষ্টা চালিয়ে যান। একজন ভালো প্রতিবেদক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন ভালো সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীও বটে। Philadelphia Inquirer-এর দুই Jim Steele I Barlett অনুসন্ধানী সাংবাদিক বলেছেন, "*The purpose of investigative reporter's interview is to get information and not to try to impress people with how brilliant they are.*"[১৮১] 'Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalist'-এ বলা হয়েছে, "*The best interview tectics reflect the interviewer's personality, so take that into account as you develop your own repertoire.*"[১৮২]

সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য

একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে গেলে অনেকজনের সাক্ষাৎকার নিতে হয়। এখানে বিষয় সংশ্লিষ্ট মূল বা প্রধান ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের কথাই বলা হচ্ছে। অর্থাৎ তিনি ঘটনার মূল নায়ক। একে ইংরেজিতে Key interview/Target interview বলা হয়। যে কোন অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। এটি এমন একজন বা একাধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার যিনি বা যারা আপনার অনুসন্ধানের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করছেন বা এর সঙ্গে সরাসরি জড়িত, আপনার প্রতিবেদনের মাধ্যমে যার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জনগণের সামনে তুলে ধরবেন। একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেন, তাহলে এটিই তার শেষ সাক্ষাৎকার। বাস্তবিক অর্থে এটি একটি সাংঘর্ষিক বা হোস্টাইল সাক্ষাৎকার। সাধারণত দুটি উদ্দেশ্যে এ প্রধান বা মূল সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

[১৮০] Ibid, Ken Metzler (1999), p. 11.
[১৮১] Paul, N. William (1978), Investigative Reporting and Editing, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J., p. 62.
[১৮২] Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists, p. 43.

১. উদ্দিষ্ট মন্তব্য জানা বা অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের সংগৃহীত তথ্য এবং ইতোমধ্যে অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ধারণার সত্যতা প্রমাণ করা;

২. অতিরিক্ত তথ্য জানা।

সাদামাটা ও অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের সাক্ষাৎকারের পার্থক্য

অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের কাজই হল গোপন করতে চায় এমন তথ্য বের করে আনা। স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের সাক্ষাৎকার সাদামাটা প্রতিবেদনের সাক্ষাৎকারের চেয়ে ভিন্ন হয়। যেমনঃ ধরুন, মহাসড়কে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। একজন প্রতিবেদক এ ঘটনায় হাইওয়ে পুলিশের সাক্ষাৎকার নিলেন। তিনি পুলিশ কর্মকর্তাকে একে একে জিজ্ঞেস করলেন: কী ঘটেছিল? (পুলিশ কর্মকর্তা বিস্তারিত বললেন), কারা হতাহত হয়েছেন?, কখন ঘটেছে? কোথায় ঘটেছে? কেন ও কীভাবে ঘটেছে। গতানুগতিক সংবাদ কাঠামোর দিক থেকে বিবেচনা করলে এক্ষেত্রে প্রতিবেদকের কোন ভুল নেই। তিনি কে, কি, কখন, কোথায়, কেন ও কীভাবে --- এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তর বের করে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক হয়ত আরো প্রশ্ন করতে পারেন; যেমন; এ ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়েছে কিনা? পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে কী পেয়েছে? চালক মাদকাসক্ত ছিল কিনা? অথবা গাড়িতে অন্য কোন ত্রুটি ছিল কিনা? অথবা অন্য কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি পুলিশ খুঁজে পেয়েছে কিনা? ধরুন, শেষ প্রশ্নের উত্তরে পুলিশ বলল, একটি তরুণ পাশ্ববর্তী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে গাড়িতে থাকা একটি শিশুকে উদ্ধার করেছে। এমন তথ্য হয়ত ওই প্রতিবেদকের সংবাদের ধরনকেই বদলে দিবে।

এ কারণে অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারকে বলা হয় সৃষ্টিশীল সাক্ষাৎকার (Creative Interview)| শুরুতে সাক্ষাৎকারের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছিল এভাবে, অগণিত অজ্ঞাত পাঠক-দর্শক-শ্রোতার পক্ষ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কথোপকথন বা আলাপচারিতাই হলো সাক্ষাৎকার (*Journalistic Interview is a conversation between two parties to gather information on behalf of an unseen audience.)*। কিন্তু অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকার হলো আসলে অগণিত অজ্ঞাত পাঠক-দর্শক-শ্রোতার পক্ষ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কথোপকথন বা আলাপচারিতা যার মাধ্যমে এমন কিছু তথ্য বের করে আনে যা অংশগ্রহণকারীর পক্ষে একা বের করে আনা সম্ভব নয় *(Investigative Journalistic Interview is a two-person conversational excahnge of information on behalf of an unseen audience to produce a level of enlightenment neither participant could produce alone.)*।[১৮৩] অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনীয়তার কথা Bell তুলে ধরেছেন এভাবে, "*However, to get all the information a journalist needs to make a story interesting and give it depth and/or colour, there is no better way than interviewing someone who knows about the subject and asking them questions.*"[১৮৪]

পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, প্রশ্ন করার ধরনের দিক থেকে সব ধরনের সাক্ষাৎকারে কিছু কিছু কৌশল প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু একটি অনুসন্ধানী প্রকল্প আপনার কাছ থেকে অধিকতর দক্ষতা এবং ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাশা করে। এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা দেখেছি এই বিশেষ দক্ষতার অভাবে গিডিওন মন্ত্রীর কাছ থেকে সাক্ষাৎকারে প্রত্যাশিত তথ্য বের করে আনতে পারেনি।

[১৮৩] Ibid, Ken Metzler (1999), p. 12.

[১৮৪] Allen, Bell (1991), The Language of News Media, Oxford: Blackwell, p. 57.

সময়, প্রেক্ষিত ও কৌশলের দিক থেকে সাদামাটা এবং অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের দশ ধাপ

'মন্ত্রী সাহেব, আপনি কতদিন ধরে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত?'
এমন প্রশ্ন একবার একজন শিক্ষানবিশ প্রতিবেদক একজন মন্ত্রীকে করেছিলেন। মন্ত্রীর উত্তর ছিল এ রকম, 'আপনি যদি আমার সম্বন্ধে এই তথ্যটিই না জানেন, তবে কেন আমার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছেন?'

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রতিবেদকের সর্বোচ্চ দক্ষতা ও সুনির্দিষ্ট কিছু গুণাবলী অত্যাবশ্যকীয়। চীনা একটি প্রবাদ আছে, "*He who ask is a fool for five minutes. He who does not is a fool forever.*" সে কারণে একজন সাংবাদিক যত অভিজ্ঞ হন তিনি সাক্ষাৎকারে তত দক্ষ হয়ে উঠেন। তবে তার মানে এটা নয় যে, শুধু দক্ষ সাংবাদিকরাই ভাল সাক্ষাৎকার নেন। এর জন্য কিছু কৌশল রপ্ত করতে হয়। এ কৌশলগুলো অনুসরণ করলে প্রতিবেদকের দক্ষতা বাড়ে। আসলে যে কোন ধরনের সাক্ষাৎকার দক্ষতা বাড়ে অনুশীলন আর চর্চার মাধ্যমে। অনেকে হয়ত উত্তরাধিকার ভিত্তিতে ভাল প্রশ্ন করার ক্ষমতা রাখতে পারেন। তাদের ক্ষেত্রেও এ ক্ষমতাকে শানিয়ে নেয়ার জন্য দরকার চর্চা আর অনুশীলন। খুব চমৎকারভাবে বিষয়টি তুলে ধরতে গিয়ে Hugh C. Sherwood বলেছেন, "*To a considerable degree, interviewers are made, not born. And practice does make perfect.*"[১৮৫]

যে কোন ধরনের সাক্ষাৎকার প্রতিবেদকের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় প্রতিবেদকের বুদ্ধিদীপ্ত সহজাত কাণ্ডজ্ঞান পরীক্ষায় পড়ে। এস এম আলী বলেছেন, "সাক্ষাৎকারের একটি লক্ষ্য; যার সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে তার কাছ থেকে প্রতিবেদক যা জানতে চায় তা আদায় করা। তবে কার্যত দেখা যায় সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সবসময়েই গ্রহণকারীর প্রত্যাশা মতো কথা বলছেন না। প্রতিবেদক কতগুলো মূল নিয়ম মেনে চললে তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়ার লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন। এই নিয়মগুলো নিখুঁত, নিটোল করে তুলেছেন বহু ঝানু সাংবাদিক। এগুলোর অনুশীলন করতে হবে নিরন্তর।"[১৮৬]

অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকার মূলত মুখোমুখি সাক্ষাৎকার (Face-to-Face Interview)। এর জন্য ব্যাপক প্রস্তুতির দরকার হয়। সাদামাটা কিংবা ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকারের চেয়ে এ প্রস্তুতির ব্যাপকতা অনেক বেশি হয়। এক্ষেত্রে একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের একটি ছক অনুসরণ করতে হয়, উতরাতে হয় বেশ কিছু ধাপ। অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারে সফল হওয়ার জন্য একজন প্রতিবেদককে দশটি ধাপ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। এর মধ্যে চারটি ধাপ সাক্ষাৎকার-পূর্ব অর্থাৎ সাক্ষাৎকারদাতার কাছে পৌঁছানোর আগেই এগুলো অনুসরণ করতে হয়। পরবর্তী ছয়টি ধাপে প্রতিবেদক কতটা সফল হবেন তার অনেকখানি নির্ভর করে প্রথম চারটি ধাপের ওপর।

এই দশটি[১৮৭] ধাপ হলো:

১. সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য নিরূপণ (Defining the purpose of the interview)

২. পটভূমি গবেষণা পরিচালনা (Conducting Background Research)

[১৮৫] Ibid, Hugh C. Sherwood (1969), p. 106.

[১৮৬] প্রাগুক্ত, আফতাব হোসেন (অনুবাদ), পৃ- ১৮১-১৮২।

[১৮৭] Ibid, Ken Metzler (1979), p. 135.

৩. সাক্ষাৎকারের সময় ধার্যের অনুরোধ (Requesting an Interview Appointment)
৪. সাক্ষাৎকারের ছক তৈরি করা (Planning the interview)
৫. সাক্ষাৎকারদাতার সাথে মিলিত হওয়া: শীতল সম্পর্ক ভেঙে দেয়া (Meeting your Respondent: Breaking the Ice)
৬. প্রথম প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া (Asking your first Questions)
৭. সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা (Establishing an Easy Rapport)
৮. 'বোম্ব' প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা: স্পর্শকাতর বা বিব্রতকর প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া (Ask Bomb Questions: potentially sensitive or embrassing questions)
৯. স্পর্শকাতর থেকে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ফিরে আসা (Recovering from the Bomb)
১০. সাক্ষাৎকারের ইতি টানা (Concluding the Interview)

১. সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য নিরূপণ

অনুসন্ধানের বিষয়টি প্রতিবেদকের আগে থেকেই জানা থাকে। এমনটাই ধরে নেয়া স্বাভাবিক। অর্থাৎ ইতোমধ্যে তিনি এ বিষয়ে প্রাথমিক গবেষণা ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। এক্ষেত্রে প্রতিবেদককে অবশ্যই এ বিষয়ে যতখানি সম্ভব অনুশীলন সেরে নিতে হয়। কবহ Metzler মনে করেন, যে কোনো সাক্ষাৎকারের শুরুতে দু'টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন একজন প্রতিবেদকের নিজেকেই করতে হয়।[১৮৮] এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দু'টি হলো:

এক. কী তথ্য দরকার?
দুই. তথ্যটি কে সবচেয়ে ভালভাবে দিতে পারবে?

এই দুটো প্রশ্ন সম্পর্কে প্রতিবেদককে সাক্ষাৎকারের আগে পরিষ্কার হতে হবে। প্রত্যেক সংবাদের সাথে মানুষ জড়িত। মানুষকে নিয়ে মানুষের জন্য সংবাদ তৈরি করেন একজন প্রতিবেদক। তিনি যে ধরনের সংবাদ খোঁজেন বা যে ধরনের সংবাদ নিয়ে গবেষণা করুন না কেন তার সাথে কোন একজন বা একাধিক ব্যক্তি জড়িত। এই এক বা একাধিক ব্যক্তিই আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যটি জানেন। একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, তাদের মন্তব্য প্রতিবেদকের সংবাদ গল্পের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের কাজ হলো সেই এক বা একাধিক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা এবং তাদের কাছে আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যটি জানতে চাওয়া। অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের প্রথম ধাপ এটি।

অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের প্রথম ধাপটিতে প্রতিবেদক কী তথ্য চান বা কী ধরনের তথ্য তার প্রয়োজন সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। অন্যথায় যার সাক্ষাৎকার লাভের চেষ্টা করা হবে তাকে প্রভাবান্বিত করা সম্ভব নাও হতে পারে। আবার সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ পেলেও ভাল সাক্ষাৎকার না হওয়ার আশঙ্কাই এক্ষেত্রে বেশি। Hugh C. Sherwood "*...If you don't know precisely what you want to ask, there is always the danger that you will run out of questions. This can be very embrarrassing indeed.*"[১৮৯]

একজন প্রতিবেদক যতটা স্পষ্টভাবে তার উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে পারবেন ততটাই সুষমভাবে তার সাক্ষাৎকার লাভের চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। মনে রাখতে হবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদক সাধারণত

[১৮৮] Ibid, p. 16.
[১৮৯] Ibid, Hugh C. Sherwood (1969), p. 106.

সেসব বিষয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন যেগুলো মানুষ স্বভাবতই গোপন রাখতে চায়। আবার অনেক সময় প্রতিবেদক বা সাংবাদিকের সাথে কথা বলতে মানুষ লজ্জা পায় কিংবা ভয় পায়। প্রতিবেদক যদি সংক্ষেপে ও সুনির্দিষ্টভাবে উদ্দেশ্য তুলে ধরতে পার তাহলে তাকে রাজি করানো অনেক সহজ হয়। শুধুই তাই নয়, সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় এর ফলে অনেক চমকপ্রদ তথ্য পাওয়াও সহজ হয়।

প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের পর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রথম ধাপটিতে সে তথ্যের উত্তম যোগানদাতা খুঁজে বের করাটা জরুরি। অর্থাৎ একজন প্রতিবেদককে তার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বা মন্তব্যের জন্য কার কাছে যেতে হবে সে বিষয়টি জানা না থাকলে একদিকে যেমন প্রতিবেদক বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন তেমনি অন্যদিকে এর ফলে সময় ও শ্রম দুটোই নষ্ট হতে পারে। যেমন: একজন অপরাধ বিষয়ক প্রতিবেদক একবার নারায়ণগঞ্জের অপরাধ বিষয়ক একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য মন্তব্য নিতে গিয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনারের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কেন ডিএমপি নারায়ণগঞ্জের সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করছেন না। স্বাভাবিকভাবেই ডিএমপি কমিশনার এটি তার এখতিয়ার বহির্ভূত বলে বিষয়টি এড়িয়ে যান।

একটি বিষয় মনে রাখা দরকার, একটি ভাল অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য প্রাসঙ্গিক অনেক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার দরকার হয়। এসব ব্যক্তির কাউকে খাটো করে দেখা যাবে না। কারণ অনেক সময় কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর তথ্য এবং উপাত্ত পাওয়া যেতে পারে। এ কাজটি অনেকটা কেঁচো কুঁড়তে সাপ বের করে আনার মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। তাই একটি ভাল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষাৎকারদাতার একটি তালিকা শুরুতেই তৈরি করা উচিত। তাদের পদমর্যাদার গুরুত্ব ও সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব নিরূপণ করে তালিকাটিতে ব্যক্তিবর্গের নাম পর্যায়ক্রমে সাজাতে হবে। এরপর একে একে তাদের ফোন নম্বর, ঠিকানা জোগাড় করে তাদের সাথে সাক্ষাতের সময়সূচি নির্ধারণ করতে হবে। ধরুন, একজন প্রতিবেদন এমন কিছু তথ্য ও উপাত্ত পেয়েছেন যার ভিত্তিতে তিনি জানতে পেরেছেন সড়ক ও জনপথ বিভাগের টেন্ডার প্রক্রিয়ার দুর্নীতির সঙ্গে খোদ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীই জড়িত। এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য যেসব ব্যক্তির সাক্ষাৎকার দরকার হতে পারে তারা হলেন:

১. টেন্ডার প্রক্রিয়ায় জড়িত সরকারি কর্মকর্তা, যেমন: প্রকল্প পরিচালক, সহকারী সচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা।
২. সড়ক ও জনপথ বিভাগের সচিব
৩. টেন্ডার জমাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্ণধার
৪. টেন্ডার লাভকারী প্রতিষ্ঠান
৫. টেন্ডার মূল্যায়ন সংক্রান্ত সরকারি কমিটি
৬. যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী

উপরের তালিকায় স্বাভাবিকভাবে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীই মূখ্য ব্যক্তি। যে কোন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য মূখ্য ব্যক্তির সাক্ষাৎকার সবার শেষে নেয়াই উত্তম ও বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ এ ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির একাধিক সাক্ষাৎকার পাওয়া দূরূহ। সেক্ষেত্রে মুখ্য ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের আগে প্রাসঙ্গিক ও দরকারী অন্যান্য ব্যক্তির সাক্ষাৎকার শেষ করতে হবে। এসব সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য এবং সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে মুখ্য ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

আবার ধরা যাক, কোন প্রতিবেদক কোন ডেভলপার কোম্পানীর জমি ব্যবসায় দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে চান। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য যেসব ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেয়া যেতে পারে তারা হলেন:

১. জমির পূর্ব মালিক
২. জমির ক্রেতাগণ
৩. সাক্ষীগণ
৪. জমি উন্নয়নের সঙ্গে নিয়োজিত শ্রমিক (মাটি ভরাট)
৫. জমি উন্নয়নের সঙ্গে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার (মাটি ভরাট)
৬. ভূমি অফিসের কর্মকর্তা
৭. থানা-পুলিশ ও আইনজীবী (যদি মামলা হয়)
৮. ডেভলপার কোম্পানীর ম্যানেজার
৯. ডেভলপার কোম্পানীর মালিক

এ প্রতিবেদনের জন্য ডেভলপার কোম্পানীর ম্যানেজার ও মালিকই মুখ্য ব্যক্তি। তার/তাদের কাছে যাওয়ার আগে অবশ্যই তালিকার ছয় ধরনের ব্যক্তির সাক্ষাৎকার সেরে ফেলা উচিত। অন্যথায় মুখ্য ব্যক্তির সাক্ষাৎকার আবারও দরকার হতে পারে। ধরুন, এক্ষেত্রে প্রতিবেদক ভূমি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নেয়ার আগে ডেভলপার কোম্পানীর মালিকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। কিন্তু ভূমি কর্মকর্তা তার সাক্ষাৎকারে প্রতিবেদককে জানায়, পরপর তিনবার চিঠি দিয়ে সতর্ক করা সত্ত্বেও ডেভলপার কোম্পানীটি সরকারি খাস জমি নিজেদের জমি বলে দাবি করে ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করেছে। এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ব্যাপারে আরেক দফায় ডেভলপার কোম্পানীর কর্ণধারের সাক্ষাৎকার আবার নাও পাওয়া যেতে পারে।

২. পটভূমি গবেষণা পরিচালনা

Paul N. Williams তাঁর Investigative Reporting and Editing গ্রন্থে বলেছেন, "*A good interview involves knowledge of the background of your topic -- obtain through base-building. A well prepared reporter has detailed knowledge of the elements of the story, accumulated through documents and notes of previous interviews.*"[১৯০]

অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের জন্য গবেষণা অত্যাবশ্যকীয়। এর কোন বিকল্প নেই। গবেষণার মাধ্যমে একজন প্রতিবেদক নিজেকে তার সংবাদ গল্পের প্রধান সাক্ষাৎকারটির জন্য তৈরি করতে হয়। অপ্রস্তুত অবস্থায় কোন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলে তাতে কোন ভাল ফল আসতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায়, স্বল্প সময়ে তৈরি করা কোন বিশেষ প্রতিবেদনের জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে গবেষণা করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। কিন্তু সিরিয়াস অনুসন্ধানী

[১৯০] Ibid, Paul N. Williams (1978), p. 62.

প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে একথা কোনভাবেই খাটে না। এর জন্য প্রয়োজন সময়সাপেক্ষ গবেষণা। কারণ এ পর্যায়ে একজন প্রতিবেদককে বেশ কিছু বিষয় জানতে হয়। ক্লডিয়া ডেরিফাস, যিনি একযুগেরও বেশি সময় ধরে নিউইয়র্ক টাইমসের জন্য সাক্ষাৎকার নিতেন; তিনি সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এভাবে, "*Whether or not the interview will succeed will very much depend on the chemistry between the subject and the interviewer. That, in turn, depends on the level of preparation. An actor needs to know his lines, understand the motivation of his and the other characters.*"[১৯১] তবে এ ধরনের গবেষণার কোন বাধা-ধরা নিয়ম নেই। প্রতিবেদনের প্রকৃতিই বলে দিবে কী ধরনের গবেষণা করতে হবে। এখানে গবেষণা বলতে দু'টো বিষয়কে বোঝানো হয়:

ক. সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ইতিহাস জানা

প্রতিবেদক যে বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে চান সে বিষয়ে অতীতে কী কী কাজ হয়েছে তা জানা আবশ্যক। এজন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্লিপিং, পত্রিকার কাটিং ইত্যাদি জোগাড় করতে হবে। এক্ষেত্রে ইন্টারনেট একটি বড় সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অতীত জানার একমাত্র উপায় গবেষণা। অনুসন্ধান প্রতিবেদনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো এ প্রতিবেদনে অবশ্যই নতুন কোন দিক উন্মোচিত হতে হবে। যে কোন সংবাদ গল্পের মুখ্য বিবেচ্য বিষয়ই হলো নতুনত্ব। অতীতে প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়েছে এমন কোন তথ্যই মানুষের কাছে সংবাদের গুরুত্ব বহন করতে পারে না। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নতুন তথ্য বের করে আনতে হলে অবশ্যই প্রতিবেদককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অতীত জানতে হবে। সে কারণে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে গবেষণার গুরুত্ব ক্যান মেজলার তুলে ধরেছেন এভাবে, "*Only by research – reviewing what's gone before – can you grasp what questions may lead you into the territory. New is the key word. With the background you might repeat the same questions you already asked a hundred times and end up presenting material already reported.*"[১৯২]

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অতীত ইতিহাস জানতে শুধু এ সম্পর্কিত প্রকাশিত প্রতিবেদন জোগাড় করাটাই সার কথা নয়, পাশাপাশি বিভিন্ন উপাত্ত, দলিল ও আইনি নথিপত্র সংগ্রহ করতে হবে। কারণ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে সাক্ষাৎকারদাতাকে প্রভাবিত করাটা কষ্টসাধ্য। প্রতিবেদককে নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হলে বিষয় সম্পর্কে দলিল-দস্তাবেজ, নথিপত্র যোগাড় করতে হবে। আর নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যতই সম্যক ধারণা থাকবে ততই সাক্ষাৎকারদাতাকে প্রভাবিত করা কিংবা সাক্ষাৎকার দিতে রাজি করানোর কাজটা সহজ হবে।

উদাহরণস্বরূপ, সড়ক ও জনপথ বিভাগের টেন্ডার প্রক্রিয়ার দুর্নীতির সঙ্গে খোদ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীই জড়িত-এমন প্রতিবেদন তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট যেসব তথ্য জানা দরকার সেগুলো হলো:

১. টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ে ইতিমধ্যে কোন সংবাদপত্র/টেলিভিশন/রেডিও'তে কোন সংবাদ প্রকাশিত/প্রচারিত হয়েছে কিনা?

---

[১৯১] Claudia Dreifus (1997), Interview, New York: Seven Stories.
[১৯২] Ibid, Ken Metzler (1999), p. 17.

২. টেন্ডার প্রক্রিয়া কোন সংবাদপত্র/টেলিভিশন/রেডিও'তে কোন বিজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত/প্রচারিত হয়েছে কিনা?
৩. টেন্ডার প্রক্রিয়ার দুর্নীতি নিয়ে কোন তথ্য প্রকাশিত/প্রচারিত হয়েছে কিনা?
৪. বর্তমান মন্ত্রীর আমলে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অন্য কোন টেন্ডার প্রক্রিয়ার দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশিত/প্রচারিত হয়েছে কিনা? সে প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত কোন ব্যক্তি বর্তমান টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কাজ করছে কিনা?
৫. সরকারি টেন্ডার প্রক্রিয়ার নিয়ম-নীতিমালা ও আইন
৬. বর্তমান টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের স্বচ্ছতার বিষয়ে অতীতে কোন প্রতিবেদন প্রকাশিত/প্রচারিত হয়েছে কিনা?
৭. সরকারি অর্থ বরাদ্দের নিয়ম-কানুন
৮. বর্তমান কাজটির সরকারি অনুমোদনের নথিপত্র
৯. বাজেট সংক্রান্ত নথিপত্র; ইত্যাদি

আবার ডেভলপার কোম্পানীর জমি ব্যবসায় দুর্নীতি নিয়ে যে প্রতিবেদন তৈরির উদাহরণ দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে একজন প্রতিবেদককে যেসব প্রাসঙ্গিক গবেষণা করতে হবে সেগুলো হলো:

১. সংশ্লিষ্ট ডেভলপার প্রতিষ্ঠানের প্রচারপত্র
২. সংশ্লিষ্ট জমি নিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রচারপত্র
৩. এ বিষয়ে ইতিমধ্যে কোন সংবাদ মাধ্যমে কোন সংবাদ প্রকাশিত/প্রচারিত হয়েছে কিনা?
৪. এ বিষয়ে ইতিমধ্যে কোন সংবাদ মাধ্যমে কোন বিজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত/প্রচারিত হয়েছে কিনা?
৫. সংশ্লিষ্ট ডেভলপার কোম্পানীটির অন্য কোন প্রকল্প নিয়ে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমে কোন সংবাদ প্রকাশিক/প্রচারিত হয়েছে কিনা?
৬. প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট জমির মূল দলিল
৭. জমি বিক্রির দলিল
৮. বায়নানামা/চুক্তিপত্র
৯. ক্রেতাদের দেয়া রসিদ
১০. জমি ভরাটকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিপত্র

এ ধরনের গবেষণার মাধ্যমে একজন প্রতিবেদক তার সম্ভাব্য প্রতিবেদনটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পান। এমন গবেষণা শুধু প্রতিবেদককে নতুন দিকনির্দেশাই দেয় না; বরং অতীতে একইরকম পরিস্থিতিতে বা একই ধরনের ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতায় কী ঘটেছিল সে সম্পর্কেও ধারণা দেয়। এর ভিত্তিতে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো তিনি ক্রসচেক করে পূর্বানুমানগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন। আর এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তিনি মুখোমুখি হতে পারেন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মুখ্য ব্যক্তির।

খ. সাক্ষাৎকারদাতা সম্পর্কে জানা

সরাসরি ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার না হলেও মুখ্য ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেয়ার আগে তার সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু তথ্য জেনে নেওয়া ভালো। অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের পরের ধাপগুলোর জন্য এ বিষয়টি কার্যকরী ভূমিকা রাখে। কারণ মনে রাখতে হবে, প্রতিবেদক হিসেবে আপনি একটি স্পর্শকাতর ও জনসমক্ষে প্রকাশ করতে চায় না এমন একটি বিষয় সম্পর্কে সাক্ষাৎকার নিতে

যাচ্ছেন। সে বিষয়ে কথা বলার জন্য তাকে রাজি করাতে হলে কিছু প্রভাবনমূলক তথ্য জানতে হবে। এসব তথ্য সরাসরি প্রতিবেদনের জন্য তেমন কোনো কাজে লাগবে না। কিন্তু সাক্ষাতের অনুমতি পেতে হলে কিংবা সাক্ষাৎকারকে সফল করার জন্য এ তথ্যগুলো বেশ কাজে লাগবে। যেমনঃ সড়ক ও জনপথ বিভাগের টেন্ডার প্রক্রিয়ার দুর্নীতির প্রতিবেদনটির ক্ষেত্রে মুখ্য ব্যক্তি হিসেবে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর জীবনাচরণ সম্পর্কে কিছু তথ্য আগে থেকে জেনে নেয়া ভালো। যেমন: তার শিক্ষা জীবন, রাজনৈতিক জীবন ইত্যাদি। এছাড়া তার মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন ভালো ভালো দিকগুলো সম্পর্কে জানলে সাক্ষাৎকারটি ফলপ্রসূ করতে সহায়ক হয়।

৩. সাক্ষাৎকারের সময় ধার্যের অনুরোধ

একজন প্রতিবেদক হিসেবে কখনই এটা মনে করা ঠিক না যে, আপনাকে যে কেউ যে কোন সময় সাক্ষাৎকার দিতে বাধ্য। তাই সাক্ষাৎকারের জন্য সময় দেয়ার অনুরোধ করতে হয়। একসময় স্বশরীরে হাজির হয়ে সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য সময় নির্ধারণ করতে হয়। Paul N. Williams বলছেন, "*Your first consideration is to do everything reasonably possible to obtain the interview.*"[১৯৩] প্রায়ই অনেক প্রতিবেদককে বলতে শোনা যায়, কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটি সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হচ্ছেন না। এমনকি তিনি দেখাই করতে চান না। আসলে একটি সাদামাটা প্রত্যাখান কিংবা ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটি সাক্ষাৎকার দিবেন না বা ব্যক্তিটিকে পাওয়া যাচ্ছে না। এ ধরনের ছুঁতো আসলে একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের জন্য কখনই যথেষ্ট হতে পারে না। এক্ষেত্রে শুধু দেখা করাই নয়, কখনও কখনও সাক্ষাৎকারদাতার পরিচিত জন, তাদের কোন বন্ধু বা সহকর্মীরও সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এখন যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারতার কারণে টেলিফোনেই এ ধরনের সময় নির্ধারণ বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু শুধু ফোনের ওপর নির্ভরশীল হলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য প্রয়োজনীয় স্পর্শকাতর সাক্ষাৎকারগুলোর জন্য অনুমতি নাও মিলতে পারে। কারণ যে লোকটি আপনাকে কখনও দেখেনি তিনি আপনাকে স্পর্শকাতর কোন বিষয়ে সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হবেন এমনটা ভাবা যৌক্তিক নয়। সাংবাদিক Denny Walsh টেলিফোনে সাক্ষাৎকারের অনুমতি প্রার্থনার অসুবিধা তুলে ধরেছেন এভাবে, "*I want to make it uncomfortable if not possible for the person to avoid seeing me.*"[১৯৪] ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর রচয়িতা বব উডওয়ার্ড এবং কার্ল বার্নস্টাইন বলছেন, "*If you call them on the phone they're gonna say no... But instead you show up at their homes and show that you're well-dressed and civilized. ...*"[১৯৫]

অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের একটি বড় গুণ থাকা দরকার, আর তা হলো ধৈর্য্য। সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে এ ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হয় বেশি। কারণ আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন এবং ঘটনা বা বিষয়টির সঙ্গে জড়িতরা এটি গোপন করতে চাইবেন। সে কারণে চাইলেই যে আপনি বিষয় বা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাৎকার পেয়ে যাবেন এমন ধারণা করা ঠিক নয়। Leonard M. Kantumoya বলেছেন,

---

[১৯৩] Ibid, Paul N. Williams (1978), p. 81.
[১৯৪] Ibid.
[১৯৫] Gerry Keir, Maxwell McCombs & Donald L. Shaw (1986), Advanced Reporting: Beyond News Events, Longman Inc, New York, p-53.

"*What you learn from investigative reporting is that when it comes to human sources, persistence is the most important factor. If someone refuses to talk to you on first request, try again later. And again. And again. Do not give up at first attempt.*"[১৯৬] Sun Jose Mercury News-এর বিনোদন লেখক Nora Villagran অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে ধৈর্যের প্রতিমূর্তি কীভাবে হতে হবে তা তুলে ধরেছেন এভাবে, "*If the front door is locked, try the back door. If that's locked, try a window.*"[১৯৭] ধৈর্য্য ধরার পাশাপাশি সবসময় আশাবাদীও হতে হবে প্রতিবেদককে।

যেভাবেই হোক না কেন অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের জন্য সময় ধার্য করে নেয়া অত্যাবশ্যকীয়। এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি সহজ বটে; কিন্তু একটু কৌশলী হওয়া ভাল। কৌশলী না হলে অনেক সময় মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। এ পর্যায়ে প্রতিবেদকের উচিত প্রথমেই নিজের পরিচয় উপস্থাপন করা ও সাক্ষাৎকারের জন্য সময় ও স্থান নির্ধারণের অনুরোধ করা। সাধারণত জ্যেষ্ঠ ও নামীদামী প্রতিবেদকদের পরিচয় দেয়ার ক্ষেত্রে লম্বা ফিরিস্তি টানতে হয় না। তবে আপনি যদি শিক্ষানবিশ প্রতিবেদক হন কিংবা যার সাক্ষাৎকার চাচ্ছেন তার সাথে যদি আপনার পূর্ব পরিচয় না থাকে তাহলে একজন সেলসম্যানের মতো নিজেকে উপস্থাপন করা ভালো। সাক্ষাৎকারের অনুমতি পেতে হলে কতটুকু কৌশল অবলম্বন করতে হবে বা কী ধরনের পদ্ধতি প্রতিবেদক প্রয়োগ করবেন তা সত্যিকার অর্থে নির্ভর করে প্রতিবেদনটির ধরনের ওপর।

বস্তুতপক্ষে, এ ধাপে অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে একজন সেলসম্যানের ভূমিকা এমনিতেই পালন করতে হয়। কারণ কিছুটা কৌশলের আশ্রয় না নিলে সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাওয়া নাও যেতে পারে। কারণ আপনাকে মনে রাখতে হবে, আপনি এমন একটি বিষয়ে সাক্ষাৎকার নিতে যাচ্ছেন যার সাথে ওই ব্যক্তিটি জড়িত এবং তিনি কোনভাবেই বিষয়টি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে চান না। ধরুন, সড়ক ও জনপথ বিভাগের টেন্ডার প্রক্রিয়ার দুর্নীতি নিয়ে আপনি যদি সরাসরি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে তার দুর্নীতির বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরির জন্য সাক্ষাৎকারের সময় চান তাহলে তিনি হয় রেগে যেতে পারেন অথবা ব্যস্ততার ভান করে এড়িয়ে যেতে পারেন। এজন্য প্রতিবেদককে কিছুটা কৌশলী হতে হয় বা সেলসম্যানের ভূমিকা নিতে হয়। এক্ষেত্রে মন্ত্রীকে সরাসরি দুর্নীতির বিষয়ে সংবাদ প্রতিবেদন তৈরির বিষয়টি না বলে অন্যভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করা যায়। এখানে পটভূমি গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য কাজে লাগাতে পারেন। পটভূমি গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারদাতা সম্পর্কে আপনি যেসব তথ্য জেনেছেন তার ভিত্তিতে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন। যেমন আপনি বলতে পারেন, তার মন্ত্রণালয়ের নানা ধরনের ভাল উদ্যোগগুলো সম্পর্কে আপনি প্রতিবেদন তৈরি করতে চান। পাশাপাশি একেবারেই নতুন উদ্যোগগুলো যেগুলো আগে কখনই নেয়া হয়নি সেসব বিষয় সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরির আগ্রহের কথা প্রকাশ করতে পারেন। এক্ষেত্রে তার সাক্ষাৎকার ছাড়া যে প্রতিবেদনটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং তার মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর কারণে যে মানুষ সুফল পাচ্ছে সেসব বিষয় তুলে ধরতে হবে। যেমনটা একজন সেলসম্যান একজন ক্রেতার কাছে পণ্যের গুণাগুণ তুলে ধরে। এ বিষয়টিকে ক্যান মেজলার ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, "*... if you have not met the person before, and if the*

---

[১৯৬] Leonard M. Kantumoya (2004), Investigative Reporting in Zambia: A Practitioner's Handbook, First Edition, Friedrich Ebert Stiftung and Transparency International Zambia, p-53.
[১৯৭] Ibid, Ken Metzler (1999), p-123.

topic seems out of ordinary, then you may have to sell yourself much as a salesperson would."[১৯৮]

সাক্ষাৎকারের তারিখ নির্ধারণের সাথে সাথে সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণও জরুরি। এখানে সাক্ষাৎকারটি কখন হবে তা শুধুই নয়; সাথে সাথে সাক্ষাৎকারের জন্য কতখানি সময় বরাদ্দ পাবেন সেই বিষয়টিও জেনে রাখা ভাল। কারণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য সাধারণত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। সেক্ষেত্রে দিনভর ধরে কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার লাভের আশা করা বোকামির নামান্তর। আর সাক্ষাৎকারের জন্য বরাদ্দকৃত সময়টা জানা থাকলে সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্ন তৈরি ও সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা অনেক সহজ হয়।

এ ধাপে আরো বেশ কিছু বিষয়ের দিকে একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের খেয়াল রাখতে হয়। সেগুলো হলো:

ক. কৌশলে যে কোন আগাম চাহিদা এড়িয়ে যাওয়া

যারা গণমাধ্যম কিংবা সংবাদকর্মীদের নিয়ত মোকাবেলা করতে অভ্যস্ত তারা যে কোন স্পর্শকাতর বিষয়ে সাক্ষাৎকার দেয়ার আগে প্রতিবেদকের কাছে লিখিত প্রশ্নমালা চান। ভাল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য এ ধরনের শর্তের ফাঁদে পা দেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। অনেক সময় পরিস্থিতি বাধ্য করলে মার্জিতভাবে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। সেসব ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা নয়, যেসব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হবে সে সম্পর্কে একটি ধারণাপত্র পাঠানো শ্রেয়। তবে এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক প্রশ্ন করার অধিকারটি প্রতিবেদকের থাকতে হবে।

খ. সংবাদ লেখার পর প্রচার/প্রকাশের আগে দেখিয়ে নেয়ার প্রতিশ্রুতি না দেয়া

সংবাদকর্মীদের মোকাবেলায় অভ্যস্ত লোকেরা অনেক সময় এমন প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতে চান। কারণ তারা জানেন সংবাদ প্রচার বা প্রকাশের পর উচ্চবাচ্য করার চেয়ে এ কৌশল অনেক বেশি কার্যকর। কিন্তু ভাল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির পথে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক শিক্ষানবিশ প্রতিবেদক এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যান। তবে টেকনিক্যাল এক্সপার্ট বা বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রে এ বক্তব্য প্রযোজ্য নয়। কিন্তু কেউ যদি প্রতিবেদনের কোন তথ্য বাদ দেয়ার অনুরোধ করেন তা রাখা যাবে না। কারণ এ ক্ষমতা শুধু সম্পাদকই রাখেন।

গ. উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ

সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করার আগে প্রতিবেদককে অবশ্যই এর জন্য সম্ভাব্য উপযুক্ত স্থানগুলো ভেবে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারদাতার বাসা/বাড়ি কিংবা তার কার্যালয় হলে ভাল হয়। কারণ এসব স্থান সাক্ষাৎকারদাতাকে এক ধরনের মানসিক সুবিধা দেয়। ইংরেজিতে এটাকে বলে টাফ্ (turf)। এতে সাক্ষাৎকারদাতা মানসিকভাবে এক ধরনের নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা পান। তবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য একান্ত অনন্যোপায় না হলে কোন জনসমাগম বা বিশৃংখল স্থানে সাক্ষাৎকারের আয়োজন করা উচিত নয়। তবে স্পর্শকাতর বিষয়ে সাক্ষাৎকারের স্থান নির্ধারণের সময় প্রতিবেদককে অনেক সময় নিজের নিরাপত্তার বিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত। যেমন: কোন সন্ত্রাসীর অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির সময় ওই সন্ত্রাসীর দ্বারা নির্ধারিত স্থানে সাক্ষাৎকার নেয়ার আগে

[১৯৮] Ibid, p. 17.

প্রতিবেদককে অবশ্যই নিজের নিরাপত্তার দিকটি ভেবে দেখা উচিত।

৪. সাক্ষাৎকার কৌশলের ছক তৈরি করা

সাক্ষাৎকারদাতার মুখোমুখি হওয়ার আগে এটিই শেষ ধাপ। একটি উত্তম-পরিকল্পিত সাক্ষাৎকার সফলতার মুখ দেখতে বাধ্য। Keir, McCombs I Shaw বলেছেন, "*If an unprepared subject is "the dream of any interviewer," the unprepared interviewer is the bane of the subject's existance.*"[১৯৯] সাক্ষাৎকারে কোন কোন ক্ষেত্র বা বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করা হবে সে পরিকল্পনার ছককই মূলত: এ স্তরে করতে হয়। ক্যান মেজলার এ ধাপের গুরুত্বটি তুলে ধরেছেন এভাবে, *"The more your plan your interview, the more you can make it into a seemingly unplanned and caasual discussion that your respondent will enjoy and from which you will learn much."* [২০০]

মূলতঃ সাক্ষাৎকারদাতার কাছে হাজির হবার আগে এ ধাপে প্রতিবেদকের নিজেকে ঝালিয়ে নিতে হয়। ব্যাপক প্রস্তুতি ছাড়া নতুন কোন কিছু বের করে আনা যেকোন ক্ষেত্রেই কষ্টকর এবং কখনো কখনো অসম্ভবও বটে। আর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো নতুন কোন কিছু খুঁজে বের করা। তাই অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারেও নতুন কোন দিক উন্মোচনের চেষ্টা থাকে সবসময়। আর এর জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি প্রয়োজন। ইতিমধ্যে যোগাড় করা তথ্যাদি আরও একবার ভাল করে এ পর্যায়ে পড়ে নেয়া উচিত। কিভাবে সাক্ষাৎকারটি শুরু করা যেতে পারে, কিভাবে সাক্ষাৎকারটি পরিচালনা করা হবে, অপ্রস্তুতকর পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করা হবে, এড়িয়ে যেতে চাওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর কিভাবে বের করে আনা যাবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তুতি নিলে যে কোন সাক্ষাৎকারে কাঙ্খিত ফল লাভের সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি। ক্যান মেজলার বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, *"The interviewer seeks to venture into new territory.The sudden fresh insight, the new twists, the new patways explored, the unexpected turns, the recalling of new illustrative anecdotes--all these are the golden nuggets of interviewing. They come more easily to the interviewer who has planned for them and who can recognize them when they drop out of the conversation.* "[২০১]

এ ধাপটিতে প্রতিবেদককে বেশ কিছু কাজ করতে হয়:

ক. সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ঝালাই করে নেয়া

পরিকল্পনার মূল হাতিয়ার হলো উদ্দেশ্য সম্পর্কে শক্তিশালী ধারণা থাকা। প্রকৃতপক্ষে যে কোন কিছুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছাড়া সফল হওয়া যায় না। সাক্ষাৎকারদাতার কাছে হাজির হওয়ার আগেই তার কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য, প্রতিবেদনটি তৈরির মুখ্য উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণাগুলো আবারও পোক্ত করে নিতে হয়। সাক্ষাৎকারটি পরিচালনার জন্য প্রতিবেদককে এখানে নিজের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট করতে হয়।

খ. হোমওয়ার্ক করা

Hugh C. Sherwood বলেছেন, "*Nothing is more important to the success of most*

---

[১৯৯] Ibid, Gerry Keir, Maxwell McCombs & Donald L. Shaw (1986), p. 54.
[২০০] Ibid, Ken Metzler (1999), p. 18.
[২০১] Ibid, p. 19.

interview than advance preparation."[২০২] গণমাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবেদকের পক্ষে পূর্বপ্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হয় না। বিশেষ করে এ মুহূর্তে ঘটেছে এমন কোন ঘটনা বা কোন ব্রেকিং সংবাদের জন্য প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দীর্ঘ পরিকল্পনার মাধ্যমে যেসব সংবাদ করা হয় বা বিশেষ স্টোরির ক্ষেত্রে প্রস্তুতি নেয়া জরুরি। তবে সব ধরনের সংবাদের জন্য একইভাবে ও একই পরিমাপের সময় নির্ধারণ করে প্রস্তুতি নিতে হবে এমনটা নয়। প্রকৃতপক্ষে কতক্ষণ ও কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে তা নির্ভর করে সংবাদগল্পের প্রকৃতি ও যার সাক্ষাৎকার নেয়া হবে তার ওপর। Hugh C. Sherwood বলেছেন, "*How much time you should spend on advance research depends on how much time you have, how important the man you want to interview is, what the particular subject you want to interview him about is, how important the resulting article is expected to be, and other obviously related factors.*"[২০৩]

তবে সাধারণভাবে বলা হয়, একঘন্টা ব্যাপী একটি সাক্ষাৎকারের জন্য কমপক্ষে পাঁচঘন্টার প্রস্তুতি নিতে হয়। এটি অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনীর মাধ্যমে প্রাপ্ত একটি মৌলিক নিয়মের মতো। আমেরিকান 'লাইফ' ম্যাগাজিনের বিখ্যাত সাংবাদিক রিচার্ড ম্যারিম্যান তার ২৩ বছরের সাংবাদিকতা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি পর্বে খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ কোন সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়ার কয়েকদিন আগে থেকে মদ্যপান থেকে দূরে থাকা উচিত ও কার্বোহাইড্রেড উপাদান সমৃদ্ধ খাবার-দাবার গ্রহণ করা ঠিক নয়। সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়ার দিন সকালের নাস্তায় উচ্চ-প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন রিচার্ড ম্যারিম্যান। তিনি মনে করেন, শ্রবণদক্ষতা বাড়াতে এবং ভালো ফলোআপ প্রশ্ন করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে এ ব্যাপারগুলো বেশ কাজে দেয়।[২০৪]

সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতিকালে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের প্রতি একজন প্রতিবেদকের অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত। সেগুলো হলো:

অ. উপাত্ত যোগাড় করা

উপাত্ত বা নথিপত্র ছাড়া অনুসন্ধান প্রতিবেদন অনেকাংশেই অসাধ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া উপাত্ত বা নথিপত্র না পেলে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট করা, অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে মুখ্য ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট সব উপাত্ত/নথিপত্র যোগাড় করতে হবে এবং সেগুলোর ওপর হোমওয়ার্ক করতে হবে। বিখ্যাত মার্কিন দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমসের পরামর্শ হলো, আপনার বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে জানুন এবং ভাগ্যের উপর বিশ্বাস রাখুন। ক্যান মেজলার বলেছেন, "*Knowing your subject permits you to follow down new conversational pathways you could not have envisioned in the planning stage.*"[২০৫]

আ. অন্যদের সাক্ষাৎকার শেষ করা

আগেই বলেছি একটি পূর্ণাঙ্গ ও ভাল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য একাধিক সাক্ষাৎকার নেয়ার দরকার হয়। এক অর্থে শুধু একজনের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অনুসন্ধান প্রতিবেদন

[২০২] Ibid, Hugh C. Sherwood (1969), p. 31.
[২০৩] Ibid, p. 35.
[২০৪] Life, July 7, 1972.
[২০৫] Ibid, Ken Metzler (1999), p. 77.

তৈরি করা যায় না। তবে একটি প্রতিবেদন তৈরির জন্য সবার সাক্ষাৎকার আবার সমান গুরুত্ব বহন করে না। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনের জন্য একজন বা দুইজন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার সবচেয়ে মুখ্য ব্যক্তি হিসেবে প্রতিবেদকের কাছে প্রতিভাত হয়। এ ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার সবার শেষে নিতে হয়। কিন্তু তার আগে আনুষঙ্গিক অন্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার শেষ করতে হবে। অন্যথায় মুখ্য ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতিটা পূর্ণাঙ্গ করা দূরূহ হয়ে পড়তে পারে।

ই. প্রশ্নমালা ও ছক তৈরি করা

এখানে মূলত: সম্ভাব্য জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করার কথা বোঝানো হয়। প্রশ্নমালা বলতে দীর্ঘ একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করা উচিত নয়। শিক্ষানবিশ প্রতিবেদকরা প্রায়ই এ ভুলটি করে থাকেন, তারা যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের আগে একটি বিশাল প্রশ্নের ফর্দ তৈরি করে নেন। এতে বিপত্তি ঘটে সাক্ষাৎকারের সময়। দীর্ঘ প্রশ্নপত্র তৈরি করে নিলে সাক্ষাৎকারটি আন্তরিক না হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। কারণ এতে প্রতিবেদক ও সাক্ষাৎকারদাতা দুজনেরই মনোযোগ নষ্ট হতে পারে। অভিজ্ঞ প্রতিবেদকরা জটিংস আকারে কিছু নোট নিয়ে যান। এখানে যেসব বিষয়ে জানতে চাওয়া হবে সেগুলোর বিষয়ে নোট নিয়ে যাওয়াই ভাল। তাহলে কোন বিষয় বা দিক বাদ পড়ার আশঙ্কা থাকে না। বিশেষ করে এক্ষেত্রে যদি বিষয়ের বা প্রশ্নের সিকোয়েন্স করে প্রস্তুতি নেয়া যায় তাহলে সাক্ষাৎকারের সময় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা অনেক সহজ হয়। তবে সাক্ষাৎকারদাতাকে আক্রমণ করার একমাত্র লক্ষ্য নিয়ে প্রশ্নমালা তৈরি করা উচিত নয়। এ ধাপে সাক্ষাৎকারের জন্য একটি চূড়ান্ত গেমপ্ল্যান তৈরি করতে হয় প্রতিবেদককে। এ গেমপ্ল্যান তৈরির সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হয়:

> সাক্ষাৎদাতার সাথে শীতল সম্পর্ক কীভাবে দূর করতে হবে।
> কীভাবে মূল বিষয়ের আলোচনা শুরু করতে হবে।
> নির্বাচিত এজেন্ডা ওপর কীভাবে ধীরে ধীরে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে হবে।
> কীভাবে স্পর্শকাতর প্রশ্নগুলো করতে হবে।
> কোন প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যেতে চাইলে কী কৌশল নিতে হবে।
> কীভাবে সাক্ষাৎকারটি শেষ করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, এ পরিকল্পনাটি বাধা-ধরা কিছু নয়। সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় যে কোন পরিস্থিতিতে মোকাবেলার জন্য পুরো পরিকল্পনায় নমনীয়তা বজায় রাখতে হবে। যেমন: ধরুন, আপনি ১০টি মৌলিক প্রশ্ন ঠিক করেছেন যা উত্তরদাতাকে জিজ্ঞেস করবেন। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে উত্তরদাতা ৪ নং প্রশ্নের একটি অংশের উত্তর দিয়ে ফেলেছেন। এক্ষেত্রে আপনি কী করবেন? আপনি কি ১ নং প্রশ্নে আবার ফেরত আসবেন নাকি ৪ নং প্রশ্নের বাকি অংশের উত্তর নিবেন? এক্ষেত্রে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনার উত্তরদাতার উদ্দীপনার দিকে। তিনি কোন প্রশ্নটার উত্তর দিতে উৎসাহ বোধ করছেন। তিনি যদি সানন্দে ও আগ্রহের সঙ্গে ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন, তাহলে তার এ উৎসাহ রোধ করার দরকার নেই। আপনি পরে এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর চাইতে পারেন।

যাই হোক, পরিকল্পনার ছক তৈরির পরই সাক্ষাৎকারদাতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য মূলত: প্রতিবেদক পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যান। আর সাক্ষাৎকারদাতার সামনে হাজির হওয়ার আগে দুটো বিষয় মনে রাখতে হবে। বিষয় দুটি হলো:

■ **ঠিক সময়ে হাজির হওয়া**

যে কোন সাক্ষাৎকারে অবশ্যই প্রতিবেদককে নির্ধারিত সময়ের আগে পৌঁছতে হবে। আমাদের দেশে যানজটের যে অবস্থা তাতে অবশ্যই প্রতিবেদকের উচিত সাক্ষাৎকারের নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ৩০ মিনিট আগে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছানোর পরিকল্পনা নিয়ে রাখা। সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ধারিত সময় ঠিক না থাকলে তাতে শুধু সময় ও মনযোগ বিনষ্ট হয় না; পাশাপাশি সাক্ষাৎকারদাতাও রুষ্ট হতে পারেন। M.K. Verma বলেছেন, "*Sources become irritated when they are kept waiting, and it makes a good impression to be just a few minutes early.*"[২০৬]

■ **মার্জিত ও রুচিশীল পোশাক পরিধান করা**

কথায় আছে, আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারী। অর্থাৎ "First impression is the last impression." এমন পোশাক পরিধান করা উচিত নয় যাতে সাক্ষাৎকারদাতার মনে প্রতিবেদক সম্পর্কে প্রথম দর্শনেই কোন বিরূপ ধারণার জন্ম নেয়। কেমন পোশাক পরিধান করা উচিত সে সম্পর্কে Investigative Journalism Manuals- এ বলা হয়েছে, "*Dress in a way that will fit in with the context, show appropriate respect, and be natural enough to send no messages about your lifestyle or views.*"[২০৭]

৫. সাক্ষাৎকারদাতার সাথে মিলিত হওয়া (Meeting your Respondent)

সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করে একজন প্রতিবেদক তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সাক্ষাৎকারদাতার মুখোমুখি হন। এ ধাপে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি একজন প্রতিবেদককে খেয়াল রাখতে হয়। কারণ সকাল যেমন পুরো দিনের একটা আভাস দেয় তেমনি সাক্ষাৎকারদাতার সাথে সাক্ষাতের শুরুটা পুরো সাক্ষাৎকার সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত দেয়। এ ধাপের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো:

ক. উপযুক্ত আসন নির্বাচন (Choose appropriate Sit)

সংবাদপত্রের জন্য এ বিষয়টি কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও টেলিভিশনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো সাক্ষাৎকারের জন্য উপযুক্ত আসন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা। অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের জন্য মুখোমুখি অবস্থান করা উত্তম। এমনভাবে বসতে হবে যাতে সাক্ষাৎকারদাতার চোখে চোখ রেখে কথা বলা যায়। দু'জনের মাঝখানে কোন ফাইল বা বইয়ের স্তুপ বা অন্য কোনো বাধা যাতে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। Sally Adams ও Wynford Hicks মুখোমুখি বসা এবং চোখে চোখ রেখে কথা বলার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এভাবে, "*If you take your eyes off them for even a split second, you can hear their voices start to falter.*"[২০৮] তিনি আরো বলেছেন, "*Don't drop your eyes when your interviewee looks at you. This is a signal that you're not enjoying their company, but don't read the same into their eye movements.*"[২০৯]

খ. শীতল সম্পর্ক ভেঙে দেয়া (Breaking the Ice)

আপনি এমন একজনের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন যিনি আপনার পূর্ব পরিচিত নাও হতে পারে।

---

[২০৬] M. K. Verma (2009), News Reporting and Editing, A.P.H Publishing Corporation, New Delhi, p. 108.
[২০৭] Ibid, Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals.
[২০৮] Ibid, Sally Adams & Wynford Hicks (2009), p. 48.
[২০৯] Ibid, p. 80.

আবার পূর্ব পরিচিত হলেও সাংবাদিক সম্পর্কে এমনিতেই মানুষের মনে এক ধরনের ভীতি কাজ করে। আর যে কোন স্পর্শকাতর বিষয়ে হুট করেই কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করাটা ঠিক নয়। সে কারণে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা থাকতে হবে সর্বাগ্রে। স্বাভাবিক ও সাধারণ নিয়ম হলো, সাক্ষাৎকারদাতার সঙ্গে প্রতিবেদকের একটি অনুকূল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। প্রতিবেদককে অবশ্যই বিশ্বাস বা আস্থা অর্জন করতে হবে। অনুকূল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা না গেলে অনেক সময় বহু কষ্টে অর্জিত এই সাক্ষাৎ লাভের সুযোগটি নষ্ট হতে পারে। আবারও কাঙ্ক্ষিত তথ্য নাও পাওয়া যেতে পারে। একবার এক সাংবাদিক পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী পারভেজ মোশাররফের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারের শুরুতে তিনিই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণের অর্থ পাকিস্তান সরকার কেন ফেরত দিচ্ছে না। এমন প্রশ্ন শুনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ওই সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দেননি। Bob Greene বলেছেন, "*Our interviews are very low key. We're not district attorneys and we shouldn't be playing district atorneys. We're not playing for a jury. We'll say something like, 'Hi, how are you?'*"[২১০]

প্রতিবেদকের মনে রাখা উচিত তিনি যার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তিনি একজন মানুষ। আর যে কোনো আলোচনার শুরুতে কুশল বিনিময় আমাদের সংস্কৃতিরও অংশ। একজন বন্ধু যেভাবে অন্য বন্ধুর সাথে দেখা হলে প্রথমে কুশল বিনিময় করে তেমনি প্রতিবেদকেরও উচিত কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার শুরু করা। কেমন আছেন, আজকের আবহাওয়া চমৎকার বা আজকে খুব গরম পড়েছে কিংবা তার কোন পরিচিত বন্ধুর কথা তুলে ধরে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, আপনি একজন প্রতিবেদক, গবেষক নন। চাঁছাছোলা প্রশ্ন-উত্তর আঙ্গিকে প্রশ্ন করা ঠিক নয়। যে কোন ব্যক্তিই আলোচনার শুরুতে তার প্রশংসা শুনলে আলোচনার পরিবেশটি তার জন্য সহায়ক বলে ভাবেন। যেমন, আপনার জামাটি সুন্দর বা আপনার জানালা দিয়ে চমৎকার আকাশ দেখা যায় ইত্যাদি ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। এতে শীতল সম্পর্কের বাধ ভেঙ্গে যায়। এজন্য একে বলা হয় আইস ব্রেকিং। একজন প্রতিবেদক যত দ্রুত এ আইস ব্রেকিং করতে পারেন ততই তিনি মূল আলোচনার দিকে অগ্রসর হতে পারেন। আইসব্রেকিং ছাড়া বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হতে পারে না। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি না হলে সাক্ষাৎকারদাতা কখনই খোলামেলাভাবে তার বক্তব্য তুলে ধরবেন না। তবে অনেকসময় অনেক সাক্ষাৎকারদাতার ব্যস্ততা থাকতে পারে। যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন সামান্য সৌজন্যতা ছাড়া আলোচনা শুরু করা উচিত নয়। এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা গিডিওন ও মন্ত্রীর মধ্যকার আলাপচারিতা দেখেছি যেখানে প্রতিবেদক গিডিওন তেমন কোন ধরনের আইস ব্রেকিংয়ের চেষ্টা করেননি। ফলে খুব দ্রুত সাক্ষাৎকারটি ব্যর্থ হয়ে যায়।

এখানে একজন প্রতিবেদককে দুইটি বিষয় করার চেষ্টা করতে হবে:

১. সাক্ষাৎকারদাতার সবলতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা, অনুসন্ধানকৃত বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎকারদাতার সম্পর্ক এবং এ বিষয় সম্পর্কে তার প্রাথমিক মনোভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। এ বিষয়টি পরবর্তী প্রশ্ন করার জন্য যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা রাখে।

[২১০] Ibid, Paul N. William (1978), p. 83.

২. পেশাগত দিক থেকে একজন দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে সাক্ষাৎকারদাতার সামনে উপস্থিত করা। Quinn & Zunin বলেছেন, "*What happens in the first four minutes of a meeting between strangers largely determines what happens thereafter, so starting on the right foot is important. The early conversation should exclude a friendly, amiable tone. Humor can lubricate the conversation with most people*."[২১১] এ ধাপে একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে Paul N. Williams বলেছেন, "*Avoid any accusatory remarks that might make the interviewee more tense than he already is. Your first goal is to get him talking. The more free he talks, the better your chances of getting him to answer the difficult questions letter.*"[২১২]

৬. প্রথম প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া (Asking your First Questions)

প্রতিবেদকের প্রশ্ন করার ধরনের ওপর সাক্ষাৎকারদাতার উত্তরদানের বিষয়টি অনেকখানি নির্ভর করে। ভলতেয়ার বলেছেন, '*একজন মানুষকে বিচার করতে হবে তার প্রশ্নের মাধ্যমে, উত্তরের মাধ্যমে নয়*'। এখানে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রশ্নকে বোঝানো হয়েছে। অনেকে একে '*Business Question*' বলে থাকে। অর্থাৎ শুরুর আলোচনাটা জমে উঠার পর সুযোগ বুঝে প্রতিবেদককে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নে পা রাখতে হয়। এর ক্ষেত্র/প্লট প্রতিবেদককেই তৈরি করতে হবে। তবে অনানুষ্ঠানিকভাবেই আলোচনার মধ্য দিয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়াই ভাল। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার চলাকালীন আলাদাভাবে নোটিশ করার দরকার নেই। যেমন: অনেক প্রতিবেদক বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করার পর হঠাৎ বলে থাকেন আমরা এবার সাক্ষাৎকার শুরু করি। এরকম আনুষ্ঠানিকতা করলে সাক্ষাৎকারদাতাও বিশেষ প্রস্তুতি নিয়ে বসেন, তিনি অনেক বেশি সচেতন হয়ে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেন। ফলে মূল বা কাঙ্খিত উত্তর পাওয়া কঠিন হয়ে যেতে পারে। সেজন্য শুরুর আলোচনার সূত্র ধরেই বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন করলে অনেক বেশি কার্যকর ফল আসতে পারে। ধরুন, আপনি কোন মন্ত্রীর দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করবেন। সেক্ষেত্রে ওই মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য গিয়েছেন। শুরুতেই কিছু সৌজন্যতামূলক প্রশ্ন দিয়ে শুরু করবেন। এক পর্যায়ে ব্যক্তিগত কুশলাদি থেকে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন মন্ত্রণালয়ের হালচাল বা এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব কেমন উপভোগ করছেন, ইত্যাদি প্রশ্ন। এর মাধ্যমে আপনি বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তবে বিষয়ভিত্তিক প্রথম প্রশ্নটি করার সময় কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হয়:

ক. প্রশ্নটি এমন হবে যাতে সাক্ষাৎকারদাতা সহজে উত্তর দিতে পারেন। বিশেষ করে সম্প্রচার মাধ্যমের সাক্ষাৎকারে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খ. প্রশ্নটি এমন হবে যাতে এর উত্তর দিতে গিয়ে সাক্ষাৎকারদাতার আত্ম-মর্যাদায় আঘাত না লাগে। অর্থাৎ তিনি যেন কোনোভাবেই অনুভব না করেন যে, তাকে আঘাত করা হচ্ছে।

গ. প্রশ্নটি এমন হবে যাতে সাক্ষাৎকারদাতা এর উত্তর দিতে গিয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবেই বিষয়ে প্রবেশ করেন।

ঘ. প্রশ্নটি এমন হবে যাতে উত্তরদাতার কাছে বিষয়ে প্রবেশ করাটা যৌক্তিক মনে হয়।

[২১১] Quinn, L., and N. Zunin (1972), Contact: The First Four Minutes, Los Angeles: Nash, p. 27.
[২১২] Ibid, Paul N. William (1978), p. 83.

পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক বারবারা ওয়ালসের অভিজ্ঞতা[২১৩]

বারবারা ওয়ালস (Barbara Walsh), একাধিকবার পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন সাংবাদিক। তিনি বলেছেন, সাক্ষাৎকারে একটি 'নির্বোধ' কাজ যে প্রতিবেদনটির জন্য তিনি পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছিলেন সেটি মাটি করে দিচ্ছিল। ওয়ালস বেশ কয়েকমাস ধরে খুনের দায়ের দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি উইলিয়াম আর. হর্টনের (জুনিয়র) সাক্ষাৎকার লাভের চেষ্টা তদবির করছিলেন। শেষ পর্যন্ত হর্টনের আইনজীবী সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেন। তিনি জেলখানায় গিয়ে হর্টনের সাক্ষাৎ পান এবং সেখানে ওয়ালসের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

একটি গ্যাস স্টেশনের নিরাপত্তা রক্ষীকে খুন করা ও আরো একটি ধর্ষণের মামলায় যাবজ্জীবনসহ ৮৫ বছরের কারাদণ্ডাদেশ নিয়ে ম্যাসাচুসেটস জেলে দিন কাটাচ্ছিলেন হর্টন। হর্টন একবার জেল থেকে পালিয়েছিলেন। ওয়ালস তখন ছিলেন ঈগল-ট্রিবিউনের সাংবাদিক। হর্টনের কাছে ওয়ালসের প্রথম প্রশ্ন ছিল, 'কীভাবে আপনি জেল থেকে পালিয়েছিলেন?'। ওয়ালসের মতে, এটিই তাঁর 'নির্বোধ' প্রশ্ন ছিল। এ কথা শুনেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন হর্টন। সাক্ষাৎকার বাতিল করতে চেয়েছিলেন। ওয়ালস দ্রুত প্রশ্ন পরিবর্তন করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হর্টন, তুমি আমাকে কী বলতে চাও?'। হর্টনের উত্তর ছিল, 'আমি দৈত্য নই, তোমরা (গণমাধ্যম) আমাকে দৈত্যদানব বানিয়ে দিয়েছ'।

এরপর দু ঘন্টা ধরে হর্টনের সাক্ষাৎকার নেন ওয়ালস। ওয়ালস বলেছেন, ধীরে ধীরে তিনি কঠিন ও জটিল প্রশ্নগুলো করেছিলেন। ওয়ালস বলছেন, এ থেকে তাঁর একটি কঠিন শিক্ষা হয়েছে, 'কঠিন প্রশ্নটি সাক্ষাৎকারের শেষ স্তর বা পর্যায়ের জন্য সংরক্ষণ করে রাখো'।

৭. সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা (Establishing an Easy Rapport)

এই স্তরটি অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের প্রাণ। প্রকৃতপক্ষে এ স্তরটি যে কোনো সাক্ষাৎকারেরই প্রাণ। কারণ প্রত্যেক সাংবাদিকই চান একটি হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়ে সাক্ষাৎকারদাতার কাছ থেকে তথ্য বের করে আনতে। Charles L. Yeschke এর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এভাবে, "*Rapport is important in an interview because the degree of rapport you establish determines the degree of compliance you obtain from the interviewee.*"[২১৪]

এ ধাপে অবাধে এবং আন্তরিকতার সাথে তথ্যের প্রবাহটা হতে হয়। একজন প্রতিবেদক যদি পূর্বোক্ত ছয়টি স্তর ঠিকভাবে অনুসরণ করে আসেন তবে এ স্তরটি নিয়ে কোন চিন্তা করতে হয় না কিংবা চিন্তা থাকার কথা নয়। এটি তার আপন গতিতেই চলবে। এখানে শুধু মনে রাখতে হবে, সাক্ষাৎকারকে যত বেশি সম্ভব অনানুষ্ঠানিক করতে হবে। একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তিনি কোন সভা-সেমিনারে বক্তব্য শুনছেন না, তিনি

[২১৩] Carole Rich (2010), Writing and Reporting News: A Coaching Method, Sixth edition, Wardsworth, USA, p. 107.
[২১৪] Charles L. Yeschke (2003), The Art of Investigative Interviewing: A Human Approach to Testimonial Evidence, second edition, Butterworth Heimann, New York, p.79.

একজনের সাথে আলাপ করছেন। এ আলাপচারিতা যতবেশি অনানুষ্ঠানিক হবে তত বেশি তথ্য পাওয়া সম্ভব। এখানে প্রতিবেদককে তার ব্যক্তিত্ব ব্যবহার করে সাক্ষাৎকারদাতাকে আগ্রহী করে তুলতে হবে, করতে হবে অভিভূত। এ ধাপে একটি সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা ছাড়া আলাপচারিতা জমে উঠতে পারে না। আর আলাপচারিতা জমে না উঠলে প্রতিবেদকের পক্ষে কাঙ্ক্ষিত তথ্য বের করে আনাটাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠতে পারে। Woody ও Woody বলেছেন, "*Mutual confidence and trust are difficult to establish in an interview, and the interviewee is not always your partner in seeking the truth. While your goal is to determine the truth in an investigation, the interviewee's goal might be to protect himself from a variety of harms.*"[২১৫] এই বাধা ডিঙানোর জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তা সাক্ষাৎকারগ্রহীতা হিসেবে প্রতিবেদককেই করতে হবে।

Rogers Ges Roethlisberger তাঁদের একটি নিবন্ধে[২১৬] যোগাযোগ বা যে কোন আলাপচারিতা সফল করার জন্য দুটি তত্ত্বের কথা বলেছেন। প্রথম তত্ত্ব অনুযায়ী, যোগাযোগ বা আলাপচারিতা তখনই সফল হয় যখন একজন ব্যক্তি সন্তুষ্ট করতে পারেন এ মর্মে যে, তিনি যা বলছেন তা সত্য বলছেন। দ্বিতীয় তত্ত্ব অনুযায়ী, যোগাযোগ বা আলাপচারিতা তখনই সফল হয় যখন একজন ব্যক্তি মনে করেন যে, তিনি যা ভাবছেন এবং উপলব্ধি করছেন তা মুক্তভাবে বলতে পারছেন; এমনকি তিনি যাকে বলছেন তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেন বা না পারেন। নিঃসন্দেহে সাংবাদিকতার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষাৎকারের সফলতার জন্য দ্বিতীয় তত্ত্বটি বেশি দরকারি। Hugh C. Sherwood বলেছেন, "*If you are a reporter, you must be an interviewer. And if you are to be a good interviewer, you must impress most of the people you interview as friendly, intelligent, not easily maneuvered-- and, above all, as a human being who can be talked with as another human being and not just as a journalist.*"[২১৭] Charles L. Yeschke এই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ককে বৈদ্যুতিক প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করেছেন, "*In an interview, rapport is like an electric current that flows between participants. It is based on how they communicate rather than on what they say, and it requires practiced effort.*"[২১৮] Downs et. al বলেছেন, "*Rapport involves building a degree of comfortableness together, of trust in one another, and of basic goodwill that will permit nondefensive interaction.*"[২১৯]

New York Times এর সাংবাদিক Harrison Salisbury ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কৌশল তুলে ধরেছেন এভাবে, "*In the early days it was much tighter and I had a series of every sharply defined questions and I was in a great hurry to put them accross, bing, bing, bing. As the years went on I've taken*

[২১৫] Woody, Robert H., and Jane D. Woody (eds.) (1972), Clinical Assessment in Counseling and Psychotherapy, New York: Appleton, Century, Crofts, Meredith, p. 210
[২১৬] Ibid, Carl R. Rogers & F. J. Roethlisberger (1952), p. 46.
[২১৭] Ibid, Charles L. Yeschke (2003), p. 79.
[২১৮] Downs, Cal W., G. Paul Smeyak, and Ernest Martin (1980), Professional Interviewing, New York: Harper and Row, p. 57
[২১৯] Downs, Cal W., G. Paul Smeyak, and Ernest Martin (1980), Professional Interviewing, New York: Harper and Row, p. 57

a much more relaxed technique which I think is more effective, of letting the interview develop its own pace and establishing a sort of a mood of interchange before bringing in the sharper questions."[২২০]

এ স্তরে একজন প্রতিবেদককে অনেক বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয়। কারণ একটি ভাল সাক্ষাৎকারের পেছনে অনেক অবাচনিক অনুভূতি কাজ করে। একটু ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, এ স্তরের সফলতা নির্ভর করে একজন প্রতিবেদকের কিছু গুণাবলীর ওপর।

ক. বলা ও শোনা (Speaking and listening)

"Careful listening is the best way in which to secure information."[২২১]

সাক্ষাৎকার মূলত: এক ধরনের কথোপকথন বা আলাপচারিতা। তবে এটি বিশেষ ধরনের আলাপচারিতা। যে কোন কথোপকথন বা আলাপচারিতায় একজন বলেন আর একজন শোনেন। একটি অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারে প্রতিবেদককে শ্রোতার ভূমিকাই বেশি পালন করতে হয়। একজন ভাল সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী অবশ্যই একজন ভাল শ্রোতা। সে কারণে সাক্ষাৎকারের সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সাক্ষাৎকারদাতা কী বলছেন এবং তা প্রতিবেদক বুঝতে পারছে কিনা। এ ধরনের শ্রোতাকে সক্রিয় শ্রোতা বা অ্যাকটিভ লিসনার বলা হয়। ক্যান মেজলার তাঁর 'Newsgathering' বইতে সাক্ষাৎকারের যে ছয়টি মৌলনীতির কথা তুলে ধরেছেন তার চার নম্বরটিকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন 'Pleasure Principle' হিসেবে। তাঁর মতে, "*People talk more openly when they are having fun. Most people do enjoy interviews; being interviewed gives them a chance to "be somebody" and to "educate" the public to their point of view. You can heighten their pleasure, simply by listening.*"[২২২] সত্যিই তাই, একটি আনন্দঘন পরিবেশে আপনি যখন কারো কথা শুনবেন, তখন তিনিও মন খুলে কথা বলবেন, রাখবেন না কোন সঙ্কোচ। এর প্রেক্ষিতে অনেক সময় আপনি আশাতীত কিংবা কল্পনাতীত তথ্যও তার কাছ থেকে পেয়ে যেতে পারেন। আর আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শ্রবণ যে কত জরুরি তা বলেছেন *Coventry Telegraph-Gi* সম্পাদক *Alan Kirby*, "*Be a first class listener. Always show interest and never stop an interviewee in full flight.*"[২২৩]

নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক ক্লডিয়া ড্রেইফাস সাক্ষাৎকারকে একটি নাটকের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "*If this is a play, it is an improvisational one. And just like in acting, the interviewer must be able to listen, to go with what is heard, to change course mid-interview.*"[২২৪]

সাংবাদিকদের নেয়া সাক্ষাৎকারগুলো একই ধরনের নয় বা সব সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার একই ধরনের নয়। কিছু সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে অন্যদের চেয়ে বেশি তথ্য পেয়ে থাকেন, "*Journalistic interviews are not equal: Some get more than others.*"[২২৫] এখানে শুধু

---

২২০ Ibid, Gerry Keir, Maxwell McCombs & Donald L. Shaw (1986), p. 58

২২১ Ibid, Paul N. Williams (1978), p. 63.

২২২ Ken Metzler (1979), Newsgathering, USA: PRENTICE-HALL, INC., p. 134.

২২৩ John Smith (2007), Essential Reporting: The NCTJ Guide for Trainee Journalists, SAGE publications, London, p. 83

২২৪ Ibid, Claudia Dreifus (1997).

২২৫ Ibid, Ken Metzler (1999), p. 84.

চতুর প্রশ্ন আর কৌশলে পুরোপুরি কাজ হয় না। বরং এক্ষেত্রে কীভাবে বক্তার বক্তব্য শোনা হচ্ছে এবং সে অনুযায়ী কীভাবে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া হচ্ছে তার ওপর সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। অদক্ষ বা শিক্ষানবিশ প্রতিবেদকরা সাক্ষাৎকারদাতার বক্তব্য ভালোভাবে শোনেন না। প্রায়ই তারা পূর্বনির্ধারিত ধারণা বা অনুমানের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন। যদি এ উত্তর সহসা পাওয়া না যায়, তবে অধৈর্য হয়ে পড়েন। আর এতে সাক্ষাৎকারের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। Nirenberg বলেছেন, "*Active listening involves your total person and must be a part of your presentation. You can exhibit your attentiveness to the interviewee through the intonation of your voice, the positioning of your body, and your facial expressions. By questioning, accepting, rephrasing, reflecting, and pausing, you can signal that you are listening.*"[২২৬]

একজন প্রতিবেদক যখন তার কী দরকার সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হবেন তখনই মূলতঃ তিনি সাক্ষাৎকার থেকে ভাল ফল লাভ করতে পারেন। একজন প্রতিবেদকের যদি উদ্ধৃতিযোগ্য কোন মন্তব্য দরকার হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই সাক্ষাৎকারদাতার বক্তব্য মনযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অংশটি তাৎক্ষণিক ধরতে হবে। শুধু তাই নয়, সে অনুযায়ী এমনভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হবে যাতে সাক্ষাৎকারদাতা সে সম্পর্কে আরো বেশি কিছু বলেন। প্রতিবেদক যেই হোক না কেন, কোন সাক্ষাৎকারদাতা কিংবা কোন সোর্স কখনই বলে দিবে না যে, এখানেই আপনার সংবাদ সূচনার উক্তিটি পাবেন। সাক্ষাৎকারদাতা শুধু বলে যাবেন। কোথায় মূল বা প্রয়োজনীয় অংশটি নিহিত সেটি প্রতিবেদককেই ধরতে হবে। প্রকৃতপক্ষে তা নির্ধারণের দায়িত্ব একান্তই প্রতিবেদকের। সেজন্য কোন প্রতিবেদক যদি মনযোগ দিয়ে সাক্ষাৎকারদাতার বক্তব্য না শুনেন তাহলে তিনি অনেক কিছু হারাতে পারেন, এমনকি এত ঘটা করে আয়োজিত সাক্ষাৎকারটি কোন ফল নাও দিতে পারে। এখানে মনে রাখতে হবে প্রতিবেদকের মূল লক্ষ্য তথ্য পাওয়া, কোন কারিশমা দেখানো নয়। *Paul N. Williams* বলছেন, "*Interviewing is an art, and good interviewing involves talking -- and listening. Ask questions, even what might be regarded as dumb questions. The reporter's objective is to get information, not to impress the interviewee with his own brilliance.*"[২২৭]

প্রতিবেদককে তার ভূমিকার কথা মনে রাখতে হবে। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি হচ্ছেন প্রশ্নকর্তা। কথোপকথন বা আলাপচারিতাকে রসগ্রাহী করে তোলা তার দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনমাফিক তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে বক্তার কথার সঙ্গে তথ্য সংযুক্ত করতে পারেন। তবে অনেক সময় দেখা যায়, অনেক সাক্ষাৎকারগ্রহীতা নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেন। এ কাজ কখনই করা উচিত নয়। প্রতিবেদককে নিজের জ্ঞানের বহর জাহির করা এখানে উচিত নয়; কখনই এ ধরনের আচরণ করে সাক্ষাৎকারদাতার বিরক্তি উদ্রেক করা যাবে না। পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন সাংবাদিক বারবারা ওয়ালস তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, "*I've learned to be real slow and real patient. I'm more inclined to let people talk longer. You may not use all the information, but you can off end them if you rush. The key to good interviewing is good listening. In interviewing, if you are sincere and the sources know that you have compassion, they're going to talk. A lot of the*

---

[২২৬] Nirenberg, Jesse S. (1963), Getting through to People, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

[২২৭] Ibid, Paul N. Williams (1978), p. 91.

skill is just being open to what they have to say."[২২৮] সাক্ষাৎকারদাতার উত্তর মূল্যায়নের জন্য তার মুখনিসৃত শব্দ বা বাক্যের পাশাপাশি অবাচনিক চিহ্নগুলোর দিকে খেয়াল রাখা একান্ত জরুরি। Hugh C. Sherwood ভেতরের বা মনের কান দিয়ে শোনার পরামর্শ দিয়েছেন, বক্তার অকথ্য কথা বা তার মনের ভাষা বোঝার দিকে তাগিদ দিয়েছেন। যেন 'যে কথা যায় না বলা, শুধু বোঝা যায়'- এর মতো, "*If you would be really successful as an interviewer, you must learn to listen with the inner ear. You must hear more than the words the interviewee speeks. You must catch his hidden feelings, his unexpressed reactions."*[২২৯] Nirenberg বলেছেন, "*Active listening means concentrating on what is and what is not being said—both verbally and nonverbally."*[২৩০] সাক্ষাৎকারদাতার অব্যক্ত কথা বোঝার জন্য তার মাথা নাড়া, চোখের পলক ফেলানো, হাত নাড়ানো ইত্যাদি খেয়াল রাখা দরকার। সাক্ষাৎকারদাতার শারীরিক ভাষা বোঝার গুরুত্ব কতখানি তা তুলে ধরা হয়েছে Investigative Journalism Manual-এ। এখানে বলা হয়েছে, "*Clusters of defensive gesture and posture can signal evasion and are a good clue to where you may want to push the questioning harder. Look too for signal of hurt, relief, humour, anger or boredom to either build on or counteract.*"[২৩১]

সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীকে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে। উপযুক্ত শ্রোতা হওয়ার জন্য এর বিকল্প কিছুই নেই। আপনি যদি আপনার মনোযোগ হারিয়ে ফেলেন, বিরক্ত হন কিংবা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন তাহলে সেটি সাক্ষাৎকারদাতার কাছে ধরা পড়বে। তখন সাক্ষাৎকারদাতা এই সাক্ষাৎকার দেয়াটাকে সময়ের অপচয় মনে করতে পারেন এবং তিনি তথ্য চেপে যেতে পারেন।

খ. নিয়ন্ত্রণ (Control)

১. থাকতে হবে উদ্দীপনা

একজন ভাল শ্রোতা হতে হলে অবশ্যই তার মধ্যে সাক্ষাৎকারদাতার বক্তব্য শোনার উদ্দীপনা থাকতে হবে। প্রতিবেদককে অবশ্যই ভালভাবে শুনতে হবে সাক্ষাৎকারদাতা কী বলছেন বা বলতে চাচ্ছেন? সাক্ষাৎকারদাতার বক্তব্য শেষ করতে দিতে হবে। ঘন ঘন বক্তব্যের মাঝখানে থামিয়ে দিলে সাক্ষাৎকারদাতা বিরক্ত হতে পারেন। সেজন্য তার বক্তব্য শেষ হলে প্রশ্ন করাটাই শ্রেয়। প্রতিবেদককে মনে রাখতে হবে, তিনি একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন, কোনভাবেই তাড়াহুড়ো করা কাম্য নয়। যে কোন আলাপচারিতায় ক্ষণে ক্ষণে নীরবতা পালন করতে হয়। *Investigative Journalism Manuals-* এ বলা হয়েছে, *"Silence is not a bad thing. Let the interviewee finish, pause, than ask your next question. You don't need to fill the gaps. If the interviewee needs time to think about an answer, give it; if they need time to recover their emotions, just wait quitely before asking, Shall we go on now?"*[২৩২] সাক্ষাৎকারদাতার সামনে অবশ্যই উদ্দীপনার পরিচয় দিতে হবে। সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার স্তরে কোনভাবেই

---

[২২৮] Ibid, Carole Rich (2010), p. 107.
[২২৯] Ibid, Hugh C. Sherwood (1969), p. 65.
[২৩০] Nierenberg, Gerard I. (1968), The Art of Negotiating, New York: Cornerstone.
[২৩১] Ibid, Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals.
[২৩২] Ibid, Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals.

সাক্ষাৎকারদাতার আত্মমর্যাদায় আঘাত করা যাবে না। তাতে সাক্ষাৎকারদাতার কথা বলার উদ্দীপনা নষ্ট হতে পারে। Charles L. Yeschke বলেছেন, বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ ভাবে তিনি যা বলছেন সেটিই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মন্তব্য বা তথ্য। এ কারণে প্রত্যেক বক্তাই তার প্রতি শ্রোতার ইতিবাচক মনোযোগ ও মন্তব্য প্রত্যাশা করেন, "*Recognizing the interviewee's dignity, worth, and importance, and helping the interviewee strive for self-expression, self-realization, and self-fulfillment, improves the productivity of the interview.*"[২৩৩] যখন সাক্ষাৎকারদাতা মনে করবেন যে, আপনি তাকে আপনার নিজস্ব মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করছেন এবং তা তার বিশ্বাসের বিরোধী তখন তার মনে ধাক্কা লাগতে পারে ও এতে তিনি রক্ষণশীল হয়ে যেতে পারেন, যা তথ্যের গতিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। সে কারণে চেষ্টা করতে হবে একটি সার্বজনীন বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে কথা বলা, প্রতিবেদকের নিজস্ব মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়।

২. অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ না করা

সাক্ষাৎকারদাতার কোন বক্তব্য না বুঝলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে থামিয়ে না দিয়ে বক্তব্য শেষ হলে একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলে বেশি ফল দিতে পারে। দুঃখিত, আপনার কথাটা ঠিক বুঝলাম না-- এভাবে না বলে আপনি .... বুঝাতে চাচ্ছেন... এভাবে বলাটা অনেক শ্রেয়। M.K. Verma বলেছেন, "*Give the interviewee some time. It is more than often that he wants to speak about the issue, but it takes him some time to jog through the memory lane and then answer a particular question. This is the silent treatment interview technique.*"[২৩৪] Woody ও Woody বলেছেন, "*If the interviewee talks spontaneously, avoid interrupting until there is a significant pause. Encourage the interviewee to continue by nodding your head and paying careful attention to the interviewee's words.*"[২৩৫]

৩. মনোযোগ ধরে রাখা

একজন প্রতিবেদক কতটা আন্তরিক বা তার মধ্যে কতটা উদ্দীপনা কাজ করছে সে বিষয়টি তার প্রতিক্রিয়া ও চোখের চাহনির মধ্যে ধরা পড়ে। সেজন্য সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় যত বেশি সম্ভব সাক্ষাৎকারদাতার চোখে চোখ রেখে কথা বলা দরকার। অর্থাৎ আই কন্ট্রাক্ট ভালো হওয়া দরকার। বিশেষ করে ঘন ঘন নোট নেয়া কিংবা প্রশ্নের তালিকার দিকে তাকালে সাক্ষাৎকারদাতার মনোযোগ নষ্ট হতে পারে। এতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি মনোযোগ হারিয়ে ফেলতে পারেন। মনে রাখতে হবে, আপনি যতটা আন্তরিকতা ও মনোযোগের সাথে সাক্ষাৎকারদাতার বক্তব্য শুনবেন, ততই আপনার তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। এজন্য প্রতিবেদককে অবশ্যই আগ্রহী হতে হবে এবং তার মধ্যে আগ্রহী ভাবটাও পরিলক্ষিত হতে হবে। প্রস্তুতি অনুযায়ী কোন প্রশ্নের উত্তর না পেলে কিংবা ভিন্ন কোন উত্তর পেলে উত্তেজিত বা অবাক হওয়ার দরকার নেই। Investigative Journalism Manuals- এ বলা হয়েছে, "*Don't try and shoe-horn an interview into a proconceived story. The surprise must turn into a better story in the end; if it doesn't, you can choose a later moment to return to your original theme.* "[২৩৬]

---

[২৩৩] Ibid, Charles L. Yeschke (2003), p. 86.
[২৩৪] Ibid, M.K.Verma (2009), p. 111.
[২৩৫] Ibid, Woody, Robert H., and Jane D. Woody, eds.(1972), p. 157
[২৩৬] Ibid, M.K.Verma (2009), p. 111.

৪. ধৈর্য্য ধরা ও শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব না দেখানো

অনভিজ্ঞ প্রতিবেদক প্রায়ই একটি ভুল করেন, সেটি হলো উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে এক প্রশ্ন থেকে দ্রুত অন্য প্রশ্নে চলে যান। Dexter বলছেন, তারা আসলে ধৈর্য্যের গুরুত্ব কতখানি তা বুঝতে ব্যর্থ হন।[২৩৭] রিপোর্টারকে ধৈর্য্য ধরতে হবে। Wicks & Joshep বলেছেন, "*To be a good listener, you should take the backseat and allow the interviewee time to talk.*"[২৩৮] প্রতিবেদককে মনে রাখতে হবে, তার ধৈর্য্য উত্তরদাতার টেনশন প্রশমন করতে সাহায্য করে।

বিশেষ করে সাংঘর্ষিক কোন প্রশ্নে নিজের ওপর কিংবা সাক্ষাৎকার গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা যাবে না। হয়ত আপনার কোনো প্রশ্নের উত্তর সাক্ষাৎকারদাতা দিলেন না, ঘুরিয়ে কৌশলে সেটা করতে হবে। কিন্তু ধৈর্য্য হারালে চলবে না। সাক্ষাৎকারদাতাকে বোঝাতে হবে কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের উত্তর জনস্বার্থে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কোনভাবেই সাক্ষাৎকারদাতার ওপর বিরোধাত্মক বা শত্রুভাবাপন্ন কোন মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ; কিন্তু কোন সাংবাদিক কাউকে পর্যবেক্ষণের জন্য গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কোন সদস্য নন। একজন সাংবাদিক হিসেবে যেটুকু দায়িত্ব পালনের কথা সেটুকুর মধ্যেই একজন প্রশ্নকর্তা বা প্রতিবেদককে এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। একজন প্রতিবেদক হিসেবে সাক্ষাৎকারের সময় কতটা সহনশীল হতে হবে তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন Charles L. Yeschke। তিনি বলেছেন, "*When ending an unsuccessful interview, do nothing to create hard feelings. Even when hostile interviewees refuse to answer your questions, don't hold a grudge, show no disgust, frustration, or anger, and don't allow yourself to vent your displeasure. Don't allow your pride to cause you to blame interviewees for their lack of cooperation. Instead, lay a positive foundation for future interviews. Aim to have all interviewees leave with a positive feeling, allowing them to believe that they experienced a meaningful and valuable interaction.*"[২৩৯] কখনই সাক্ষাৎকারদাতার প্রতি কোন ধরনের অবজ্ঞাপূর্ণ উপেক্ষা বা বিদ্রূপ মনোভাব পোষণ করা যাবে না। সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী Benjamin Disraeli বলেছেন, "Next to knowing when to seize an advantage, the most important thing in life is to know when to forego an advantage."[২৪০]

অনেক সময় দেখা যাবে, কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের কাঙ্ক্ষিত উত্তর নাও পাওয়া যেতে পারে। আবার অনেক সময় উত্তরদাতাও আক্রমণাত্মক হয়ে যেতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে কোন খোঁড়া অজুহাত বা ঠুঁটো জগন্নাথের মতো কোন যুক্তি দাঁড় করাবেন না (যেমন: '*আমি আমার অফিসের দেয়া দায়িত্ব পালন করছি*' *এমন কথা বলবেন না*)।

গ. আবেগ নিয়ন্ত্রণ

একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে মনে রাখতে হবে, তিনি একটি সংবাদ তৈরির জন্য তথ্য

---

[২৩৭] Dexter, Lewis Anthony (1970), Elite and Specialized Interviewing. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, p.112.
[২৩৮] Wicks, Robert J., and Ernest H. Josephs Jr. (1972), Techniques in Interviewing for Law Enforcement and Corrections Personnel. Springfield, Ill.: Charles C Thomas.
[২৩৯] Ibid, Charles L. Yeschke (2003), p. 82.
[২৪০] Ibid, p. 88.

সংগ্রহে গিয়েছেন; কোন যুদ্ধ জয় করতে যাননি। প্রতিবেদককে মনে রাখতে হবে, তিনি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে গিয়েছেন এবং সে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য লাভের উপায় হলো প্রশ্ন করা। কিন্তু সে প্রশ্ন করতে গিয়ে এবং সাক্ষাৎকারদাতার উত্তর শুনে কোন ধরনের অতিরিক্ত আবেগ প্রদর্শন বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিবেদকের পরিচয় বহন করে না। সাক্ষাৎকারদাতার সাথে তাল মেলাতে গিয়ে চোখ, মুখসহ শরীরের নানা প্রত্যঙ্গের অবাচনিক যোগাযোগের মাধ্যমে আলাপচারিতাকে ফলপ্রসূ করে তোলা যায় এবং তা করতেও হয়। কিন্তু এ ধরনের সাড়া প্রদানের একটি সীমা আছে; আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে কোনভাবেই যেন সে সীমা অতিক্রম করা না হয়। আপনাকে মনে রাখতে হবে, অনুসন্ধানের এ পর্যায়ে আপনি প্রায় সবকিছুই ঠিকঠাকভাবে শেষ করেছেন। আঠার মতো লেগে থেকে আপনার নিজস্ব অনুসন্ধানের ধারায় সাক্ষাৎকার ঠিকই এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ আক্রমণাত্মক বা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ার কারণে সবকিছুই ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে পারে। এমন মনোভাব কোন অবস্থাতেই কাম্য হতে পারে না।

উত্তরদাতা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না চাইলে আপনি কোনভাবেই রাগান্বিত হয়ে পড়বেন না। মনে রাখতে হবে, অনেক উত্তরদাতা আছেন খুব ভালোভাবে গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের মোকাবিলা করতে অভ্যস্ত, তারা আপনাকে উত্তেজিত করতে পারেন যাতে কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকতে পারেন বা তা এড়িয়ে যেতে পারেন। Investigative Journalism Manual-এ বলা হয়েছে, "*Your aim is to get the story, not to 'win'. Adopt a cool, unflustered stance, taking as much time as you need.*"[২৪১] শুধু অতিরিক্ত আবেগ নিয়ন্ত্রণই নয়, অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে খেয়াল রাখতে হবে যে তিনি একজন সাক্ষাৎকারগ্রহীতা, উত্তরদাতার বন্ধু বা আত্মীয় নন। তাই কোন ধরনের তোষামোদি বা সহানুভূতি প্রদর্শন করা যাবে না -- "*This is an interview, not a friendship. You are there to discover things, not to be patronised.*"[২৪২] বিষয়টি আরো সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন *Charles L. Yeschke*, "*The development of rapport does not require that the interviewer become emotionally involved or that the interviewer's commitment, persistence, or objectivity be eroded. You are not trying to become the interviewee's best buddy. You are trying to solve the case. You want the interviewee to buy into your friendliness only long enough so that you can obtain the information you need.* "[২৪৩]

ঘ. দৃশ্যায়ন ও মূল্যায়ন (Visualizing & Evaluating)

এটা সাক্ষাৎকারের একটা অন্যতম গুণ। একজন প্রতিবেদক সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় অনেক তথ্য পাবেন। সব তথ্য যে তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা কিন্তু নয়। আবার সব তথ্য সমান গুরুত্বও বহন করবে না। প্রতিবেদক তার হোমওয়ার্ক অনুযায়ী সংবাদগল্পের একটা চিত্র ভেবে রেখেছেন। সাক্ষাৎকার যখন ঠিকভাবে এগুচ্ছে তখন মনে মনে সে গল্পের দৃশ্যায়ন করে নিতে হয়। অর্থাৎ সংবাদ গল্পের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো তিনি পেয়েছেন কিনা তার একটি দৃশ্যায়ন মানসপটে করে নিতে হয়। প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে কে, কী, কোথায়, কখন এবং বিশেষ করে কেন ও কীভাবে-এর উত্তর পাওয়া গেছে কিনা তা ভাবতে হবে সাক্ষাৎকার

[২৪১] Ibid, Gwen Ansell (ed.) Investigative Journalism Manuals.
[২৪২] Ibid.
[২৪৩] Ibid, Charles L. Yeschke (2003), p. 79.

চলাকালীনই। যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া না যায় তা নিয়ে উত্তেজিত বা আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই। বরং প্রতিবেদককে অবশ্যই ধৈর্য্য ধরতে হবে। এটি যে কোন সাক্ষাৎকারের সফলতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

প্রস্তুতির সাথে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত উত্তরের চিত্রায়ন যেমন জরুরি তেমনি সাক্ষাৎকারদাতার উত্তরগুলোর মূল্যায়নও একান্ত করণীয়ের মধ্যে পড়ে। ফিডব্যাক বা পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়ার জন্য এ মূল্যায়ন মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। সাক্ষাৎকার চলার সময় প্রতিবেদককে মূল্যায়ন করতে হবে তিনি যা শুনছেন তার গুরুত্ব বা প্রভাব কতখানি। সাক্ষাৎকারদাতা যা বলেছেন তা কি তার সংবাদগল্পের জন্য সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত জবাব, এটা কি তার সংবাদগল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে, এটা কি নতুন কিছু ইত্যাদি নানা ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক বা পাল্টা প্রশ্নের ডালি সাজাতে হয়।

ঙ. প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা (Asking Question)

সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী ও শিক্ষানবিশ সাংবাদিকরা প্রায়ই প্রশ্ন রাখেন যে, তারা প্রায়ই বুঝতে পারেন না একটি সাক্ষাৎকারে কী জিজ্ঞেস করা উচিত। তাদের এ প্রশ্নের প্রাথমিক উত্তর হলো, ‘যা কিছু আপনি জিজ্ঞেস করুন না কেন, নিশ্চিত হোন এটি একটি প্রশ্ন।’ প্রশ্ন দিয়ে বিচার করা প্রসঙ্গে ভলতেয়ারের কথাটি আগেই বলা হয়েছে, ‘একজন মানুষকে তার উত্তরের মাধ্যমে নয়, বরং প্রশ্নের মাধ্যমে বিচার করতে হবে।’ অ্যারিস্টেটল বলেছেন, ‘*Think as wise men do, but speak as the common people do.*’

আপনি কী জিজ্ঞেস করবেন তা কিভাবে নির্ধারণ করবেন? উত্তরটা খুবই সহজ, আপনি একজন মানুষ। একজন মানুষ হিসেবে আপনার উৎসুক মনকে ব্যবহার করুন। কানাডিয়ান বিখ্যাত অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও সাক্ষাৎকার বিশেষজ্ঞ জন সোয়াস্কির (John Sawatsky) কাছে উত্তম প্রশ্ন হলো স্বচ্ছ বা পরিষ্কার জানালার মতো, যেটি আপনার সামনে উপযুক্ত চিত্র তুলে ধরবে। তিনি বলেছেন, "*A clean window gives a perfect view. When we ask a question, we want to get a window into the source. When you put values in your questions, it's like putting dirt on the window. It obscures the view of the lake beyond. People shouldn't notice the question in an interview, just like they shouldn't notice the window. They should be looking at the lake.*" তিনি আরো চমৎকারভাবে বলেছেন, "Stained-glass windows are beautiful to look at, but it's all about the window, not about the view."[২৪৪] Charles L. Yeschke বলেছেন, "*Interviewers succeed when they convince their subjects to provide truthful information. It’s not a matter of telling, but a matter of selling. Well-crafted questions sell the interviewee on the idea of telling the truth.*"[২৪৫]

- **সহজ ও স্পষ্টভাবে প্রশ্ন তুলে ধরা (Phrase Your Questions Simply and Clearly)**

যে কোনো সাক্ষাৎকারে প্রশ্নগুলো হওয়া উচিত স্পষ্ট ও সহজ এবং সাবলীল। একসঙ্গে একাধিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া উচিত নয়। একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর সে সম্পর্কিত সম্পূরক

[২৪৪] For more on the Sawatsky method, see The Question Man, by Susan Paterno, American Journalism Review, October 2000, available online at www.ajr.org.
[২৪৫] Ibid, Charles L. Yeschke (2003), p. 166.

প্রশ্ন করা উচিত। না হলে দ্বিধার সৃষ্টি হতে পারে। সাক্ষাৎকারে প্রশ্নগুলো হতে হবে স্পষ্ট ও সরাসরি এবং যে কোন ধরনের পক্ষপাতমুক্ত। পাশাপাশি এমনভাবে প্রশ্ন করা যাবে না যাতে প্রশ্নটিতে মাত্রাতিরিক্ত ব্যাখ্যা থাকে। শব্দচয়ন করতে হবে উপযুক্তভাবে। পুরো সাক্ষাৎকারে এমনভাবে প্রশ্ন করতে হবে যাতে মনে হবে এটি একটি আলাপচারিতা, কোন পরীক্ষা-পদ্ধতি নয়। Downs et al. বলেছেন, "*Do not grill the interviewee as a prosecuting attorney might do. Ask questions in a conversational manner, because your purpose is to hold a conversation with someone who has knowledge or has experienced something that you want to know about. Holding a conversation implies a certain amount of give-and-take during the interview. Make sure that you are asking questions and not making statements that do not call for answers.*"[২৪৬]

প্রতিবেদককে এখানে মনে রাখতে হবে, তিনি সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছেন, কাউকে জ্ঞান দিতে বা কোন দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে যাননি। সেজন্য দার্শনিক প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে হবে। বিশেষ করে সহজে বোধগম্য নয় এমন কোন প্রশ্ন করা চলবে না।

- **দৃষ্টিভঙ্গি (Approach)**

সংবাদ সাক্ষাৎকারে তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা যায়। প্রথম দুইটি হলো, প্রত্যক্ষ/সুনির্দিষ্ট (Directive approach) ও পরোক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি (Nondirective approach) এবং তৃতীয়টি হলো যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি (Combining approach)।

অ. প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি (Directive approach)

যে সাক্ষাৎকার ধারাবাহিকভাবে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, অর্থাৎ প্রশ্নকর্তা শুধুই তার কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যই প্রশ্ন করেন সেটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে পরিচালিত। কিন্তু এক্ষেত্রে সোর্স বা উত্তরদাতা প্রশ্নকর্তা বা সাক্ষাৎকারগ্রহীতার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। রায়ান ও টেনকার্ড প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অসুবিধা তুলে ধরেছেন এভাবে, "*The questions can suggest answers to the interviewee in ways that inhibit communication or produce distorted or inaccurate information.*"[২৪৭] তাছাড়া সংকীর্ণ বা কাঠখোট্টা ধরনের প্রশ্নের উত্তরে অনেকসময় সাক্ষাৎকারদাতা নতুন বা কার্যকরী দিক সম্পর্কে কিছু নাও বলতে পারেন। সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অনেক সময় উত্তরদাতার মধ্যে এমন ধারণা হতে পারে যে, প্রশ্নকর্তা এ বিষয়ের উত্তর পেতে চান না; সে কারণে পুরোপুরি সুনির্দিষ্ট বা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রশ্ন করলে সাক্ষাৎকারে আংশিক উত্তর পাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একজন প্রশ্নকর্তা বা সাক্ষাৎকারগ্রহীতা কখনই মিথস্ক্রিয়া স্থাপন করতে পারেন না। তবে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিরও কিছু সুফল আছে। এ ধরনের সাক্ষাৎকার খুব দ্রুত ও কার্যকরভাবে শেষ করা যায়। টেলিভিশন ও রেডিওতে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে এ ধরনের সাক্ষাৎকার খুব কার্যকরী হয়।

আ. পরোক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি (Nondirective approach)

এ ধরনের সাক্ষাৎকারে সর্বপ্রশ্ন সুনির্দিষ্ট হয় না। এখানে সাক্ষাৎকারদাতাকে স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়। রায়ান ও টেনকার্ড বলেছেন, "*The nondirective interviewer*

[২৪৬] Ibid, Downs, Cal W., G. Paul Smeyak, and Ernest Martin (1980), p. 286.
[২৪৭] Michael Ryan and James W. Tankard Jr. (2005), Writing for Print and Digital Media, The McGraw-Hill Companies, New York, p. 261.

encourages the source to talk freely by establishing good rapport and by showing sympathy for and understanding of what is being said."[২৪৮] এ ধরনের সাক্ষাৎকারের একটি বড় অসুবিধা হলো এর জন্য তুলনামূলকভাবে সময় বেশি লাগে। পাশাপাশি এ ধরনের সাক্ষাৎকার দীর্ঘ হওয়ায় এর নিয়ন্ত্রণ রাখাও কঠিন হয়ে পড়ে। তবে এ ধরনের সাক্ষাৎকার অত্যন্ত আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে হয়।

ই. যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি (Combining approach)

একটি ভাল সাক্ষাৎকার শুধু প্রত্যক্ষ কিংবা শুধু পরোক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে পরিচালিত হতে পারে না। সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি নেয়ার সময় একজন সাংবাদিককে অবশ্যই প্রশ্নের ছক করতে গিয়ে দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির কথা মাথায় রাখতে হয়। তবে সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় কম থাকলে বিশেষ করে সম্প্রচার মাধ্যমের সাংবাদিকদের জন্য দু'একটি সাধারণ প্রশ্নের পর সুনির্দিষ্ট প্রশ্নে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হয়।

▪ উন্মুক্ত বনাম বদ্ধ প্রশ্ন (Open versus Closed Question)

সাধারণত ধরন অনুযায়ী সাক্ষাৎকারের প্রশ্নগুলোকে মোটাদাগে দু'ভাগে ভাগ করা হয়: উন্মুক্ত ও বদ্ধ। উন্মুক্ত প্রশ্নে উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে উত্তরদাতার বেশ স্বাধীনতা থাকে। Ken Metzler বলেছেন, *"Open questions are general and allow leeway for the answer. Closed questions are specific and call for a specific answer."*[২৪৯]

যেমন: আপনার নিজের সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী? অথবা,
আপনার প্রতিষ্ঠানের এমন আচরণ আপনি কীভাবে দেখেন?
কিন্তু বদ্ধ প্রশ্ন সুনির্দিষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট উত্তরের আশায় এ ধরনের প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া হয়।
যেমন: আপনি কি কম কথা বলেন? অথবা আপনার প্রতিষ্ঠানের এমন আচরণ কি আইনসম্মত?

বদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরিতে অনেক সময় সমস্যা দেখা দেয়, যেমন: একজন প্রতিবেদক যদি একজন আবহাওয়াবিদকে নিম্নোক্তভাবে প্রশ্ন করে তাহলে প্রতিবেদন তৈরিতে সমস্যা দেখা দিতে পারে:

প্রশ্ন : কাল কি বৃষ্টি হবে?
উত্তর : না।
প্রশ্ন : তার মানে কাল আমরা ভাল আবহাওয়া পাব?
উত্তর: নির্ভর করছে ভাল আবহাওয়া বলতে কী বুঝাচ্ছেন তার ওপর?
প্রশ্ন: রৌদ্রজ্জল।
উত্তর : না
প্রশ্ন: তাহলে কী রকম হবে?
উত্তর: মেঘাচ্ছন্ন।
প্রশ্ন: আপনি কেন তা বলেননি?
উত্তর: আপনি তো জিজ্ঞেস করেননি।

এ ধরনের আলাপচারিতা সমস্যা তৈরি করতে পারে। একান্ত দরকার না হলে হাঁ বা না ----- এর মধ্যে উত্তর দেয় এমন প্রশ্ন না করাই ভাল। আবহাওয়াবিদের কাছে প্রতিবেদক যদি প্রশ্ন

---

[২৪৮] Ibid, p. 262.
[২৪৯] Ibid, Ken Metzler (1999), p. 36.

রাখতেন, ‘আগামীকালের আবহাওয়া নিয়ে আপনার অনুমান কী?’ তাহলে অনেক ভাল উত্তর পাওয়া যেত। এক্ষেত্রে আবহাওয়াবিদের পক্ষেও উত্তর দেয়াটা অনেক সহজ হতো। অনেক আমলা বা রাজনীতিবিদ আছেন যারা গণমাধ্যম বা সাংবাদিকদের সহজেই মোকাবেলা করতে পারেন তাদের ক্ষেত্রে বদ্ধ প্রশ্ন করলে কাঙ্ক্ষিত উত্তর পাওয়া সহজ হয় না।

তবে সাংবাদিকতার জন্য নেয়া সাক্ষাৎকারে দু’ ধরনের প্রশ্ন করা হয়। অনেক সময় অনভিজ্ঞ সাংবাদিক খুব দ্রুত বদ্ধ প্রশ্নের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েন। বদ্ধ প্রশ্নের উত্তর যে কতটা গতানুগতিক ফল নিয়ে আসে তা কানাডার বিখ্যাত অনুসন্ধানী প্রতিবেদক এবং সাক্ষাৎকার বিশেষজ্ঞ জন সোয়াস্কি (John Sawatsky) তুলে ধরেছেন এভাবে, “*Interviewing is about people. They're not chemical compounds, and they don't always act predictably. But there is a predictable part. Ask a closed-ended question and sources will confirm or deny 98 percent of the time. That's the science.*"[২৫০] অনেক পেশাদার উত্তরদাতা থাকেন যাদের সোয়াস্কি বলেছেন স্পর্শকাতর রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়িক কর্ণধার, তাদের একনাগাড়ে বদ্ধ প্রশ্ন করে গেলে তারা ‘না, আদৌ ঠিক নয়’ কিংবা ‘ওহ, আমার মনে হয় না’ এদের উত্তর দিয়ে সাংবাদিকদের নিরাশই শুধু করেন না পরাজিতও করে দেন। তাই সোয়াস্কির পরামর্শ হলো, নিরপেক্ষ এবং উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে শুরু করতে হবে। এরপর কী, কীভাবে এবং কেন -- এ ধরনের প্রশ্ন করতে হবে। সাক্ষাৎকারদাতার কাছ থেকে বিস্তারিত কারণ (কী ঘটেছিল?), প্রক্রিয়া (কিভাবে এটি ঘটেছিল?) এবং লক্ষ্য (কেন আপনি এটি করেছিলেন?) ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতে হবে।

সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় আমাদের লক্ষ্য থাকে উত্তম মন্তব্যটা পাওয়া। সেজন্য এমনভাবে প্রশ্ন করা উচিত যাতে সাক্ষাৎকার দাতা বিস্তারিত উত্তর দিতে পারেন। উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত মন্তব্য জানা সম্ভব। যেমন: জিজ্ঞেস করতে পারেন, এ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলেন বা এ বিষয়ে আপনার মতামত কি।

- **প্রতিদ্বন্দ্বী ও আদালতি প্রশ্ন (Adversarial & Forensic Question)**

অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের জন্য দুটি শব্দ প্রায়ই ব্যবহৃত হয়: ফরেনসিক ও এডভারসারিয়াল। অপরাধ ও আদালত জগৎ থেকে এ শব্দ দুটি এসেছে। আপনার প্রস্তুতকৃত সংবাদ পরিকল্পনা আর সংগৃহীত প্রমাণাদির ভিত্তিতে আপনি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন অপরাধ বা মন্দ কাজের জন্য প্রকৃত দায়ী কে বা কারা। এ স্তরে আপনাকে সাজাতে হবে তারা কীভাবে ও কোন প্রক্রিয়ায় কাজটি করেছে। অর্থাৎ এর সাথে তারা কীভাবে জড়িত। যে কোনো আদালতে সরকার পক্ষের উকিল ঠিক এই কাজটিই করে থাকেন। সাধারণভাবে ‘ফরেনসিক’ শব্দের অর্থ ‘আইন-আদালত সম্পর্কিত বা এর মতো’ (relating to, or like, the law-courts) এবং ‘এডভারসারিয়াল’ অর্থ হলো অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিযোগ প্রমাণ করতে গিয়ে তার বিপরীত অবস্থান (You are in a contest with the person, to uncover his or her guilt)। তবে এখানে এডভারসারিয়াল বা বিপরীত অবস্থান বলতে কখনই মারমুখী বা এগ্রেসিভ প্রশ্ন করাকে বুঝায় না। একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক কখনই তার আচরণে এগ্রেসিভ হতে পারেন না। এস এম আলী বলেছেন, “তর্কের সৃষ্টি করে – এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এড়িয়ে যান।

[২৫০] For more on the Sawatsky method, see The Question Man, by Susan Paterno, American Journalism Review, October 2000, available online at www.ajr.org.

তর্কজোড়ার জিজ্ঞাসাবাদের পদ্ধতিটি আদালতের আইনজীবীর জন্য আদর্শ হলেও, সাক্ষাৎকারে এ পদ্ধতি কদাচিৎ সাফল্য নিয়ে আসে। একথা মনে রাখাও খুব দরকার যে, রিপোর্টার তর্কের অবতারণা না করেও তার দরকারি তথ্য পাওয়ার ব্যাপারে নাছোড়বান্দা হতে পারেন।"[২৫১] Investigative Journalism Manuals-এ বলা হয়েছে, "*An adversarial interview is intended, like the prosecutor's questions in a court room, to secure evidence of wrong-doing from the possible wrong-doer. It's a contest of wits with your interviewee. And against a thoroughly prepared interviewer who has the key facts and a thorough knowledge of the subject, most interviewees will find the going tough. But don't misunderstand the word adversarial – it does not mean aggressive in terms of your behaviour. In the interest of good journalism (fairness) the person or institution against whom you are making allegations will expect tohave the opportunity to disprove or deny them. A good journalist will want to be seen offering this opportunity to put the other side of the case.*"[২৫২]

- **প্রশ্নের ধারাবাহিকতা: কুপি (Sequencing of Questions: The Funnel)**

সাংবাদিককে অবশ্যই ধারাবাহিকতার সাথে প্রশ্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে দুটো ধারা আছে: ক. সুনির্দিষ্ট থেকে ব্যাপক বা সাধারণ খ. ব্যাপক বা সাধারণ থেকে সুনির্দিষ্ট। যেকোন একটি ধারা সাংবাদিককে অনুসরণ করতে হয়। ব্যাপক বা সাধারণ থেকে সুনির্দিষ্ট ধারাটিকে বলা হয় Funnel। Funnel অর্থ কুপি। একটা কুপির ওপরের অংশ বড় কিন্তু নিচের বা শেষের অংশ ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসে। সেরকম অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য সাক্ষাৎকারে প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্র ব্যাপক থেকে ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ছুটে যায়। যেহেতু এ ধরনের সাক্ষাৎকারে বিশ্বাস স্থাপন জরুরি হয়ে পড়ে তাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট প্রশ্নগুলো ধীরে ধীরে করাই ভাল।

- **অনুগামী প্রশ্ন (Follow-up/Probe Questions)**

অনেক সময় হ্যাঁ বা না উত্তর বিস্তারিত উত্তর পাবার পথ বন্ধ করে দেয়। তখন আপনাকে ফলোআপ প্রশ্ন দিয়ে সে পথ উন্মুক্ত করতে হয়। যেমনঃ

> 'আপনি কি চুক্তি সাক্ষর করেছেন?'
> 'হ্যাঁ'
> 'আপনি কি দয়া করে বলবেন, কী উদ্দেশে আপনি তা করেছেন?'

অনুগামী প্রশ্ন সাক্ষাৎকারের প্রাণ। এটি সাক্ষাৎকারদাতাকে তার বক্তব্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে অনুপ্রাণিত বা উদ্বুদ্ধ করে। এক্ষেত্রে বাচনিক ও অবাচনিক দু'ধরনের সাড়া প্রদানের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর বের করে আনা যায়। এক্ষেত্রে আবচনিক প্রক্রিয়াগুলো সাক্ষাৎকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। Charles L. Yeschke বলেছেন, "*It is an important part of the climate of an interview, which is in play from the beginning to the end of the encounter. You will convey your expectations to the interviewee through your body language.*"[২৫৩] এ প্রক্রিয়াগুলোকে Keir, McCombs এবং Shaw বিবেচনা করছেন, 'Mining for Gems' বা রত্ন খননের উপায় হিসেবে। এগুলো হলো:

---

[২৫১] প্রাগুক্ত, আফতাব হোসেন (অনুবাদ), পৃ- ১৮৫।
[২৫২] Ibid, Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals.
[২৫৩] Ibid, Charles L. Yeschke (2003), p. 90.

ক. নিষ্ক্রিয় সমর্থন (Passive Probe): হু, জি হ্যাঁ............ তাই তো দেখছি, (‘hmm............I see.’) - এ ধরনের ইতিবাচক সাড়ার মাধ্যমে সাক্ষাৎকারদাতার কাছে নিজের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো যায়। অর্থাৎ এ বিষয়ে প্রতিবেদক আরো শুনতে চান এমন ধারণা সাক্ষাৎকারদাতাকে দিতে হয়। Ken Metzler বলেছেন, "*This kind of passiveness suggests that the interviewer wants to hear more, through respondents sometimes take it to mean lack of interest.*"[২৫৪] **১৯৬৩** সালে এক গবেষণায় দেখা গেছে, যদি কোন সাক্ষাৎকারগ্রহীতা প্রশ্ন করতে ৫-৬ সেকেন্ড সময় নেন তাহলে উত্তরদাতা গড়ে সে প্রশ্নের উত্তর দেন ৩০-৪০ সেকেন্ড সময় ধরে। কিন্তু এ উত্তর দেয়ার সময় সাক্ষাৎকারগ্রহীতা যদি হু, জি এ ধরনের শব্দ উচ্চারণ করেন তাহলে উত্তরদাতা সে প্রশ্নের উত্তর দেন ৫০-৬০ সেকেন্ড ধরে।[২৫৫]

খ. সাড়ামূলক (Responsive) এক্ষেত্রে কিছু শব্দ আর চেহারার অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রশ্নকর্তাকে তার আগ্রহ ফুটিয়ে তুলতে হয়। যেমনঃ সত্যি......কি অদ্ভুত, চমৎকার (‘Really............how interesting’) এ ধরনের শব্দের পাশাপাশি চেহারার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেলে সাক্ষাৎকারদাতা নির্ভার হয়ে উত্তর দিতে পারেন। জন সোয়াস্কি বলছেন, সাক্ষাৎকার চলাকালীন সাংবাদিকদের কোন বিবৃতি দেওয়া কিংবা মন্তব্য করা উচিত নয়। তার পরামর্শ হলো, সাক্ষাৎকার চলাকালীন সোর্সের জন্য কোনো ধরনের সহানুভূতি দেখানো উচিত নয়। তিনি বলেছেন, কোনো ধরনের সহানুভূতি না দেখিয়ে মোক্ষম উপায়ে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেয়াই একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব। উদাহরণস্বরূপ, সোয়াস্কি বলছেন, ‘যখন আপনাকে গুলি ছোঁড়া হয়, তখন কি আপনি ভয় পেয়েছিলেন?’ -- প্রেসিডেন্ট রোলান্ড রিগ্যানকে এমন প্রশ্ন করার পরিবর্তে ‘যখন আপনাকে গুলি ছোঁড়া হয়, তখন আপনার কেমন মনে হয়েছিল?’ -- এমন প্রশ্ন করাই ভালো।

গ. পুনঃউচ্চারণ (Mirroring/Repitition) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা, নাম ইত্যাদি সাক্ষাৎকারদাতা বলার পর প্রতিবেদক নিজেও আবার বলতে পারেন। যেমনঃ কোন দুর্নীতির প্রতিবেদনের সাক্ষাৎকারদাতা বললেন, এ কাজে ১০ কোটি টাকা লোপাটের প্রমাণ পাওয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেদন বিস্ময় প্রকাশ করে বলতে পারেন, ১০ কোটি টাকা! আবার হয়ত সাক্ষাৎকারদাতা বললেন, এ কাজে অমুক জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেদক বলে উঠলেন, অমুক জড়িত! এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারদাতার মধ্যে কোনো মানসিক জড়তা থাকলে তা তিনি কাটিয়ে উঠে আরও বিস্তারিত বলা শুরু করেন।

ঘ. নীরবতা (Silence): সাক্ষাৎকারদাতা যে শুধু বলেই যাবেন এমনটা ভাবা ঠিক নয়। আবার কোনো প্রশ্ন করার সাথে সাথেই যে তিনি মুখস্থ বলার মত করে উত্তর দিয়ে যাবেন এমনটাও ভাবা যাবে না। কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষাৎকারদাতাকে সময় দিতে হবে। এক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করে চুপ থাকাটাই শ্রেয়। এই নীরবতা হলো ইতিবাচক নীরবতা। এটি এক ধরনের কৌশলও বটে। Charles L. Yeschke বলছেন, “*The tactic of silence can be a weapon for battle or a marvelous instrument of the most delicate construction.*”[২৫৬] Gorden বলেছেন, “*Research indicates that there is positive correlation between the amount of silence used by the interviewer and the*

[২৫৪] Ibid, Ken Metzler (1999, p. 38

[২৫৫] Matarazzo, Joseph D., Morris Weitman, George Saslow, and Arthur N. Weins (1963), "Interviewer Influence on Duration of Interview Speech." Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, I, p- 451-58.

[২৫৬] Ibid, Charles L. Yeschke (2003), p. 92.

interviewee's general level of spontaneity."[২৫৭]

তবে এসব ক্ষেত্রে অবাচনিক সংকেতের মাধ্যমে শ্রোতা হিসেবে প্রতিবেদক যে মনোযোগী সেটা প্রকাশ করতে হবে। আবার অনেক সময় পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে না দিয়ে সাক্ষাৎকারগ্রহীতাকে চুপ থাকতে হয়। বিশেষ করে সংক্ষিপ্ত উত্তর পেলে বা প্রত্যাশিত উত্তর না পেলে সাক্ষাৎকারগ্রহীতা চুপ থাকলে বিব্রত বোধ করতে পারেন এবং তিনি ওই বিষয়ে অধিকতর উত্তর দিতে পারেন। Drake বলছেন, "*When I pause between questions, I find that interviewees often provide further information to fill the silence.*"[২৫৮]

ঙ. অগ্রগতিমূলক (Developing): ইতিমধ্যে উত্তর দিয়েছে এমন প্রশ্নের আরও বিস্তারিত জানার জন্য সাক্ষাৎকারদাতার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া যায়। এ বিষয়ে যদি আরো বিস্তারিত বলেন? অথবা এত টাকা কীভাবে লোপাট করলো? অথবা এ দুর্নীতি কীভাবে ধরা পড়লো? ইত্যাদি প্রশ্নের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারদাতাকে উত্তর দিতে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করা যায়।

চ. স্পষ্টকরণমূলক (Clarifying): নির্ভুল তথ্য উপস্থাপনই একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে কোনো প্রশ্নের উত্তর যদি অস্পষ্ট বা সংক্ষিপ্ত মনে হয় তাহলে সাক্ষাৎকারদাতার কাছ থেকে তা পরিষ্কার হয়ে নেয়া উত্তম।

ছ. মোড় ঘুরিয়ে দেয়া (Diverging): অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকার বিশেষ করে স্পর্শকাতর কোন বিষয়ে সাক্ষাৎকারে এ ধরনের প্রশ্ন করতে হয়। যে সমস্ত সাক্ষাৎকারদাতা গণমাধ্যমে সচরাচর সাক্ষাৎকার দেন বা গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিতে যারা অভ্যস্ত তাদের কাছে স্পর্শকাতর বিষয়ের সরাসরি উত্তর পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এ ধরনের সাক্ষাৎকারদাতারা স্পর্শকাতর প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এসব ক্ষেত্রে সরাসরি উত্তর পাওয়া না গেলে প্রতিবেদককে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করতে হয়। এক্ষেত্রে উত্তেজিত বা চিন্তিত হওয়া যাবে না। বরং প্রশ্নটি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আবার করতে হবে। যেমন বলা যেতে পারে, 'আপনি কি এটি বুঝাতে চাচ্ছেন?' বা 'আমি যদি ভুল না করি তাহলে এর অর্থ কি এটিই দাঁড়ায়?' কিংবা 'অন্যভাবে বললে, এ বিষয়টি কি এভাবে দাঁড়াচ্ছে?' এভাবে প্রশ্নটি আবারও করে কাঙ্ক্ষিত উত্তরটি বের করে আনা যেতে পারে।

▪ ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন (Leading Questions)

এমন কিছু প্রশ্ন থাকে যার মধ্যে প্রশ্নকর্তা যে উত্তর চান বা আশা করেন তার ইঙ্গিত থাকে। ইংরেজিতে একে বলা হয়, Leading Questions। যেমনঃ 'আপনি সত্যি দুর্নীতির সাথে জড়িত, তাই না?' অথবা আপনি যদি কোন মেয়রকে জিজ্ঞেস করেন, 'জনাব, আপনি কি সত্যি মনে করেন না, শহরের কিছু পার্কে যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে তাহলে শহর লাভবান হবে? অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি, কর আদায় ও শহরের অর্থনৈতিক লাভের কথা।' প্রশ্নকর্তা খুব হাশিখুশিভাবে এ ধরনের প্রশ্ন করলেও এর উত্তর দেয়া উত্তরদাতার জন্য খুব কঠিন। সে কারণে এ ধরনের ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন না করাই ভাল। Sheila S. Coronel বলেছেন, "*Asking a leading question is risky, On the one hand, it may prompt a provocative and dramatic answer that could make for a great television moment. On the other*

[২৫৭] Gorden, Raymond L. (1969), Interviewing: Strategy, Techniques, and Tactics Homewood, Ill.: Dorsey Press, p. 188.
[২৫৮] Drake, John D (1972), Interviewing for Managers: Sizing up People, New York: American Management Association, p. 86.

hand, it could irk the interviewee and make them calm up."[২৫৯]

▪ অতিরিক্ত প্রশ্ন (Loaded Questions)

প্রতিবেদক হিসেবে আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি কোনো সংবাদ নাটক মঞ্চস্থ করতে উত্তরদাতার কাছে হাজির হননি; বরং গিয়েছেন সাক্ষাৎকার নিতে। একাধিক বিষয়ে একসাথে প্রশ্ন করা উচিত নয়। আবার একটি বিষয়ের উপরও একাধিক সম্পূরক প্রশ্ন একসাথে করা ঠিক নয়। যেমনঃ আপনি কোন মন্ত্রীকে প্রশ্ন করছেন, এভাবে -- 'আপনি কি টেন্ডারের অনিয়ম সম্পর্কে জানেন? আপনিই তো এ প্রক্রিয়ার সুপারভাইজার? কীভাবে প্রতিষ্ঠানটির সাথে চুক্তি করলেন? প্রতিষ্ঠানটি যে ভুয়া সে সম্পর্কে আগে জানতেন না?' এতগুলো প্রশ্ন একসাথে করলে উত্তরদাতা খেই হারিয়ে ফেলতে পারেন। এক্ষেত্রে শুধু উত্তরদাতার পক্ষে উত্তর দেয়াটাই কঠিন হয়ে পড়ে তা নয়; বরং তথ্য সংগ্রহ করার পথও সংকুচিত হয়ে পড়ে। জন সোয়াস্কি বলেছেন, "*Remembering that less is more. The more information journalists put into questions, the more information sources leave out. Short questions produce succinct, dramatic, focused responses. Long, rambling questions get long, rambling, or confused replies.*"[২৬০]

৮. স্পর্শকাতর প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া (Asking the Bomb)

Ken Metzler বলছেন, এখানে বোম্ব বলতে রাগ বা আক্রমণ করাকে বুঝানো হয়নি। বরং এর মাধ্যমে সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও বিব্রতকর প্রশ্নকে নির্দেশ করা হয়েছে। যখন আপনি সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন বা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তখনই কিছু বিব্রতকর বা স্পর্শকাতর প্রশ্নের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই স্তরে সেসব প্রশ্ন করা হয়। Ken Metzler বলছেন, "*The term 'sensitive question' means either potentially embrassing or critical questions relating to business or public affairs, or personal questions dealing with traumatic events in one's life.*"[২৬১]

মনে রাখতে হবে, কঠিন ও স্পর্শকাতর প্রশ্ন করা যাবে; কিন্তু কোনোভাবেই নোংরা কিংবা অশ্লীল প্রশ্ন করা যাবে না। সাক্ষাৎকারদাতাকে শুধু বিব্রত করার জন্য কোনো প্রশ্ন করা উচিত নয়। তবে প্রত্যেক সাক্ষাৎকারে যে নির্দিষ্ট সময়েই এ স্তরটি আসবে তা ঠিক নয়। এটি নির্ভর করে সাক্ষাৎকারটি কতটা আন্তরিকতা ও হৃদ্যতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে তার ওপর। এখানে বিস্ফোরণের অর্থে বোমা শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। বরং স্পর্শকাতর প্রশ্নগুলো ছুঁড়ে দেয়ার পর উদ্ভূত পরিস্থিতি শক্ত হাতে মোকাবেলা করে প্রশ্নের মোক্ষম উত্তর বের করার আনাটাই হলো কৃতিত্ব। Ken Metzler এখানে কিছু নিয়ম অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছেন: [২৬২]

অ. ভদ্রভাবে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে হবে।
আ. স্পর্শকাতর প্রশ্নটি করার পেছনে যৌক্তিক কারণ থাকতে হবে।
ই. সঠিক মুড না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ধরুন, একজন সুন্দরী তরুণীর সাথে আপনার দেখা হলো। দেখা হওয়া মাত্রই আপনি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন না, 'আপনি

---

[২৫৯] Sheila S. Coronel (2009), Digging Deeper: A Guide for Investifative Journalists in the Balkans, BIRN, Sarajevo, chapter 7, p-166.
[২৬০] For more on the Sawatsky method, see The Question Man, by Susan Paterno, American Journalism Review, October 2000, available online at www.ajr.org.
[২৬১] Ibid, Ken Metzler (1999), p. 124
[২৬২] Ibid, Ken Metzler (1979), p. 147-148.

কি আমাকে বিয়ে করবেন?' তেমনি সঠিক মুড বা মানসিক পরিস্থিতি তৈরি না হলে স্পর্শকাতর প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

একজন সাক্ষাৎকারগ্রহীতা বা প্রতিবেদককে খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো পরিস্থিতিতে তিনি তার মোক্ষম প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিবেন। এক্ষেত্রে অনেক সময় এ ধরনের প্রশ্ন করার জন্য অনুমতিও চাওয়া যেতে পারে। যেমনঃ আপনাকে একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলে আপনি কি কিছু মনে করবেন? অথবা অন্য কারো উদ্ধৃতি দিয়ে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেয়া যেতে পারে। যেমনঃ এই প্রকল্পের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, প্রকল্পের সিংহভাগ অর্থ ঠিকভাবে খরচ করা হয়নি, যেটি আপনি জানেন? এমনভাবে প্রশ্ন করলে অনেক ভালভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এক্ষেত্রে এমনভাবে বলতে হবে যে, এই ধারণাটি কোনোভাবেই আপনার নয়, বরং অন্যরা এমনটি মনে করছেন বলেই আপনি জিজ্ঞেস করছেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে, কোনোভাবেই যদি মোক্ষম প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া যায় তবে সরাসরি প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিতে হবে। কারণ এ প্রশ্নের উত্তরের ওপর আপনার প্রতিবেদনের সংবাদ মূল্য অনেকখানি নির্ভরশীল।

- **পিছু হটা (Shifting Gears)**

সাধারণত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনার জন্য যে মূল বা প্রধান সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হয় তা স্পর্শকাতর ও বিতর্কিত ইস্যুতে সম্পন্ন হয়। সে কারণে এ ধরনের সাক্ষাৎকারের পরিবেশ যে কোনো মুহূর্তে উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া এ ধরনের সাক্ষাৎকারে সবসময় কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এমন প্রত্যাশা করা বোকামি। অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া না গেলে তাতে উত্তেজিত বা চিন্তিত হওয়ার কোন দরকার নেই। বরং কিছুটা কৌশলী হতে হয়। এক্ষেত্রে পিছু হটাই শ্রেয়। অনেকটা গাড়ির গিয়ার পরিবর্তন করার মতো। Paul N. Williams বলছেন, "*If the conversation becomes too heated and if the target begins to refuse answering questions, shift gears.*"[২৬৩]

৯. স্পর্শকাতর পরিস্থিতি থেকে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ফিরে আসা (Recovering from the Bomb)

মোক্ষম প্রশ্নটির উত্তর দেয়ার যে বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা থেকে ফিরিয়ে এনে একটি হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে সাক্ষাৎকার শেষ করতে হবে। সপ্তম স্তরে যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ও পরিবেশ তৈরি হয়েছিল অষ্টম স্তরে এসে তা কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক। সেজন্য সম্পর্ক আবারও স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনার জন্য কিছুটা হালকা ধরনের প্রশ্ন করতে হবে।

১০. সাক্ষাৎকারের ইতি টানা (Concluding the Interview)

অনেকেই সাক্ষাৎকার বা আলাপচারিতা কীভাবে শেষ করবে তা নিয়ে সমস্যায় পড়ে যান। এটা আসলে এক ধরনের মোড়কাবৃত করার মতো। যখন আপনি কাউকে সুন্দর একটি উপহার দিতে যান তখন র‌্যাপিং পেপার দিয়ে মোড়কাবৃত করেন। সাক্ষাৎকার যখন শেষ তখন পুরো বিষয়টির সারাংশ টেনে তা শেষ করার দায়িত্ব প্রতিবেদকের। সহজ পদ্ধতি হলো সাক্ষাৎকারদাতাকে ইঙ্গিত দেয়া যে আলাপচারিতার ইতি টানতে যাচ্ছেন। এ পর্যায়ে বেশ কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হয়:

[২৬৩] Ibid, Paul N. Williams (1978), p. 87.

ক. সাক্ষাৎকারদাতাকে জিজ্ঞেস করা আলোচ্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য বাদ পড়েছে কিনা? বা এমন কোন প্রশ্ন করেননি যা আপনার জানা উচিত।

খ. কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ বুঝতে না পারলে তা আরেকবার যাচাই করে নেয়া সে শব্দ বা বাক্যের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারদাতা কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. মানুষ মাত্রই ভুলে যায়। জটিংস বা নোটবুকটি দেখে নেয়া, পরিকল্পনা অনুযায়ী সবগুলো দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে কিনা? কোন কিছু বাদ পড়লে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে নেয়া।

ঘ. ভিজিটিং কার্ড দেয়া, যাতে পরবর্তীতে কোন মত বা বিষয় মনে আসলে তা যেন জানাতে পারেন।

ঙ. যদি কোন দলিল-দস্তাবেজ প্রয়োজন হয় তা চেয়ে নেয়া।

চ. ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নেয়া। সাক্ষাৎকার যে ধরনের হোক না কেন কোনোভাবেই সাক্ষাৎকারদাতাকে ধন্যবাদ না দিয়ে বিদায় নেয়া যাবে না।

সাক্ষাৎকারের ৯টি 'আর' (The Nine Rs of Interviewing)

শিকাগোর পুলিশ বিশেষজ্ঞ স্টিভ রোডস্ (Steve Rhoads) সাংবাদিকদের ওয়ার্কশপে সাক্ষাৎকারের ৯টি 'আর' এর কথা বলেছেন।[২৬৪] সেগুলো হলো:

১. গ্রহণ (Receive)

ওপেন-এন্ডেড বা উন্মুক্ত ধরনের প্রশ্ন করুন। সাক্ষাৎকাদাতার বলার সময় হস্তক্ষেপ করবেন না। যতটা সম্ভব তত বেশি তথ্য গ্রহণ করুন।

২. প্রশমন (Relieve)

সাক্ষাৎকারদাতার বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করুন। সাক্ষাৎকারদাতা বিষয় বা প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে অধৈর্য হবেন না, রাগ প্রশমনের চেষ্টা করুন।

৩. প্রতিফলন (Reflect)

বোঝার চেষ্টা করুন আপনি বিস্তারিতভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়েছেন কিনা? মনে রাখবেন, আপনি অন্যের মতামত জানতে চেয়েছেন, সে সম্পর্কে আপনার ব্যাখ্যা জানাতে যাননি।

৪. পশ্চাদ্‌গমন (Regress)

প্রশ্ন করার সময় 'এর আগে.....'-এভাবে জিজ্ঞেস করুন। 'এরপর......' -- এভাবে প্রশ্ন করবেন না।

৫. পুনর্নির্মাণ (Reconstruct)

ধীরে ধীরে সাক্ষাৎকারের দৃশ্যায়ন ও মূল্যায়ন করতে থাকুন। কিছু বাদ যায়নি তো?

৬. গবেষণা (Research)

এর মাধ্যমে আপনি সাক্ষাৎকারের সবচেয়ে মোক্ষম প্রশ্নগুলো সম্পর্কে সক্ষম হবেন।

৭. পর্যালোচনা (Review)

তথ্য ও মন্তব্যগুলো যাচাই করে দেখুন।

৮. দূরত্বহ্রাস (Resolve)

যে কোনো ধরনের ভুল বোঝাবুঝি ও দূরত্ব দূর করুন।

৯. শেষ করা (Retire)

একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শেষ করুন।

---

২৬৪ David Spark (1999), Investigative Reporting: A Study in Technique, Oxford: Focal Press, p.79.

অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের ছয় বিপত্তি

ক. আস্থার অভাব

শিক্ষানবিশ প্রতিবেদকরা প্রায়ই এ সমস্যায় পড়েন। একজন ভাল অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারগ্রহীতা হতে হলে অবশ্যই প্রতিবেদককে নিজের প্রতি আস্থা বাড়াতে হবে। অবশ্য পটভূমি গবেষণা ও সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হলে স্বাভাবিকভাবে প্রতিবেদকের আস্থা বেড়ে যায়।

খ. পূর্ণাঙ্গ বা নতুন তথ্য পাওয়া

প্রায়ই শিক্ষানবিশ প্রতিবেদকরা এই অভিযোগ করেন যে, 'সাক্ষাৎকারদাতার সাথে আমার চমৎকার কথোপকথন হয়েছে; কিন্তু যখন আমি লিখতে বসি তখন বুঝতে পারি যে, আমি নতুন বা চমকপ্রদ কোন তথ্য পাইনি।' এ সমস্যাটি হয় প্রস্তুতিতে ঘাটতি থাকলে। কারণ একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে আগেভাগেই জানতে হয় অতীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কী প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়েছিল।

গ. পরবর্তী প্রশ্ন নিয়ে সমস্যা

সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরা প্রায়ই এ প্রশ্নটা করেন যে, অনেক সময় তারা কোনো প্রশ্নের এত চমৎকার উত্তর পান তাতে খেই হারিয়ে ফেলেন, বুঝতেই পারেন না পরবর্তী প্রশ্ন কী করবেন।

ঘ. নোট নেয়া

শ্রেণীকক্ষে নোট নেয়ার মতো করে নোট নেন না একজন সাংবাদিক। শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষার্থী শিক্ষকের পুরো বক্তব্য নোট নেন। কিন্তু একজন সাংবাদিককে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর নোট নিতে হয়। কিন্তু সাক্ষাৎকারের তুলনায় শ্রেণীকক্ষের লেকচার একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া। সে কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর নোট নেয়া সাক্ষাৎকারের সময় সহজ কাজ নয়।

সাক্ষাৎকারদাতার কথা নোট বইয়ে অক্ষরে অক্ষরে টুকে নেওয়া হচ্ছে দেখলে সাক্ষাৎকারদাতা সহজ হয়ে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করতে পারেন। একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়, যখন কোন স্পর্শকাতর প্রশ্নের বা বিষয়ের উত্তর দেন কিংবা কোন সাদামাটা প্রশ্নের উত্তর দিতে উত্তরদাতার নিজেই কোন স্পর্শকাতর বিষয়ের অবতারণা করেন তখন নোট না নেওয়া ভাল। কারণ হঠাৎ করে এ সময় আপনি নোট নিতে গেলে বিষয়টি সাক্ষাৎকারদাতার চোখে লাগতে পারে এবং তিনি সচেতন হয়ে পড়তে পারেন। এতে তার কথা বলার তাল কেটে যেতে পারে।

একটি স্পর্শকাতর বিষয়ের সাক্ষাৎকার চলাকালীন আপনি যখন প্রায়ই কলমের আঁচড় কাটবেন তখন তাতে সাক্ষাৎকারদাতা নার্ভাস বা অস্বস্তিবোধ করতে পারেন। উপরন্তু একটি ভাল সাক্ষাৎকারের জন্য প্রতিবেদকের উচিৎ সবসময় ভাল চক্ষু-সংযোগ (আই কন্ট্রাক্ট) রাখা। সাধারণত ভাল প্রতিবেদকরা আলাপের শুরুতেই নোট নেওয়া শুরু করেন না, বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নে ঢোকার পর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর আলোচনা শুরু হলেই তারা নোট নেওয়া শুরু করেন। কারণ আলোচনার শুরুতেই নোট নেওয়া শুরু করলে উত্তরদাতা ঘাবড়ে যেতে পারেন। যখন আলোচনার পরিবেশটি বন্ধুত্বপূর্ণ ও খোলামেলা হয়ে উঠে তখন প্রতিবেদক ধীরে ধীরে নোট নেওয়া শুরু করতে পারেন। অনেক ভালো সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর উপদেশ হলো, সৌহাদ্যপূর্ণ

সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আগে কখনই নোট বই ও টেপরেকর্ডার বের করা উচিত নয়। এতে সাক্ষাৎকারদাতা ভয় পেতে পারেন বা কিছুটা অস্বস্তিবোধ করতে পারেন। 'এ জার্নালিস্ট গাইড'-এ নোটবুক ব্যবহার সম্পর্কে অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, "*কোনো কোনো লোকের সামনে নোটবুক দোলাতে দোলাতে এগিয়ে গেলে সে হয়তো আপনাকে সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারে। তেমন সম্ভাবনাই বেশি। আপনার সাক্ষাৎকারদাতার সঙ্গে সবার আগে সম্পর্ক গড়ুন। আপনার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নোটবুকে আপত্তি করবে না-যদি আদৌ এমন কোন আশার রেশ থাকে, তাহলে ওটা চুপচাপ বের করুন অর্থাৎ বলুন, আমি যদি আপনার কথাগুলো একটু লিখে নিই, আপত্তি নেই তো? আমি চাই যেন তথ্যের ভুল না হয় কিংবা শুধু বলুন, কিছু মনে করবেন না ক'টি লাইন লিখে নিই। কোন সময় আপনি আপনার নোটবুক বের করবেন, আর সেটি সর্বোত্তম সময় হবে কি না সেটি আপনার বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়েই স্থির করুন।*"[২৬৫]

আবার উত্তরদাতা বা সাক্ষাৎকারদাতার পুরো বক্তব্য নোট নেওয়ার কোন দরকার নেই এবং তা সুবিবেচনাপ্রসূতও নয়। মূল পয়েন্টগুলো আপনি নোট নিতে পারেন। অনেক সময় সাক্ষাৎকারদাতা নোট গ্রহণের ওপর কড়া নজর রাখতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি হয়তো মনে করতে পারেন, সাক্ষাৎকারগ্রহীতা যেসব বিষয়ে নোট নিচ্ছেন না, সেগুলোকে কম গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হিসেবে গণ্য করছেন। এ ধরনের পরিস্থিতি মনে হলে চক্ষু-সংযোগ বা আই-কন্ট্রাক্ট বাড়ানোই গুরুত্বপূর্ণ।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদক হিসেবে আপনি সাক্ষাৎকার চলাকালীন যতটুকুই নোট নেন কেন তা ওইদিনই অর্থাৎ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার দিনই পূর্ণাঙ্গ টাইপ করে ফেলা উচিত। কারণ ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখলে আপনি ভুলে যেতে পারেন এবং অনেক সময় দেরি হলে নিজের নেওয়া নোটের মর্ম নিজের পক্ষেই উদ্ধার করা কষ্টকর হতে পারে। একটি বিষয় মনে রাখা দরকার, টেপরেকর্ডার ব্যবহার করা হলেও কিছু কিছু মূল বা উল্লেখযোগ্য বিষয়ের নোট নেওয়া ভাল। তা টেপরেকর্ডার থেকে বক্তব্যগুলো লেখার সময় স্মৃতিশক্তিকে সজীব করে তুলতে সাহায্য করবে।

সব ধরনের বিপত্তি এড়িয়ে ভাল অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী হওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই আপনার স্মৃতিশক্তির দক্ষতা বাড়াতে হবে এবং নিজের স্মৃতিশক্তির উপর আস্থা না বাড়লে আপনার সাক্ষাৎকার গ্রহণে ছেদ পড়তে পারে। অনেক সময় এমন পরিস্থিতিতে আপনাকে পড়তে হতে পারে যেখানে কোন ভাবেই নোট নিতে পারবেন না কিংবা টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করতে পারবেন না। বিভৎস হত্যাকাণ্ডের ওপর রচিত In Cool Blood: A True Account of a Multiple Murder and Its Consequences বইতে Truman Capote বলেছেন, অনেক ব্যক্তি সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় নোট নিতে গেলে খুব অস্বস্তিবোধ করেন। তিনি লিখেছেন, "*If you write down or tape what people say, it makes them feel inhibited and self-conscious. It makes them say what they think you expect them to say....*"[২৬৬]

[২৬৫] প্রাগুক্ত, আফতাব হোসেন (অনুবাদ), পৃ- ১৮৮।

[২৬৬] Capote, Truman (1965), In Cool Blood: A True Account of a Multiple Murder and Its Consequences, New York, Random House.

ঙ. টেপ রেকর্ডিং (Tape Recording)

অনেকেই সাক্ষাৎকারে টেপ রেকর্ডিংয়ের বিরোধী। এস এম আলী তাঁর 'সাক্ষাৎকার গ্রহণ কৌশল' নিবন্ধে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, "*এশীয় বহু নেতা যেমন, ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট (সাবেক) মার্কোস, সিঙ্গাপুরের উপ-প্রধানমন্ত্রী এস রাজরত্নম এতে কোনোই আপত্তি করেননি। কিন্তু আরও একদল নেতা আছেন যেমন বাংলাদেশের শেখ মুজিবুর রহমান ও মালয়েশিয়ার তুন আবদুল রাজ্জাকের মতো নেতারা এই যন্ত্রের ব্যবহারে আপত্তি করতেন।*"[২৬৭] বিরোধীরা মনে করেন, যন্ত্র অনেক সময় নোটপ্যাডের চেয়ে সাক্ষাৎকারদাতার মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করতে পারে বা করে। Paul N. Williams বলছেন, তারও দীর্ঘদিন ধরে একই রকম ধারণা ছিল। তিনি বলেছেন, "*তিনি ১৯৫০ এর দশক পর্যন্ত একে বাতুলতাই মনে করতেন কিন্তু ১৯৭০ এর দশকে এসে তিনি টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করা শুরু করেন এবং এই ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিকাংশ আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারে এটিকে ক্ষতির কারণ হিসেবে তার কখনই মনে হয়নি*"[২৬৮]। তিনি ১৯৭৪ সালে এসোসিয়েটেড প্রেস ম্যানেজিং এডিটরস-এর জন্য পাবলিক রিলেশনস সোসাইটি অব আমেরিকা (পিআরএসএ)-এর হয়ে এ বিষয়ে জরিপও পরিচালনা করেন। এ ব্যবসা, রাজনীতি, শিক্ষা ও শ্রম ক্ষেত্রে আমেরিকার ৪৭০ জন জাতীয়ভাবে পরিচিত ব্যক্তি প্রশ্নপত্র পূরণ করেন। তাদের মধ্যে ৫৩ শতাংশ মনে করেন, আগের বছর তাদের বক্তব্য ভুলভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছিল। ৮৩.৯ শতাংশ অভিযোগ করেন, সংবাদপত্রগুলো তাদের বক্তব্য ভুলভাবে উদ্ধৃত করেন, যেখানে ২০ শতাংশের অভিযোগ ছিল রেডিও এবং টেলিভিশনের বিরুদ্ধে। ৬৯.৬ শতাংশ মনে করেন, আন্তঃব্যক্তিক আলাপের সময় টেপরেকর্ডার ব্যবহার করা হলে এ ধরনের ভুল উদ্ধৃতির প্রবণতা হ্রাস পাবে। গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশ ছিল এরকম, "*Wide use of tape recorders might help build credibility for reporters and newspapers.*"[২৬৯]

তাছাড়া টেপরেকর্ডার একটি রেফারেন্স হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে টেপরেকর্ডার ব্যবহারের অসুবিধাও আছে। যে কোন সময় টেপরেকর্ডারের ব্যাটারি শেষ বা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে উচিত প্রতিটি সাক্ষাৎকারের আগে নতুন ব্যাটারি সংযোজন করা। টেপরেকর্ডারের সাথে যদি মাইক্রোফোন থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে মাইক্রোফোনের সঙ্গে কোন বাহ্যিক শব্দ (noise) গোলযোগ সৃষ্টি করছে কিনা তা সাক্ষাৎকার শুরুর আগেই দেখে নেওয়া ভাল। রেকর্ডার চালু করার আগে অবশ্যই অনুমতি নেওয়া উচিত। এটি এক ধরনের সৌজন্যতা। তবে 'আমি কি এই সাক্ষাৎকার রেকর্ড করতে পারি?'-এভাবে অনুমতি নেওয়া উচিত নয়; বরং বলতে হবে, 'আমি ঠিকঠাকভাবে সাক্ষাৎকারটি নেওয়ার জন্য বা আপনার মন্তব্যগুলো যথাযথভাবে প্রকাশের জন্য সাক্ষাৎকারটি রেকর্ড করতে চাই'। এমনভাবে বললে সাক্ষাৎকারদাতা মনে এই ভেবে স্বস্তিবোধ হবে যে, আপনি সাক্ষাৎকারদাতার জন্য ক্ষতিকর কিছু করবেন না।

চ. নাম প্রকাশ না করা

"*An anonymous source may be better than no source, but it is certainly not as good as an identified source. That is because the reader can judge the credibility of a source only when the reader knows the source's identity.*"[২৭০]

---

[২৬৭] প্রাগুক্ত, আফতাব হোসেন (অনুবাদ), পৃ- ১৮৯।

[২৬৮] Ibid, Paul N. Williams (1978), p. 90.

[২৬৯] 1974 APME-PRSA survey, released through APME, 1975, n.p.

[২৭০] Ibid, M.K.Verma (2009), p. 109.

প্রায়ই সোর্সকে বলতে শোনা যায়, 'অফ দ্য রেকর্ড' বা এই তথ্য 'অবশ্যই অফ দ্য রেকর্ড'। সমস্যা হলো, এই অফ দ্য রেকর্ড বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন তা আসলে তিনি নিজেও পরিষ্কার থাকেন না অনেক সময়। দুঃখজনক হলো, অনেক সময় অনেক প্রতিবেদকও তা বোঝেন না। অফ-দ্য-রেকর্ড শব্দটি এত বহুল প্রচলিত যে, অনেক সময় এর অতিরঞ্জিত ব্যবহার হয়। যেমনঃ কোন সোর্স হয়তো আপনাকে বললেন যে, এই তথ্যটি অফ-দ্য-রেকর্ড। এ সময় আপনার পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া উচিত যে, আসলে তিনি অফ-দ্য-রেকর্ড বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছেন। অফ-দ্য-রেকর্ড বলতে 'তথ্যটি প্রকাশ করা যাবে না' নাকি 'তথ্যটি প্রকাশ করা যাবে কিন্তু সোর্সের পরিচয় গোপন করা যাবে না' সে বিষয়ে স্পষ্ট হতে হবে। Sheila S. Coronel বলেছেন, "*This is tricky condition that sources often mistake for `not for attribution'. Both journalists and sources often misuse the term. Strictly speaking, `off the record' means the information cannot be used either in the report or for further reporting. Thus, a journalist should always clarify what `off the record' means to a source.*"[২৭১]

বিভিন্ন ধরনের নামহীনতা বা সম্বোধন আরোপন না করার শর্ত থাকতে পারে, যেগুলো সম্বন্ধে প্রতিবেদকের অবশ্যই পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। যেমনঃ

১. অফ-দ্য-রেকর্ড

অনেক সময় একজন সোর্স প্রতিবেদককে অফ দ্য রেকর্ড কিছু তথ্য দিতে পারেন। অর্থাৎ তথ্যটি অন্য কোন সোর্স বা উৎস থেকে পাওয়া না গেলে প্রতিবেদক এই তথ্যটি ব্যবহার করতে পারবেন না। আবার অনেক সময় কোন ঘটনা ঘটবে এমন তথ্যও অফ-দ্য-রেকর্ড হিসেবে সাংবাদিকদের অনেকেই জানিয়ে থাকেন। যেমনঃ ধরুন, পুলিশ মাদকবিরোধী কোন নির্দিষ্ট এলাকায় অভিযান চালাবে আজ রাতে। এ তথ্যটি যদি অফ-দ্য-রেকর্ড না হয় তাহলে এ অভিযান ফলপ্রসূ হতে পারে না। এখানে মনে রাখতে হবে,

"*The reporter promises not to use the information provided by the source, unless the infomation comes from another source entirely. The source cannot forbid the reporter to use the information under those conditions.*"[২৭২] *Dennis Stauffer Lye* সুন্দরভাবে অফ-দ্য-রেকর্ড পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন, "*This is as restrictive as you can get. It means that nothing that you say will be repeated, anywhere, anytime. It enters the reporter's ears and stops.*"[২৭৩] কোন সোর্স অফ-দ্য-রেকর্ড কিছু বললে তা উন্মোচন বা প্রকাশ করার জন্য সব ধরনের বিকল্প উপায় বা সোর্স ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত।

২. পরিচিতি ব্যবহার না করা

ইংরেজিতে একে বলে নট ফর এট্রিবিউশন (Not for attribution)। অর্থাৎ ওই প্রতিবেদক তথ্যটি ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু কোনভাবেই তথ্যের উৎস হিসেবে সোর্সের পরিচিতি সরাসরি উল্লেখ করা যাবে না কিংবা টেলিভিশনে হলে তার চেহারা দেখানো যাবে না। অনেক সময় টেলিভিশনে চেহারা দেখানো হয় কিন্তু এমনভাবে অস্বচ্ছ করে দেখানো হয় যাতে ওই

---

[২৭১] Ibid, Sheila S. Coronel, (2009), p. 161.
[২৭২] Ibid, Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), chapter 4, p. 46.
[২৭৩] Dennis Stauffer (1994), Media Smart: How to Handle a Reporter, USA, p. 178.

ব্যক্তিটি কে তা ধরা না পড়ে। এক্ষেত্রে সোর্সের পরিচিতি একেবারে সাধারণীকরণ করে উল্লেখ করতে হয়। যেমন: অর্থ সচিব কোন তথ্য আপনাকে দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে সরাসরি তার নাম ও পদবি ব্যবহার করা যাবে না; বরং আপনি লিখতে পারেন 'অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানিয়েছেন'। তবে একটি কথা মনে রাখা দরকার, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে কোন নেতিবাচক মন্তব্য কিংবা তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সে তথ্য বা মন্তব্য কোন নামহীন বা পরিচয়হীন সূত্রের বরাত দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না। M. K. Verma বলেছেন, "*Any information that is negative about a particular person should never come from an anonymous source.*"[২৭৪] *Dennis Stauffer* বলেছেন, "*This is the classic "anonymous source" agreement. It means the reporter can use the information, but won't say where it came from. It's used by people who want the information included in the story, but who doesn't want it attributed to them.*"[২৭৫]

নাম-পরিচয় সূত্র ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে কিন্তু কোন স্বাধীন গণমাধ্যম ব্যবস্থায় এখন আর অন্যায় কিছু নয়। Sheila S. Coronel বলছেন, "*In every country that has a free press, unnamed sources are part of the journalist's toolkit. These days, anonymous sources are all over the newspaper and even television.*"[২৭৬] বহু আগে থেকেই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে নামহীন সূত্র বা সূত্রের মন্তব্য প্রকাশিত হয়ে আসছে। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর উদঘাটনকারী বব উডওয়ার্ড ও কার্ল বার্নস্টাইনও পরিচয়হীন সূত্র ব্যবহার করেছিলেন। তারা এ সূত্রের নাম দিয়েছিলেন 'ডিপ থ্রোট' (Deep Throat)। ৩১ বছর পর্যন্ত কেউ জানতেন না এই ডিপ থ্রোটের আসল পরিচয়।

২০০৫ সালের ৩১ মে ভ্যানিটি ফেয়ার ম্যাগাজিনে স্যার উইলিয়াম মার্ক ফেল্টের পরিচয় উন্মোচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতার নিরিখে সত্য উন্মোচনের চিরাচরিত দাবি পূরণে বা জনগণকে তথ্য জানানোর জন্য অনেক সময় প্রতিবেদককে এই নাম-পরিচয়হীন সূত্র ব্যবহার করতে হয়। Sheila S. Coronel বলেছেন, "*Nobody knew who he was until Deep Throat came out to reveal himself more than 30 years after the investigation. It can be argued that without unnamed sources, significant information that has an impact on politics and policy will never be made public. Some important stories that are high in the public interest may also never get written or aired.*"[২৭৭] কিন্তু এই অভ্যাসটির বেশ অপব্যবহার হচ্ছে। কষ্ট করে তথ্য আহরণের পরিবর্তে, অনেক লোক বা সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ বা তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পরিবর্তে প্রতিবেদকরা আজকাল একজন সূত্রের ওপর নির্ভর করে, একাধিক অসমর্থিত বা বেনামী সূত্রের বরাত দিয়ে দুর্নীতির দুর্বল প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। রসালো একটি শিরোনাম দেয়ার প্রতিযোগিতা বেশ বেড়েই চলেছে। কিন্তু এ ধরনের অপব্যবহার সংবাদপত্র, টেলিভিশনসহ গণমাধ্যমের বিশ্বস্ততা নষ্ট করছে। নিউইয়র্ক টাইমসের সাবেক পাবলিক এডিটর ডেনিয়েল অরকেন্ট (Daniel Orkent) বলেছেন, নাম-পরিচয়হীন সূত্রের ব্যাপারে অনেক পাঠক থেকে তারা অভিযোগ পেয়েছেন। ২০০৫ সালে তিনি টাইমসের অনলাইন সংস্করণে নামহীন বা বেনামী তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা

---

[২৭৪] Ibid, M.K.Verma (2009), p. 110.

[২৭৫] Ibid, Dennis Stauffer (1994), p. 181.

[২৭৬] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p. 168.

[২৭৭] Ibid, p.168.

নিয়ে পাঠকদের মতামতগুলো তুলে ধরেছিলেন। সেখানে দেখা গিয়েছে, অনেক পাঠক মনে করে যেসব প্রতিবেদক বেনামী তথ্য দেয় তারা আসলে অলস। সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো, অনেক পাঠক মনে করেন যে, বেনামী তথ্যগুলো আসলে নিজেদের মনের কথা। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিউইয়র্ক টাইমসের একজন ভাল প্রতিবেদকের বেনামী সূত্রের তথ্য কেলেঙ্কারীর পর পত্রিকাটি প্রতিবেদকদের জন্য বেশ কড়া নির্দেশিকা তৈরি করে। এর এক মাস পর ওয়াশিংটন পোস্টও সোর্স, উদ্ধৃতি ও পরিচিতি ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করে। তবে দুটি পত্রিকাই বেনামী সোর্স যতটুকু সম্ভব নির্দিষ্ট করার ওপর জোর দিয়েছে। যেমন: 'সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা' বলার চেয়ে পত্রিকা দুটি '... অমুক মন্ত্রণালয়ের ... পদবীর কর্মকর্তা' বলাই শ্রেয় মনে করে।[২৭৮] বেনামী সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন বাড়তে থাকায় দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ মাধ্যমে বেনামী বা নাম-পরিচয়হীন সূত্রের ব্যবহার ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। ২০০৩ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৮১ সালে সংবাদ মাধ্যমে ব্যবহৃত সব ধরনের সূত্রের মধ্যে ৩০% ছিল বেনামী, ১৯৯৩ সালে এসে এ হার দাঁড়ায় ২৫ শতাংশে, ২০০১ সালে যা হয় ২০%। টেলিভিশনে এ হার আরো কম; ১৯৯৩ সালে টেলিভিশনে বেনামী সূত্র ব্যবহারের হার ছিল ২১%, যা ২০০১ সালে এসে দাঁড়ায় ১৪%-এ।[২৭৯]

তথ্যের উৎস হিসেবে সোর্সের নাম ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না তা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সোর্সের মর্জির ওপর। সেক্ষেত্রে তার জীবন ও পেশার নিরাপত্তার কথা তিনিই বিবেচনা করবেন। কিন্তু প্রতিবেদক হিসেবে অবশ্যই আপনাকে সোর্সের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটি আপনার পেশাগত নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। নাম-পরিচয়হীন সোর্সের মাধ্যমে কোন তথ্য প্রকাশ করলে তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে তথ্য যদি ভুল হয়, তাহলে প্রতিবেদক হিসেবে আপনার বিশ্বযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে, "*Using anonymous sources transfer the risk of using the information from the source to you. Your credibility is at stake if the information is wrong.*"[২৮০] এজন্য নামহীন বা পরিচয়হীন তথ্যের দায়ভার সম্পূর্ণই প্রতিবেদকের ওপর বর্তায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেনামী সূত্র প্রতিবেদনে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট নিয়মকানুন এখনও পর্যন্ত তৈরি হয়নি। যেটি সাধারণ নিয়ম সেটি হলো, খুবই ব্যতিক্রম পরিস্থিতি ছাড়া কখনই একক সূত্র হিসেবে বেনামী কোন সূত্রের উল্লেখ করা যাবে না। কোনভাবেই নিম্নোক্তভাবে যাচাই-বাছাই না করে নামহীন-পরিচয়হীন তথ্য প্রকাশ করা উচিত নয়:

- অন্যান্য সোর্স বা উৎস থেকে ডকুমেন্টরি বা উপাত্তভিত্তিক প্রমাণ সংগ্রহ করা;
- নাম প্রকাশ করতে চান না এমন সোর্স আপনাকে যে তথ্যটি দিয়েছে তা তার দেওয়া অন্যান্য তথ্যের সাথে যাচাই করে নেওয়া;
- এই সোর্সটি অতীতে বিশ্বাসযোগ্য ছিল কিনা;
- যদি সোর্সটি কোন উপাত্ত বা ডকুমেন্টের ভিত্তিতে আপনাকে এই তথ্যটি দিয়ে থাকেন তাহলে সে ডকুমেন্টটি তার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া এবং তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সে উপাত্তটি যাচাই করে নেওয়া।

টেলিভিশনের ক্ষেত্রে যখন বেনামী সূত্রের পরিচয় তুলে ধরা যায় না তখন অপেক্ষাকৃত বেশি

---

[২৭৮] Ibid, p. 169.

[২৭৯] Ibid.

[২৮০] Ibid, Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), p. 46.

যত্নবান হতে হয়। বিবিসির সম্পাদকীয় নীতিতে বলা হয়েছে:

'অবশ্যই নিশ্চিত করতে যে, বেনামী সূত্র তখনই জরুরি হবে যখন এটি কার্যকর হবে। ছবি এবং কণ্ঠ-উভয় ক্ষেত্রেই ছদ্মবেশ দরকার হতে পারে। প্রযুক্তিগতভাবে বিকৃত করার চেয়ে অন্য ব্যক্তির কণ্ঠস্বর (ভয়েস-ওভার) ব্যবহার করা ভাল, তবে এক্ষেত্রে দর্শক-শ্রোতাকে বলে দিতে হবে তারা কী এবং কীভাবে শুনছেন। ছবির ক্ষেত্রে নাম-পরিচয় গোপন করার উত্তম পন্থা হিসেবে ছবি বিকৃত বা অন্য ছবি জুড়ে দেয়ার চেয়ে অস্পষ্ট কিংবা দুর্বোধ্য করে দেয়াই ভাল।' এখানে আরো বলা হয়েছে, "*To avoid any risk of 'jigsaw identification' (that is, revealing several pieces of information in words or images that can be pieced together to identify the individual), our promises of anonymity may also need to include, for example, considering the way a contributor or source is described, blurring car number plates, editing out certain pieces of information (whether spoken by the contributor or others) and taking care not to reveal the location of a contributor's home. Note that, in some circumstances, avoiding the 'jigsaw effect' may require taking account of information already in the public domain.*"[২৮১]

৩. ব্যাকগ্রাউন্ড

এটি এক ধরনের অফ-দ্য-রেকর্ড পরিস্থিতি। সাধারণত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এ ধরনের তথ্য সরবরাহ করে থাকেন। অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অনেক সময় সাংবাদিকদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে থাকেন। কিন্তু কোনভাবেই ওই কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম-পরিচয় দিয়ে ওই তথ্য প্রকাশ করা যায় না। যেমন ঃ ধরুন, সিটি করপোরেশনের কোন কর্মকর্তার সঙ্গে আপনি হয়তো সড়ক বাতি বা স্ট্রিট লাইটের বেহাল দশা নিয়ে অনানুষ্ঠানিক আলাপ করছিলেন। সিটি করপোরেশনের কোন কর্মকর্তা আপনাকে এই আলাপচারিতায় জানালেন যে, সড়ক বাতিগুলোর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে দুই বছর হয়ে গেছে। কিন্তু এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে সিটি মেয়র নিজের জন্য গাড়ি কিনেছেন। আপনি হয়তো এর মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন কেন শহর রাতের বেলা অন্ধকার থাকে। কিন্তু আপনি শুধু এর মাধ্যমেই কোন প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবেন না। এটি একটি অফ-দ্য-রেকর্ড তথ্য। এ ধরনের তথ্যকে বলে ব্যাকগ্রাউন্ড। Leonard M. Kantumoya বলেছেন, "*Background situations are unproductive, unless they are only temporarily off the record and can be used at a later time.*"[২৮২] যে কোন ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড সাক্ষাৎকার অবশ্যই অফ-দ্য-রেকর্ড হবে। তবে আপনার সাথে অবশ্যই রেকর্ডিং সামগ্রী থাকতে পারে এবং তা আপনি ধারণও করতে পারেন।

৪. গভীর পটভূমি (Deep Background)

এটি অফ-দ্য-রেকর্ড তথ্য ব্যবহারের এক ধরনের জনপ্রিয় পদ্ধতি। ডিপ ব্যাকগ্রাউন্ড এমন এক ধরনের সোর্স বা সূত্র যা আসল সোর্স নয়। একজন প্রতিবেদক কোনভাবেই তার সংবাদে সোর্সের পরিচিতি তুলে ধরতে পারে না। ওয়াটার গেট অনুসন্ধানের জনক উডওয়ার্ড-বার্নস্টাইনের ব্যবহারের মাধ্যমে এটি জনপ্রিয় হয়। উডওয়ার্ড-বার্নস্টাইন তাদের

---

[২৮১] BBC Editorial Guidelines, Section 06 (6.4.12): Fairness, Contributors and Consent, BBC, P-57.

[২৮২] Ibid, Leonard M. Kantumoya (2004), p-47

অফ-দ্য-রেকর্ড সূত্রের নাম দিয়েছিলেন ‘Deep Throat’. তাঁরা ‘All the President's Men’ বইতে এই ডিপ থ্রোটের সঙ্গে এক ধরনের এগ্রিমেন্ট বা চুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যাকে তারা বলেছেন ডিপ বেকগ্রাউন্ড এগ্রিমেন্ট হিসেবে, “*He [Woodward] would never identify him or his position to anyone. ... He agreed never to quote the man, even as an anonymous source. Their discussions would be only to confirm information that had been obtained elsewhere and to add some perspective.*” Associated Press এর *Mike Feinsilber* এর মতে ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন বা অফ-দ্য-রেকর্ডের অর্থ হলো, ‘আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে রাজি যদি আপনি আমার নাম বা পদবী ব্যবহার না করার শর্তে সম্মত হন’।

৫. অন-দ্য-রেকর্ড

এক্ষেত্রে প্রতিবেদক তথ্য ও সোর্সের পরিচিতি দুটোই প্রকাশ করতে পারেন। পত্রিকায় আপনি এই সোর্সের নাম প্রকাশ করতে পারেন কিংবা টেলিভিশনে তাকে দেখাতে পারেন। তবে এটি নির্ভর করবে আপনার সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যের ওপর।

ব্যতিক্রম

অনেক সময় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যে কোনো ভাবেই সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাওয়া যায় না। যখন সাক্ষাৎকারদাতা বুঝতে পারেন তার কৃতকর্মের বিষয়ে প্রতিবেদক প্রতিবেদন করতে চান তখন তিনি নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করেন। সেক্ষেত্রে সরাসরি সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাওয়া না গেলে ভিন্ন কিছু কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

১. একজন প্রতিবেদক কোন মন্ত্রী বা সরকারি কোন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার দুর্নীতির বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরির জন্য ওই মন্ত্রী বা সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার চেয়েও পাননি। সেক্ষেত্রে প্রতিবেদক মন্ত্রী বা সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারেন। মন্ত্রী বা সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাটি কার্যালয় থেকে বের হলে তার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া যেতে পারে। এছাড়া কোন অনুষ্ঠানে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন প্রতিবেদক। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতিবেদককে ভদ্রতা ও নম্রতার সাথে প্রশ্ন করতে হবে। 'Digging Deeper: A Guide for Investigative Journalists in the Balkans' পুস্তকে বলা হয়েছে, “*If sources still refuse to be persuaded, journalists can wait at their doors - stake out their offices or homes and, with cameras ready, wait for them to come out, so they can ask their questions.*”[২৮৩]

২. ইমেইলের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর চাওয়া যেতে পারে।

গিডিওন রুফারো-এর নেয়া সাক্ষাৎকারের পর্যালোচনা

এখন নিশ্চয় আপনি নিজেই গিডিওনের সাক্ষাৎকারের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

গিডিওন: জনাব মন্ত্রী, সুপ্রভাত, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সম্মত হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যমকে বলেছেন যে, সরকারি যান সরবরাহের জন্য সিডর মটরের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে ‘অনভিপ্রেত কিছুই’ হয়নি। কিন্তু আমাদের সোর্স বলছে যে, সিডরের দেয়া দাম অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও আপনি সিডরকে চুক্তির জন্য বিবেচনা

[২৮৩] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p. 160.

করেছেন। আপনি কি দয়া করে এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানাবেন?
(গিডিওন তার সাক্ষাৎকারে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যূনতম চেষ্টাই করেননি। সাক্ষাৎকারের স্বাভাবিক নিয়ম যেগুলো, যেমন: নাম জানা, সামান্যতম সৌজন্যতা প্রদর্শন অথবা অন্য যে কোন উপায়ে মন্ত্রীর সঙ্গে একটি ভাল আলাপচারিতার পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করা হয়নি। গিডিওন পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে তাড়াহুড়ো করে তার নির্ধারিত প্রশ্নের মাধ্যমে খুব দ্রুত মূল বিষয়ে এবং স্পর্শকাতর প্রশ্নে চলে গেছেন।)

মন্ত্রী: এসব সোর্স কারা? একজনের নাম বলুন!

গিডিওন: আপনি জানেন, আমরা আমাদের সোর্সের পরিচয় উন্মোচন করি না। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, আপনার অফিসের জন্য যে লিমুজিন গাড়ি কিনেছেন সিডর মটর থেকে তার দাম বাজারে ৩০% কম........

মন্ত্রী: যদি আপনি বলতে চান যে, আমি মিথ্যে বলছি, তাহলে তা নিয়ে এ সাক্ষাৎকারে কোন আলোচনা হবে না। আপনি জানেন, সরকারি গাড়ির অতিরিক্ত কিছু বিষয় থাকে, যেমন -- নিরাপত্তার বিষয়টি দেখতে হয়। যাহোক, আপনার পত্রিকা কী করে, আমার মতো পদমর্যাদার একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য আপনার মতো কম বয়সের একজনকে পাঠালো?

গিডিওন: সত্যি, মাননীয় মন্ত্রী! আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি আমি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় মাস্টার্স পাস করেছি।

(গিডিওন হয়তো এখানে মন্ত্রীর কৌশলটি বুঝতে পারেননি, মন্ত্রী হয়তো ইচ্ছেকৃতভাবে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিবেদককে অপমান করতে চেয়েছেন। এটি অনেক বেশি ভাল হতো যদি গিডিওন মন্ত্রীর বক্তব্যের জবাবে বলতেন, 'মাননীয় মন্ত্রী, আপনার পত্রিকা আমাকে এসাইনমেন্টটি দিয়েছে, সেজন্য মনে হয় আমরা বিষয়ের মধ্যে থাকলে খুব ভাল হয়।')

মন্ত্রী: আহ! আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের একজন চাকর! আপনি যে আমাকে ফাঁদে ফেলবেন এতে আমি বিস্মিত হচ্ছি না।

গিডিওন: আমরা যদি আমাদের বিষয়ে ফিরে যাই .... সরকার কি এ অভিযোগের বিষয় খতিয়ে দেখছে? সরকারের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কমপক্ষে তিনটি দরদাতা থাকা দরকার বা বিবেচনা করতে হয়। সেক্ষেত্রে আপনি কীভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন যেখানে কোন টেন্ডারই আহ্বান করা হয়নি?

(গিডিওন এবার বুঝতে পেরেছেন, অপমানের জবাব দেয়া তার উচিত হয়নি। তিনি এ পর্যায়ে চমৎকারভাবে বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু তার কৌশলে দুর্বলতা ছিল। এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি শুরুতেই করা যেত এবং এটি তখন করলে এ বিষয়ে মন্ত্রী বিস্তারিত বলার সুযোগ পেতেন।)

মন্ত্রী: আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে চাই যে আমরা কোন ধরনের আজগুবি গুজবে বিচলিত নই। সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রত্যেকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

গিডিওন: তাহলে কে ....
(এখানে সত্যিই গিডিওন রূঢ়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন। শুরুতে মন্ত্রীকে কিছুটা বকবক করতে দিলে খুব বেশি ক্ষতি হতো না। তাছাড়া এখানে প্রশ্নটি হবে 'কে?' নয় বরং এটি হবে

‘কীভাবে?’। গিডিওন শুরুতেই মন্ত্রীর কাছ থেকে পরিষ্কার ধারণা নিতে পারতেন সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়াটি আসলে কী? এবং সে বিষয়ে মন্ত্রী কী করেছেন তার ব্যাখ্যা পেলে মন্ত্রীর জন্য প্রশ্নটি ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে প্রতীয়মান নাও হতে পারতো।)

মন্ত্রী: আমার বক্তব্যে বাধা দেবেন না। আপনার মতো ছোট্ট হায়নার কাছ থেকে আমি সর্বনিম্ন মৌলিক ভদ্রতা প্রত্যাশা করি।

গিডিওন: মন্ত্রী সাহেব, আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট ভদ্র নন..........
(একেবারেই ভুল! আবারও প্রতিবেদক ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়লেন। মন্ত্রী খুব কৌশলে দ্রুত সাক্ষাৎকারের সময় শেষ করতে চাচ্ছিলেন এখানে কৌশলে তিনি যদি মন্ত্রীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করতেন তাহলে অনেক ভাল হতো। তিনি বলতে পারতেন, ‘মাননীয় মন্ত্রী, আমি আসলে খুবই সীমিত সময় সম্পর্কে খুব চিন্তিত। আপনি বলুন।)

মন্ত্রী: আপনার সাহস কত! যা হোক আপনার অবশ্যই জানা উচিত যে, আমাদের সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ধারিত সময় পাঁচ মিনিট এবং সে সময় পার হয়ে গেছে। এরকম অথর্ব বিষয়ে নষ্ট করার মতো মূল্যবান সময় আমার নেই। (রিং বাজলো)। আমার সেক্রেটারি আপনাকে পথ দেখিয়ে দেবেন।

গিডিওন: কিন্তু মন্ত্রী সাহেব .... !
(হ্যাঁ, এই পরিসমাপ্তি খুবই অনুমানযোগ্য। মন্ত্রী সঙ্গত কারণেই গিডিওনকে সময় দিতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু আরেকটু কৌশলী হলে আরও বেশি সময় ধরে সাক্ষাৎকার নেয়া যেত এবং বেশি তথ্য পাওয়া সম্ভব ছিল)

তথ্যসূত্র

Allen Bell (1991), The Language of News Media, Oxford: Blackwell.
BBC Editorial Guidelines, Section 06 (6.4.12): Fairness, Contributors and Consent, BBC.
Capote, Truman (1965), In Cool Blood: A True Account of a Multiple Murder and Its Consequences, New York, Random House.
Carl R, Rogers, and F. J. Roethlisberger (1952), "Barriers and Gateways to Communication.", Harvard Business Review, July-Aug, 1952.
Carole Rich (2010), Writing and Reporting News: A Coaching Method, Sixth edition, Wardsworth, USA.
Charles L. Yeschke (2003), The Art of Investigative Interviewing: A Human Approach to Testimonial Evidence, second edition, Butterworth Heimann, New York.
Claudia Dreifus (1997), Interview, New York: Seven Stories.
Dennis Stauffer (1994), Media Smart: How to Handle a Reporter, USA.
Dexter, Lewis Anthony (1970), Elite and Specialized Interviewing. Evanston, Ill.: Northwestern University Press.
Downs, Cal W., G. Paul Smeyak, and Ernest Martin (1980), Professional Interviewing, New York: Harper and Row.
Drake, John D (1972), Interviewing for Managers: Sizing up People, New York: American Management Association.
Gerry Keir, Maxwell McCombs & Donald L. Shaw (1986), Advanced Reporting: Beyond News Events, Longman Inc, New York.
Gorden, Raymond L. (1969), Interviewing: Strategy, Techniques, and Tactics Homewood, Ill.: Dorsey Press.
Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals, http://www.investigative-journalism-africa.info/
Hugh C. Sherwood (1969), The Journalistic Interview, First Edition, Haroer & Row Publishers, New York.
Itule Bruce and Anderson Douglas (2008), News Writing and Reporting for Today’s Media, McGraw

অধ্যায়
১১

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পর্যবেক্ষণ ও জরিপ

এ অধ্যায়ে থাকছে
- পর্যবেক্ষণ
- জরিপ

পর্যবেক্ষণ (Surveillance)

যে কোন অনুমোচিত ঘটনার ক্ষেত্রে ঘটনাটি সরাসরি দেখার জন্য কিংবা পরিস্থিতি পরখ করে দেখতে পর্যবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ব্যক্তিগত বা সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবেদক নিজেই প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে যান এবং সরাসরি তথ্য পান। এতে কিভাবে ঘটনাটি ঘটছে বা কি হচ্ছে সে সম্পর্কে প্রতিবেদক সরাসরিই অবগত হন। যা থেকে তিনি পরবর্তীতে অনুমোচিত ঘটনা উদ্ধারের কৌশল খুঁজে পান। Leonard M. Kantumoya বলেছেন, "*Surveillance places you the reporter in a situation where you become an eye-witness to an unfolding event. You get information first-hand through personal observation. Through personal observation, you are able to see how things develop. One thing leads to another, links begin to come into view and, finally, you recognise a pattern emerging from occurrences which at first instance appear to be isolated and purely coincidental.*"[২৮৪]

যদিও তথ্য অধিকার আইন বলবৎ আছে, তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে প্রায়ই প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রতিবেদকদের ভোগান্তির শিকার হতে হয়। অনেক সময় তা সংগ্রহও করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে প্রতিবেদককে নিজস্ব পর্যবেক্ষণ এবং সাক্ষাৎকারের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। ঘটনা বা পরিস্থিতি সচক্ষে অবলোকন করার জন্য পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। এর মাধ্যমে প্রতিবেদক সরাসরি (first-hand) তথ্য পেতে পারেন, সরাসরি জানতে পারেন কি ঘটছে, "*When the reporter bases his/her story on direct observation, the story is a first-hand account. But when the reporter is not on the scene and information is obtained from those who were present, the reporter's story is a second-hand account.*"[২৮৫] ধরুন, কোন প্রতিবেদক কোন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছেন যে তার সাথে মাদক ব্যবসায়ীদের অবৈধ সম্পর্ক আছে। এ অভিযোগ তদন্ত করতে গেলে প্রতিবেদককে ওই পুলিশ কর্মকর্তার লাইফস্টাইল খতিয়ে দেখতে হবে। সেই পুলিশ কর্মকর্তা কোথায় যান, যখন ডিউটি থাকে না কিংবা অফ-ডিউটিতে তিনি কি করেন, কাদের সাথে বৈঠক করেন এসব বিষয় সচক্ষে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

অনেক সময় প্রতিবেদককে পরিচয় গোপন করে ছদ্মবেশ ধারণ করে পর্যবেক্ষণ করতে হতে পারে। যেমন ধরুন, কোনো ডায়াগোনস্টিক সেন্টারে নিয়মিত জনসাধারণের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পেয়েছেন এক প্রতিবেদক। তিনি নিজে বিষয়টি দেখার জন্য ওই

[২৮৪] Leonard M. Kantumoya (2004), Investigative Reporting in Zambia: A Practitioner's Handbook/ Transparency International Zambia, p. 34.

[২৮৫] Manual for Arab Journalists on Freedom of Information and Investigative Journalism (2007), Article 19, London, October, 2007, p. 12.

কেউ কেউ গুরু দণ্ড দিচ্ছেন। জরিপের মাধ্যমে এই বৈষম্যের চিত্র বের করে আনা সম্ভব। সেক্ষেত্রে হয়তো প্রতিবেদকের অনিয়মের পেছনে বিচারকদের অদক্ষতা ও ঘুষ নেয়ার চিত্র খুঁজে বের করার জন্য কাজ শুরু করতে পারেন।

যখন প্রয়োজনীয় নথিপত্র পাওয়ার কোন পথ থাকে না তখন জরিপ একটি কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যখন কোন ঘটনা বা বিষয়ে ভুক্তভোগীর অভিযোগ প্রমাণের জন্য অন্য কোন হাতিয়ার শক্তিশালীভাবে কাজ করে তখন জরিপকে ভালোভাবে কাজে লাগানো সম্ভব।

পুলিশের খাতায় ৪, বাস্তবে ৪৫

ময়মনসিংহের ভালুকা একটি ডাকাতিপ্রবণ এলাকা। ২০০৪ সালে ভালুকার লোকজন ডাকাতদের অত্যাচারে এতটাই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল যে তারা এক রাতে ১৩ ডাকাতকে মেরে ফেলে। ডাকাতদের ওপর আক্রমণের চিত্রটিও ছিল নৃশংস। শাবল দিয়ে কারো চোখ তুলে ফেলা হয়েছিল, কারো বুক ছিদ্র করে দেয়া হয়েছিল। স্থানীয় জনগণ ডাকাতদের শুধু মারেনি; মেরে তাদের স্থানীয় নদীতে ফেলে দিয়েছিল।

আমি তখন কাজ করি দৈনিক প্রথম আলোতে। প্রথম আলোর স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কর্মরত। ঘটনার পর আমার এসাইনমেন্ট দেয়া হয়। ঢাকা থেকে ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর স্থানীয় জনগণ যার সাথে কথা বলেছি, সেই-ই বলেছে তার বিক্ষুব্ধতার কথা। মোটামুটি অবস্থা দাঁড়ায় এমন যে, এমন কোন বাড়ি নেই যেখানে ডাকাতি হয়নি।

ভুক্তভোগীদের এসব বক্তব্য নিয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যখন কথা বললাম, তখন তিনি এমন বক্তব্য শুনে আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি আমাকে থানার মামলার রেকর্ড বই বের করে দেখালেন, মামলা হয়েছে একমাসে মাত্র ৪টি। আবার ফিরে গেলাম ঘটনাস্থলে, গ্রামে। সেখানে গিয়ে গ্রামে ঢুকার পর প্রথম বিশটি বাড়ি আমি জরিপের নমুনা হিসেবে বেছে নিলাম। প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে বাড়ির একাধিক সদস্যের সাথে কথা বললাম। ফলাফল দাঁড়ালো এমন, প্রত্যেক বাড়িতে ডাকাতরা এক মাসে কমপক্ষে তিন-চার বার করে ডাকাতি করেছে। প্রমাণ হিসেবে কেউ কেউ থানায় মামলা রেকর্ডের প্রমাণও দেখালো। ওই নথিতে পেয়ে গেলাম একটি সূক্ষ্ম বিষয়। ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী, ডাকাতি সংঘটনের সময় ৫ বা ততোধিক ডাকাত উপস্থিত থাকতে হবে। অন্যথায় তা চুরি বা দস্যুতার মামলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে। পুলিশের খাতায় ডাকাতি অনেক গুরুতর অপরাধ হলেও চুরি/দস্যুতা ততটা নয়।

জরিপ শেষে ওইসব মামলার নথিপত্রসহ ফিরে এলাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে। জরিপের ফলাফল আর মামলার কাগজগুলো তার সামনে তুলে ধরলাম। নিরূপায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন মন্তব্য করতে পারলেন না আর।

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যায়
১২

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লিখন কৌশল

এ অধ্যায়ে থাকছে
- অনুসরণীয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য
- সুষ্ঠু পরিকল্পনা
- অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মৌলিক কাঠামো
- খসড়া ও পুনঃচিন্তা
- সিরিজ প্রতিবেদন লেখা
- টেলিভিশনের জন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখা

"*The art of writing, like the art of love, runs all the way from a kind of routine hard to distinguish from piling bricks to a kind of frenzy closely related to delirium tremens.*"[২৮৯]

(H.L. Mencken, journalist)

দিন, সপ্তাহ, মাসব্যাপী কঠিন পরিশ্রম করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদক যে তথ্যের ফাইলের স্তুপ বানিয়েছেন তাতে অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ার অর্ধেক কাজ শেষ করেছেন মাত্র। বিষয়টি খুব কষ্টকর মনে হলেও এটিই সত্যি। কারণ অনুসন্ধানকৃত তথ্যের গুরুত্ব ও চমৎকারিত্ব যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন তা পাঠক/দর্শকের কাছে উপস্থাপন না করা পর্যন্ত এর সাফল্য পুরোপুরি আসে না। তাই এ প্রক্রিয়াকে পূর্ণাঙ্গ দিতে হলে অবশ্যই সেসব তথ্য পাঠক/দর্শকের জন্য উপযোগী করে লিখে উপস্থাপন করতে হবে। এজন্য Leonard M. Kantumoya বলেছেন, "*After days, weeks, or months of painstaking work, you wind up with a pile of information. But the story is still waiting to be told or presented to the public. It is now time to sift through the pile to pick out the gems to use in the construction of a story that will command the attention of audiences.*"[২৯০]

অনুসরণীয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের খসড়া লেখার সময়ই প্রতিবেদককে লিখন কৌশলের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রাখতে হয়। আসলে এগুলো যে কোন ধরনের সংবাদ লেখার জন্য অনুসরণীয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করলে লেখার মান যেমন উন্নত হবে তেমনি পুরো প্রতিবেদনটি হবে সুষম ও সাবলীল। সহজ স্পষ্ট করে লেখার জন্য এসব নিয়ম যতই অনুসরণ করা হবে ততই প্রতিবেদনটি শাণিত হবে। কারণ ভাল লিখন শৈলীর অর্থ হলো প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনটি পাঠক বা সর্বসাধারণের উপযোগী করে লিখবেন। তার লিখিত প্রতিবেদনটির মাধ্যমে তিনি নিজের সাথে পাঠকের এক ধরনের সেতুবন্ধন গড়ে তুলবেন, "*Good writing is a personal liaison between the writer and the reader that takes*

[২৮৯] Pressfred Fedler, John R. Bender, Lucinda Davenport & Michael W. Drager (2005), Reporting for the Media, 8th edition, Oxford University Press, Inc., p. 181.

[২৯০] Leonard M. Kantumoya (2004), Investigative Reporting in Zambia: A Practitioner's Handbook, Transparency International Zambia, p. 6.

অনেক বেশি তেজি ও শক্তিধর। লেখার মাধ্যমে পাঠকের সঙ্গে সুষম যোগাযোগ স্থাপনের সহজ উপায় হলো সাধারণ ও পরিচিত শব্দ ব্যবহার করা। এতে প্রতিবেদকের লেখার বার্তা যথাগন্তব্যে পৌঁছবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। হুয়ান এল মারকানো বলেছেন, "পরিচিত শব্দগুলি আপনার 'বার্তা' ও পাঠকের নিজ অভিজ্ঞতার মাঝে যোগসূত্র রক্ষা করে। সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক এসব শব্দের সাহায্যে সহজেই জানা বিষয় থেকে অজানা বিষয়ান্তরে যেতে পারে। এতে সহজে সমঝোতা গড়ে ওঠে দুই তরফে। সাহিত্যের অনেক প্রাজ্ঞ অধ্যাপক নিউ টেস্টামেন্ট-এর prodigal son কাহিনীটি একটি নিখুঁত, নিটোল গল্প বলে মনে করেন। আসলেও এ গল্পের প্রতিটি শব্দ তথা কথা যেন তুলে আনা হয়েছে দৈনন্দিন জীবন থেকে।"[২৯৭] তবে অপরিচিত শব্দ প্রয়োজনসাপেক্ষে ব্যবহার করা যাবে। সেক্ষেত্রে অপরিচিত শব্দটি ব্যাখ্যা করে কিংবা বোধগম্য করে তুলে ধরলে তার অর্থ ও তাৎপর্য পাঠকের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব। অন্যথায় ভারী ও অপিরিচিত শব্দ পাঠক আর প্রতিবেদকের মধ্যে এক বিশাল দেয়াল তৈরি করে দেয়। অপিরিচিত শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটো নিয়ম অনুসরণ করা হয়। একটি হলো অপরিচিত শব্দ ব্যবহারের বেলায় বন্ধনীর মধ্যে ব্যাখ্যাটি দিয়ে দেয়া; অন্যটি হলো আলাদা অনুচ্ছেদের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা দেয়া।

সহজ ও সাবলীলভাবে লেখার জন্য আরেকটি অনুসরণীয় বৈশিষ্ট্য হলো পরিচিত ছোট শব্দের পাশাপাশি ছোট বাক্য ব্যবহার করা। ছোট বাক্য কেবল পাঠকের জন্যই সুবিধাজনক নয়, বোঝার জন্যও সহায়ক। বাক্য যতই লম্বা হয় ততই বাক্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যকার সম্পর্কগুলো জটিল থেকে জটিলতর রূপ নেয়। আর এই সম্পর্কগুলো যত জটিল হবে ততই পাঠযোগ্যতা হারিয়ে যাবে। এতে পাঠক ভুল বুঝতে পারে। সেজন্য যত বেশি কঠিন বিষয় তত বেশি ছোট বাক্য ব্যবহার করা উচিত। এতে পাঠককে নিঃশ্বাস ফেলার, ভাববার অবকাশ দেয়া যায়। গড় বাক্য ১৫ শব্দের মধ্যে রাখা উত্তম। বিংশ শতাব্দীর প্রথিতযশা ইংরেজ লেখক উইনস্টন চার্চিল প্রতিটি বাক্যে গড়ে ১৫ শব্দ ব্যবহার করতেন। তবে সবসময় যে গুনে গুনে বাক্য লিখতে হবে এমন ধারণা করা উচিত নয়। এ বিষয়টি অভ্যাসের ব্যাপার। একটু সচেতন হয়ে লিখলে ধীরে ধীরে এটি অভ্যাসে পরিণত হবে। হুয়ান এল মারকানো তাঁর 'সংবাদ লিখনের মৌলিক নিয়মাবলি' শীর্ষক নিবন্ধে বাক্যের পাঠযোগ্যতা নিরূপণে শব্দসংখ্যার একটি সারণি[২৯৮] তুলে ধরেছেন:

গড় বাক্যে শব্দের সংখ্যা	
খুব সহজ	৮ শব্দ বা তারও কম
সহজ	১১
বেশ সহজ	১৪ বা কম
প্রমিত	১৭
বেশ কঠিন	২১
কঠিন	২৫
খুবই কঠিন	২৯ বা তারও বেশি

বাক্য বেশি লম্বা বা দীর্ঘ হলে তা ভেঙ্গে লিখতে হবে। একটি বাক্যে একটি 'ভাব' বা থিম থাকবে। একাধিক ভাব নিয়ে একটি বাক্য তৈরি করলে বাক্যটি পাঠকের কাছে বিমূর্ত হয়ে উঠতে পারে। বিমূর্ত ভাব পাঠককে অনুৎসাহী করে তোলে। বাক্য লম্বা বা দীর্ঘ হলে ওই

[২৯৭] প্রাগুক্ত, আফতাব হোসেন (অনুবাদ) (১৯৯৫), পৃ- ১৪৮-১৪৯।
[২৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪৮-১৫০।

ডায়াগোনস্টিক সেন্টারে চাকরি নিতে পারেন। এটি যেমন ঝুঁকিপূর্ণ তেমনি নৈতিকতার দিক দিয়েও প্রশ্নবিদ্ধ। তবে এ পদ্ধতিতে কার্যকর ও সফলভাবে চমৎকার প্রতিবেদন তৈরির অনেক উদাহরণ আছে। ভারতের তিহার জেলে মাতাল হয়ে ঢুকে সাড়া জাগানো প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন এক প্রতিবেদক। বাংলাদেশের এক প্রতিবেদক দালালদের মাধ্যমে নিজের ছবি দিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের নামে পাসপোর্ট তৈরি করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। যেমন সরকারি হাসপাতালগুলোতে খাবারের মান খুবই খারাপ বলে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায়। এ ধরনের অভিযোগ সরেজমিনে তদন্ত করে দেখতে প্রতিবেদক নিজেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে পারেন।

ব্যক্তি বিশেষের দুর্নীতি তদন্তের ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির ও তার অর্জিত সম্পদের গতিবিধি অনুসরণ করা জরুরি হয়ে পড়ে। যেমন ধরুন, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের অভিযোগ পেলে সে অর্থ তিনি কোথায় খরচ করছেন ও কোথায় বিনিয়োগ করছেন তা পর্যবেক্ষণ করতে হয়। যেমন তিনি খুব বেশি দামি গাড়ি, বাড়ি ও অন্যান্য জিনিসপত্র কিনছেন কীনা, অদৃশ্যমান খাত যেমন শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করছেন কীনা ইত্যাদি খতিয়ে দেখতে হয়। এ ধরনের পর্যবেক্ষণকে অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ (Participant Observation) বলা হয়। সমাজ বিজ্ঞানী Howard Becker I Blanche Geer এ ধরনের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন, "*Participant observation as that method in which the observer participates in the daily life of the people under study, either openly in the role of researcher or covertly in some disguised role, observing things that happen, listening to what is said, and questioning people, over some length of time.*"[২৮৬] এ ধরনের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিবেদক গোপন ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে পারেন যার মাধ্যমে ধারণকৃত ছবি ও কথা পরবর্তীতে উপাত্ত হিসেবে প্রতিবেদনে ব্যবহার করা যায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যে, পর্যবেক্ষণকে কোনোভাবে নথিপত্র বা ডকুমেন্ট হিসেবে রূপান্তর করা গেলে কিংবা তা ডকুমেন্ট হিসেবে প্রতিবেদনে উপস্থাপনযোগ্য হলে অবশ্যই তা করতে হবে।

এ ধরনের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হয়:

১. পর্যবেক্ষণকৃত বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ নোট নেয়া;
২. কোন পক্ষাবলম্বন না করা;
৩. পর্যবেক্ষণকৃত বিষয় বা ব্যক্তি সম্পর্কে অন্য লোকজনের ভাবনা সংগ্রহ করা।

জরিপ (Survey)

জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ব্যবহার করা যায়। আবার জরিপের মাধ্যমেও কোন বিষয় অনুসন্ধান করে প্রমাণ করা যায়। এক্ষেত্রে জরিপ হলো অনুসন্ধেয় বিষয় বা এর উপাদানসমূহের ওপর পরিচালিত একটি সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। Leonard M. Kantumoya অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে জরিপের ব্যবহারকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, "*By survey is meant a systematic examination of a group or a set of items within a subject under investigation to produce a story.*"[২৮৭] যেমন ধরুন একই ধরনের অপরাধের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিচারক বিভিন্ন রকম রায় দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে কেউ লঘু আর

[২৮৬] Gerry Keir, Maxwell McCombs & Donald L. Shaw (1986), Advanced Reporting: Beyond News Events, Longman, New York, p. 242.
[২৮৭] Ibid, Leonard M. Kantumoya (2004), p. 34.

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য ব্যবহৃত জরিপ মূলত একটি বিশেষ ধরনের সাক্ষাৎকার যেখানে একটি সমগ্রক বা জনগোষ্ঠী থেকে নমুনায়ন নির্বাচন করে সকল উত্তরদাতাকে একই ধরনের প্রশ্ন করা হয়। জরিপের ব্যবহার নিয়ে নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী বলেছেন, "জরিপের বিষয়টি আপাত দৃষ্টিতে হয়তো অনেকেরই অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের হাতিয়ার বলে মনে হবে না কারণ এখানে তথ্য তো কেউ গোপন করছে না, তথ্য তো লুকানো নেই --- এমনটিই সাধারণভাবে মনে হয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে জরিপ চালিয়ে প্রতিবেদক অবশ্যই লুকানো তথ্য উদঘাটন করে আনতে পারেন। যেমন ধরুন, কোনো একটি পাবলিক প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কর্মচারিদের মধ্যে প্রতিবেদক জরিপ চালিয়ে গত বছর এই প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন এমন পাঁচজনের নামের একটি তালিকা তৈরি করলেন, এখন এই তালিকার সাথে প্রতিবেদক যদি পদোন্নতির তালিকাটি মিলিয়ে দেখেন তা হলে হয়তো দেখবেন কিছু গরমিল পাওয়া যাচ্ছে। এবার আরো অনুসন্ধান চালালে হয়তো দেখা যাবে, যারা পদোন্নতি পেয়েছেন তারা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের উপকারে এসেছেন বেশি কিংবা হয়তো দেখা যাবে তারা সকলেই ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী। এভাবেই শুরু হতে পারে চমৎকার একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের কাজ।"[২৮৮]

সাধারণত সংখ্যা ও পরিসংখ্যান বের করে আনতে জরিপে নমুনায়ন ব্যবহার করে থাকে যা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে একটি সংবাদগল্প তৈরি করা যায়। এ কারণে জরিপ নির্ভর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের অর্থ হলো পরিসংখ্যানের সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবহার। যেমন ধরুন, কোন প্রতিবেদক একটি অভিযোগ পেলেন অর্থমন্ত্রী তার নিজের শহরের সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দেশের অন্য শহরগুলোর তুলনায় বেশি অর্থ বরাদ্দ করেছেন। এক্ষেত্রে অনুসন্ধানী প্রতিবেদক বেশ কয়েকটি শহরের সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচের তুলনা করে দেখাতে পারেন কোন শহরের সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচের জন্য বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদক সামাজিক গবেষণার নমুনায়নের বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে নমুনা বাছাই করতে পারেন। কোনো একটি পদ্ধতিতে নমুনা বাছাই করা হয়ে গেলে সে নমুনার ভিত্তিতেই তাকে পুরো জরিপ পরিচালনা করতে হয়। তিনি কোন পরিস্থিতিতেই বা কোনো কারণেই ওই নমুনা পরিবর্তন করতে পারেন না। কারণ অনেক সময় প্রতিবেদকের অনুমিতি প্রমাণিত না হলে নমুনা পরিবর্তনের ঝোঁক দেখা দিতে পারে। কিন্তু একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের পক্ষে এ ধরনের পরিবর্তন ও পরিমার্জন কখনই উচিত নয়। আবার অনুসন্ধানী প্রতিবেদক যখন তার প্রতিবেদনে জরিপের ফলাফল ব্যবহার করেন তখন তাকে পুরো চিত্রই তুলে ধরতে হয়।

তথ্যসূত্র

Gerry Keir, Maxwell McCombs & Donald L. Shaw (1986), Advanced Reporting: Beyond News Events, Longman Inc, New York.

Leonard M. Kantumoya (2004), Investigative Reporting in Zambia: A Practitioner's Handbook, First Edition, Friedrich Ebert Stiftung and Transparency International Zambia.

Manual for Arab Journalists on Freedom of Information and Investigative Journalism (2007), Article 19, London, October, 2007.

নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী (১৯৯৬), অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি), ঢাকা, জুলাই, ১৯৯৬।

[২৮৮] নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী (১৯৯৬), অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি), ঢাকা, জুলাই, ১৯৯৬, পৃ ৯৮

a reader by the hand, willing or unwilling, and leads him into a new experience of emotion or thought. It may be a soft lullaby or a strident bellow, and he may cry, or he may laugh. It may be meaningful or absolute nonsense, it may be crude, or it may be highly polished verbal sophistication. But one thing, it holds that reader to the last echoing word."[২৯১]

সেন্টপল *(Saint Paul)* করিন্থীয়দের উদ্দেশে তাঁর লেখা প্রথম পত্রে হবু লেখকদের হুঁশিয়ার করে বলেছেন, 'তোমরা যা বলো তা সহজে বোঝা না গেলে কী বলা হলো তা জানা যাবে কি করে?'[২৯২] সাংবাদিকতার কাজ হলো তথ্য জানানো। কিন্তু একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক যদি তার জটিল ও দুর্বোধ্য ভাষার জন্য পাঠক/দর্শকের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হন তাহলে তার পুরো অনুসন্ধান কাজই ব্যর্থ হয়ে যায়। সেজন্য লেখার অর্থ বোঝা যাওয়ার ব্যাপারটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে প্রতিবেদককে মনে রাখতে হবে তিনি ভাব প্রকাশের জন্য লিখছেন, প্রভাবিত করার জন্য নয়। পাঠক/দর্শককে তাক লাগানো তার কাজ নয়। জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দ, বাক্য ও ভাষা দিয়ে তাক লাগানো যায় না। প্রতিবেদকের অনুসন্ধান, সংগৃহীত তথ্য-নথিপত্রই তাক লাগিয়ে দিবে, অন্য কিছুই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তাক লাগাতে পারে না। সহজ ও সাবলীল এবং স্পষ্টভাবে তথ্য তুলে ধরাই প্রতিবেদকের কাজ। স্পষ্টতার গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে Paul N. Williams বলেছেন, "*Clarity implies getting to the point quickly in language that is clear to the reader and carrying the story through to a clear conclusion.*"[২৯৩] The Los Angeles Times-এর সাংবাদিক Louis Fleming ভাল সংবাদ লিখন শৈলী বলতে কি বোঝায় তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, "*Good news writing must communicate without pretension, in clear and simple language, information and ideas.*"[২৯৪]

শিক্ষানবিশ অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের শব্দচয়ন ও বাক্য গঠনের দিক থেকে নতুন প্রেমিক-প্রেমিকার সাথে তুলনা করা যায়। তরুণ প্রেমিক তার প্রেমিকার মন গলানোর জন্য চিঠিতে সাহিত্যের জটিল ও দুর্বোধ্য এবং আবেগঘন শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। শিক্ষানবিশ অনুসন্ধানী প্রতিবেদকদের মধ্যে পাঠকদের তাক লাগিয়ে দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ প্রবণতা থেকে তারা জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু প্রতিবেদককে মনে রাখতে হবে তার কাজ তাক লাগানো নয়, বরং পাঠককে সহজ ও সাবলীলভাবে সংবাদটি জানানো। Neale Copple বিষয়টি তুলে ধরেছেন এভাবে, "*The young writer is like a young lover who gropes for the right words but does not seem to make his point. He uses them at the wrong time, the wrong place, and with the wrong emphasis.*"[২৯৫]

সহজ ও স্পষ্টভাবে লেখার জন্য প্রতিবেদককে অবশ্যই পরিচিত শব্দ ব্যবহার করতে হবে। শব্দই প্রতিবেদনের হাতিয়ার। The Portland Oregonian-Gi Don Holm বলেছেন, "*Words have to be molded just as a sculptor molds day.*"[২৯৬]। ছোট পরিচিত শব্দ

[২৯১] Neale Copple (1964), Depth Reporting: An Approach to Journalism, Prentice-Hall, Inc, New Jersey, p. 77.

[২৯২] আফতাব হোসেন (অনুবাদ) (১৯৯৫), এশিয়ার রিপোর্টার: প্রতিবেদন কৌশল সারগ্রন্থ, সম্পাদনা গেরি গিল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৫, পৃ. ১৪৫।

[২৯৩] Paul N. Williams (1978), Investigative Reporting and Editing, PRENTICE-HALL, INC, New Jersey, p. 134.

[২৯৪] Ibid, Neale Copple (1964), p. 79.

[২৯৫] Ibid, p. 78.

[২৯৬] Ibid, p. 85.

Hill, New York U.S.A.
John Smith (2007), Essential Reporting: The NCTJ Guide for Trainee Journalists, SAGE publications, London.
Ken Metzler (1979), Newsgathering, USA: PRENTICE-HALL, INC.
Ken Metzler (1999), Creative Interviewing: The Writer's Guide to Gathering Information By Asking Questions, 3rd ed., USA: Allyn & Bacon.
Leonard M. Kantumoya (2004), Investigative Reporting in Zambia: A Practitioner's Handbook, First Edition, Friedrich Ebert Stiftung and Transparency International Zambia.
Life, July 7, 1972.
Louis L. Snyder and Richard B. Morris (1962), A Treasury of Great Reporting, 2nd edition, New York: Simon and Schuster.
Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists.
Matarazzo, Joseph D., Morris Weitman, George Saslow, and Arthur N. Weins (1963), "Interviewer Influence on Duration of Interview Speech." Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, I.
Michael Ryan and James W. Tankard Jr. (2005), Writing for Print and Digital Media, The McGraw-Hill Companies, New York.
M. K. Verma (2009), News Reporting and Editing, A.P.H Publishing Corporation, New Delhi.
Nirenberg, Jesse S. (1963), Getting through to People, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Nierenberg, Gerard I. (1968), The Art of Negotiating, New York: Cornerstone.
Paul N. Williams (1978), Investigative Reporting and Editing, PRENTICE-HALL, INC., Englewood Cliffs, New Jersey.
Quinn, L., and N. Zunin (1972), Contact: The First Four Minutes, Los Angeles: Nash.
Sally Adams & Wynford Hicks (2009), Interviewing for Journalists, Second edition, Routledge New York.
Sheila S. Coronel (2009), Digging Deeper: A Guide for Investifative Journalists in the Balkans, BIRN, Sarajevo, chapter 7.
Wicks, Robert J., and Ernest H. Josephs Jr. (1972), Techniques in Interviewing for Law Enforcement and Corrections Personnel. Springfield, Ill.: Charles C Thomas.
Woody, Robert H., and Jane D. Woody (eds.) (1972), Clinical Assessment in Counseling and Psychotherapy, New York: Appleton, Century, Crofts, Meredith.
আফতাব হোসেন (অনুবাদ), এশিয়ান রিপোর্টার: প্রতিবেদন কৌশল স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদনা গেরি গিল, বাংলা একাডেমী।

বাক্যটিকে পূর্ণচ্ছেদ বা সেমিকোলন দিয়ে ভেঙ্গে ওই বাক্যের 'ভাব' বা থিমগুলোকে আলাদা করে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে হুয়ান এল মারকানোর সুপারিশটি প্রণিধানযোগ্য, "*বৈচিত্র্য পড়ার কাজটাকে আনন্দদায়ক, রুচিকর করে। কিন্তু তাই বলে সরল বাক্যকেই ছোট হতে হবে এমন নয়। ছোট বাক্যের পর লম্বা বাক্য দিয়ে ভারসাম্য আনা যায়। তবে মনে রাখতেই হবে, 'লম্বা' বাক্যের গতি মন্থর, আপনি যখন তরতাজা, গতিময় শৈলী আশা করেন, তখন লম্বা বাক্য পিছটান দিয়ে তাতে বাধা দেয়।*"[২৯৯]

সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভাষা ব্যবহার করা ছাড়া পাঠক/দর্শকের কাছে পৌঁছানোর সহজ অন্য কোন পথ নেই। সঠিক শব্দ ব্যবহারের মমার্থ তুলে ধরেছেন মার্ক টোয়েন, "*The difference between the right word and the almost right word is the difference between lightning and the lightning bug.*" সঠিক শব্দ নির্বাচন করতে পারলে বাক্য হয় শক্তিশালী ও আকর্ষণীয়; আর ব্যত্যয় ঘটলে সন্দেহ ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। বাক্যে স্পষ্টতা রাখতে হলে যতটা কম বিশেষণ ব্যবহার করতে হবে। এতে বাক্যের দৈর্ঘ্য যেমন ছোট থাকে তেমনি পাঠকের কাছে বিশেষণের গুরুত্ব থাকে। বিশেষণ লেখককে তার বক্তব্য অতিবয়ানের দিকে নিয়ে যায়- "*আর যেখানে এই অতিশয়োক্তি ঘটে, সেখানে পাঠক আপনার বিচার-বিবেচনাবোধের ওপর আস্থা হারায়।*"[৩০০] হুয়ান এল মারকানো চমৎকারভাবে বলেছেন, "*যথা প্রয়োগ ঘটলে, বিশেষণ আপনার ভালো প্রতিবেদন লেখার বন্ধু হতে পারে। কিন্তু বিশেষণবাহুল্য এক বর্ণাঢ্য, অলঙ্কারিক গদ্যের জন্ম দেয় যা হজম করা দায়, পড়ায় আগ্রহ কমায়।*"[৩০১] স্পষ্টভাবে লেখার জন্য কর্তৃবাচ্য ব্যবহার করতে হবে। এতে বাক্যের গঠনশৈলী তরতাজা হয়। ভাববাচ্যে রচিত বাক্য বুঝতে হলে চিন্তা করতে হয়। বাক্য সম্পূর্ণ করার জন্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে হবে।

স্পষ্ট ও সহজ করে লেখার জন্য যে কোন ধরনের পাণ্ডিত্য জাহির করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে চাঁছাছোলা শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করতে হবে। এতে প্রতিবেদক যা বোঝাতে চাইছে পাঠক ঠিক তাই বুঝতে পারবে। এক্ষেত্রে বস্তুবাচক বিশেষ্য পদ ব্যবহার করলে তা পাঠকের দৃষ্টি ও মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে- "সবসময় সার্বজনীন থেকে সুনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট থেকে সূচিহ্নিত, অধরা থেকে নিরেটকে বেছে নিন"[৩০২]।

সুষ্ঠু পরিকল্পনা

অনেকে বলে থাকেন, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন ফর্মুলা নেই। প্রকৃতপক্ষে ভাল লিখন কোন ফর্মুলা দিয়ে হয় না। Paul N. Williams খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন, "*There is no formula for writing investigative stories. Good writing is not done by formula.*"[৩০৩] প্রথাগত সংবাদ লিখনের কিছু ফর্মুলা আছে বৈকি এবং অনেক সম্পাদক ও প্রতিবেদক এসব ফর্মুলা দ্বারা প্রভাবিত হন। কিন্তু একটি ভাল লিখন যতটা না কোনো কাঠামো কিংবা ফর্মুলার ওপর নির্ভরশীল তার চেয়ে ঢের বেশি পরিকল্পনা ও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা নীতিমালা অনুসরণের ওপর নির্ভরশীল।

সংগৃহীত ও প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ ও সুষ্ঠু এবং সুষম ব্যবহারই একটি প্রতিবেদন সাফল্যের মুখ

[২৯৯] প্রাগুক্ত।
[৩০০] প্রাগুক্ত।
[৩০১] প্রাগুক্ত।
[৩০২] প্রাগুক্ত।
[৩০৩] Ibid, Paul N. Williams (1978), p. 134.

দেখতে পারে। এখানে প্রতিবেদককে তারই সংগৃহীত তথ্যের ওপর ছুরি চালাতে হয়, বিচার করতে হয় সংগৃহীত তথ্যের উৎকর্ষতা। উৎকর্ষতার মানদণ্ডে উতরে যাওয়া তথ্যগুলো দিয়ে প্রতিবেদককে সব ধরনের পাঠক/দর্শকের জন্য সহজ ও সাবলীল হয় এমনভাবে প্রতিবেদনটি লিখতে হয়। এ কাজটি যতটা সহজভাবে বলা যায়, করতে গিয়ে ততটা সহজভাবে করা যায় না। কারণ এখানে প্রতিবেদকের এমন এক মুন্সীয়ানা বা দক্ষতার পরিচয় দিতে হয় যার মধ্য দিয়ে প্রতিবেদনের গুরুত্ব, যথাযর্থতা, মেজাজ ও উত্তেজনা সহজেই পাঠক/দর্শকের কাছে ফুটে উঠবে। মনে রাখতে হবে, ভাল লিখন একটি দুর্বল প্রকল্পের মানোন্নয়ন করতে পারে আর দুর্বল লিখন একটি ভাল মানের অনুসন্ধানকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারে। *Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists*-এ বলা হয়েছে, "*When it's time to compose the final story, different skills are required and different creative conventions are involved than in news writing, drawing on the rules of narrative in more complex ways. The reporter must at once use the power of devices associated with fiction, and avoid composing a fiction. Finally, your emotional state enters into the text, consciously or not.*"[৩০৪]

দেখা যায়, অনেক সাংবাদিকের জন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য স্তর হলো গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করা। কিন্তু তাদের জন্য সবচেয়ে কঠিন ও হাস্যকর কাজ হলো সেই প্রতিবেদনটি লেখা। কারণ এটি এমন একটি কাজ যা নিয়ে তাদের বেশ ভোগান্তি পোহাতে হয়। অথচ সেই প্রতিবেদকগণ হরহামেশাই সাদামাটা প্রতিবেদন লিখে থাকেন। কিন্তু সাদামাটা প্রতিবেদনের চেয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন অনেক বেশি জটিল। এ কারণেই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের লিখন প্রক্রিয়াও অনেক বেশি জটিল। একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে একজন প্রতিবেদক একটি সাদামাটা প্রতিবেদনের চেয়ে অনেক অনেক বেশি তথ্য সংগ্রহ করেন; বলা যায় তিনি তথ্যভাণ্ডার সংগ্রহ করেন। এ তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করে একটি চমকপ্রদ ও প্রাঞ্জল প্রতিবেদন লেখা সত্যিই দুরূহ কাজ। এই দুরূহ কাজটি সুষ্ঠু ও সাবলীলভাবে করার জন্য তথ্য সংগ্রহের সময় থেকেই লেখার ব্যাপারটি মাথায় রাখতে হবে।

তথ্য সংগ্রহ ও লিখন- গাঁথতে হবে একসূত্রে

প্রতিবেদককে মনে রাখতে হবে রিপোর্টিং বা তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেসব তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্ট লেখা পৃথক কাজ নয়। প্রতিবেদক যখন তথ্য সংগ্রহ করেন তখন থেকেই তাকে লেখার বিষয়টি মাথায় রাখতে হয়। কিছু জটিং নিয়ে বসলাম আর কম্পিউটারের কিবোর্ডের বোতাম টিপলেই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখা হয়ে যায় না। কারণ তথ্য সংগ্রহের পর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লিখতে গেলে প্রতিবেদককে কিছু ধাপ পার করতে হয়। অর্থাৎ অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের লিখন প্রক্রিয়া কিছু ধাপের সমাহার যেসব ধাপে প্রতিবেদককে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নিচে এসব স্তরগুলো তুলে ধরা হলো:

১. তথ্য সংগঠন (Organising the Information)

তথ্য সংগঠনের কাজটি তথ্য সংগ্রহের সমান্তরালে চলতে থাকে। প্রথাগত রিপোর্টিং বা সাদামাটা সাংবাদিকতায় তথ্য সংগঠনের প্রয়োজন অনেক সময়ই পড়ে না। কিন্তু অনুসন্ধানী

[৩০৪] Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists, chapter five; Organization: How to Set Yourself Up to Succeed, p. 57.

প্রতিবেদনে অন্য যে কোন ধরনের প্রতিবেদনের তুলনায় অনেক বেশি তথ্য, নথিপত্র যোগাড় করতে হয়। সে কারণে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি তথ্য সংগঠনের কাজটিও এখানে সুষ্ঠুভাবে করতে হয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য সংগঠনের কাজটি সমান্তরালে করার গুরুত্ব Story-Based Inquiry : A manual for investigative journalists-এ তুলে ধরা হয়েছে এভাবে, "*This organizational work is part of a systematic writing and publishing process: You do not do research, then organize, then write. Instead, you organize as you research, and this organization prepares and initiates the writing process.*"[৩০৫] তথ্য গোছানো ও সাজানো না হলে প্রতিবেদকের কি ধরনের ভোগান্তি হতে পারে সে সম্পর্কে সুন্দর একটি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, "*If you do not take the time to organize, you will need twice as much time for the project in the end (that's a minimum), and your work will be harder to compose, explain and defend. Besides, you will not have as much fun, because you will be worried all the time and… disorganized, frantic, and frustrated.*"[৩০৬]

সুষ্ঠু ও সুষমভাবে সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে একটি কার্যকরী প্রতিবেদন লেখার জন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগঠনের কোনো বিকল্প নেই। তথ্য সংগঠিত থাকলে লেখার সময় কোথায় কোন নথিপত্র আছে এবং কোন নথিপত্রে কি ধরনের তথ্য আছে তা সহজেই পাওয়া যায়। তাছাড়া কোন ধরনের তথ্যের সঙ্গে কোন মন্তব্য কিংবা কোন বক্তব্যটি প্রাসঙ্গিক এ বিষয়েও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক নিয়মিত যদি এ কাজটি করেন তা তার ক্যারিয়ারের উন্নতিতেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে। সেজন্য কোনোভাবেই এই তথ্য সংগঠনের কাজকে খাটো করে দেখা যাবে না। অনেক প্রতিবেদক বিশেষ করে শিক্ষানবিশ প্রতিবেদকরা ভাবেন, তথ্য সংগ্রহ হয়ে গেলেই সব কাজ শেষ। প্রকৃতপক্ষে তথ্য সংগ্রহ হওয়া মানে অর্ধেক কাজ শেষ হওয়া। সে কারণে তথ্য সংগ্রহের সময়ই তথ্য সংগঠনের কাজটি করতে হয়। এটি না করলে লেখার সময় অনেক সময় ও শ্রমের অপচয় হয়। এই তথ্য সংগঠন প্রক্রিয়ার দুটি অংশ আছে; প্রথমত একটি ডাটাবেজ তৈরি করা ও দ্বিতীয়ত সেই ডাটাবেজের ভিত্তিতে তথ্যগুলো সাজানো। এ দুটি ক্ষেত্রে প্রতিবেদককে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হয়:

ক. নথিপত্র ও তথ্যের ফাইল তৈরি

ডাটাবেজের অর্থ হলো শুধু নথিপত্র বা রেকর্ড সংরক্ষণ করলেই হবে না, একজন প্রতিবেদককে তার কম্পিউটারে আলাদা আলাদা ফোল্ডারে ধারাক্রম অনুসারে তার নেয়া সাক্ষাৎকারগুলোর ট্রান্সক্রিপ্ট, অডিও-ভিস্যুয়াল রেকর্ডগুলোও সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি ডিজিটাল রেকর্ডও গড়ে তুলতে পারেন (যেমন ওয়েব পেজের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ফরম্যাটে সংরক্ষণ করতে পারেন)। কিছু কিছু সাংবাদিক স্প্রেডশিট বা সারণীর মাধ্যমে নথিপত্র ও সাক্ষাৎকারগুলোর তালিকা তৈরি করে সংরক্ষণ করেন। আবার কিছু কিছু সাংবাদিক শুধু উদ্ধৃতিগুলো বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজিয়ে আলাদা আলাদা ফাইলে সংরক্ষণ করেন যাতে সহজেই তা লেখার সময় খুঁজে পাওয়া যায়।

খ. সংগৃহীত তথ্যের তালিকা তৈরি

ঘটনার সময়ের ধারাক্রম অনুযায়ী তা সাজিয়ে রাখা কিংবা ঘটনাগুলোর একটি তালিকা

[৩০৫] Ibid, p. 50.
[৩০৬] Ibid.

তৈরি করা একটি অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় তথ্য হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। এই ধারাক্রম রিপোর্টিং বা তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়েও প্রয়োজনীয়– কোন সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় কিংবা তথ্য সংগ্রহে কোন ফাঁক আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে এটি বেশ কার্যকরী। আবার এভাবে ধারাক্রম অনুযায়ী তথ্য সংগঠন লেখার ক্ষেত্রেও বেশ কাজে দেয়। যদি একজন প্রতিবেদক ধারাক্রম অনুযায়ী ঘটনাগুলো সাজিয়ে রাখেন তাহলে লিখতে বসার পর তাকে বারবার জটিং বা নোটবুক ঘাঁটতে হয় না। এখানে এই ধারাক্রম বিবরণী একটি রেফারেন্স হিসেবে কাজ করে, যেখানে নাম, ঘটনার বিবরণ ও তারিখ অবশ্যই থাকে।

গ. গ্রাফিকস তৈরি

বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিকসও (যেমন ফ্লো চার্ট) সাংবাদিকের লেখার সময় ঘটনার ধারাক্রম স্মরণ করিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে কাজ করে। মানচিত্র, গ্রাফ ও সারণি লেখার সময় খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কারণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের বিষয় জটিল হয়ে থাকে। এসব জটিল বিষয়কে পাঠকের সামনে সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপনের জন্য সংখ্যার পরিবর্তে গ্রাফ, চার্ট, সারণি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এসব গ্রাফ, চার্ট ও সারণি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যাখ্যাও তুলে ধরতে হবে।

ঘ. ব্যাকআপ ফাইল তৈরি

সংগঠিত তথ্য কিংবা তথ্যভান্ডারের যে ডাটাবেজ প্রতিবেদক তৈরি করেছেন তার একটি ব্যাকআপ ফাইল সবসময় সংরক্ষণ করতে হবে। এমনকি গোপনীয় কোন নথিপত্র থাকলে সে ফাইলটি ভালভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

ঙ. মাস্টার ফাইল তৈরি

সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি মাস্টার ফাইল তৈরি করতে হবে। লিখতে বসার পর এই ফাইলটি হবে প্রতিবেদকের প্রধান হাতিয়ার। একজন প্রতিবেদক দিন, সপ্তাহ, মাসব্যাপী শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগ করে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেগুলো তার প্রতিবেদনের মূল সম্পদ। কিন্তু এসব তথ্য যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিত/প্রচারিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এর সুফল পাওয়া যাবে না। এই সুফল পাওয়ার কাজটি সহজ ও সাবলীল করতেই সংগৃহীত তথ্যের একটি মাস্টার ফাইল তৈরি করতে হয়। এই মাস্টার ফাইলের ভিত্তিতেই প্রতিবেদক তার অনুমিতির ভিত্তিতে যুক্তিতর্ক নির্ধারণ করতে পারেন। এই মাস্টার ফাইলকে "data department store"[৩০৭] বলা হয়, যেখানে প্রতিবেদক তার সংগৃহীত সমস্ত তথ্য জমা করে রাখেন। তবে বিশৃংখলভাবে নয়, বরং ধারাবাহিক ও সুশৃংখল উপায়ে এ ধরনের ফাইল তৈরি করতে হয়। প্রতিবেদককে তার অনুসন্ধানের ধারাক্রমের ওপর চোখ রাখতে হবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনটি অবশ্যই কালানুক্রমিক কাঠামোতে রচনা করবেন। বরং এর মাধ্যমে তথ্য সংগঠনের সময় প্রতিবেদক ঘটনা/ইস্যুর অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত রূপরেখা পূর্ণাঙ্গভাবে জানতে পারবেন।

সাদামাটা বা প্রথাগত রিপোর্টিংয়ের চেয়ে অনেক অনেক বেশি তথ্য ও নথিপত্র অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় একজন প্রতিবেদককে সংগ্রহ করতে হয়। সে কারণে এ ধরনের প্রতিবেদন

[৩০৭] Ibid, p. 52.

লেখার আগে সংগৃহীত তথ্য ও নথিপত্র এবং বক্তব্যগুলোর সমন্বয়ে একটি মাস্টার ফাইল তৈরি না করলে লেখার সময় কিংবা প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পড়ে যেতে পারে। কম্পিউটারে ডাটাবেজের মাধ্যমে এ ধরনের মাস্টার ফাইল তৈরি করা যায়। তবে যেসব নথিপত্র ডিজিটালি রেকর্ড করা সম্ভব নয় সেগুলোকে ক্যাটালগিং করে ফাইল নামটি ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। প্রতিবেদক তার সুবিধা অনুযায়ী এ ফাইল তৈরি করতে পারেন। নিচে একটি মাস্টার ফাইল তৈরির নমুনা দেয়া হলো:

অ) নথিপত্রের তালিকা

সংখ্যা	তারিখ	প্রেরক	প্রাপক	বিষয়, আধেয়, কিওয়ার্ড	ধরন
					ইমেইল
					চিঠি

আ) উৎস তালিকা

সংখ্যা	উপাধি	ব্যক্তির নাম	প্রতিষ্ঠান	ঠিকানা	টেলিফোন

২. বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক (Theme and Angle)

প্রতিবেদককে প্রথমেই নির্ধারণ করতে হবে তার সংবাদের মূল বিষয়বস্তু কি অথবা পাঠক/দর্শককে তিনি কি বিষয়ে অবগত করতে চান। অর্থাৎ পাঠক/দর্শককে কি বলতে চান এটিই হবে প্রতিবেদকের প্রথম বিবেচ্য বিষয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি কোন প্রতিষ্ঠানের অব্যবস্থাপনা অনুসন্ধান করেছেন যেখানে ওই প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তি বা পরিচালকের প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই। এক্ষেত্রে আপনি আপনার প্রতিবেদনে কি তুলে ধরবেন- প্রতিষ্ঠানটির অব্যবস্থাপনা নাকি প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তির অযোগ্যতা, নাকি প্রতিষ্ঠানটি অব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে যার কারণ পরিচালকের যোগ্যতাহীনতা? এক্ষেত্রে আপনাকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিষ্কার হতে হবে। অন্যদিকে আঙ্গিক সংবাদগল্পটির আত্মস্থকরণের স্তরগুলোর সাথে সম্পৃক্ত এবং তথ্য সংগ্রহের সময়ই এই আঙ্গিক ঠিক করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিবেদক তথ্য সংগ্রহের সময়ই এক পর্যায়ে বুঝতে পারেন তার প্রতিবেদনের মূল বিষয়বস্তু কি এবং এ প্রতিবেদনে কয়টি আঙ্গিক থাকতে পারে। মূলত এ পর্যায়ে প্রতিবেদককে তার প্রতিবেদনটির লেখার জন্য একটি লক্ষ্যবিন্দু বা ফোকাস নির্ধারণ করতে হয়। অর্থাৎ কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে তার প্রতিবেদনটি আবর্তিত হবে সে বিষয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

৩. ব্যবহারযোগ্য উপাদান (Usable Material)

অনুসন্ধানের সময় থেকেই ঘটনা/বিষয়ের থিম বা বিষয়বস্তুটি প্রতিবেদকের মাথায় খেলা করছে। সে বিষয়বস্তুর নিরিখে তিনি এঙ্গেল বা আঙ্গিকও ঠিক করে ফেলেছেন। এখন সে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের নিরিখে সংগৃহীত তথ্যগুলো থেকে ব্যবহারযোগ্য তথ্যগুলো আলাদা

করতে হবে। এসব তথ্য ও উপাত্ত এমনভাবে বাছাই করতে হবে যাতে এসব বাছাইকৃত তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে পুরো সংবাদ বা সংবাদগল্পের বিষয়টি পাঠক/দর্শকের সামনে জলের মত পরিষ্কার হয়ে উঠে। অর্থাৎ সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে কোনগুলো প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনে ব্যবহার করতে চান, কোনগুলোকে গুরুত্ব দিতে চান সে বিষয়ে লেখা আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিষয়টিকে ভাত রান্না করার আগে চাল থেকে তুষ ঝাড়ার সাথে তুলনা করা যায়। ভাত রান্না করার আগে যেমন চাল থেকে তুষ বা অন্যান্য ময়লা পরিষ্কার করার জন্য চাল ঝাড়া হয় তেমনি অনুসন্ধানী প্রতিবেদককেও তার সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তগুলো থেকে অপ্রয়োজনীয় কিংবা স্বল্প প্রয়োজনীয় কিংবা যাচাই-বাছাই করা যায়নি এমন তথ্য-উপাত্তগুলো বাছাই করে আলাদা করতে হয়। সেজন্য Leonard M. Kantumoya বলেছেন, "*The next task is to subject the information to a winnowing process to select only those facts and incidences that make the point of the story clear.*"[৩০৮]

অনুসন্ধানী সাংবাদিকের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সংগৃহীত তথ্যগুলো সংগঠিত করা, সেসব তথ্যের মর্মার্থ উদ্ধার করা এবং এসব তথ্যের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত ও সুষম উপায়ে প্রতিবেদন লিখে তা পাঠক/দর্শকের কাছে উপস্থাপন করা। এখানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো তথ্য বাছাই করা ও তথ্য বাদ দেয়া। একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক যিনি সপ্তাহ-মাস-বছরব্যাপী অনুসন্ধান করেছেন, যিনি নাওয়া-খাওয়া ভুলে ঘটনার গভীরে গিয়েছেন, যার সাথে ঘটনা/বিষয়ের সঙ্গে একধরনের আবেগীয় সম্পর্ক তৈরি হয়েছে; তিনি স্বভাবতই চাইবেন প্রাপ্ত সবগুলো তথ্যই প্রতিবেদনে তুলে ধরতে। এখানেই বাধে বিপত্তি। এ কারণে প্রায়ই দেখা যায়, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন খুব বড় হয়ে যায়; যা পড়তে বা শুনতে পাঠকের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। প্রতিবেদক এটাই ভুলে যান যে, তিনি পাঠক/দর্শকের জন্য লিখছেন, লেখক বা নিজের জন্য নয়। প্রতিবেদক এতটাই বড় প্রতিবেদন লিখেন যার কারণে অনেক সময় পাঠক/দর্শক খেই হারিয়ে ফেলেন, ঘটনা/বিষয়ের সবচেয়ে বড় দিকটিই কি তা বুঝতে পারেন না। খুব কষ্ট করে যোগাড় করা সংগৃহীত তথ্যগুলো একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের কাছে পরমপ্রিয় হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি এসব তথ্যের সবগুলোকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তখন 'শ্যাম রাখি না কূল রাখি' অবস্থা হয় তার। গুরুত্বপূর্ণ মনে হওয়া তথ্যগুলোর কোনটি দেবেন আর কোনটি দেবেন না তা নির্ধারণ করতে না পেরে সব তথ্যই প্রতিবেদক দিয়ে দেন; যার ফলে প্রতিবেদনটি অনেক সময় হয়ে যায় জগদ্দল পাথর, যেন কোন বিচারকের রায়ের দলিল। এ ধরনের প্রতিবেদনে প্রতিবেদক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন - 'এ অনুসন্ধানের অর্থ কি' তার উত্তর গোছানোভাবে তুলে ধরতে পারেন না। প্রতিবেদনে থাকে না কোন কেন্দ্রীয় চরিত্র। ফলে প্রতিবেদনটি যেন হয়ে যায় কোন গবেষণা প্রতিবেদন বা অভিসন্দর্ভ। এমন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক সম্পর্কে Sheila S. Coronel বলেছেন, "*They do not tell a story; they have no characters. They end up writing a research paper rather than a riveting, journalistic account.*"[৩০৯]

দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্য থেকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত আরো জটিল। কারণ এখানে টাকা-পয়সার জটিল লেনদেনের হিসাব এত বেশি থাকে এবং সেসব লেনদেনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিস্তৃতি এত দূর পর্যন্ত থাকে

[৩০৮] Ibid, Leonard M. Kantumoya (2004), p. 69.
[৩০৯] Sheila S. Coronel (2009) Digging Deeper: A Guide for Investigative Journalists in the Balkans, Sarajevo, Balkan Investigative Reporting Network, p 179.

যে প্রতিবেদক সে সম্পর্কজালের সবটুকু তুলে ধরতে চান, প্রকাশ করতে চান তিনি কতটা পরিশ্রম করে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এ কাজটিই বিপদ ডেকে আনে। এতে প্রতিবেদন এত লম্বা ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠে যে পাঠক অন্য কোন সংবাদের শিরোনামে চোখ বুলায় কিংবা রিমোটের বোতাম টিপে অন্য কোন টেলিভিশন চ্যানেলের খবরে চলে যায়। সেজন্য একটি নিটোল, ঝরঝরে প্রতিবেদন তৈরির স্বার্থে বেশ কিছু ত্যাগ প্রতিবেদককে করতেই হয়।

প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারযোগ্য তথ্যগুলো বাছাই করার ক্ষেত্রে প্রতিবেদককে খেয়াল রাখতে হবে যেসব তথ্যের সত্যাসত্য পুরোপুরি যাচাই-বাছাই করা সম্ভব হয়নি কিংবা যেসব তথ্য একাধিক সূত্রের মাধ্যমে সেগুলোর সত্যাসত্য প্রতিষ্ঠা করা যায়নি সেগুলো অবশ্যই বাদ দিতে হবে। যদিও সময় ও পরিশ্রমের কথা বিবেচনা করলেও এটি খুবই পীড়াদায়ক একটি কাজ, কিন্তু প্রতিবেদনের গ্রহণযোগ্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতার জন্য প্রতিবেদককে এ স্বার্থত্যাগ অবশ্যই করতে হবে। কারণ প্রতিবেদক প্রচুর সময় ও পরিশ্রম করে এসব তথ্য যোগাড় করেছিলেন। এ কাজটি কঠিন বলে ইদানিং উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য সম্পাদকরা একটি টিম করে দেন। এ টিমের একটি অংশ তথ্য সংগ্রহ করে আরেকটি অংশ তথ্য বাছাই ও প্রতিবেদন লেখার কাজ করে থাকেন। স্পর্শকাতর প্রতিবেদনগুলোর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় টিমটির সাথে সম্পাদক ও সহসম্পাদকরা যোগ দেন। কারণ এখানে প্রতিবেদকের একার বিচার-বিশ্লেষণের চেয়ে দলীয় বা একাধিক ব্যক্তির বিচার-বিশ্লেষণ অনেক ধরনের বিপত্তি এড়াতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। তবে আমাদের মতো গরীব দেশের সংবাদমাধ্যমগুলোর পক্ষে এ ধরনের দুটি টিম করে দেয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। সে কারণে আমাদের দেশের অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে তার প্রতিবেদনটি নিজেকেই লিখতে হয়। তবে তথ্য বাছাইয়ের পর যেসব তথ্য আপাতত ব্যবহারযোগ্য নয় বলে প্রতিবেদক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেগুলো একেবারে ময়লার ঝুঁড়িতে ফেলে দেয়া উচিত নয়। বরং সেগুলো সংরক্ষণ করা উচিত যাতে ভবিষ্যতে কিংবা ফলোআপ প্রতিবেদনের জন্য নতুন করে যাচাই-বাছাই করে এসব তথ্য ব্যবহার করতে পারেন।

৪. তথ্য সাজানো (Lining up the Facts)

চাল থেকে তুষ ঝাড়ার মতো প্রতিবেদক তার সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত থেকে অপ্রয়োজনীয়, স্বল্প-প্রয়োজনীয় কিংবা অযাচাইকৃত তথ্যগুলো ঝেড়ে ফেলেছেন। এখন প্রতিবেদকের কাজ হলো ব্যবহারযোগ্য হিসেবে বাছাইকৃত তথ্য-উপাত্তগুলোর ভিত্তিতে সংবাদগল্পটি লেখার জন্য তথ্যগুলো সাজিয়ে ফেলা। কারণ প্রতিটি প্রতিবেদনই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাজানো দরকার। এখানে প্রতিবেদককে নিরীক্ষকের ভূমিকা পালন করতে হয়। সংবাদগল্পের পুরো কাঠামোর কোথায় ও কিভাবে কোন কোন তথ্য সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তুলে ধরলে পাঠকের জন্য সহজ হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। কারণ মনে রাখতে হবে, তথ্য সংবাদ কাহিনীকে তুলে ধরে না; বরং সংবাদ কাহিনীই তথ্যকে তুলে ধরে। এ কারণে অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় কোনো তথ্যই প্রতিবেদনে তুলে ধরা যাবে না। সেজন্য Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists-তে বলা হয়েছে, "*The facts do not tell the story. The story tells the facts. If the story bogs down under the weight of the facts, the reporter will fail. Do not use a fact that does not illuminate the meaning of your story, no matter how interesting it otherwise appears to you.*"[৩১০] এ পর্যায়ে প্রতিবেদককে

[৩১০] Ibid, Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), p. 63.

নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হয়:

ক. রূপরেখা তৈরি করা

পরিষ্কার ও স্পষ্ট লেখার জন্য আগেভাগে চিন্তা করতে হবে। লেখার শুরুতেই প্রতিবেদককে ভেবে নিতে হবে তিনি কি লিখতে চান। সুস্পষ্ট লেখার জন্য দরকার সুস্পষ্ট চিন্তা। চিন্তার স্বচ্ছতা ছাড়া লেখার স্বচ্ছতা কখনো আসতে পারে না। সহজ, স্পষ্ট ও সাবলীল লেখা হঠাৎ করে হয় না। অনেকটা 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে'-এর মতো। এটি নির্ভর করে সুষ্ঠু চিন্তাভাবনার ওপর। হুয়ান এল মারকাদো বলেছেন, "*আপনার দেয়া তথ্য/ঘটনা অপর্যাপ্ত হলে, আপনি যে বিষয়টি বিশেষভাবে জানাতে চান তা অস্পষ্ট হলে ও সেই সাথে আপনার পরিবেশনার উপকরণগুলি সুসংবদ্ধ, গোছালো করার ব্যাপারে আপনার মাথাব্যথা না থাকলে, আপনি কাগজে সেগুলি লিখে দিয়ে খালাস হলেই তা স্পষ্ট, স্বচ্ছন্দ, ঝরঝরে হবে না।*"[৩১১] এজন্য অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের ভালো প্রতিবেদন লেখার জন্য সংবাদ লেখা শুরুর আগেই একটি আউটলাইন বা স্টোরিবোর্ড কিংবা রূপরেখা তৈরি করে নিতে হয়। হুয়ান এল মারকাদো বলেছেন, "*খসড়া যে নানা বিষয় ও ভাবের প্রবাহকে আরও দ্রুত করে, একটা থেকে আরেকটায় স্বচ্ছন্দে গড়াতে সাহায্য করে, বিজাতীয় কিছু থাকলে তা ছাঁটাই করতে সাহায্য করে – এটি আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই রূপরেখামূলক খসড়া কাহিনীর উপসংহার নির্ধারণে সাহায্য করে।*"[৩১২]

অভিজ্ঞ প্রতিবেদকরা তথ্য সংগ্রহ ও তা সংগঠনের সাথে সাথেই মনে মনে সম্ভাব্য প্রতিবেদনের একটি খসড়া বা ছক এঁকে নেন। এই রূপরেখাটি ঘটনা বা সংবাদের প্রধান দিক/মূল প্রতিপাদ্য, প্রাপ্ত ফলাফল ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত চরিত্রগুলোর উল্লেখ থাকে। স্টোরিবোর্ড মূলত একটি ভিজ্যুয়াল লেআউট বা অঙ্কনচিত্র যেখানে কিভাবে ঘটনাটি ঘটেছে তার একটি বর্ণনা থাকে। এই স্টোরিবোর্ড প্রতিবেদকের সামনে ঘটনার বিভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরে। Sheila S. Coronel বলেছেন, "*The storyboard is a visual layout - a sketch - of the narrative that helps reporters imagine how their story is going to play out. The storyboard allows them to move around various elements of the story - and see how these look - before they write it.*"[৩১৩] এক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি কয়েক কিস্তির হবে না কি এক কিস্তিতেই শেষ করা হবে সে বিষয়ে পরিষ্কার দিকনির্দেশনা এই রূপরেখায় থাকে। তবে এখানে মনে রাখতে হবে, রূপরেখা তৈরির জন্য প্রতিবেদকের খুব বেশি সময় দেয়া উচিত নয়। একটি মোটামুটি কাঠামোতে সাজানো তথ্যগুলো দাঁড় করানোই এখানে মূখ্য বিষয়। প্রতিবেদককে মনে রাখতে হবে, তিনি একজন প্রতিবেদক, কোন রূপরেখাবিদ নন। পাঠক/দর্শক তার রূপরেখাটি পড়বেন/দেখবেন না, পড়বেন/দেখবেন তার প্রতিবেদনটি। এজন্য খসড়া খুব বেশি বিস্তৃত হওয়ার দরকার নেই। এখানে গুরুত্বের অগ্রাধিকার বিবেচনা করে সংগৃহীত তথ্যগুলোর মধ্যে থেকে প্রতিবেদনের জন্য সব দিকের একটি তালিকা তৈরি করলেই চলবে। একইরকম আঙ্গিকের তথ্যগুলো একজায়গায় করতে হবে। এরপর রূপরেখাটিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে যাতে তথ্যগুলো যৌক্তিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য। এ ধরনের রূপরেখা তৈরি করার সময় মানবীয় কৌতূহল উদ্দীপক বিষয়ক ও তাৎপর্যপূর্ণ

[৩১১] প্রাগুক্ত, আফতাব হোসেন (অনুবাদ) (১৯৯৫), পৃ- ১৪৭।
[৩১২] প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪৭।
[৩১৩] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p 180.

কিংবা স্পর্শকাতর মন্তব্যগুলো আলাদাভাবে চিহ্নিত করে রাখা ভাল। লস এঞ্জেলস টাইমসের সাংবাদিক ফ্লেমিং অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার আগে সংগৃহীত তথ্যগুলো কার্ড বা কাগজের টুকরোতে পরপর লিখে নিতেন। এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী কার্ডগুলোকে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে নিতেন। পুলিৎজার পুরষ্কার বিজয়ী নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদক এনথনি লিউস তথ্য সাজানোর ধরন সম্পর্কে বলেছেন, "*In writing any serious story, I think about the whole story before writing it, at least to decide what points I should cover and in what order. If there is time -- which there frequently is not -- I may jot down an outline.*"[৩১৪]

খ. ঘটনা/বিষয়ের চরিত্র বা ক্রীড়নক নির্ধারণ

সংবাদ-কাহিনিকে প্রাণ দেয়ার জন্য তাতে মানুষকে আনতে হবে। অর্থাৎ যে কোন সংবাদকাহিনিকে জনসমন্বিত করতে হবে। যে কোন সংবাদগল্পের ক্ষেত্রেই শক্তিশালী ও চমকপ্রদ চরিত্রগুলোই মূখ্য বিষয়। এদের ছাড়া সংবাদগল্পটি হবে অনুজ্জ্বল কিংবা নিস্প্রভ। এ চরিত্রগুলো ছাড়া সংবাদগল্প জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে না। এজন্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। কারণ একজন মানুষ আরেকজন মানুষের গল্পই বেশি শুনতে চায়। একজন মানুষের জীবন অন্য মানুষকে যতটা আকর্ষণ করে অন্য কোন কিছু ততটা আকর্ষণ করে না- এটা মানবীয় চরিত্রের একটি বিশেষ প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য। চরিত্রগুলোর যথাযথ উপস্থাপন এবং তাদের মন্তব্য বা উদ্ধৃতি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে একজন প্রতিবেদক তার সংবাদে প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন। এতে ঘটনার সত্যতা ও বিশ্বস্ততা বাড়ে। Sheila S. Coronel বলছেন, "*Characters and interesting quotations breathe life into a report.*"[৩১৫] ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি সংবাদে চরিত্র বা ক্রীড়ানক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে; এখানে ভুক্তভোগী যেমন থাকবে তেমনি থাকবে মূল কর্তাব্যক্তিও। এখানেও হুইসেল-ব্লোয়ার কিংবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অনুসন্ধানকারীও থাকতে পারেন। এরা মূলত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীই বেশি হন। এরা এমন সাধারণ মানুষ যাদেরকে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিবেদককে স্থাপন করতে হয়।

তথ্য সংগ্রহের সময় সুক্ষভাবে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে হয় এবং বিস্তারিত নথিপত্র সংগ্রহ করতে হয়। এ সময় মনে রাখতে হবে যে, এই পর্যবেক্ষণ আর নথিপত্রের ভিত্তিতেই তিনি সংবাদটি লিখবেন। তথ্য সংগ্রহকালে বা রিপোর্টিংয়ের সময় তাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় নানা তথ্য (যেমন, বয়স, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি) সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। একটি সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় সাক্ষাৎকারদাতার চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় দিকগুলো (যেমন- পোশাক-পরিচ্ছদ, আচরণ, মুখের বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি) সম্পর্কে বিস্তারিত নোট নিতে হয়। সাক্ষাৎকারের সময় ওই ঘটনার সঙ্গে ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতার দিকটি ফুটে ওঠে এমন প্রশ্ন করতে ভুলে গেলে চলবে না। কারণ এমন প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় খুব কাজে লাগতে পারে।

যখন প্রতিবেদক ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন স্থান পরিদর্শনে যান তখন অবশ্যই সেখানে যা দেখেছেন সে বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নোট নিতে হবে। এমনকি মোবাইল ফোনের ক্যামেরার সাহায্যে ছবিও তুলে রাখতে পারেন, পরে যা লেখার সময় তাকে সাহায্য করবে। তবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে প্রায়ই দেখা যায়, প্রতিবেদক যা দেখেছেন তারই বর্ণনা দেন;

[৩১৪] Ibid, Neale Copple (1964), p. 64.
[৩১৫] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p 180.

প্রতিবেদনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার জন্য লেখার সময়ও তাই আরো অনুসন্ধান চালাতে হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদকের কোনভাবেই তড়িঘড়ি বা তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রতিবেদক এতদিন ধরে শ্রম দিয়ে ক্লান্ত, তিনি আর নতুন করে অনুসন্ধানে নামার চেয়ে সুনির্দিষ্ট নয় এবং যাচাই-বাছাই করা হয়নি এমন তথ্য দিয়ে একটা গোঁজামিল দিয়ে দেন। এ ধরনের কর্মকাণ্ড দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ভয়ঙ্কর পরিণতি ঢেকে আনতে পারে। আবার তথ্য সাজানোর এ স্তরে প্রতিবেদনের কোন আঙ্গিক/দিকের কোন ধরনের ভারসাম্যহীনতাও ধরা পড়তে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মন্তব্য যোগাড় করতে হয় বা অভিযুক্তের বক্তব্য সংগ্রহ করতে হয়।

৫. স্বরভঙ্গি (Tone)

প্রতিবেদনের স্বরভঙ্গি ব্যবহৃত শব্দ ও লিখন শৈলীর ওপর নির্ভরশীল। Leonard M. Kantumoya বলেছেন, "*The tone is the "mood" or "feel" of the story. ... The tone of the story is set by the choice of words used and the writing style used, whether formal or informal.*"[৩১৯] দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন মানেই যে কাটখোট্টা কিংবা রাগী রাগী ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করতে হবে- এমন ধারণা অমূলক। অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন কিংবা অনিয়ম বা ক্ষমতার অপব্যবহারের খবর তুলে ধরতে হয়। তবে খুব কদাচিৎই একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক তার প্রতিবেদন লেখার সময় প্রতিবেদনের স্বরভঙ্গি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। প্রত্যেক প্রতিবেদকের মধ্যে এক ধরনের নিজস্ব লেখার ভঙ্গি গড়ে উঠে। যতই তিনি অভিজ্ঞ হন, ততই এই ভঙ্গি শক্তিশালী হয়। একজন বক্তা যেভাবে একটি বিষয় থেকে আরেকটি বিষয়ে অবলীলায় ভঙ্গি পরিবর্তন করে দ্রুত চলে যেতে পারেন তেমনি একজন প্রতিবেদকও ধীরে ধীরে কাজের মধ্যে দিয়ে লিখন ভঙ্গি করায়ত্ত করেন। তারপরও প্রতিবেদনের প্রতি পাঠককে আকৃষ্ট করতে এবং পুরো প্রতিবেদন জুড়ে তাদের এই আকর্ষণ ধরে রাখতে প্রতিবেদনের স্বরভঙ্গি নিয়ে কিছুটা হলেও প্রতিবেদককে চিন্তাভাবনা করতে হয়। যেমন ধরুন, কেউ যদি দুস্কর্ম ও দুস্কৃতিকারীদের আক্রমণের শিকার হয়েছে- এমন বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে চান তাহলে এ ধরনের প্রতিবেদন গাম্ভীর্যপূর্ণ হওয়া উচিত। এ ধরনের প্রতিবেদনে দ্ব্যর্থকতার কোন সুযোগ নেই। প্রতিবেদনে সংগৃহীত নথিপত্রের মাধ্যমে অপকর্ম কিংবা দুষ্কর্মের বিবরণ তুলে ধরতে হবে। আবার নাটকীয়ভাবে ঘটনা উপস্থাপনের মাধ্যমেও দুষ্কর্মের বিবরণ তুলে ধরা যেতে পারে। প্রতিবেদনের স্বরভঙ্গি প্রতিষ্ঠার জন্য জড়িত সকল পক্ষের মতামত তুলে ধরতে হবে। Leonard M. Kantumoya বলেছেন, "*Remember, though, that not all investigative stories should be shrill or accusatory, or tinted with sarcasm. Do not sensationalise just for the sake of inciting public outrage. In the heat of the moment, keep your composure. Do not forget that, as a reporter, your role is to present a case based on facts and not to allow your personal feelings and opinion to creep into the story.*"[৩২০]

সংবাদের গঠন

ভাল অনুসন্ধানী সংবাদ লিখন কোন একটি একক বাধাধরা কাঠামোর উপর নির্ভরশীল নয়। তবে একটি সাদামাটা সংবাদ সংবাদের আদি লিখন পদ্ধতি উল্টো পিরামিড কাঠামোয়

[৩১৯] Ibid, p. 73.

[৩২০] Ibid.

সংবাদের প্রথাগত গঠনকাঠামোকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয় না। যে কোন অনুসন্ধানে এই উপাদানগুলো থাকে; প্রকৃতপক্ষে থাকতে বাধ্য; তবে তা থাকে অনেক গভীরতর ও বিস্তৃত কাঠামোয়। অনুসন্ধানের মাধ্যমে একজন প্রতিবেদক ঘটনা বা ইস্যুর সঙ্গে জড়িত চরিত্র অর্থাৎ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে খুঁজে পায়, তাদের উদ্দেশ্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিগত ইতিহাসের সন্ধান পায়। ঘটনা, তার পারিপার্শ্বিকতা, জড়িত চরিত্রগুলোর সূত্র সন্ধান করে প্রতিবেদক অনুসন্ধানের মাধ্যমে ওই ঘটনার অতীত, বর্তমান প্রেক্ষিত এবং ভবিষ্যতে এর প্রভাব বের করে আনেন। সেজন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মৌলিক লিখন কাঠামোটিই উপাখ্যানমূলক (narrative); বলা যায় বিস্তৃত উপাখ্যানমূলক সংবাদ কাহিনি। *Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists*-তে বলা হয়েছে, "*It shows us a past in which the story began a present in which it is revealed, and a future that will result from the revelation. In short, it is a rich narrative. If you want it to work, you must structure it.*"[৩২৫] এরিস্টটল তাঁর '*The Poetics*'-এ বলেছেন, যেকোন উপাখ্যানমূলক লেখারই তিনটি অংশ থাকে। একইভাবেই অনুসন্ধানী সংবাদেরও তিনটি অংশ থাকে: শুরু বা সূচনা, মধ্যবর্তী অংশ বা দেহ বা বডি (ঘটনার উন্নতি-ডেভেলপমেন্ট) ও শেষাংশ। মূলত এটি যে কোন ধরনের সংবাদ কাঠামোরই মৌলিক সজ্জা। যে কোন ধরনের সংবাদ কাঠামোতে এই তিনটি স্তরই থাকাটা অনিবার্য। নিচের চিত্রে এ ধরনের মৌলিক সংবাদ কাঠামোটি দেখা যাচ্ছে:

চিত্রঃ সংবাদের মৌলিক কাঠামো

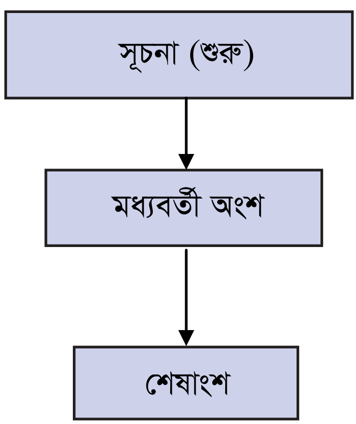

এ মৌলিক কাঠামোর ভিত্তিতেই মূলত বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধানী সংবাদ লিখন কাঠামো রচিত হয়েছে। সংবাদ লিখন কাঠামোর এই তিনটি স্তরকে একত্রিত করলে দেখা যাবে, এখানে একটি বর্ণনামূলক চক্র বা কাঠামো থাকে। সাংবাদিককে তার লেখা শুরুর আগেই এই আখ্যানমূলক চক্র বা কাঠামো (narrative arc or structure) সম্পর্কে ভাবতে হয়। এ চক্রের মূল বিষয় হচ্ছে, একটি সংবাদে ধারাবাহিকতা থাকা উচিত। একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার সময় প্রতিবেদককে মনে রাখতে হবে তিনি একটি ঘটনা ও ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলো দিয়ে একটি আখ্যানমূলক বা গল্পকথনের মালা গাঁথছেন। একটি চরিত্র অন্য আরেকটি চরিত্রের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত কিংবা তাদের মধ্যকার বৈপরীত্যগুলো

[৩২৫] Ibid, p. 60.

Paul O'Neil প্রথম অনুচ্ছেদেই বাজিমাত করার কথা বলেছেন, "*Always grab the reader by the throat in the first paragraph, sink your thumbs into his windpipe in the second, and hold him against the wall until the tag line.*"[৩৩০]
সর্বোত্তম সংবাদ সূচনা পাঠক/দর্শকের প্রাথমিক আগ্রহ বা কৌতুহল মেটায়। এ তৃপ্তিই তাদেরকে সংবাদের পরবর্তী অংশের দিকে নিয়ে যায়। এসোসিয়েটেড প্রেসের সাংবাদিক Rene Cappon মনে করেন, পাঠক/দর্শক সংবাদের ভেতরে যাবেন কীনা সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সংবাদ সূচনার ওপর। তিনি বলেছেন, "*Lead writing as a cause of great agony. Why is no mystery. Based on the lead, a reader makes a critical decesion: Shall I go on?*"[৩৩১]

লেখক William Zinsser একটি ভাল সংবাদ সূচনা ছাড়া যে প্রতিবেদন মাঠে মারা যেতে পারে তা তুলে ধরেছেন এভাবে, "*The most important sentence in any article is the first one. If it doesn't induce the reader to proceed to the second sentence, your article is dead. And if the second sentence doesn't induce him to continue to the third, it's equally dead.*"

সাধারণত দুই ধরনের সংবাদ সূচনার মাধ্যমে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করা হয়। একটি হলো হার্ড বা গুরু; অন্যটি সফট বা লঘু সংবাদ সূচনা। তবে যে ধরনের সংবাদ সূচনাই হোক না কেন তাতে সংবাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি বা দিকটি থাকতে হয় কিংবা সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে হয়। Doug Newsom I James A. Wollert বলেছেন, "*The lead must give the most newsworthy of the specific points; it must answer the reader's question: What's the news in this story?*"[৩৩২]

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন একটি গুরু সংবাদ সূচনা, সারাংশ সূচনার মাধ্যমে শুরু হতে পারে। এটি নির্ভর করে সংবাদটির ধরন ও প্রতিবেদকের হাতে থাকা তথ্যের উপর। এই ধরনের সূচনার লক্ষ্য হলো পাঠক/দর্শককে সংবাদের দিকে টেনে নেয়া এবং তাদের সামনে ঘটনা/বিষয় সম্পর্কে একটি সমন্বিত ধারণা তুলে ধরা। Sheila S. Coronel বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, "*The aim of a lead is to pull the readers into the story and to provide them with a sense of what the story is all about.*"[৩৩৩] এ ধরনের সংবাদ সূচনা প্রথাগত অকুস্থল-সংবাদ সূচনার মতোই।

[৩৩০] Ibid, Tony Harcup (2004), p. 107.
[৩৩১] Doug Newsom & James A. Wollert (1985), Media Writing: News for the Mass Media, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California, p. 72.
[৩৩২] Ibid, p. 79.
[৩৩৩] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p 182.

কিন্তু তিনি কি শুনেছেন বা স্বাদ/গন্ধের বর্ণনা থাকে না। এই ধরনের স্পর্শকাতর পর্যবেক্ষনগুলোও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে খুব কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

গ. আরো অনুসন্ধান

প্রতিবেদক যখন মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন তখন শেষ দিকে এসে মোটামুটিভাবে নিজের মনের মধ্যে প্রতিবেদনের একটি ছক এঁকে ফেলতে পারেন এবং এ কাজটি বেশিরভাগ প্রতিবেদকই করে থাকেন। এমনকি বেশিরভাগ প্রতিবেদক মনে মনে ধামাক্কা সংবাদ সূচনা দাঁড় করিয়ে ফেলেন। তারপরও তথ্য সাজানোর স্তরে এসে প্রতিবেদক যখন তথ্যগুলো সারিবদ্ধভাবে ছকে ছকে সাজিয়ে ফেলেন এবং সে অনুযায়ী ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত চরিত্রগুলো ও তাদের মন্তব্যগুলোকে আলাদা করেন তখন প্রতিবেদককে বুঝতে হবে সংগৃহীত তথ্যের কোন গলদ বা ফারাক আছে কীনা। সংগৃহীত তথ্যগুলো যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদককে ঘটনা/বিষয়টি পুরোপুরি প্রমাণের জন্য গলদ বা ফারাকগুলো বের করতে হয়। এক্ষেত্রে নির্ধারিত বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের নানা দিকগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপনে নতুন কোন তথ্য-উপাত্ত দরকার কীনা তা বের করে আনতে হয়। Leonard M. Kantumoya বলেছেন, "*By laying out all the relevant facts, you can spot the gaps in the data as well as the missing links in the flow of the story and the transition from one sub-theme to another.*"[৩১৬]

নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী বলেছেন, "দাবার ছকে যেভাবে যার যার নির্ধারিত স্থানে বসানো হয় ঘুঁটি কিংবা পিকচার পাজেলে যেভাবে নির্ধারিত স্থানে যুক্ত করতে হয় খণ্ডাংশ সেভাবে তথ্যগুলো সাজানোর পর প্রতিবেদক সহজেই সনাক্ত করতে পারবেন কোন ঘুঁটিটি বা খণ্ডাংশটি তার নেই অর্থাৎ কোন তথ্য এখানে অনুপস্থিত। লেখার সময় এই কাজটি অবশ্যই করতে হবে।"[৩১৭] এসব ঘাটতি পূরণে নতুন করে গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে কীনা সে বিষয়ে প্রতিবেদককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সংবাদটিকে আরো বেশি অর্থবহ এবং পূর্ণাঙ্গ করতে প্রয়োজনসাপেক্ষে এসব তথ্য নতুন করে খুঁজে বের করতে হবে। প্রাপ্ত তথ্যগুলো সাজানোর সময়ই এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। এ স্তরে তথ্যের যাচাই-বাছাই করার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। কারণ এর ওপরে অনেক সময় আপনার প্রতিবেদনের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করে। বিশেষ করে বাছাইকৃত ব্যবহারযোগ্য তথ্য-উপাত্তগুলো প্রতিবেদকের অনুমিতি বা পূর্বানুমানগুলোকে সমর্থন না করে তখন প্রতিবেদকের মনে হতে পারে তিনি একটি ভুল উপসংহারে উপনীত হয়েছেন। Leonard M. Kantumoya বলেছেন, "*Scrutiny of the facts at this stage is crucial. It can determine the life or death of the story, especially if it is found that the facts assembled do not support the original thesis and you feel you have reached a wrong conclusion.*"[৩১৮]

এক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রাপ্ত তথ্যগুলো যাচাই করতে হয়: একটি উপাত্তের সঙ্গে অন্য একটি উপাত্তের; একজন ব্যক্তির বক্তব্যের সঙ্গে অন্যের বক্তব্যের; একজন ব্যক্তির বক্তব্যের সঙ্গে রেকর্ড ও নথিপত্রের যাচাই করতে হয়। এসব যাচাই-বাছাই শেষে অনুসন্ধানী

[৩১৬] Ibid, Leonard M. Kantumoya (2004), p. 70.
[৩১৭] নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী (১৯৯৬), অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি), ঢাকা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ- ১১৮।
[৩১৮] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p 180.

যেভাবে সহজেই লেখা যায় একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সেভাবে খুব সহজেই লেখা সম্ভব নয়। আবার কোন একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো দিয়ে সব ধরনের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা করাও সম্ভব নয়। অনুসন্ধানী সংবাদ লিখতে গিয়ে প্রতিবেদককে কাঠামো নির্বাচনেও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতে হয়। কারণ সংবাদমাধ্যমের জায়গা সীমিত ও গুরুত্বপূর্ণ কিংবা মূল্যবান। এ মূল্যবান ও সীমিত পরিসরের মধ্যেই পাঠক/দর্শকের আগ্রহ ধরে রাখার মতো প্রতিবেদন লিখতে হয়। তবে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, লিখন কাঠামো নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ার কোন কারণ নেই। তথ্য সংগঠন ও সাজানোর কাজটি ঠিকভাবে হলে এবং প্রতিবেদনের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু ঠিক করা থাকলে, সেসব তথ্য এবং আঙ্গিক বা কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে সংবাদ কাঠামো রচিত হবে।

একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, সংবাদ কাহিনি বলতে কোন তথ্যের সমাহার বা তথ্যের তালিকাকে বুঝায় না। যদিও তথ্য ছাড়া কোন সংবাদ কাহিনি রচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু শুধু তথ্য বা পরিসংখ্যান তুলে ধরলে সেটি হতে পারে হিসাববিজ্ঞানের জাবেদা বা রেওয়ামিল বহি। এসব তথ্য কিভাবে সংবাদ আকারে পাঠকের সামনে তুলে ধরা হবে সেটিই হলো সংবাদ কৌশল বা কাঠামো। এ তুলে ধরার প্রক্রিয়াটি এমনভাবে হবে যেন পাঠক কোন গল্প শুনছেন কিংবা কোন দৃশ্য দেখছেন। তথ্যের তালিকা ও সংবাদ কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য খবু সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন Neale Copple। তিনি বলেছেন, "*A list of facts is not a story. Although a list of facts may satisfy the journalistics precept that we get all the facts that list alone makes no sense. The difference between a list of facts and a story is style.*"[৩২১] একটি সংবাদ কাঠামো যে শুধু তথ্যের সমাহার নয় তা James Milne তুলে ধরেছেন এভাবে, "*Lots of facts, plainly stated and grouped with drama and maybe a dash of sentiment -- no more. That's the journalistic cocktail.*"[৩২২] এ কারণে লিখন হলো শব্দ থেকে শব্দ, বাক্য থেকে বাক্য এবং অনুচ্ছেদ থেকে অনুচ্ছেদ নির্মাণের কাজ। এ ধাপে সংবাদকাঠামো অনুযায়ী তথ্য সাজাতে হয়।[৩২৩]

আবার কোন কাঠামোই সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists-এ লেখার ছন্দের ওপর কিংবা তথ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার ওপর জোর দিতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কাঠামো নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত না হওয়ার পরামর্শও দেয়া হয়েছে; কারণ এতে লেখা তার গতি হারাতে পারে -- "*Your style should not overcome the material; if it does, the material seems unimportant. Remember that a simple style can easily be made more complicated, but a complicated style is hard to simplify. Do not get caught in your own devices and mannerisms. The key to investigative writing is rhythm, and too much style will slow it down.*"[৩২৪]

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মৌলিক কাঠামো

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ষড়-ক (কে, কি, কখন, কোথায়, কেন ও কিভাবে) এর উত্তর সম্বলিত

[৩২১] Ibid, Neale Copple (1964), p. 79.
[৩২২] Tony Harcup (2004), Journalism Principles and Practice, Vistaar Publications, New Delhi, p. 111.
[৩২৩] ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে এবং আমিনুল ইসলাম (২০১৩), বাংলাদেশে সাংবাদিকতা: সংবাদ লেখা শৈলী ও কাঠামো, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ- ১৪৯।
[৩২৪] Ibid, Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), chapter five; Organization: How to Set Yourself Up to Succeed, p. 58.

প্রতিবেদককে এই মালায় ধারাবাহিকতা রেখে বর্ণনা করতে হয়। Sheila S. Coronel বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এভাবে, "*A story needs continuity. Sometimes a character can be used as the thread that ties a narrative together. That character's life can be used throughout the report; his or her life can be illustrative of the various themes the journalist wants to develop in the report.*"[৩২৬] এ চরিত্রগুলো পারস্পারিক সম্পর্ক, তাদের বৈপরীত্য তুলে ধরার মধ্য দিয়ে প্রতিবেদক ঘটনার নাটকীয় দিকটি জীবন্তভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। আবার একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে অনেকগুলো ঘটনার সমন্বয় করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রতিবেদক একটি ঘটনা দিয়ে তার প্রতিবেদন শুরু করেন এবং তার ফ্ল্যাশব্যাক হিসেবে আরও ঘটনা তুলে ধরেন। একাধিক ঘটনার এই মেলবন্ধন তার প্রতিবেদনটির কাহিনির মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে। যেমন ধরুন, কোন প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনটি শুরু করেছে একটি হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করে; এক্ষেত্রে তাকে ধীরে ধীরে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলো উন্মোচন করতে হয়। এক্ষেত্রে তিনি মূলত যেভাবে অনুসন্ধান করে ঘটনাটি বের করে এনেছেন সেভাবে ঘটনাগুলো উন্মোচন করতে হয়।

দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দুর্নীতি কিংবা অনিয়মের সঙ্গে জড়িত মূল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকেও বর্ণনামূলক সুঁতোর মালায় গাঁথতে হবে। যেভাবেই করুক না কেন, কিভাবে তিনি পাঠক/দর্শকের সামনে প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবেন সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ স্তরেই তাকে ভাবতে হবে। Sheila S. Coronel বলেছেন, "*Whatever it is, journalists should already be thinking about and imagining narrative structures during the reporting phase, so that they can do the reporting that is needed to make these structures possible.*"[৩২৭]

সংবাদগল্পের শুরু: গুরু নাকি লঘু? (Beginning of the news story: hard or soft?)

সাধারণভাবে সংবাদের শুরুর অংশ বা সংবাদ কাহিনির প্রথম অনুচ্ছেদটিই সংবাদ সূচনা বা সংবাদ শীর্ষ নামে পরিচিত। এই অংশটি পড়েই পাঠক কোন সংবাদ কাহিনি সম্পর্কে মোটামুটি অবগত হয়ে যান এবং এ অংশটি যদি পাঠকের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয় তবেই তিনি সংবাদের বাকি অংশটুকু পড়তে মনোনিবেশ করেন। সাধারণত এ অংশে ঘটনা/বিষয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতুহলোদ্দীপক ভাবটি থাকে; যাকে ঘিরে গড়ে উঠে গোটা সংবাদ কাহিনি। সংবাদ সূচনা সম্পর্কে সংবাদ লিখন প্রশিক্ষক Donald M. Murray বলেছেন, "*... the lead can be thought of as the promise and the body what makes good on that promise. The lead says to the reader or listener: Hey, look at what I found out. The body says: Let me explain it to you.*"[৩২৮] *Paul N. Williams Lye* স্পষ্টভাবে বলেছেন, "*Once the lead is clear, the points sketched out -- if only mentally--the rest of the story follows natutrally and quickly.*"[৩২৯] সংবাদ সূচনার গুরুত্ব নিয়ে বলে শেষ করা যাবে না। একটি ভাল সূচনা ছাড়া যে একটি প্রতিবেদন তা যতই তথ্যসমৃদ্ধ হোক না কেন ব্যর্থ হতে পারে এমন আশঙ্কার কথা অনেক লেখক, সাংবাদিক বলেছেন। লেখক

[২২৬] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p. 181.

[২২৭] Ibid.

[২২৮] Melvin Mencher (1983), Basic News Writing, Wm.C.Brown Company Publishers, p. 115.

[২২৯] Ibid, Paul N. Williams (1978), p. 138.

Paul O'Neil প্রথম অনুচ্ছেদেই বাজিমাত করার কথা বলেছেন, "*Always grab the reader by the throat in the first paragraph, sink your thumbs into his windpipe in the second, and hold him against the wall until the tag line.*"[৩৩০]
সর্বোত্তম সংবাদ সূচনা পাঠক/দর্শকের প্রাথমিক আগ্রহ বা কৌতুহল মেটায়। এ তৃপ্তিই তাদেরকে সংবাদের পরবর্তী অংশের দিকে নিয়ে যায়। এসোসিয়েটেড প্রেসের সাংবাদিক Rene Cappon মনে করেন, পাঠক/দর্শক সংবাদের ভেতরে যাবেন কীনা সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সংবাদ সূচনার ওপর। তিনি বলেছেন, "*Lead writing as a cause of great agony. Why is no mystery. Based on the lead, a reader makes a critical decesion: Shall I go on?*"[৩৩১]

লেখক William Zinsser একটি ভাল সংবাদ সূচনা ছাড়া যে প্রতিবেদন মাঠে মারা যেতে পারে তা তুলে ধরেছেন এভাবে, "*The most important sentence in any article is the first one. If it doesn't induce the reader to proceed to the second sentence, your article is dead. And if the second sentence doesn't induce him to continue to the third, it's equally dead.*"

সাধারণত দুই ধরনের সংবাদ সূচনার মাধ্যমে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করা হয়। একটি হলো হার্ড বা গুরু; অন্যটি সফট বা লঘু সংবাদ সূচনা। তবে যে ধরনের সংবাদ সূচনাই হোক না কেন তাতে সংবাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি বা দিকটি থাকতে হয় কিংবা সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে হয়। Doug Newsom I James A. Wollert বলেছেন, "*The lead must give the most newsworthy of the specific points; it must answer the reader's question: What's the news in this story?*"[৩৩২]

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন একটি গুরু সংবাদ সূচনা, সারাংশ সূচনার মাধ্যমে শুরু হতে পারে। এটি নির্ভর করে সংবাদটির ধরন ও প্রতিবেদকের হাতে থাকা তথ্যের উপর। এই ধরনের সূচনার লক্ষ্য হলো পাঠক/দর্শককে সংবাদের দিকে টেনে নেয়া এবং তাদের সামনে ঘটনা/বিষয় সম্পর্কে একটি সমন্বিত ধারণা তুলে ধরা। Sheila S. Coronel বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, "*The aim of a lead is to pull the readers into the story and to provide them with a sense of what the story is all about.*"[৩৩৩] এ ধরনের সংবাদ সূচনা প্রথাগত অকুস্থল-সংবাদ সূচনার মতোই।

---

[৩৩০] Ibid, Tony Harcup (2004), p. 107.
[৩৩১] Doug Newsom & James A. Wollert (1985), Media Writing: News for the Mass Media, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California, p. 72.
[৩৩২] Ibid, p. 79.
[৩৩৩] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p 182.

অস্ত্র মামলায় নিজাম উদ্দিন হাজারীর ১০ বছর কারাদণ্ড

সাজা কম খেটেই বেরিয়ে যান সাংসদ

একরামুল হক, চট্টগ্রাম
দৈনিক প্রথম আলো, ১০ মে, ২০১৪

দুই বছর ১০ মাস কম সাজা খেটেই কারাগার থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ফেনী-২ আসনের আওয়ামী লীগের সাংসদ নিজাম উদ্দিন হাজারী। অস্ত্র আইনের একটি মামলায় তাঁর ১০ বছর সাজা হয়েছিল। কারাগার কর্তৃপক্ষ এটিকে জালিয়াতি বলে মন্তব্য করেছে। একাধিক আইনজীবী ও কারাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন, এই জালিয়াতির ঘটনা সত্য হলে নিজাম হাজারীকে আবার কারাগারে ফিরে যেতে হবে। জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে মামলাও হতে পারে।

আদালত সূত্র জানায়, ২০০০ সালের ১৬ আগস্ট অস্ত্র আইনের ১৯(ক) ধারায় ১০ বছর এবং ১৯(চ) ধারায় সাত বছরের কারাদণ্ড হয় নিজাম হাজারীর। চট্টগ্রাম নগরের ডবলমুরিং থানায় হওয়া মামলায় চট্টগ্রামের চতুর্থ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল তাঁকে এই সাজা দিয়েছিলেন। উভয় দণ্ড একসঙ্গে চলবে বলে রায়ে বলা হয়। অর্থাৎ ১০ বছর সাজা ভোগ করবেন নিজাম হাজারী। এই আদেশের বিরুদ্ধে নিজাম হাজারী হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন। উচ্চ আদালত তাঁর সাজা বহাল রাখেন। সর্বশেষ তিনি রিভিউ আবেদন করলে আদালত তা খারিজ করে দেন।

চট্টগ্রাম কারাগার সূত্র জানায়, নিজাম হাজারী ১৯৯২ সালের ২২ মার্চ হাজতে যান। হাজতে যাওয়ার দুই দিন পর (২৪ মার্চ ১৯৯২) তাঁকে আটকাদেশ (ডিটেনশন) দেওয়া হয়। ওই বছরের ২৮ জুলাই তিনি জামিন পান। কিন্তু তাঁর আটকাদেশ বাতিল হয় ওই বছরের ১৫ আগস্ট এবং ওই দিনই তিনি কারাগার থেকে ছাড়া পান। এই হিসাবে, নিজাম হাজারী হাজতে ছিলেন ১৯৯২ সালের ২২ মার্চ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত মোট চার মাস ২৪ দিন। কোনো মামলায় সাজার আদেশ হওয়ার আগে কারাগারে থাকা সময়কে হাজতবাস এবং সাজা ঘোষণার পরের সময়কে কয়েদ খাটা বলা হয়।

নথিপত্রে দেখা যায়, পলাতক থাকা অবস্থায়ই ২০০০ সালের ১৬ আগস্ট ওই মামলায় নিজাম হাজারীকে সাজা দেন ট্রাইব্যুনাল। ২০০০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁকে ওই দিনই কারাগারে পাঠানো হয়। তাঁর কয়েদি নম্বর ছিল ৪১১৪/এ। ২০০৫ সালের ১ ডিসেম্বর তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। অর্থাৎ, কয়েদি হিসেবে তিনি কারাভোগ করেন পাঁচ বছর দুই মাস ১৭ দিন।

এই হিসাবে হাজতবাস ও কয়েদ- দুয়ে মিলে নিজাম হাজারী সাজা ভোগ

করেছেন পাঁচ বছর সাত মাস ২১ দিন। তাঁকে সাজা রেয়াত (মাফ) দেওয়া হয়েছে এক বছর ছয় মাস ১৭ দিন। কারাগারে সর্বনিম্ন নয় মাসে বছর ধরা হয়। তবে কত মাসে বছর হবে, তা নির্ধারিত হয় কয়েদির আচরণের ওপর ভিত্তি করে।

কারাগারে ঢোকা ও মুক্তি পাওয়ার সময় ধরে নিজাম হাজারী চার মাস ২৪ দিন হাজতবাস করেছেন। কিন্তু তাঁর কয়েদি রেজিস্টারের তথ্য হলো, তিনি তিন বছর দুই মাস ২৫ দিন হাজত খেটেছেন। সূত্র জানায়, নিজাম হাজারীর হাজতি রেজিস্টারের তথ্য কয়েদি রেজিস্টারে স্থানান্তরের সময় তাঁর হাজতবাসের সময় বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে।

জানতে চাইলে চট্টগ্রাম কারাগারের জ্যেষ্ঠ সুপার মো. ছগির মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, ‘মনে হচ্ছে এটা জালিয়াতি। এই হিসাবটা কীভাবে করা হয়েছে, সেটা আমারও বোধগম্য নয়। তৎকালীন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কেবল এর জবাব দিতে পারবেন। কারাগারের হিসাব বলছে, নিজাম হাজারী দুই বছর ১০ মাস এক দিন কম কারাভোগ করে বেরিয়ে গেছেন।’

আদালত সূত্র জানায়, মামলাটি বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন অবস্থায় আসামি নিজাম হাজারী নানাভাবে কালক্ষেপণের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। বিষয়টি আদালতের নজরে আসে। হাইকোর্টের আপিল আদেশেও বিচারপতি এ কে বদরুল হক ও বিচারপতি এ এফ এম মেছবাউদ্দিন বিষয়টি তুলে ধরেন। ২০০১ সালের ১৮ এপ্রিল এ দুই বিচারপতির বেঞ্চে নিজাম হাজারীর আপিল শুনানি শুরু হয় (ফৌজদারি আপিল ২৩৬৯/২০০০)। একই বছরের ২ মে তাঁরা ট্রাইব্যুনালের দেওয়া সাজা বহাল রেখে রায় দেন।

হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে নিজাম হাজারী সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন (নম্বর ১০৭/২০০১)। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মাহমুদুল আমীন চৌধুরীর নেতৃত্বে বিচারপতি মো. রুহুল আমিন ও বিচারপতি এফ এম হাসান আপিল নাকচ করে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন। পরে নিজাম হাজারী সুপ্রিম কোর্টে রায় বিবেচনার জন্য রিভিউ আবেদন করেন (নম্বর ১৮/২০০২)। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছের হোসেনের নেতৃত্বে বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম ও বিচারপতি আমীরুল কবির চৌধুরী আবেদন খারিজ করে দেন। ফলে নিজাম হাজারীর ১০ বছরের দণ্ড বহাল থেকে যায়।

হলফনামায় ভিন্ন তথ্য: নিজাম হাজারী ২০১১ সালের ১৮ জানুয়ারি ফেনী পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হন। ওই নির্বাচনে অংশ নিতে তিনি যে হলফনামা দাখিল করেন, তাতে তিনি এই মামলায় সাজার তথ্য গোপন করেন। তাঁর হলফনামায় মামলা-মোকদ্দমার ঘরে লেখা হয় ‘খালাসপ্রাপ্ত’। ২০০৬ সালের ১৯ আগস্ট তিনি খালাস পান বলে এতে উল্লেখ করা হয়।

কিন্তু তিনি সাজা খেটে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন ২০০৫ সালের ১ ডিসেম্বর।

পৌর মেয়র পদ থেকে ইস্তফা না দিয়ে গত ৫ জানুয়ারি নিজাম হাজারী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হন। এবার হলফনামায় তিনি মামলা-মোকদ্দমার ঘরে লেখেন 'মামলা নিষ্পত্তি ও মুক্তি'।

সাংসদ নিজাম হাজারীর বক্তব্য: চার মাস ২৪ দিনের জায়গায় তিন বছর দুই মাস ২৫ দিন হাজতবাসের তথ্য দেখানোর বিষয়ে জানতে চাইলে সাংসদ নিজাম হাজারী প্রথম আলোকে বলেন, 'আমি তো এখন কিছু বলতে পারব না। এসব তো নথিতে আছে।'

এটা কি হিসাবের ভুল, নাকি জালিয়াতি- এ প্রশ্ন করা হলে নিজাম হাজারী বলেন, 'জালিয়াতি কেন হবে?'

তাহলে কী ভুল? এবার সাংসদ নিজাম বলেন, 'নথি না দেখে এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারছি না।'

ফেনীর পৌর মেয়র পদে মনোনয়ন দাখিলের সময় হলফনামায় আপনি তথ্য দিয়েছেন, ২০০৬ সালের ১৯ আগস্ট মুক্তি পান। কিন্তু কারাগারের নথিতে আছে, আপনি ২০০৫ সালের ১ ডিসেম্বর সাজা খেটে মুক্তি পেয়েছেন। তাহলে কোন তথ্যটি সত্য? জবাবে সাংসদ নিজাম হাজারী বলেন, 'কারাগারের নথির তথ্য সত্য।'

হলফনামায় আপনি তাহলে ভুল তথ্য দিয়েছেন? জবাবে নিশ্চুপ থাকেন নিজাম। প্রসঙ্গত, হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দিলে প্রার্থিতা বাতিলের বিধান আছে।

জানতে চাইলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, এই সাংসদের নির্বাচন করার যোগ্যতা ছিল কি না, নির্বাচন কমিশনকে এখন তা খতিয়ে দেখতে হবে। তাঁর জালিয়াতির বিষয়টিও শিগগিরই তদন্তের আওতায় আনা উচিত।

ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, ক্ষমতাসীন দলের জন্য এটি আরেকটি বিব্রতকর বিষয়। এর দায় দল এড়াতে পারে না। কারণ, এর মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই করার প্রক্রিয়া প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তা ছাড়া এ ঘটনার মধ্য দিয়ে নিয়মনীতি মানার ক্ষেত্রে কারা প্রশাসনের অবহেলা ও দুর্বলতা প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে।

উপরের প্রতিবেদনের সূচনা বা ইন্ট্রোটি একটি গুরু সংবাদ সূচনা। এটি মূলত সারাংশ সূচনা। সূচনাটিতে পুরো প্রতিবেদনের একটি সারমর্ম তুলে ধরে পাঠককে সংবাদটির পুরো চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং সারাংশ সূচনার মাধ্যমে একটি সমন্বিত ধারণা দেয়া হয়েছে।

সারাংশ সংবাদ সূচনায় প্রাণময়তা বা সজীবতা থাকে এবং এখানে সরাসরি মূল বিষয়ের অবতারণা করা হয়। এই ধরনের সংবাদ সূচনা পাঠক/দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করে এভাবে যে, এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ যেখানে এমন কিছু উন্মোচন করা হয়েছে যা পাঠক/দর্শক আগে কখনও জানেননি। আবার এই ধরনের সূচনা গুরু (হার্ড) হয় এবং এখানে গুপ্ত তথ্যগুলো স্পষ্ট ও শক্তিশালীভাবে উন্মোচন করা হয়। এই ধরনের সংবাদ সূচনায় একটি ঘটনার পুরো চিত্র ফুটে উঠে। একটি বিষয় সম্পর্কে পাঠক সব প্রশ্নের উত্তর সহজ ও সাবলীলভাবে এই ক্ষুদ্র পরিসরে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। তবে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক থাকলে কিংবা একাধিক আঙ্গিক থাকলে এ ধরনের সংবাদ সূচনা দিয়ে সংবাদ শুরু করা কঠিন হয়ে যায়। কারণ এতে সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করতে গিয়ে সংবাদ সূচনাটি বড় হয়ে যায়।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদকরা সংবাদ সূচনা লিখতে গিয়ে অনেক সময় সংবাদ সূচনা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে যান। তারা সংবাদ সূচনাটি গুরু নাকি লঘু (সফট) করবেন তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। একটি গুরু সংবাদ সূচনায় প্রাণময়তা বা সজীবতা ও তাৎক্ষণিকতা থাকে। বিশেষ করে একেবারেই নতুন ও মানুষকে ধাক্কা দিতে পারে এমন কোন ঘটনা তুলে ধরার ক্ষেত্রে এ ধরনের সূচনা ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, একটি লঘু সংবাদ সূচনায় আবেগ ও নাটক থাকে; এবং সংবাদে মানবীয় চরিত্রগুলোকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। লঘু সংবাদ সূচনায় শুরুতেই কোন চমকপ্রদ তথ্য থাকে না কিংবা দেয়া হয় না। ধীরে ধীরে কয়েকটি অনুচ্ছেদ পরে মূল আকর্ষণীয় তথ্যটি থাকে।

লঘু সূচনার ধরন (Types of soft leads)

লঘু সূচনা সারমর্ম সূচনার মতো নয়। এখানে ঘটনার বিষয়বস্তুর সারমর্ম তুলে ধরার পরিবর্তে বর্ণনা থাকে। তিন ধরনের লঘু সূচনা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো:

১. উদ্ধৃতিমূলক সূচনা (Quotation lead)

ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা চরিত্রের কোন মন্তব্য দিয়ে এ ধরনের সংবাদ সূচনা লেখা হয়। তার মুখ দিয়েই অনিয়ম বা দুর্নীতির কথা তুলে ধরা হয়। ওই চরিত্রই পাঠক/দর্শককে সংবাদের ভেতরে টেনে নিয়ে যায়। এ ধরনের সূচনায় একাধিক অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়। ধীরে ধীরে চরিত্রটি ঘটনার সঙ্গে কিভাবে সম্পৃক্ত এবং ঘটনার মূল সার কী-তা তুলে ধরেন।

ওষুধও নিরাপদ নয়!

দেশজুড়ে ভেজাল নকল চোরাই ওষুধ, জড়িত অসাধু ব্যবসায়ী কোম্পানি, বিক্রেতা, হাসপাতাল, ডাক্তারদের বিশেষ চক্র

তৌফিক মারুফ
কালের কণ্ঠ, ২৪ জুলাই, ২০১৪

র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট আনোয়ার পাশা আফসোসের সুরে বললেন, 'দেশটাকে খুবই আজব মনে হয়। যে ওষুধ মানুষের জীবন রক্ষা করে, সেই ওষুধ নিয়েই এক শ্রেণির মানুষ অসাধু ব্যবসা করে যাচ্ছে। ভেজাল ও নকল ওষুধ বানিয়ে মানুষকে ঠকিয়ে, মানুষের জীবন বিপন্ন করে টাকা রোজগারে লিপ্ত হচ্ছে।'

খাদ্যে ভেজাল ও বিষ নিয়ে তুমুল হৈচৈ চলছে দেশে। অভিযানও চলছে সমানে। এর মাঝে আবার অভিযান চালাতে হচ্ছে নকল ওষুধের বিরুদ্ধেও। হাতেনাতে প্রমাণ মিলছে, জীবনরক্ষাকারী ওষুধে কিভাবে অবলীলায় ভেজাল বা বিষ মিশিয়ে বেশি মুনাফার আয়োজন করছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। তাই বলা যায়, ভেজাল খাদ্য খেয়ে অসুস্থ মানুষ চিকিৎসার আওতায় গিয়ে জীবন বাঁচাতে আশ্রয় নেবে যে ওষুধে, সেই ওষুধও এখন আর নিরাপদ নয়। ভেজাল, নকল ও অনুপযোগী ওষুধ ছড়িয়ে পড়ছে দেশজুড়ে। দেশের ভেতরে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী যেমন এসব নকল ও ভেজাল ওষুধ বানিয়ে বাজারে ছাড়ছে, তেমনি আরেক চক্র চোরাই পথে বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে আসছে অনুমোদনহীন নানা ওষুধ। প্রশাসন অভিযান চালিয়েও নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না এসব অবৈধ বাণিজ্য। পরিণতিতে দেশের মানুষের জীবন হয়ে পড়ছে বিপন্ন।

ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির একাধিক সদস্য জানান, ক্যান্সারের মতো জটিল বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জীবনরক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক মেরোপেনাম ইনজেকশন। কোম্পানিভেদে এর একেকটি ভায়ালের দাম দুই হাজার-আড়াই হাজার টাকা। জানা যাচ্ছে, বড় বড় ওষুধ কোম্পানির এ জাতীয় ওষুধও এখন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় নকল বেরিয়েছে। তবে দেশের সবচেয়ে বড় ওষুধ মার্কেট ঢাকার মিটফোর্ডে কেবল মেরোপেনামই নয়, বেশি প্রচলিত সব ওষুধেরই নকল পাওয়া যায়। বিভিন্ন কোম্পানির ও কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে মিটফোর্ডের ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হলেও খুব একটা কাজ হচ্ছে না।

ম্যাজিস্ট্রেট আনোয়ার পাশা আরো বলেন, 'আমরা সাধারণত বিভিন্ন মার্কেটে অভিযান চালিয়ে খুঁজে খুঁজে ভেজাল, নকল ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ জব্দ করে থাকি। এ ছাড়া মাঝে মধ্যে নকল ওষুধের কারখানারও সন্ধান পাই। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুই বছর ও সর্বনিম্ন সাত দিনের সাজা দেওয়া হয়ে থাকে।'

সরকারের ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তথ্য মতে, গত এক বছরে (জুন ২০১৩-জুন ২০১৪) দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৬৫৩টি অভিযান চালিয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন ধরনের নকল, ভেজাল, চোরাই, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ আটক করা হয়েছে। এ সময় বিভিন মেয়াদে ১০৫ জনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং দুই কোটি ২৫ লাখ ৯৬ হাজার ৭৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিচালক সেলিম বারামী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'জীবন রক্ষাকারী ওষুধ নিয়েও এক শ্রেণির মানুষ জঘন্য ব্যবসায় লিপ্ত হচ্ছে। তারা বিভিন্ন জেনেরিকের ওষুধ নকল করে বাজারে ছাড়ছে। এর মধ্যে অ্যান্টিক্যান্সার, অ্যান্টিবায়োটিক থেকে শুরু করে যৌন উদ্দীপক ও হরমোনাল ওষুধও রয়েছে। এ ছাড়া ফুড সাপ্লিমেন্টের অনেক আইটেম বাজারে ছাড়া হচ্ছে, যেগুলো খেলে মানবদেহের কোনো উপকার তো হয়ই না, বরং মারাত্মক ক্ষতি বয়ে আনে।' ওই কর্মকর্তা বলেন, 'মাঝেমধ্যে আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে খবর পেয়ে বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে এসব ভেজাল ও নকল ওষুধ উদ্ধার করলেও তা পর্যাপ্ত নয়। বিশেষ করে জনবলের অভাবে প্রয়োজনমতো বাজার মনিটরিং করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া এ ধরনের ব্যবসার সঙ্গে অনেক সময় শক্তিশালী চক্র জড়িত থাকায় ধরা পড়া লোকজন সাজা খেটে কিংবা জামিনে বেরিয়ে আবারও একই ধরনের কাজে লিপ্ত হয়।' রাজধানীর ধানমণ্ডির বাসিন্দা ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অনেক দিন ধরেই জটিল রোগে ভুগছি। প্রতিদিন কয়েক ধরনের ওষুধ খেতে হচ্ছে। জীবন বাঁচানোর জন্য ওষুধ খাব, তাতেও যদি ভেজাল ও নকলের বিপদ থাকে, তবে আর উপায় কী!'

তিনি বলেন, সরকারের উচিত যেকোনো মূল্যে ওষুধকে নিরাপদ রাখা, ওষুধের ভেজাল-নকল ঠেকানো না গেলে, তা খুবই ভয়াবহ ব্যাপার হবে।'

সর্বশেষ এক অভিযান সম্পর্কে র‍্যাবের ম্যাজিস্ট্রেট আনোয়ার পাশা জানান, গত ৯ জুলাই রাজধানীর পল্টনের ২৭/৭/এ তোপখানা রোডের পাঁচতলা বাড়ির নিচতলায় অভিযান চালিয়ে একটি কথিত কারখানা থেকে সাত প্রকারের নকল অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ, ওষুধ তৈরির উপকরণ, লেভেলসহ ২০ লাখ টাকার মালামাল জব্দ করা হয়। নকল ওষুধ তৈরির অভিযোগে কারখানার মালিক আমিনুল এহসানকে দুই বছরের কারাদণ্ড ও দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তিনি জানান, দণ্ডপ্রাপ্ত আমিনুল বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করতেন। ১০ বছর আগে চাকরি ছেড়ে নিজেই নকল ওষুধ তৈরির কারখানা করেন। নকল ওষুধ তৈরির ব্যবসা করে তিনি বিপুল সম্পদ গড়ে তুলেছেন। বর্তমান স্থানে পাঁচতলা নিজস্ব বাড়ির নিচতলায় প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে নকল ওষুধ তৈরি করছেন। ওষুধের নকল

মোড়ক ও লেভেল প্রিন্টিং প্রেস থেকে ছাপাতেন। বাড়ির নিচতলার তিনটি রুম বাইরে থেকে তালা দিয়ে বন্ধ করে ডুরাসেফ, নাভাসেফ, সিমক্স, সেফক্সসহ সাত প্রকারের দামি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ তৈরি করতেন। এর মধ্যে নাভাসেফ ওষুধটি শিশুদের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতির যুগ্ম সম্পাদক মনির হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ওষুধের দোকানে অভিযান চালানো হয়। আমরা এর কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পাই না। কারণ ওষুধ তো আর দোকানদাররা বানায় না, বানায় কোনো না কোনো ওষুধ কোম্পানি। সাধারণত এক শ্রেণির ওষুধ কোম্পানি বিদেশ থেকে নিম্নমানের কাঁচামাল আমদানি করে তা অপেক্ষাকৃত ছোট বা অখ্যাত কোম্পানির কাছে বিক্রি করে; আবার কেউ কেউ মিটফোর্ডের কাঁচামালের মার্কেটেও পরোক্ষভাবে ব্যবসায় যুক্ত থাকে। ফলে নিম্নমানের, নকল বা ভেজাল ওষুধ তৈরিতে মূল অপরাধী হচ্ছে ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি। কিন্তু এসব কোম্পানি সব সময়ই রহস্যজনক কারণে ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়।'

ওষুধ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, ভেজাল ও নকল ওষুধের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী দেশসহ বিভিন্ন দেশ থেকে এ দেশের কিছু হাসপাতাল, ক্লিনিক ও এক শ্রেণির ডাক্তার চোরাই পথে মূল্যবান কিছু ওষুধ আনিয়ে থাকেন, যে ওষুধগুলো এ দেশের মানুষের জন্য উপযুক্ত নয় বলে অনুমোদন দেওয়া হয় না। আবার কিছু ওষুধ আছে, যেগুলো এ দেশে বহুল উৎপাদিত হওয়ার ফলে বাইরে থেকে আনার প্রয়োজন নেই। দেশের বড় কয়েকটি হাসপাতাল এ চক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

গত ৯ জুলাই হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে অবৈধভাবে আমদানি করা প্রায় দুই কোটি টাকার ওষুধ আটক করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, শাহজালালের কাস্টমস হলের কনভেয়ার বেল্ট থেকে দুটি লাগেজ আটক করা হয়। পরে তল্লাশি করে গর্ভপাতের, ব্যথানাশক বিভিন্ন ধরনের ওষুধ উদ্ধার করা হয়। ওষুধগুলো পাকিস্তানের তৈরি। তবে এগুলো দুবাই থেকে ইত্তেহাদের একটি ফ্লাইটে করে ঢাকায় আনা হয়।

এর আগে গত এপ্রিলের শেষ দিকে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের এক অভিযানে ফাইভ স্টার হাসপাতাল বলে পরিচিত স্কয়ার, অ্যাপোলো, শমরিতা, ল্যাবএইড, ইউনাইটেড, সেন্ট্রাল হাসপাতালসহ আরো কয়েকটি

হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ অবৈধ ওষুধ। এসব ওষুধ বৈধ প্রক্রিয়ায় দেশে আমদানি হয়নি কিংবা বাংলাদেশে বাজারজাত করার জন্য অনুমোদনও ছিল না।

ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর সূত্র জানায়, দেশের বাজারে চোরাই পথে আসা একশ'র বেশি বিদেশি ওষুধ রয়েছে বলে তাদের নজরে আছে। এর মধ্যে ৪০-৪২টি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। এসবের মধ্যে সর্দি-জ্বর, ব্যথানাশকের ওষুধ থেকে শুরু করে ক্যান্সার, হৃদরোগ ও যৌন উদ্দীপক ওষুধও রয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটি নিষিদ্ধ ওষুধও রয়েছে। এসব ওষুধের মধ্যে আমেরিকা, জার্মানি, থাইল্যান্ড, ভারত ও পাকিস্তানের ওষুধই বেশি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক আ ব ম ফারুক কালের কণ্ঠকে বলেন, সাধারণত যেসব ওষুধ বাংলাদেশে প্রয়োজন নেই কিংবা মানুষের জন্য ক্ষতিকর, এসব ওষুধই সরকার অনুমোদন দেয়নি। কিন্তু এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফার আশায় এসব অবৈধ, নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর ওষুধ চোরাই পথে দেশে ঢুকিয়ে ছোট-বড় বিভিন্ন হাসপাতাল ও ফার্মেসিতে বিক্রি করে থাকে।

এর আগে গত বছরের শেষ দিকে ঢাকার মিটফোর্ডের পাঁচ শতাধিক ওষুধের দোকানে অভিযানকালে ৮০টি দোকান ও গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ নকল, ভেজাল, আন-রেজিস্টার্ড, ক্ষতিকর ওষুধ, ফুড সাপ্লিমেন্ট, মেডিক্যাল ডিভাইস, সার্জিক্যাল আইটেম উদ্ধার ও জব্দ করা হয়। এসব ওষুধের মধ্যে নকল ও মেয়াদোত্তীর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিহিস্টামিন, ভিটামিন, হরমোন, যৌন উত্তেজক, ব্যথানাশক ও স্টেরয়েড আইটেম ছিল।

ওষুধ ও জনস্বাস্থ্য খাতের বিশেষজ্ঞরা জানান, নকল, ভেজাল, নিম্নমানের বা মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধের প্রসঙ্গ এলেই চলে আসে ঢাকার মিটফোর্ড ওষুধ মার্কেটের নাম। ওই এলাকার প্রায় তিন হাজার পাইকারি ওষুধ ও কেমিক্যালের দোকানের মধ্যে অনেকেই এ ধরনের অসাধু ব্যবসায় যুক্ত।

এদিকে কেবল বেনামি বা অখ্যাত কোম্পানিই নয়, কোনো কোনো খ্যাতিমান কোম্পানিও সুকৌশলে অসাধু সুবিধা আদায়ে বহুল প্রচলিত ওষুধের সঙ্গে ভেজাল মিশিয়ে বাজারে ছাড়ছে।

কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতির নেতা মনির হোসেন বলেন, 'আমরা জানি, অনেক ওষুধ কোম্পানি বিদেশে রপ্তানির জন্য উন্নতমানের ওষুধ বানালেও দেশের মার্কেটের জন্য নিম্নমানের ওষুধ বানিয়ে থাকে, নানা ভেজাল দিয়ে থাকে। কিন্তু সেগুলোর দিকে কর্তৃপক্ষ কোনোই নজর দিচ্ছে না। বরং নেপথ্যে

থাকা অপরাধীচক্রের কারণে নিরীহ ব্যবসায়ীরাও হয়রানি ও ক্ষতিগ্রস্ত হন।’

মনির হোসেন বলেন ‘আমরাও চাই ওষুধের ব্যবসায় স্বচ্ছতা আসুক, দুর্নাম দূর হোক। ওষুধে ভেজাল বা নকল কোনোভাবেই কারো কাম্য হওয়া উচিত না।

২. বর্ণনামূলক সূচনা (Descriptive lead)

এ ধরনের সংবাদ সূচনা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন চরিত্র দিয়ে শুরু হয়। ধীরে ধীরে এ ধরনের সূচনায় চরিত্রগুলোর গুরুত্বের মাধ্যমে অনুসন্ধানের পুরো প্রক্রিয়াটি তুলে ধরা হয়। কোন ব্যক্তি, স্থান কিংবা বস্তু নিয়ে একটি বর্ণনামূলক সংবাদ সূচনা লেখা যায়।

জীবন বিমা

পলিসির অর্ধেকই তামাদি হয়!

নিজস্ব প্রতিবেদক, জুলাই ২৬, ২০১৪।
দৈনিক প্রথম আলো

নিপিকা ইসলাম একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করেন। তাঁর কলেজ জীবনের সহপাঠী শফিকুল হক রাষ্ট্রায়ত্ত জীবন বীমা করপোরেশনের (জেবিসি) একজন প্রতিনিধি (এজেন্ট)। শফিকুলের পরামর্শেই ১৮ বছর মেয়াদি জীবন বিমা পলিসি খোলেন নিপিকা। প্রথম বছর দুই হাজার ১০০ টাকা করে মাসিক প্রিমিয়াম দিয়ে এলেও দেড় বছর পর থেকেই আর দেন না। একপর্যায়ে বন্ধই হয়ে যায় পলিসি। নিজের গরজে নিপিকা যেমন প্রিমিয়াম দেন না, আর এ জন্য তাগাদা দেন না শফিকুলও। এভাবে দেশের প্রায় অর্ধেক জীবন বিমা পলিসিই তামাদি হয়ে যায়।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রতি হাজার মানুষের মধ্যে মাত্র চারজনের জীবন বিমা রয়েছে। সে হিসেবে মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র ৬০ লাখ জীবন বিমার আওতায়। তবে বিভিন্ন কোম্পানির পাঁচ বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, গড়ে মোট পলিসির অর্ধেক, অর্থাৎ ৩০ লাখই প্রথম বছরে কিস্তি দেওয়ার পর আর সচল থাকেনি। বিমা খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তামাদি হয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকটি কারণকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হচ্ছে: নতুন পলিসি খোলার জন্য জীবন বীমা কোম্পানির প্রতিনিধিরা যতটা মনোযোগী, খোলার পর আর ততটা মনোযোগী থাকেন না। পলিসি গ্রাহকদেরও সচেতনতার অভাব রয়েছে। এ ছাড়া কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে রয়েছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

বিভাগের পর্যবেক্ষণে এসেছে, একশ্রেণির অসাধু বিমা প্রতিনিধি গ্রাহকের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তা আত্মসাৎ করেন।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ আরও বলেছে, স্বল্পশিক্ষিত প্রতিনিধিরা মাঠপর্যায়ে বিমাপণ্য বিক্রিতে জড়িত। বিমা সম্পর্কে মানুষকে আলোকিত না করে বরং প্রলুব্ধ করে। ফলে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে প্রতারিত হচ্ছে। গ্রাহক প্রতারণার দায়ে প্রতিষ্ঠানকে শাস্তির আওতায় আনতে সম্প্রতি বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে (আইডিআরএ) নির্দেশ দিয়েছে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

দেশের সাত বিভাগের নয়টি অঞ্চলের ৬৮টি বিক্রয়কেন্দ্র ও ৩৫৪টি শাখা কার্যালয় রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা জেবিসির। বর্তমানে সংস্থাটিতে একক পলিসি রয়েছে তিন লাখ ৯৬ হাজার। এ ছাড়া গ্রুপ বিমা রয়েছে ২৪০টি প্রতিষ্ঠানের (এক লাখ ৪৩ হাজার সদস্য)। পাশাপাশি মেটলাইফ আলিকো বলছে, তাদের কার্যকর পলিসি সংখ্যা ১৩ লাখ ৭৯ হাজার। অথচ জেবিসি সূত্রে জানা গেছে, ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত জীবন বিমা ব্যবসায় জেবিসির অবস্থানই প্রথম ছিল। বর্তমানে আলিকো প্রথম। এর পরেই রয়েছে ডেল্টা লাইফ, ন্যাশনাল লাইফ, প্রগতি লাইফ, মেঘনা লাইফ, রূপালী লাইফ, প্রগ্রেসিভ লাইফ, পপুলার লাইফ ও ফারইস্ট লাইফের অবস্থান। জেবিসির এমডি পরীক্ষিৎ দত্ত চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, 'আমাদের তামাদি পলিসির সংখ্যা খুবই কম। আমাদের বিরুদ্ধে গ্রাহকদের অভিযোগও কম।' নতুন নতুন পণ্য নিয়ে জেবিসি গ্রাহকসংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টার পাশাপাশি পুরোনো গ্রাহকদের ধরে রাখতেও বদ্ধপরিকর বলে জানান জেবিসি এমডি।

আইডিআরএর চেয়ারম্যান এম শেফাক আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, 'শুধু জীবন বিমা নয়, গোটা বিমা খাতই এত দিন বিশৃঙ্খল ছিল। তামাদি পলিসির সংখ্যা কমিয়ে আনাসহ বিমা খাতের জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, আরও কিছু নেওয়া হবে।' এ ব্যাপারে বিমা কোম্পানির মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনকেও (বিআইএ) দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। জেবিসি ও ১৭টি বেসরকারি বিমা কোম্পানি (বিদেশি মেটলাইফ আলিকোসহ) এত দিন জীবন বিমা ব্যবসা করে এলেও গত বছরের জুলাইয়ে ১৩টি কোম্পানিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। কোম্পানিগুলো মাত্র ব্যবসা শুরু করেছে। বিআইএর তথ্য অনুযায়ী, এক বছর পার করতে পারেনি এমন পলিসি ৭০ শতাংশ। এর মধ্যে তিনটি কোম্পানি পলিসির মেয়াদের মাত্র ৩০ শতাংশ, তিনটি কোম্পানি মেয়াদের ৪০ শতাংশ, চারটি কোম্পানি মেয়াদের ৫০ শতাংশের বেশি পার করতে পেরেছে। চারটি কোম্পানি পলিসি মেয়াদের ৬০ শতাংশের ওপরে এবং তিনটি কোম্পানি ৭০ শতাংশের বেশি পার করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথম বছরে প্রিমিয়াম আদায় হলেও ৭০ শতাংশই আদায় হয়নি পরের

বছরে- এমন তিনটি কোম্পানি হচ্ছে: গোল্ডেন লাইফ ইনস্যুরেন্স, সানলাইফ ইনস্যুরেন্স ও বায়রা লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি।

মেটলাইফ আলিকোর যোগাযোগ বিভাগের প্রধান মনিরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, 'পলিসি তামাদি হয়ে গেলে কোম্পানি ও গ্রাহক- দুই পক্ষেরই ক্ষতি। তবে আমরা সব সময়ই সচেষ্ট থাকি এবং নানামুখী পদক্ষেপ নিই, যাতে একটি পলিসিও তামাদি না হয়।'

জানা গেছে, বিমা গ্রাহকেরা অন্তত দুই বছর পর্যন্ত পলিসি চালিয়ে রাখতে না পারলে কোনো টাকাই ফেরত পান না। অর্থাৎ প্রিমিয়াম দেওয়া বন্ধ করে দিলে গ্রাহকের কাছ থেকে যে টাকা পাওয়া যায়, তার পুরোটাই বিমা প্রতিনিধি ও কোম্পানির মধ্যে ভাগাভাগি হয়। এ কারণে যাঁরা গ্রাহক হয়ে গেছেন, তাঁদের প্রতি কম মনোযোগ দিয়ে কোম্পানিগুলো নতুন গ্রাহক সংগ্রহে বেশি মনোযোগী হন। তবে পাঁচ বছর পর্যন্ত পলিসি চালিয়ে নেওয়ার পর জরুরি প্রয়োজনে ভাঙতে চাইলে মূল টাকা ফেরত পাওয়া যায়।

প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনস্যুরেন্সের উপদেষ্টা এম এ করিম প্রথম আলোকে বলেন, ঝোঁকের মাথায় পলিসি খোলার পর তা আর চালিয়ে নিতে চান না গ্রাহকেরা। আবার প্রথম বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরগুলোতে কম কমিশন থাকায় আগ্রহ হারান প্রতিনিধিরা। তাই পরবর্তী বছরগুলোর কিস্তি আদায়ে তাঁরা সচেষ্ট থাকেন না। সংখ্যায় কম হলেও প্রতিনিধিদের কেউ কেউ প্রিমিয়ামের অর্থ কোম্পানিতে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করেন। প্রিমিয়ামের অর্থ আত্মসাতে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা জরুরি বলে তিনি মনে করেন।

বিমা প্রতিনিধিরা ২০১২ সালের ১৩ মার্চের আগ পর্যন্ত প্রথম বছরের প্রিমিয়াম থেকে কমিশন পেয়ে আসছিলেন ৩৫ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত। বর্তমানে কমিশন নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম বছরের কমিশন (২০ বছরের বেশি মেয়াদের পলিসি) ৩৫ শতাংশ, আর দ্বিতীয় থেকে পরবর্তী তিন বছর পর্যন্ত কমিশন ৫-১০ শতাংশ। জীবন বিমার পলিসিগুলোর মধ্যে একক বিমা ও ক্ষুদ্র বিমার আওতায় নানা ধরনের পলিসি রয়েছে। ৩-১৮ বছর মেয়াদি এসব পলিসিতে প্রিমিয়াম নেওয়া হয় মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে।

অন্যদিকে ক্ষুদ্র বিমার বিভিন্ন পলিসির প্রিমিয়ামের কিস্তি নেওয়া হয় শুধু সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে। গ্রাম ও শহরের নিম্নবিত্ত মানুষকে লক্ষ্য করেই কোম্পানিগুলো ক্ষুদ্র বিমার পলিসি বিক্রি করছে। তবে বেশির ভাগ গ্রাহকেরই ১০-১২ বছর মেয়াদি পলিসির প্রতি আগ্রহ বেশি বলে জানা গেছে। বিমা খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হলেও তামাদি হয়ে যাওয়া পলিসির পুরো চিত্র আইডিআর-এর কাছে নেই।

[রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো 'বিমা' বানান 'বীমা' লেখে]

বর্ণনামূলক সংবাদ সূচনার আরেকটি উদাহরণ নিচে দেয়া হলোঃ

যখন-তখন গুলি করাই যাঁর কাজ

একরামুল হক, চট্টগ্রাম

দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ০৩, ২০১৪

তিনি ক্ষমতাসীন দলের সাবেক সাংসদের ভাতিজা। চলাফেরা করেন অস্ত্র নিয়ে। মানুষকে যখন-তখন গুলি করেন। হঠাৎ ফটিকছড়ির নানুপুরের মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে ওঠা এই ব্যক্তি হলেন আওয়ামী লীগের সাবেক সাংসদ প্রয়াত রফিকুল আনোয়ারের ভাতিজা ফাহাদুল আনোয়ার (৩২)। সর্বশেষ গত শুক্রবার দুপুরে নানুপুরের জিলানী মসজিদের সামনে এক ব্যবসায়ীকে গুলি করতে গিয়ে গণপ্রতিরোধের মুখে পড়ে আপাতত পলাতক রয়েছেন তিনি।

পুলিশ, ভুক্তভোগীসহ স্থানীয় বিভিন্ন সূত্র জানায়, মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী ব্যবসায়ী নুরুন্নবী রওশনের কাছে ঈদের আগে এক কোটি টাকা চাঁদা দাবি করেন ফাহাদুল আনোয়ার। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানান নুরুন্নবী। এরপর শুক্রবার দুপুরে জুমার নামাজের আগমুহূর্তে জিলানী মসজিদের সামনে নুরুন্নবীর ওপর চড়াও হন ফাহাদুল। পিস্তল উঁচিয়ে নুরুন্নবীকে গুলি করতে উদ্যত হলে স্থানীয় লোকজন এসে তাঁকে উদ্ধার করেন এবং ফাহাদুলের পিস্তলটি কেড়ে নেন। এ সময় জনরোষে পড়ে ফাহাদুল পালিয়ে যান।

হাটহাজারী অঞ্চলের সহকারী পুলিশ সুপার আ ফ ম নিজামউদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ফাহাদুল আনোয়ারের ফেলে যাওয়া একটি পিস্তল পুলিশ জব্দ করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন। তিনি গা ঢাকা দিয়েছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চলছে।

নিজামউদ্দিন আরও বলেন, ফাহাদুলের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগের কথা শোনা যাচ্ছে। ভুক্তভোগীরা অভিযোগ দিলে পুলিশ আইনগত ব্যবস্থা নেবে।

নুরুন্নবী জানান, ঈদের আগে তাঁর পুকুরের মাছ লুটপাটের চেষ্টা চালান ফাহাদুল। একপর্যায়ে তাঁর কাছে এক কোটি টাকা চাঁদা দাবি করেন। তা না দেওয়ায় তাঁকে গুলি করতে উদ্যত হন ফাহাদুল।

এর আগে পঞ্চম রোজার দিন ফাহাদুল চট্টগ্রাম শহরের পাঁচলাইশে আপন চাচা ফখরুল আনোয়ারের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি করেছিলেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওমর ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, 'চাচার সঙ্গে বাগবিতণ্ডার একপর্যায়ে ফাহাদুল ফাঁকা গুলি ছোড়ে বলে আমরা শুনেছি। কিন্তু পরিবার থেকে লিখিত অভিযোগ না আসায় পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি।'

ফখরুল আনোয়ার জানান, তাঁদের যৌথ মালিকানার ব্যবসার হিসাব চাওয়ায় ফাহাদুল বাসায় এসে গুলি ছুড়ে ভয় দেখান। তিনি অভিযোগ করেন, ফাহাদুলের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ। টাকা হাতে পেলেই অস্ত্র ও মাদক কেনেন। তাঁর কাছে বিভিন্ন ধরনের ১০-১২টি অস্ত্র আছে। পারিবারিক সম্মানের কথা চিন্তা করে এত দিন এসব গোপন রেখেছিলেন।

রমজানের আগে ফাহাদুল ফটিকছড়ির ভক্তপুরে গিয়ে তাঁদের পারিবারিক ব্যবসার পুরোনো কর্মচারী মোহাম্মদ আইয়ুবের বাড়িতে গুলিবর্ষণ করেছিলেন।

মোহাম্মদ আইয়ুব প্রথম আলোকে বলেন, 'আমি ২৫ বছর ধরে এমপি রফিকুল আনোয়ারের কর্মচারী হিসেবে কাজ করছি। এমপি সাহেবসহ দুই ভাই মারা গেছেন। তাই মুরব্বি হিসেবে এমপির ছোট ভাই ফখরুল আনোয়ারের নির্দেশ মেনে কাজ করি। এতে তাঁর ভাতিজা ক্ষুব্ধ হন। আমার বাড়িতে গিয়ে ছয়-সাতটি গুলি করেন। আমি বাড়ির পেছন দিয়ে পালিয়ে রক্ষা পাই।'

ফটিকছড়ি উপজেলা যুবলীগের নেতা সরওয়ার হোসেন অভিযোগ করেন, পাওনা টাকা চাওয়ায় বছর দেড়েক আগে তাঁকে অপহরণ করে অন্যত্র নিয়ে ডান পায়ে গুলি করেন ফাহাদুল।

মাস দেড়েক আগে তুচ্ছ ঘটনায় জামালউদ্দিন নামের এলাকার একজন গাড়িচালককেও পায়ে গুলি করেন ফাহাদুল। এর কিছুদিন আগে নির্মাণসামগ্রী পরিবহন নিয়ে ফাহাদুলের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা হয় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো. ইউনুসের। এরপর তিনি ইউনুসের দোকান ভাঙচুর করেন।

সর্বশেষ শুক্রবারের ঘটনার পর ফাহাদুলকে ধরার জন্য গতকাল শনিবার উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশ নিরাপত্তাচৌকি বসিয়েছে। তাঁর মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া গেছে।

চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার এ কে এম হাফিজ আক্তার প্রথম আলোকে বলেন, 'ফাহাদুলের কাছে আরও অস্ত্র আছে বলে শুনেছি। সে মাদকাসক্ত। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।'

৩. উপাখ্যানমূলক সূচনা (Narrative Lead)

এ ধরনের সূচনায় কোন ব্যক্তি বা স্থানের বর্ণনা দেয়ার চেয়ে একটি গল্প বলা হয়।

‘মাওয়া’য় পাল্টে যাওয়া জীবন

আনোয়ার পারভেজ, বগুড়া
দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ২৬, ২০১৪ ।

দুই যুগ আগের কথা। স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ী আবু কালাম জয়পুরহাট থেকে বাসের ছাদে উঠে নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছিলেন। যমুনা সেতু তখনো চালু হয়নি। তাঁর বাসের সামনে সিরাজগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা কয়েকটি বাস। যানজটে থাকতেই কয়েকটি বাসের ছাদে চোখ আটকে গেল আবু কালামের। ছাদভর্তি নোংরা কাপড়ে মোড়ানো পোঁটলায় দুধের ছানা। ছানার গন্ধে মাছি ভনভন করছে। মাঝেমধ্যে ছোঁ দিচ্ছে কয়েকটি কাক। পোঁটলা থেকে ছানা বেরিয়ে পড়েছে। কোথায় যাচ্ছে এসব ছানা, কৌতূহলী হলেন আবু কালাম। নগরবাড়ি ফেরিঘাটে পৌঁছার পর তিনি ছানাবাহী কোচ খুঁজে কথা বললেন ছানার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। ব্যবসায়ীরা জানালেন, এসব ছানা যাচ্ছে রাজধানীর বিভিন্ন অভিজাত মিষ্টি কারখানায়।

কাকের বিষ্ঠা ছড়ানো এসব ছানা মানুষের পেটে যাবে ভেবে মনে মনে কষ্ট পেলেন আবু কালাম।

নারায়ণগঞ্জে পৌঁছার পর আলুর মহাজন চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন একটি রেস্তোরাঁয়। চায়ের আগে মিষ্টি এল। মিষ্টি দেখেই ছানার পোঁটলায় কাক বসার দৃশ্য মনে পড়ল তাঁর। বমি হওয়ার জোগাড় হলো কালামের। মহাজন কারণ জানতে চাইলে সেই ঘটনার বর্ণনা দিলেন। তাঁদের এই আলাপচারিতা পাশে বসে শুনছিলেন তপন ঘোষ নামে একজন। তিনি পেশায় ‘মাওয়া’ ব্যবসায়ী। বাড়ি মুন্সিগঞ্জ। ফরিদপুর থেকে ‘মাওয়া’ কিনে এনে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-সিলেটের অভিজাত মিষ্টি বিপণিতে সরবরাহ করেন। কালামের সঙ্গে আলাপ জমে উঠল তাঁর। উত্তরবঙ্গে দুধের দাম সস্তা। কালামের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ থেকে ‘মাওয়া’ কেনার প্রস্তাব দিলেন। ‘মাওয়া’ জিনিসটা আসলে কী জানতে চাইলেন কালাম।

তপন ঘোষ জানালেন, কড়াইয়ে নিয়ে ঘণ্টা খানেক জ্বাল দিলে দুধ ঘন হয়ে ক্ষীর হয়। আরও জ্বাল দেওয়ার পর গাঢ় হলে নামিয়ে রাখা হয়। ঠাণ্ডা হওয়ার পর গুড়ের মতো এক কেজি ওজনের ঢিমা তৈরি করা হয়। এরপর কার্টন বা প্লাস্টিকের ড্রামে ভরে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়। কাক বসার ভয় নেই, পচে যাওয়ার শঙ্কা নেই।

অঙ্ক কষে লাভের হিসাব জেনে উত্তরবঙ্গ থেকে ‘মাওয়া’ পাঠাতে রাজি হলেন কালাম। আট দিন ধরে তপন ঘোষের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন কারখানা ঘুরে ‘মাওয়া’ তৈরির কৌশল শিখলেন। এরপর আলু ব্যবসার

পুঁজি নিয়ে ফিরলেন বাড়ি। নারায়ণগঞ্জ থেকে সঙ্গে আনলেন চারজন কারিগর। দুধ কিনে বাড়িতেই কারিগরদের সঙ্গে নিজেই 'মাওয়া' তৈরি শুরু করলেন। তিন দিন পর দুই মণ 'মাওয়া' পাঠালেন নারায়ণগঞ্জে। প্রথম চালানেই খরচ বাদে এক হাজার টাকা লাভ থেকে গেল। সেই শুরু। দিনে দিনে ব্যবসার পরিধি আরও বেড়েছে। বেড়েছে কারখানায় কারিগর ও শ্রমিকের সংখ্যা। 'মাওয়া' ব্যবসায় বদলে গেছে তাঁর ভাগ্যের চাকা। অভাব ঘুচেছে। সংসারে ফিরেছে সচ্ছলতা। নিজেই রেস্তোরাঁ খুলেছেন। মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না। এখন পাকা বাড়ি করেছেন। কিনেছেন চার বিঘা আবাদি জমি। ছেলেকে পড়ালেখা শিখিয়ে বিদেশ পাঠিয়েছেন। বেড়েছে সামাজিক পরিচিতি। এ সুবাদেই ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন একবার। জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার করিমপুর গ্রামের আবু কালামের হাত ধরে 'মাওয়া'র ব্যবসা ছড়িয়ে পড়ছে আশপাশের জেলাগুলোতে। বাড়ছে দুগ্ধ খামার। বদলে যাচ্ছে এলাকার অর্থনীতি।

নিজের ভাগ্য এবং সেই সঙ্গে অনেকের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেওয়া এই আবু কালাম বড় হয়েছেন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। বললেন, 'পৈতৃক ভিটেমাটিও ছিল না। ঠিকমতো দুই বেলা ভাত ভাগ্যে জুটত না। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে অনাহারে থাকতে হতো। মাওয়ার ব্যবসা ভাগ্যদেবতা হয়ে আমার জীবনে ধরা দিয়েছে।'

মাওয়ার আদ্যোপান্ত: যুগ যুগ ধরে মিষ্টি তৈরি হয়ে আসছে ছানা দিয়ে। নব্বইয়ের দশকে রাজধানী ঢাকার অভিজাত কিছু মিষ্টি কারখানায় মাওয়া থেকে মিষ্টি তৈরি শুরু হয়। তখন মিষ্টি ব্যবসায়ীরা ফরিদপুরসহ কয়েকটি এলাকা থেকে অর্ডার দিয়ে মাওয়ার সরবরাহ নিতেন। এখন সারা দেশের অভিজাত প্রায় সব মিষ্টির দোকানেই ছানার বদলে মাওয়া দিয়ে মিষ্টি তৈরি হচ্ছে।

কালাম জানান, এক মণ দুধ থেকে সাড়ে পাঁচ কেজি মাওয়া হয়। দুধের দাম এক হাজার ২০০ থেকে এক হাজার ৪০০ টাকায়। এক মণ দুধের মাওয়া তৈরিতে এক মণ কাঠের লাকড়ি লাগে। এতে খরচ পড়ে ১৭০ টাকা। প্রত্যেক কারিগরকে মুজুরি দিতে হয় মাসে সাত থেকে আট হাজার টাকা। সেই হিসাবে প্রতি কেজি মাওয়া তৈরি খরচ প্রায় ৩০০ টাকা। ঢাকায় নেওয়ার পর তা বিক্রি হয় ৪০০ টাকায়। প্রতিদিন চাহিদা থাকে পাঁচ থেকে দশ মণ। ঈদ, পয়লা বৈশাখ ও দুর্গাপূজায় মাওয়ার চাহিদা বেশি থাকে।

বগুড়ার এশিয়া সুইটসের প্রধান কারিগর সিরাজুল ইসলাম বলেন, মিষ্টির স্বাদ ও গুণগত মান বাড়াতে এখন প্রায় সব ধরনের মিষ্টিতেই 'মাওয়া' ব্যবহার করা হয়। সন্দেশজাতীয় মিষ্টি মাওয়া ছাড়া হয়ই না। কাচ্চি বিরিয়ানিতেও মাওয়ার ব্যবহার রয়েছে।

সরেজমিন: বগুড়া থেকে প্রায় ৫২ কিলোমিটার দূরে জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার করিমপুর গ্রাম। গত বুধবার বিকেলে করিমপুরে আবু কালামের মাওয়া কারখানায় গিয়ে দেখা গেছে, ঈদ উপলক্ষে কারখানাজুড়ে কর্মমুখর পরিবেশ। বাজার থেকে পাত্রে ২০ থেকে ২৫ মণ দুধ কিনে এনে কারখানায় জড়ো করছেন কারখানার শ্রমিকেরা। সেই দুধ ১৪ থেকে ১৫ জন কারিগর কারখানার চুলায় জ্বাল দিচ্ছেন। চুলায় বসানো দুধ নাড়াচাড়া করছেন, কেউ অল্প গরম দুধ হাতে নিয়ে ঘনত্ব পরীক্ষা করছেন। কয়েকজন শ্রমিক তৈরি করা ঢিমা ঢাকায় পাঠানোর জন্য কার্টনজাত করছেন। আবু কালাম এবং তাঁর স্ত্রীও কারিগরদের সঙ্গে কাজ করছেন। আবু কালাম বললেন, 'সামনে ঈদ, মালের প্রচুর অর্ডার। তবে দুধের দাম বেশি হওয়ায় চাহিদামতো মাল সরবরাহ করতে পারছি না।' কালাম আগে সিলেটের বনফুল, ঢাকার আলাউদ্দিন সুইটসসহ অভিজাত অনেক মিষ্টি কারখানায়ই মাওয়া সরবরাহ করতেন। এখন নারায়ণগঞ্জের পাইকারি ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন মিষ্টি কারখানায় সরবরাহ করেন।

নোংরা পরিবেশে ছানা বহনের অভিজ্ঞতা থেকে মাওয়া ব্যবসায় জড়িয়ে পড়লেও নিজের কারখানায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পণ্যের মান কিভাবে নিশ্চিত করেন জানতে চাইলে আবু কালাম বলেন, একসময় তাঁর কারখানা কালাই উপজেলা সদরে এবং গোবিন্দগঞ্জের রাজাবিরাট বাজারে ছিল। তখন তিনি কারিগর ও শ্রমিকদের আলাদা পোশাক এবং শতভাগ পরিচ্ছন্ন পরিবেশে মাওয়া তৈরি নিশ্চিত করতে পারতেন। তবে এখন কারখানা নিজের বাড়িতে স্থানান্তর করায় ঠিক ততটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারেন না। কারণ, গ্রামে অভিজ্ঞ শ্রমিক-কারিগর পাওয়া যায় না। কারখানার পরিধি আরও বেড়ে গেলে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য লোক নিয়োগ ও শ্রমিক-কারিগরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

উদ্যোক্তারা চাইলে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হবে, জানালেন জয়পুরহাটের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইয়াসিন।

উপরের প্রতিবেদন থেকে বুঝা যায়, এটি অনেক বেশি বিস্তৃত সংবাদ সূচনা। এখানে তিন-চারটি অনুচ্ছেদে প্রতিবেদক পুরো ঘটনার মূল দিকটি উন্মোচন করেন। এখানে ঘটনার সঙ্গে জড়িত মূল ক্রীড়ানকদেরও পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। এ ধরনের সংবাদ সূচনা নাটকীয়ভাবে তুলে ধরা হয় বলে এটি বেশ কার্যকরী হয়ে থাকে। কারণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদক আসলে ঘটনার নাটক ও দ্বন্দ্বগুলো অনুসন্ধানের মাধ্যমে খুঁজে বের করেছেন। তবে কোনোভাবেই নাটক ও দ্বন্দ্ব তুলে ধরতে গিয়ে তার অতিরঞ্জন ঘটানো যাবে না।

যেকোন উপাখ্যানমূলক সংবাদ কাহিনীর দুটো উপাদান থাকে; একটি হলো গল্প বা স্টোরি আরেকটি হলো গল্পকার বা গল্প যিনি বলেন (স্টোরিটেলার)। একজন গল্পকার একজন নাট্যকার বা উপন্যাসিকের মতো তার চারপাশের মানুষগুলো ও তাদের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়াকে তার লেখনীর মধ্যে চিত্রায়িত করেন। ন্যারেটিভ বা উপাখ্যানমূলক কাঠামো লিখতে হলে একজন প্রতিবেদককে অবশ্যই তার সংবাদগল্পের জন্য অত্যাবশ্যকীয় চরিত্রগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং তার কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে হয়। এই কৌশলের জন্য প্রতিবেদক শুধু উপাত্ত সংগ্রহ করলে কিংবা সাক্ষাৎকার নিলেই হয় না; দরকার হয় প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের। ব্যক্তি, স্থান ও ঘটনাগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরতে হয়।

উপাখ্যানমূলক সংবাদ কাঠামোর জন্য বা উপাখ্যানের মাধ্যমে সংবাদকে তুলে ধরতে হলে উপাখ্যানমূলক (Narrative) চিন্তাভাবনা, উপাখ্যানমূলক রিপোর্টিং এবং এ ধরনের কাঠামো দরকার হয়। অর্থাৎ এখানে প্রত্যেকটি ঘটনা একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। সবগুলোকে একসাথে গেঁথে একটি অর্থবহ ঘটনার সূত্রপাত ঘটাতে হয়। Fedler et al. বলেছেন, "*Narrative writing requires narrative thinking, narrative reporting and narrative forms. Narrative thinking means seeing the world in terms of people doing things, not as piles of disparate facts. Actions connect to one another to create meaning, mostly based on human motives. The best journalistic storytellers let their curiosity lead them into stories, because they want to find out why real people do things* "[৩৩৪] এ ধরনের সংবাদ সূচনা উল্টো পিরামিড কাঠামোর বিপরীত। এখানে সংবাদের শুরু, মধ্যবর্তী অংশ ও শেষাংশকে সমান গুরুত্ব দিয়ে লিখতে হয়।

লঘু সূচনার ঝুঁকি (Risks of soft leads)

মার্কিন সাংবাদিক উইলিয়াম ব্লান্ডেল (William Blundell) 'Art and Craft of Feature Writing' বইতে সতর্ক করে দিয়েছেন, লঘু সংবাদ সূচনা সবসময় কার্যকরী নাও হতে পারে। তাঁর মতে, নিম্নোক্ত মানদণ্ডগুলো পূরণ না করলে এ ধরনের সংবাদ সূচনা ব্যর্থ হতে পারে:

সহজতা (Simplicity)

এ ধরনের সংবাদ সূচনায় উল্লেখিত কাহিনী ও বর্ণনা স্পষ্টভাবে ও খুব দ্রুত বোধগম্য হতে হবে। সংবাদ সূচনায় যে কাহিনী ও বর্ণনার কথা তুলে ধরা হয়েছে তা সংবাদের বাকি অংশের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত তা স্পষ্ট করতে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দরকার হয় তাহলে প্রতিবেদনটি তার গতি হারাতে পারে। প্রতিবেদনটি এতে অনেক বড় হয়ে যেতে পারে এবং পাঠক তার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। Paul N. Williams লঘু সংবাদ সূচনায় প্রতিবেদনের শুরু করতে গেলে অনুসন্ধানী প্রতিবেদকদের সতর্ক করে দিয়েছেন এভাবে, "*The writer's challange is to beguile the reader without confusing him, and to inform him without boring him.*"[৩৩৫]

প্রাসঙ্গিকতা (Relevance)

সূচনাটিকে অবশ্যই সংবাদের বাকি অংশের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করতে হবে। যদি প্রতিবেদনে ফোকাসের কোন পরিবর্তন হয়, তাহলে পাঠক ভাবতে পারেন প্রতিবেদক ভুল

[৩৩৪] Ibid, Pressfred Fedler, John R. Bender, Lucinda Davenport & Michael W. Drager (2005), p. 211
[৩৩৫] Ibid, Paul N. Williams (1978), p. 145.

পথে পা বাড়িয়েছেন, যে সম্পর্কে শুরুতে কোন ধারণাই দেয়া হয়নি।

আগ্রহ (Interest)

এ ধরনের সংবাদ সূচনাকে ব্লান্ডেন 'ফালা-ফালা জীবন' ('slice-of-life') বলে আখ্যায়িত করেছেন, যা অবশ্যই আকর্ষণীয় হতে হবে। যদি এ ধরনের সংবাদ সূচনা বিরক্তিকর হয় কিংবা এখানে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলো নিষ্প্রভ বা অনুজ্জ্বল হয় তাহলে পুরো সংবাদটিই হোঁচট খায়। সেজন্য ব্লান্ডেনের সুপারিশ হলো, "*If you lack vibrant examples, choose a general lead instead.*"[৩৩৬]

ফোকাস (Focus)

ব্লান্ডেন বলেছেন, এ ধরনের সংবাদ সূচনা অনেক সময় এক ধরনের 'fruit-salad lead' হয়, যেখানে খুব সামান্য বর্ণনা থাকে এবং সংবাদের অন্য অংশ থেকে একটি কাহিনী তুলে ধরা হয় যাতে পাঠকের জন্য এই অনুচ্ছেদটি হয় একটি স্তুপ যেখানে তথ্যগুলো হেলতে-দুলতে থাকে। কিন্তু সংবাদের মূল লক্ষ্যবিন্দু অবশ্যই এ ধরনের সূচনায় কাহিনী বা বর্ণনার মাধ্যমে থাকা উচিত।

মর্মস্থল অনুচ্ছেদ (The nut graf)

লঘু সংবাদ সূচনার শুরুতেই ঘটনার মূল বা সবচেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক ভাবটি তুলে ধরে পাঠককে ধাক্কা দেয়া হয় না; বরং আস্তে আস্তে কোন কাহিনী বা বর্ণনার মধ্য দিয়ে পাঠকের কৌতূহল সৃষ্টি করে ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে যাওয়া হয়। এ কারণে লঘু সংবাদ সূচনা দিয়ে তৈরীকৃত প্রতিবেদনগুলোতে সংবাদ সূচনার সাথে সুষম ও সাবলীলভাবে প্রতিবেদনের মূল অংশের সংযোগ রক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ যখন কোন কাহিনী বা বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রতিবেদক তার সংবাদগল্প শুরু করেন, তখন তাকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, তিনি প্রতিবেদনটির মূল কেন্দ্রবিন্দু বা ফোকাসে ফেরত আসবেন। এ কাজ করতে গিয়ে প্রতিবেদককে সংবাদ সূচনার পর তার সাথে প্রতিবেদনের মূল অংশের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি/কয়েকটি অনুচ্ছেদ রাখতে হয়। সংবাদ সূচনা থেকে প্রতিবেদনের মূল অংশের এই গতিপথ/সংযোগকে (transition) বলা হয় 'nut paragraph' বা 'nut graf'। এর মাধ্যমে একটি বাদামের খোসার সাথে ভিতরকার শাঁসের তুলনা করা হয়েছে। এ ধরনের সংবাদ সূচনায় সংবাদগল্পের মূল বক্তব্যটি পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয় যাতে পাঠক কেন এই সংবাদটি পড়বেন তা তারা বুঝতে পারেন। B. S. Brooks বলেছেন, "*Nutgraphs answer the "So what?" question of the story. When the news is not in the lead of the story, it appears here. The nutgraph is normally only one paragraph long and shows the link between the profile person and the larger issue.*"[৩৩৭] এই মর্মস্থল অনুচ্ছেদ কখন ব্যবহার করতে হবে তা Carole Rich তুলে ধরেছেন এভাবে, "*If your lead explains the focus in the first sentence, you don't need a separate nut graph. However, if your lead does not identify the main idea of the story, you need a nut graph to explain the focus.*"[৩৩৮]

---

[৩৩৬] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p 185.

[৩৩৭] B. S. Brooks, G. Kennedy, D. R. Moen, & D. Ranly (2008), News reporting and writing, 9th edition, New York: Bedford; St. Martin's.

[৩৩৮] Carole Rich (2010), Writing and Reporting News: A Coaching Method, sixth edition, Wadsworth Cengage Learning, p. 37.

সনদনির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়
নিষিদ্ধ ক্যাম্পাসও চালু

মোশতাক আহমেদ, দৈনিক প্রথম আলো
আগস্ট ০৭, ২০১৪

উত্তরায় মালিকের চারতলা বাসার দুই তলা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রশাসনিক কার্যালয়। মালিকই উপাচার্য। ১৬ বছর ধরে তিনি উপাচার্য। ছেলের জন্য বিশেষ সহকারী টু ভিসি (এসএভিসি) নামে পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই ছেলে একটি বিভাগের প্রধান ও অনুষদের ডিন। উপাচার্যের অসুস্থতার কারণে তাঁর ছেলেই পরোক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি। বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ সনদনির্ভর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানে 'অনেকটা টাকা দাও, সনদ নাও' ধরনের ব্যবস্থা।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) গত ৩০ জুন 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শিরোনামে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে রাজধানীর উত্তরায় অবস্থিত একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এভাবে। বিস্তারিত প্রতিবেদন গত ৭ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অননুমোদিত শাখা ক্যাম্পাস খোলাসহ নানা অনিয়মের চিত্র তুলে ধরা হয়। তবে টিআইবি তার নীতি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাম প্রকাশ করেনি।

টিআইবির প্রতিবেদনের বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম আলো খোঁজ নিয়ে জানতে পারে, উত্তরায় অবস্থিত উচ্চশিক্ষার ওই প্রতিষ্ঠানটির নাম এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়টির এসএভিসি, একটি বিভাগের প্রধান ও একটি অনুষদের ডিন-এই তিন পদে আছেন মোহাম্মদ জাফর সাদেক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য ও মালিক আবুল হাসান মোহাম্মদ সাদেকের ছেলে এবং ট্রাস্টি বোর্ডেরও চেয়ারম্যান।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৯৬ সালে অনুমোদন পায়। আবুল হাসান মোহাম্মদ সাদেক এককালীন টাকা অনুদান করায় বোর্ড অব গভর্নরসের প্রথম সভায় তাঁকে প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান করা হয়। তিনি প্রথম দফায় ১৯৯৬-২০০০ মেয়াদে উপাচার্য হন। কয়েক দফায় মিলিয়ে তিনি এখনো উপাচার্য। অভিযোগ রয়েছে, তিনি নিয়ম অনুযায়ী মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষকতা না ছেড়েই প্রথম দফায় উপাচার্যের দায়িত্ব নেন। একপর্যায়ে তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাইদের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে দুটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়। সম্প্রতি এই দ্বন্দ্ব মিটেছে বলে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।

আইন অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস নিষিদ্ধ থাকলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে মতিঝিলে একটি শাখা ক্যাম্পাস রয়েছে। টিআইবির প্রতিবেদনেও দুটি ক্যাম্পাসের উল্লেখ আছে। মূল ক্যাম্পাস উত্তরায়। শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মান নিয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা নেই। এখানে সহ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রারের কার্যত কোনো ক্ষমতা নেই।

জানতে চাইলে জাফর সাদেক ঈদের আগে টেলিফোনে প্রথম আলোকে বলেন, এসব অভিযোগ সঠিক নয়। মতিঝিলের শাখাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়টির একজন কর্মকর্তা বলেন, উত্তরায় ২৮ নম্বর রোডে উপাচার্যের বাসায় উপাচার্যের কার্যালয়, এটি প্রশাসনিক ভবন নয়। ৫ নম্বর রোডে একাডেমিক ভবন।

টিআইবির প্রতিবেদনে উত্তরার ওই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বলা হয়, সনদনির্ভর এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের গবেষণার কোনো সুযোগ নেই। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করতে চান না, তাঁরা যত কম পড়াশোনা করে সনদ পাওয়া যায় ততই খুশি। যাঁরা চাকরি করেন, তাঁরা দূরদূরান্ত থেকে এসে শুধু শুক্রবার ক্লাস করলেও নিয়মিত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেও একই রকম চিত্র লক্ষণীয়। সত্যিকার অর্থে শিক্ষার্থীরা যেভাবে চান, সেভাবেই হয়। তাই দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়টির পিয়ন-দারোয়ানও সেখানকার ডিগ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষকদের কোনো ক্ষমতা নেই। প্রভাষকেরা সাধারণত পাঁচ হাজার থেকে শুরু করে ২০ হাজার টাকা বেতন পান। শিক্ষার্থী প্রচুর। কারণ ক্লাস করতে হয় না। পরীক্ষার হলে প্রচুর নকল হয়। পরীক্ষায় সবাইকেই পাস করিয়ে দেওয়া হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকেরা বিভিন্নভাবে অর্থ নিয়ে থাকেন।

এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪০ শাখা ক্যাম্পাস: আইন অনুযায়ী শাখা ক্যাম্পাস খোলা নিষিদ্ধ হলেও টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪০টি পর্যন্ত অবৈধ ক্যাম্পাস খোলার দৃষ্টান্ত আছে। এসব ক্যাম্পাস ইউনিয়ন পর্যায়েও বিস্তৃত।

পরে প্রথম আলো ইউজিসিতে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪০টি শাখা ক্যাম্পাস আছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টি চার ভাগে বিভক্ত। একটি অংশের মূল ক্যাম্পাস ধানমন্ডিতে, আরেকটি অংশের সাভারের গণকবাড়ীতে, অপর অংশের উত্তরায় এবং আরেকটি অংশের ক্যাম্পাস রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সনদ-বাণিজ্যের অভিযোগ তদন্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন অভিযোগের সত্যতা পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির সনদ বাতিলের সুপারিশ করেছিল। মন্ত্রণালয় বলছে, মামলার কারণে ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা বলেন, তাঁরা মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

নয় বিশ্ববিদ্যালয় চালাচ্ছে অননুমোদিত ক্যাম্পাস: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, ১৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের অভিযোগ আছে। এর মধ্যে নয়টি অননুমোদিতভাবে ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। এগুলো হলো: দারুল ইহসান, প্রাইম, এশিয়ান, অতীশ দীপঙ্কর, সাউদার্ন, নর্দান, দ্য পিপলস, বিজিসি ট্রাস্ট ও ইবাইস ইউনিভার্সিটি। এ ছাড়া আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, কুইন্স ইউনিভার্সিটিসহ আরও কয়েকটি নিয়ে মামলা চলছে। মালিকানা নিয়ে দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্বে ইবাইস এখন কার্যত দুটি বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেছে। এক ভাই ধানমন্ডিতে ও আরেক ভাই উত্তরায় আলাদাভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছেন।

এসব বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গত ৭ জুলাই সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠানে বলেন, অনিয়মের কারণে ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও এগুলো মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে ৪৮টি রিট করে স্থগিতাদেশ নিয়ে টিকে আছে।

স্থায়ী সনদ দুটির: ৭৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩২টি ১২ বছর অতিক্রম করেছে। কতগুলো সাত বছর পার করেছে। আইন অনুযায়ী সাময়িক অনুমোদন নিয়ে সাত বছর পর (নবায়নসহ সর্বোচ্চ ১২ বছর) শর্তগুলো পূরণ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থায়ী সনদ নেবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র দুটি- আহসান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিটি ইউনিভার্সিটি স্থায়ী সনদ নিয়েছে। আর মাত্র ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে গেছে। আইন অনুযায়ী নিজস্ব ক্যাম্পাসে না যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা থাকলেও তা না করে মন্ত্রণালয় এ ক্ষেত্রে দফায় দফায় সময় বাড়িয়েছে।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব মোহাম্মদ সাদিক গতকাল বুধবার প্রথম আলোকে বলেন, 'কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভালো করছে, আবার কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে মামলার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হচ্ছে। তবে সব বিশ্ববিদ্যালয়কে কাঠামোর মধ্যে আনতে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। এটা রাতারাতি সম্ভব নয়। তবে আমরা আশাবাদী।'

Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists-তে বলা হয়েছে, "*At some point near the top of your story, you must compose a paragraph that tells us the essence, core or nut of the story (and by extension, why we are viewing it). If you have defined and verified a hypothesis, most times it will serve as the nut. If you do not have the paragraph, viewers may not understand where you are taking them and why.*"[৩৩৯]

[৩৩৯] Ibid, Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), chapter five; Organization: How to Set Yourself Up to Succeed, p. 63.

সাধারণ প্রতিবেদনের ৩য় থেকে ৫ম অনুচ্ছেদের মধ্যে এই সংযোগ ঘটানো হয়। তবে প্রতিবেদনে আরো পরেও এই সংযোগ ঘটানো যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Poynter Institute-এর লেখক Chris Scalan সেজন্য 'nut graf' বলতে বুঝিয়েছেন, "*The nut graf tells the reader what the writer is up to; it delivers a promise of the story's content and message. It's called the nut graf because, like a nut, it contains the 'kernel,' or essential theme, of the story.*"[৩৪০]

এর মতে, এ ধরনের সংবাদ সূচনা নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য পূরণ করে থাকে:

১. এটি সংবাদের পক্ষে এমন যুক্তি পাঠকের সামনে তুলে ধরে যে, তাতে পাঠক সংবাদটি বিবেচনায় নেয়।
২. এটি সংবাদ সূচনার সাথে সংবাদের মূল অংশের সংযোগ ঘটায়।
৩. এটি সংবাদের সময়োপযোগিতার বিষয়টি তুলে ধরে।
৪. এটি প্রায়ই পাঠকের সামনে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো তুলে ধরে যাতে পাঠক বুঝতে পারে সংবাদটি কেন গুরুত্বপূর্ণ।

সংবাদের মধ্যবর্তী অংশ লিখন

Sheila S. Coronel সংবাদের এ অংশটির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এভাবে, "*The middle is the trickiest part of a report. It is when a story can bog down and flop completely, prompting readers to flee. It is also the part where the least interesting elements of a story need to be told.*"[৩৪১] একজন প্রতিবেদক সংবাদ সূচনার মাধ্যমে যে আগ্রহ পাঠকের মনে সৃষ্টি করেছেন তা মেটানোর জন্য দরকার সংবাদের মধ্যবর্তী অংশ খুব ভালোভাবে লেখা। এটি একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের জন্য অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।

এ অংশে প্রতিবেদককে তার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনার গভীরে যেতে হয়। সংবাদের এই মধ্যবর্তী অংশ অনুসন্ধানের মূল দিক বা ফলাফলের ভিত্তিতে রচিত হতে পারে। অথবা কখনও কখনও ঘটনা কিংবা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফলের ধারাক্রম অনুসারে এই মধ্যবর্তী অংশ লেখা যেতে পারে। অর্থাৎ এই অংশে পাঠকের জন্য মূল খোরাকটিই নিহিত থাকে। সেজন্য Sheila S. Coronel বলেছেন, "*The middle is actually where the meat of the investigation resides. It is where reporters go into the details of what they have found.*"[৩৪২] এ দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Poynter Institute-এর লেখক Chris Scalan প্রতিবেদন কিভাবে লেখা যায় তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে তিনি একটি সংবাদের উপাদানগুলোকে 'এক একটি স্তুপের' ('stack of blocks') সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, এই স্তুপের তিনটি অংশ আছে: শুরু, মধ্যবর্তী ও শেষাংশ। মধ্যবর্তী অংশে বিষয় ভিত্তিতে বিভিন্ন অংশে যৌক্তিক ধারায় তথ্যগুলো সংযোজিত থাকে। প্রতিবেদনের শুরুর অংশটিতে কাঠামো ও আধেয়ের মধ্য দিয়ে মধ্যবর্তী অংশ সম্পর্কে আলোকপাত থাকে এবং শেষাংশে সংবাদের প্রধান দিকটি সম্পর্কে পাঠকের স্মৃতিকে শক্তিশালী করে।

---

[৩৪০] Ibid, Sheila S. Coronel (2009), p. 188.
[৩৪১] Ibid, p. 191.
[৩৪২] Ibid, p. 191.

স্তরসমূহ

শুরু	অনুমান	কি বিষয়ে? তাতে কি হয়েছে?
মধ্যবর্তী অংশ-১	বি	সেকশন-১
মধ্যবর্তী অংশ-২	ষ য় ব	সেকশন-২
মধ্যবর্তী অংশ-৩	স্ত	সেকশন-৩
শেষাংশ	সমাপ্তি	আঠা

সাংবাদিকতার ধারায়, সংবাদটি কি নিয়ে, কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ, কি বিষয় প্রতিবেদনে থাকছে, এবং শেষে পাঠকের স্মৃতিকে জ্বালাই করতে কিছু তথ্য তুলে ধরার মধ্য দিয়ে স্তুপগুলো শুরু হয়। যদি প্রতিবেদনটি বড়সড় হয় তাহলে এই স্তুপগুলোতে একাধিক অনুচ্ছেদ বা অংশ থাকে, যাকে Chris Scalan স্বর্ণমুদ্রা ('gold coins') হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পাঠকের পড়ার বা বোঝার সুবিধার্থে এটি করা হয়। এই স্বর্ণমুদ্রার মধ্যে উজ্জ্বল কোনো কাহিনী, খুব ভাল একটি মন্তব্য, ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেয় এমন কোন পরিচ্ছন্ন দিক কিংবা কোন আকর্ষণীয় নতুন চরিত্র।

Chris Scalan বলছেন, প্রতিবেদনের এই মধ্যবর্তী অংশটি লেখা সাংবাদিকের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ এটি যত দীর্ঘ বা বড় হবে ততই পাঠকের পড়তে অসুবিধা হবে, পাঠকের আগ্রহ ধরে রাখা কষ্টকর হবে। এখানে পাঠকের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য নানা ধরনের উপায় আছে। এসব উপায় শুধু মধ্যবর্তী অংশে ব্যবহৃত হয় তা নয়, বরং পুরো প্রতিবেদন জুড়ে এসব প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারে।

কর্ম ও দৃশ্য (Action and scenes)

পাঠকের সামনে প্রতিবেদনটি এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যেন তারা কোন সিনেমা বা মুভি দেখছেন। এজন্য ঘটনা বা বিষয়ের মূল অ্যাকশন ও দৃশ্যগুলো পাঠকের সামনে তুলে ধরতে হয়। Sheila S. Coronel বলেছেন, "*It may help to think of a report as a movie unfolding before the readers' eyes. The movie progresses only because there is action that is played out in scenes.*"[৩৪৩]

ইউনিয়নের সভাপতির পদটি ১৮ বছর ধরে অবৈধ দখলে

নির্বাচন হয়, কোন কমিটিও নেই, তবুও সভাপতি, তিনিই সব, তার ওপরে ওঠার সামর্থ্য (!) নেই কারো। নিজেকে সবকিছুর উর্ধ্বে বলে দাবিদার রহস্যবৃত্ত এ ব্যক্তির নাম শরীফুজ্জামান বিজু। ১৮ বছর ধরে তিনি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি ইউনিয়নের সভাপতির পদটি দখল করে রেখেছেন। এ ইউনিয়নের নামে কর্মচারিদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা হয় নিয়মিত। সবাইকে 'ম্যানেজ' করে স্বার্থ হাসিল করা চতুর এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাহাড় জমে গেছে। নারী কেলেংকারী ও চুরি নাটক থেকে শুরু করে বহু অপকর্মের

[৩৪৩] Ibid, p. 192.

নায়ক তিনি। তার অপকর্মের নীরব স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোটা হাসপাতালটি। হাসপাতাল থেকে বিজু ও তার সহচরদের সবচেয়ে বেশি অবৈধ আয় হয়েছে ডিউটি বন্টন এবং ইউনিয়ন ও কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের নামে তোলা চাঁদার মাধ্যমে। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, শরীফুজ্জামান বিজু ১৯৮৮ সালের জুন মাসে ওয়ার্ড বয় হিসেবে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চাকরি পায়। তার পিতার নাম শেখ ইমান আলী। নিয়োগের দু'বছর পর থেকেই কোন প্রকার নির্বাচন ছাড়াই সে চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারি ইউনিয়নের সভাপতির পদটি দখল করে। দীর্ঘ ১৮ বছরের ইতিহাসে এ ইউনিয়নের কোন নির্বাচন, কমিটি ও সভা কোন সদস্য হতে দেখেনি। এক নায়কতন্ত্র হিসেবে বিজুই এ ইউনিয়নের সদস্য, সভাপতি, কর্মকর্তা, কর্মচারি নিজেই। প্রতিমাসে ইউনিয়নের ১১০ জন সদস্যের কাছ থেকে সে ৫ টাকা হারে চাঁদা তুলে আসছে। ১৮ বছর ধরে উঠানো চাঁদার এ টাকা কোথায় জমা আছে বা কোন খাতে , কীভাবে ব্যয় হয়েছে-তা জানার সাধ্য কারো নেই। বিষয়টি জানতে চাওয়ার অপরাধে তার হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন অনেকেই। বিজু, তার সহযোগী ওয়ার্ড মাস্টার সুলতান আহমেদ ও সুইপার আকতার হোসেনের অপকর্মের বিষয় হাসপাতালের কর্মচারিরা জানিয়েছেন, গত ৫ বছর ধরে বিজুর ভূমিকা ছিলো হাসপাতালের পরিচালক স্টাইলে। সে কখনই নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেনি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কখনই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সাহস করেনি। হাসপাতাল কর্মচারির সংখ্যা কম থাকায় বিভিন্ন কাজে সমস্যা হলেও বিজু কাজ না করেই বেতন নিয়েছে। হাসপাতালের কর্মচারিদের ডিউটি বণ্টনের ১৫ দিনকে একটি রোস্টার হিসেবে ধরা হয়। সে হিসেবে মাসে দুটি এবং বছরে ২৪টি রোস্টার হয়। কর্মচারিদের ১৫ দিন অন্তর বাই রোটেশনে সকাল, বিকাল ও রাতে রোস্টার বণ্টন করা হয়ে থাকে। সুবিধাজনক স্থানে ডিউটি পেতে হলে বিজু ও ওয়ার্ড মাস্টারকে রোস্টার প্রতি ৩ থেকে ৫শ' এমনকি হাজার টাকা পর্যন্ত উৎকোচ দিতে হয়। অসৎ কর্মচারিরা এ টাকা দিয়ে রোগীদের জিম্মি করে আরো বেশি টাকা আদায় করেন। টাকা না দিলে কষ্টের জায়গায় ডিউটি দেয়া হয়। এর প্রতিবাদ করায় একাধিক কর্মচারি তার রোষানলে পড়ে হয়রানির শিকার হয়েছে। তার পক্ষ না নেয়ায় ওয়ার্ড মাস্টার আবদুল গফুর ও প্যাকার টিপু সুলতানকে এ হাসপাতাল থেকে অপমান করে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়। রোস্টার খাত থেকেই বিজু মাসে আয় করেছে অর্থ লক্ষ টাকা। অপরদিকে, গত কয়েক মাস আগে হাসপাতালের হিসাব রক্ষণ বিভাগে একটি চুরি নাটক সাজানো হয়। এর নায়কও ছিলো বিজু বলে কথিত রয়েছে। ওই সময় হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র, প্রমাণাদিসহ নগদ ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা চুরি হয়। ওই ঘটনায় বিজুকে গ্রেফতার করে রিমান্ডেও নেয় পুলিশ। এতকিছুর পরও শুধুমাত্র বিজুকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। কিন্তু তার চাঁদাবাজি ও অবৈধ অর্থের উৎস এবং চুরি নাটক রহস্য উদঘাটন করা হয়নি। ফলে বিজু সব কিছুকে থোড়াই কেয়ার করে বহাল তবিয়তে রয়েছে। এমনকি সে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে দৃষ্টিপাতে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপপ্রয়াস চালানোর সাহস দেখাচ্ছে। যাতে সচেতন মহল হতবাক হয়েছে।

উপরের প্রতিবেদনটি টিআইবির পুরষ্কারপ্রাপ্ত একটি সিরিজ রিপোর্টের অংশবিশেষ। 'দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল' শিরোনামে মুহাম্মদ নূরুজ্জামানের এ সিরিজ প্রতিবেদনটি ছাপা হয় খুলনার দৈনিক দৃষ্টিপাতে, ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত। উপরের প্রতিবেদনটিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক বিবরণ দৃশ্যের মতো পাঠকের কাছে ফুটে উঠে।

দ্বন্দ্ব (Conflict)

সাধারণভাবে বলা হয়, সব ধরনের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন মূলত দ্বন্দ্বের উপাখ্যান: অন্যায়কারী বনাম ভুক্তভোগী, বিজয়ী বনাম বিজিত, শক্তিশালী বনাম শক্তিহীনের দ্বন্দ্বই মূলত অনুসন্ধানী

প্রতিবেদনে ফুটে উঠে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রতিবেদকরা প্রতিবেদনের শুরুতে এই দ্বন্দ্বের কথা তুলে ধরেন কিন্তু মধ্যবর্তী অংশে তার খেই হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু একটি ভাল অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মধ্যবর্তী অংশে এই দ্বন্দ্বের স্বপক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। প্রতিবেদনে চরিত্রগুলো ফুটিয়ে তুলে দ্বন্দ্বের মূল সূর কিভাবে ফুটিয়ে তুলতে তার একটি উদাহরণ নিচে দেয়া হলো:

এক চিফ হুইপের এত্ত সরকারি বাসা!

সেলিম জাহিদ

দৈনিক প্রথম আলো, জুন ০৮, ২০১৪

এক চিফ হুইপের এত্ত সরকারি বাসা! জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ ও পটুয়াখালী-২ আসনের আওয়ামী লীগের সাংসদ আ স ম ফিরোজ। সরকারিভাবে তাঁর নামে একটি বাংলো ও একটি অফিস বরাদ্দ আছে। কিন্তু এর বাইরে সংসদ সদস্য ভবনে তিনি আরও সাতটি বাসা নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। সংসদ সচিবালয় সূত্র জানায়, সংসদ ভবন এলাকায় চিফ হুইপের নামে বরাদ্দ একটি বাংলো বরাদ্দ আছে। তবে তিনি থাকেন বারিধারায় নিজের বাড়িতে। সংসদের দক্ষিণ পাশে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে সংসদ সদস্য ভবনে একটি ফ্ল্যাটও চিফ হুইপের নামে সংরক্ষিত আছে। শেরেবাংলা নগরে আগের সংসদ সদস্য ভবনে (এমপি হোস্টেল)- এক কক্ষের একটি ও দুই কক্ষের একটি বাসাও চিফ হুইপ ব্যবহার করেন। পুরোনো সংসদ সদস্য ভবনের একটি বাসায় চিফ হুইপের স্ত্রীর ছোট ভাই পরিবার নিয়ে থাকেন। একটি বাসায় থাকেন তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ)। আরেকটি বাসায় থাকেন তাঁর দপ্তরের গাড়ি চালক। নাখালপাড়া ন্যাম ভবনের একটি ফ্ল্যাটে থাকেন চিফ হুইপের এক বন্ধু।

এত বাসা তাঁর নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে জানতে চাইলে চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজ সহাস্যে প্রথম আলোকে বলেন, 'পুরো সংসদই তো আমার নিয়ন্ত্রণে।' পরে বিস্তারিত শুনে তিনি বলেন, এ রকম কোনো ঘটনাই নেই। এমন কিছু যদি শোনেন বা জানেন, সেগুলো পুরো ঠিক না।

চিফ হুইপ হচ্ছেন জাতীয় সংসদের সংসদ কমিটির সভাপতি। তাঁর নেতৃত্বাধীন এ কমিটিই সাংসদদের আবাসন বরাদ্দ দেওয়াসহ তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়গুলো দেখভাল করে।

সংসদ সচিবালয় সূত্র জানায়, সংসদ ভবন এলাকায় ১ নম্বর বাংলোটি চিফ হুইপের নামে সরকারিভাবে বরাদ্দ আছে। আর সংসদ ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম ব্লকের ২২১ থেকে ২২৪ নম্বর পর্যন্ত চারটি কক্ষ তাঁর সরকারি দপ্তর। এখানে বসেই চিফ হুইপ তাঁর দাপ্তরিক কাজ করেন।

সরকারি বাংলোতে থাকেন কি না-জানতে চাইলে চিফ হুইপ গতকাল শনিবার প্রথম আলোকে বলেন, তিনি এই বাংলোয় ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এখন রাজধানীর বারিধারায় নিজের বাড়িতে থাকেন।

মানিক মিয়া অ্যাভিনিউর ৪ নম্বর সংসদ সদস্য ভবনে ১৮০০ বর্গফুট আয়তনের ৮০৪ নম্বর ফ্ল্যাটটিও চিফ হুইপের নিয়ন্ত্রণে আছে। গতকাল শনিবার গিয়ে ফ্ল্যাটটি তালাবদ্ধ দেখা যায়।

জানতে চাইলে ওই ভবনের ফ্ল্যাট পরিচালক আবদুর রশীদ হাওলাদার বলেন, 'এইডা চিফ হুইপ স্যার রাখছেন। কিন্তু এইখানে উঠেন নাই।' তবে সংসদ সদস্য ভবনের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট নাজিম উদ্দিন দাবি করেন, ওখানে চিফ হুইপের নামে কোনো বাসা বরাদ্দ নেই।

সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, জাতীয় সংসদসংলগ্ন পুরোনো সংসদ সদস্য ভবনে আরও দুটি বাসা চিফ হুইপের দখলে আছে। এর একটি হচ্ছে ১ নম্বর ব্লকে দুই কক্ষের ১/৭ নম্বর বাসা। আয়তন ৯৮০ বর্গফুট। অপরটি দুই নম্বর ব্লকে এ কক্ষের ১৭ নম্বর বাসা। এর আয়তন ৪১৫ বর্গফুট।

ন্যাম ভবন নির্মাণের আগে সাংসদেরা এসব বাসায় থাকতেন। বর্তমানে সাংসদেরা বরাদ্দ নিয়ে কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করেন।

গতকাল সেখানে গিয়ে দেখা যায়, ১/৭ নম্বর বাসার দরজায় কাগজে চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজের নাম লেখা। সংশ্লিষ্টরা জানান, এখানে বসে তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকার লোকজনদের সাক্ষাৎ দেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংসদ সদস্য ভবনের একজন কর্মচারী জানান, গত মাসে তিনি ১/৭ নম্বর বাসায় উঠেছেন। এর আগে ২ নম্বর ব্লকের ১৭ নম্বর বাসা ব্যবহার করেছেন। সেটি এখন তালাবদ্ধ আছে।

এর পাশেই পুরোনো সংসদ সদস্য ভবনের ৩ নম্বর ব্লকের এলডি হলে পার্লামেন্ট মেম্বার্স ক্লাবেও আ স ম ফিরোজের আরেকটি দপ্তর আছে। নবম সংসদে পার্লামেন্ট মেম্বার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পর তিনি এ কক্ষটি পান।

জানতে চাইলে পার্লামেন্ট মেম্বার্স ক্লাবের ব্যবস্থাপক শফিকুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, এখানে চিফ হুইপ মাঝেমধ্যে বসেন। নতুন (দশম) সংসদ বসার পর দুই-একবার এসেছিলেন। জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ পার্লামেন্ট মেম্বার্স ক্লাবের সভাপতি হন। এ রেওয়াজ অনুযায়ী, নবম সংসদের চিফ হুইপ আবদুস শহীদ সভাপতি ছিলেন। সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আ স ম ফিরোজ। ওই কমিটিই এখনো বহাল আছে। ক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দুজনই একই দপ্তর ব্যবহার করেন।

নাখালপাড়ার পুরাতন সংসদ সদস্য ভবনের দুই কক্ষের একটি বাসায় (৮৪-৮৫) চিফ হুইপের শ্যালক মোহাম্মদ খায়রুল পরিবার নিয়ে থাকছেন। এই ভবনেরই দুই কক্ষের আরেকটি বাসায় (৬৬-৬৭) থাকেন চিফ হুইপের ব্যক্তিগত সহকারী মো. আনিসুল হক। একই ভবনে এক কক্ষের একটি বাসায় (১১ নম্বর) থাকেন চিফ হুইপের কার্যালয়ের গাড়ির চালক মো. ইউনূছ। ন্যাম ভবন নির্মাণের আগে এসব বাসায় সাংসদেরা থাকতেন।

যোগাযোগ করা হলে সংসদ সদস্য ভবনের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সুজিত কুমার দেব প্রথম আলোকে বলেন, 'চিফ হুইপের শ্যালক বা বন্ধু এসব বাসায় থাকেন, এটা প্রথম শুনলাম।' তিনি দাবি করেন, স্পিকার ও চিফ হুইপের অফিসের স্টাফদের জন্য পাঁচটি কক্ষ বরাদ্দ আছে। তিনি জানান, এই বাসাগুলো এখন সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের বরাদ্দ দেওয়া হয়।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে নাখালপাড়ার পুরাতন সংসদ সদস্য ভবনে গেলে প্রতিবেশীরা জানান, ৮৪ ও ৮৫ নম্বর বাসায় চিফ হুইপের শ্যালক পরিবার নিয়ে থাকেন। বাসিন্দারা তখন বাসায় ছিলেন না। পরে ফোনে জানতে চাইলে কেয়ারটেকার রবিউল হোসেনও চিফ হুইপের শ্যালকের ওই বাসায় থাকার কথা স্বীকার করেন।

তবে ৬৬-৬৭ নম্বর বাসায় গিয়ে চিফ হুইপের ব্যক্তিগত সহকারী আনিসুল হককে পাওয়া যায়। তিনি জানান, বাসাটি তাঁর নামে বরাদ্দ নেওয়া হয়েছে।

নাখালপাড়ার ১ নম্বর সংসদ সদস্য ভবনের ২০১ নম্বর ফ্ল্যাটে (সাড়ে ১২ শ বর্গফুটের) থাকেন চিফ হুইপের বন্ধু মৃণাল কান্তি ঘোষ। তিনি অবসরপ্রাপ্ত প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বলে জানা গেছে। গত বৃহস্পতিবার ওই বাসায় গেলে মৃণাল কান্তি ঘোষ প্রথম আলোকে বলেন, 'চিফ হুইপ আমার বন্ধু। এক মাস ধরে আমি এখানে আছি।'

চিফ হুইপ হিসেবে একাধিক বাসা নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে বক্তব্য জানতে চাইলে আ স ম ফিরোজ প্রথম আলোকে বলেন, 'এগুলো কি নিউজ করার মতো বিষয়? আমরা রাজনীতিকেরা কিছুটা হলেও স্বচ্ছ থাকার চেষ্টা করি। এসব ছোটখাটো বিষয়ে লিখলে মানুষ খারাপভাবে নেয়। আমাদের চরিত্র হনন করলে আর থাকে কি? আসলে আমরা এতটা ছোট না।'

দৃষ্টিভঙ্গি (Point of View)

অধিকাংশ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়। অর্থাৎ তথ্য সংগ্রাহক হিসেবে প্রতিবেদক যা দেখেছেন, যা বুঝেছেন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে তাকে তথ্যগুলো তুলে ধরতে হয়; প্রতিবেদনটি লিখতে হয়। তবে তার অর্থ এই নয় যে, একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ তুলে ধরা যাবে না। প্রতিবেদকের পর্যবেক্ষণ যেমন প্রতিবেদনে তুলে ধরতে হবে, তেমনি সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণও প্রতিবেদনে থাকতে হবে। Sheila S. Coronel বিষয়টি তুলে ধরেছেন এভাবে, "*The author's voice need not be the only one that the readers 'hear' when they read a story; other voices, other points of view, can be included as well.*"[৩৪৪] প্রতিবেদনে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরলে তা প্রতিবেদনের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত করে। এর মাধ্যমে শুধু লেখক বা প্রতিবেদক ঘটনাটি যেভাবে দেখেছেন তাই শুধু পাঠক জানেন না, পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ কিভাবে ঘটনাটি দেখছেন সে বিষয়ও পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠে। এজন্য Sheila S. Coronel বলেছেন, "*Writing from different points of view allows readers to see how events unfold through the eyes of those who were actually part of these events, rather than only through the eyes of a reporter who was not even there.*"[৩৪৫] ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবেদনের মধ্যবর্তী অংশে তুলে ধরলে প্রতিবেদনটি অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও পাঠযোগ্য হয়ে উঠে।

সংলাপ/কথোপকথন (Dialouge)

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনগুলো তথ্যসমৃদ্ধ হয়। মাঝে মাঝে এসব প্রতিবেদন রং ও বর্ণনায়ও সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু এসব প্রতিবেদনে ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলোর বক্তব্যও সমৃদ্ধ হতে হয়; এসব চরিত্র কিভাবে কথা বলছে সে বিষয়টিও শক্তিশালী হতে হয়। শুধু উদ্ধৃতি অনেক সময় এ ধরনের প্রতিবেদনের জন্য যথেষ্ট নয়। অনেক ক্ষেত্রে কথোপকথন বা সংলাপের মাধ্যমে প্রতিবেদক সুষমভাবে ঘটনা বা বিষয়টি তুলে ধরতে পারেন। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এ ধরনের কথোপকথন বা সংলাপের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists-এ প্রয়োজনে সম্পাদনা করে কথোপকথন বা সংলাপ ছোট করে হলেও দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে-- "*People are not just listening to you for the facts. They want to know the character, the tone, the color of the sources you will present to them. Dialogue is the single best vehicle to convey those elements. Edit it for length and impact, but use as much as you need.*"[৩৪৬]

অনুচ্ছেদ (Paragraph)

প্যারা বা অনুচ্ছেদ যে কোনো লিখনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি বিষয়। একজন প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনে অনেকগুলো অনুচ্ছেদ ব্যবহার করেন। অনেক সময় শিক্ষানবিশ প্রতিবেদকরা মনে করে থাকেন, প্যারা বা অনুচ্ছেদ বেশি হলে সম্পাদক বা সহ-সম্পাদকরা বকাঝকা করবেন। এমন ধারণা ঠিক নয়। বরং প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদগুলো স্বচ্ছ, সাবলীল ও সুষমভাবে স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ এক

---

[৩৪৪] Ibid, p. 194.

[৩৪৫] Ibid.

[৩৪৬] Ibid, Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), p. 65.

একটি ছোট গল্প। এক একটি অনুচ্ছেদ হবে এক একটি ভাবনায় সম্পূর্ণ। আপনি একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে অনেকগুলো বিষয়ে অনুসন্ধান করেছেন। সবগুলো জটিল ও স্পর্শকাতর বিষয় যদি একটি অনুচ্ছেদে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেন তাহলে তা পাঠযোগ্য হবে না। সে কারণে একটি অনুচ্ছেদে শুধু একটি ভাব বা আঙ্গিক উপস্থাপন করবেন। কোন বিষয়ের সূচনা নির্দেশ (topic sentence) করে এমন বাক্য দিয়ে অনুচ্ছেদ শুরু করতে হবে। অর্থাৎ এমন বাক্য দিয়ে অনুচ্ছেদটি শুরু করতে হবে যাতে পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় আপনি এই অনুচ্ছেদে কি বলতে চান। এতে পাঠকের সুবিধা হয়। Investigative Journalism Manuals-এ বলা হয়েছে, "*Each paragraph is a mini-story. It takes one aspect of your overall investigation and explores it fully, breaking down the big theme into parts that are manageable for writer and reader. It starts with a 'topic sentence' that tells the reader which aspect you are dealing with, or how it links to what has gone before.*"[৩৪৭]

প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ লেখার সময় মনে রাখতে হবে সেগুলো যেন ছোট ও পাঠযোগ্য হয়। ছোট অনুচ্ছেদ চোখের জন্য স্বস্তিদায়ক। লম্বা অনুচ্ছেদ পড়তে গিয়ে পাঠক খেই হারিয়ে ফেলতে পারেন এবং এতে তাদের মনোযোগ ও আকর্ষণ নষ্ট হতে পারে। এজন্য একটি অনুচ্ছেদে কখনই একাধিক ভাব বা আঙ্গিক দেয়া যাবে না। একটি অনুচ্ছেদ থেকে আরেকটি অনুচ্ছেদে যাওয়ার জন্য 'যোজক শব্দ'; যেমন এছাড়া, আবার, একারণে, এজন্য, অতএব, সুতরাং, এদিকে- এ ধরনের শব্দগুলো ব্যবহার করা যায়।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মধ্যবর্তী অংশটি অনেকগুলো অনুচ্ছেদ নিয়ে গঠিত হয়। এখানে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের সবটুকু দিয়ে সব ধরনের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করতে হয়। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুচ্ছেদগুলোতে তুলে ধরতে হয়:

প্রমাণ (বিশদ বিবরণ, মন্তব্য, তথ্য ও সংখ্যা)
সংজ্ঞায়ন বা ব্যাখ্যা
প্রেক্ষিত, ইতিহাস, তুলনা বা বৈপরীত্য
কারণ ও ফলাফল
পক্ষ-বিপক্ষে যুক্তি
বিশ্লেষণ

উদ্ধৃতির ব্যবহার (Using quotes)

উদ্ধৃতি বা মন্তব্য সে পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষ অথবা আংশিক; যেভাবেই ব্যবহার করা হোক না কেন উদ্ধৃতির ব্যবহার এখনকার সংবাদ কাঠামোর একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। এর মাধ্যমে পাঠক/দর্শক ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্তদের বক্তব্য জানতে পারেন। সংবাদ কাঠামোতে উদ্ধৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে Pressfred Fedler et al. বলেছেন, "*Quotations add color and interest to news stories by allowing readers to hear many voices rather than just the voice of the writer.*"[৩৪৮]

কোন একটি দিক তুলে ধরার জন্য কিংবা সেটি প্রতিষ্ঠার জন্য অথবা তার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের জন্য প্রতিবেদনে মন্তব্য/উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে উদ্ধৃতি

[৩৪৭] Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals, Chapter seven: Writing the story/ http://www.investigative-journalism-africa.info/

[৩৪৮] Ibid, Pressfred Fedler, John R. Bender, Lucinda Davenport & Michael W. Drager (2005), p. 239.

দিয়ে কখনই পুরো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তুলে ধরা যায় না। কোন তথ্যের স্বপক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের জন্য মন্তব্য দেয়া হয়; তবে এক্ষেত্রে ওই তথ্যটির পুনরাবৃত্তি ঘটানো যাবে না। কখনই মৌলিক কোন তথ্য উপস্থাপনের জন্য মন্তব্য তুলে ধরা উচিত নয়। মন্তব্যের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতিই সবচেয়ে কার্যকরী। সেক্ষেত্রে অবশ্যই নির্ভুল এবং পূর্ণাঙ্গভাবে মন্তব্য তুলে ধরতে হবে। তবে মন্তব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষণ বা ভারী ভারী শব্দ; যেমন, তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, তিনি যুক্তি দিয়ে বলেছেন- এমন শব্দগুলো ব্যবহার না করাই ভালো।

একজন প্রতিবেদক বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য প্রতিবেদনের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করে থাকেন। এর মধ্যে সংবাদ সূচনার পরপরই অনেক প্রতিবেদক উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন। বিশেষ করে সূচনায় সংবাদের যে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তার সমর্থনে একটি শক্তিশালী উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। এ ধরনের উদ্ধৃতি মূলত সূচনাকে ব্যাকআপ দিয়ে থাকে বলে একে সূচনা উদ্ধৃতি (lead quote) বা যুক্তিতর্কমূলক উদ্ধৃতি (augmenting quote) বলে থাকে। তবে এখানে কোনভাবেই সূচনার তথ্যগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয় না। তবে প্রত্যেক ধরনের সংবাদে যে সূচনা উদ্ধৃতি থাকতেই হবে এমন কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই।

পরিসংখ্যান ও পরিভাষার ব্যবহার

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা গুণগত ও পরিমাণগত দুই ধরনেরই হতে পারে। অধিকাংশ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাই গুণগত। এ ধরনের সাংবাদিকতায় কেন ঘটনাটি ঘটেছে, কিভাবে অনিয়মটি ঘটলো এবং কে এর জন্য দায়ী- এ সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরা হয়। কিন্তু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বিশেষ করে দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে সংখ্যার আধিক্য থাকা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কারণ অর্থনৈতিক লেনদেনে অনিয়মের ঘটনা তুলে ধরার ক্ষেত্রে অঙ্কের হিসাব তুলে ধরতে হয়। প্রায়ই প্রত্যেক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে অনিয়মের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে কোন না কোনভাবে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরতে হয়। কিন্তু অনেক সাংবাদিকই সংখ্যা বা পরিসংখ্যান দেখলেই ভয় পান। একটি ভাল অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার জন্য এই ভয় ভাঙতে হবে। কারণ সংবাদে সংখ্যার ব্যবহার কষ্টকর কিছু নয়; প্রয়োজনীয়। কিছু নিয়ম অনুসরণ করলে সংখ্যা ও পরিসংখ্যান ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়।

পরিসংখ্যান বা সংখ্যাগত তথ্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনভাবেই ভুল তথ্য উপস্থাপন করা না হয়। সেজন্য একাধিকবার যাচাই করেই পরিসংখ্যান তুলে ধরা উচিত। কারণ সংখ্যা বা পরিসংখ্যানের ভুল কোন উদ্ধৃতি ভুলভাবে তুলে ধরার জন্য মারাত্মক ভয়ঙ্কর হতে পারে। সে বিষয়টি তুলে ধরতে গিয়ে Maier Scott বলেছেন, "*News sources thought numerical errors were almost as severe as getting a name wrong, and numerical errors were seen as more severe than misquoting a source.*"[৩৪৯]

শতাংশ তুলে ধরা

একের পর এক সংখ্যা বা পরিসংখ্যান তুলে ধরার চেয়ে শতাংশের ভিত্তিতে তথ্য উপস্থাপন করা অনেক বেশি ফলপ্রসূ। এতে পাঠক/দর্শকের জন্য পরিস্থিতি বুঝতে অনেক সহজ হয়।

হার ও গড়

একটির সাথে আরেকটির তুলনা তুলে ধরতে হার (rate) খুব কার্যকরী। যেমন, মূল্যস্ফীতি হার, মাথাপিছু আয়ের হার ইত্যাদি। পাশাপাশি গড় হিসাবও তুলে ধরলে পাঠকের বোঝার জন্য অনেক সহায়ক হয়।

[৩৪৯] Maier Scott (2002), Getting It Right? Not in 59 Percent of Stories, Newspaper Research Journal, 23:1, p. 11.

পরিসংখ্যান কিংবা সংখ্যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে, প্রতিবেদনের মূল বিষয়বস্তু প্রমাণের জন্য সংখ্যা বা পরিসংখ্যানটি সত্যিই উপযুক্ত ও ব্যবহার করা জরুরি কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। পাঠক বা দর্শকের বোঝার সুবিধার্থে পরিসংখ্যানগুলোকে সংখ্যায় প্রকাশ না করে শব্দে প্রকাশ করা উচিত। প্রতিবেদনে শুধু পরিসংখ্যান তুলে ধরার জন্য পরিসংখ্যানের ব্যবহার করলে তেমন কোন ফল আসে না। বরং প্রতিবেদককে পরিসংখ্যান ব্যবহারের তাৎপর্য ও যৌক্তিকতাও তুলে ধরতে হবে কিংবা তা প্রমাণ করতে হবে। তাছাড়া সংবাদ কাহিনীর আলোকে ঘটনার তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরতে এই পরিসংখ্যান কতটা মানবিক আবেদন তৈরি করতে পারবে তাও প্রতিবেদককে ভাবতে হবে।

অপ্রয়োজনীয় কিংবা অনুপযুক্ত পরিসংখ্যান যতই গ্রাফ বা চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হোক না কেন তা কোনভাবেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। বরং পাঠক এতে বিরক্তই হবেন। পাঠকের কাছে বোধগম্য উপায়ে সংখ্যা বা পরিসংখ্যান তুলে ধরার গুরুত্ব কতখানি তা বোঝায় যায় Anna McKane-এর কথা থেকে, "*Figures are important in a story to give weight to the facts, and to back up points. Percentages and ratios are important because they show how something has changed. However, this does not mean that stories should be about figures. They should be about people, always, but the figures might show how things have changed for people: more or fewer people moving house, going abroad, being jailed, or whatever.*"[৩৫০] পাশাপাশি অনেক পরিভাষা ও টেকনিক্যাল শব্দ থাকে যেগুলো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ব্যবহার করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে যতটা সহজ ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা যায় সে চেষ্টা করতে হবে; প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিয়ে দিতে হবে।

শেষাংশ (The Ending)- সমাপ্তি নয়, উপসংহার

যে কোনো উপাখ্যান বা আখ্যানমূলক লিখনেই একটি সন্তোষজনক সমাপ্তি টানতে হয়। তবে গল্প, উপন্যাসের মতো সাংবাদিক নিজের কল্পনার রং মিশিয়ে সমাপ্তি টানতে পারেন না। বরং সমাপ্তি টানার চেয়ে তাকে একটি উপসংহার তুলে ধরতে হয়। Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists-তে বলা হয়েছে, "*Narrative art requires a satisfying closure – but unfortunately, journalists do not have the right to invent one. Instead of endings, we must compose closers.*"[৩৫১] এ ম্যানুয়েলে বলা হয়েছে, উপসংহার ও সমাপ্তি টানার মধ্যে পার্থক্যটি উল্লেখযোগ্য। একটি পরিসমাপ্তি যে কোনো কাহিনীর সকল রহস্যের সমাধান দিয়ে থাকে। আর একটি উপসংহার সাধারণভাবে সেই স্থান বা প্রেক্ষিতকেই নির্দেশ করে যেখানে কাহিনির অনুসন্ধান শেষ হয়েছে। একজন কাহিনীকার জোর করে একটি সমস্যার সমাধান দিতে পারেন কিন্তু একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক তার হাতে না থাকা সমাধানের কথা বলতে পারেন না। একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের শেষটা কেমন হতে পারে তা Albert Londres-এর এই কথা থেকে বোঝা যায়, *"I've finished. The government must start."*

প্রতিবেদকরা সবসময়ই চান তাদের প্রতিবেদনের শেষটা হবে স্মরণীয়। কিন্তু এতে তারা সবসময় সফল হন না। অনেক সময় প্রতিবেদক শেষের দিকে বিষয়টি ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রতিষ্ঠা

[৩৫০] Anna McKane (2006), News Writing, SAGE Publications, London, p. 87

[৩৫১] Ibid, Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), p. 67.

করার চেষ্টা করেন। Sheila S. Coronel বলেছেন, "*Sometimes, they are too exhausted by the writing process that they end not with a bang but with a whimper.*"[৩৫২] সাধারণত দেখা যায়, অনুসন্ধানী প্রতিবেদকরা কোন মন্তব্য দিয়ে প্রতিবেদন শেষ করেন অথবা যে চরিত্র দিয়ে প্রতিবেদন শুরু করেছিলেন সেই চরিত্র দিয়েই প্রতিবেদনের সমাপ্তি টানেন। এসোসিয়েট প্রেসের সাংবাদিক Bruce de Silva মনে করেন, প্রতিবেদনের শেষাংশ তিন ধরনের কাজ করে। সেগুলো হলো:

- পাঠককে বলা প্রতিবেদনটি শেষ হলো।
- পাঠকের মনে প্রতিবেদনের কেন্দ্রবিন্দুটি শক্ত করে প্রতিষ্ঠা করা।
- অনুরণন করা। প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্যটি পাঠকের কাছে আবারও তুলে ধরা। Bruce de Silva বলেছেন, "*It should stay with you and make you think a little bit. The very best endings do something in addition to that. They surprise you a little. There's a kind of twist to them that's unexpected. And yet when you think about it for a second, you realise it's exactly right.*"[৩৫৩]

এ কাজগুলোর কথা মাথায় রেখে একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক বিভিন্নভাবে তার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটির উপসংহার টানতে পারেন। সেগুলো হলো:

১. উপাখ্যানমূলক উপসংহার (Narative Ending)

উপাখ্যান বা কাহিনীর মাধ্যমে যেমন প্রতিবেদন শুরু করা যায় তেমনি শেষও করা যায়। এ ধরনের সমাপ্তির মাধ্যমে প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনের নানা দিকগুলোর সারমর্ম টানতে পারেন। কিন্তু এখানে পরোক্ষ বা একটি গল্প বলার মাধ্যমে এটি করতে হয়।

২. ব্যাখ্যামূলক উপসংহার (Explanatory Ending)

সারমর্মমূলক সমাপ্তি যে সবসময় উপাখ্যান বা কাহিনী নির্ভর হতে হবে এমন কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। এখানে প্রতিবেদনের মধ্যবর্তী অংশে উল্লেখিত মূল অভিযোগের বিষয়টি আবারও তুলে ধরা হয়। এই পুনরাবৃত্তির মূল কারণ হলো পাঠককে ঘটনাটির গুরুত্ব আবারো স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং এই প্রতিবেদনটি কেন তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরা। মাঝে মাঝে এ ধরনের সমাপ্তিতে ঘটনা বা বিষয়ের ভবিষ্যত প্রভাব তুলে ধরা হয়।

৩. উদ্ধৃতিমূলক উপসংহার (Quote Ending)

এটিই সর্বাধিক ব্যবহৃত সমাপ্তি বা প্রতিবেদন শেষ করার পদ্ধতি। এ ধরনের সমাপ্তিতে প্রতিবেদনের সারমর্ম যেমন টানা যায় তেমনি উপসংহারও টানা সহজ হয়। তবে এক্ষেত্রে একাধিক বা সবপক্ষের উদ্ধৃতি তুলে ধরা ভাল। কারণ এর মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠতার বিষয়টি সহজেই পরিষ্কার করে তুলে ধরা যায়। এক্ষেত্রে চেষ্টা করা উচিত, ঘটনার সঙ্গে জড়িত কোন ব্যক্তির শক্তিশালী কোন মন্তব্যের মাধ্যমে প্রতিবেদন শেষ করা।

৪. বর্ণনামূলক উপসংহার (Descriptive Ending)

কোন স্থানের চিত্র কিংবা কোন দৃশ্যের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে এ ধরনের সমাপ্তি টানা যায়। এ ধরনের মৌলিক কাঠামো অনুসরণ করে বিভিন্নভাবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখা হয়ে থাকে।

[৩৫২] Ibid/ Sheila S. Coronel/ 2009/ p 197.
[৩৫৩] Ibid

সাম্প্রতিক সময়ে বেশি ব্যবহৃত এমন কাঠামোগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

ক. কালানুক্রমিক কাঠামো (Chronological Structure)

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য বহুল ব্যবহৃত কাঠামো এটি। এ ধরনের কাঠামোর সংবাদে ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয় অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্কিত ঘটনাগুলো পর্যায়ক্রমে ও ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়।

চিত্র: কালানুক্রমিক কাঠামো

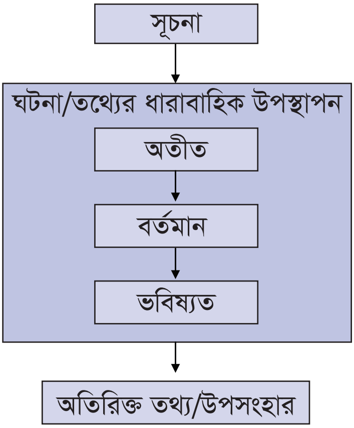

এ ধরনের কাঠামোতে প্রতিবেদক কোন একটি দৃশ্য বা ঘটনার মাধ্যমে প্রতিবেদন শুরু করতে পারেন। সেই ঘটনা বা দৃশ্যের সঙ্গে সামগ্রিক চিত্র ফুটিয়ে তোলেন। ধীরে ধীরে সময়ানুক্রমিক ও ধারাবাহিকভাবে পুরো চিত্র বা তথ্য তুলে ধরেন। এখানে সূচনার সঙ্গে প্রতিবেদনের মূল অংশের সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি নাটগ্রাফ বা মর্মস্থল অনুচ্ছেদ দিতে হয়। ধীরে ধীরে ঘটনা বা তথ্যের উপস্থাপনের জন্য এ ধরনের কাঠামোতে অবশ্যই 'অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত' রূপরেখা অনুসরণ করতে হবে। ইংরেজিতে এ রূপরেখাকে সংক্ষেপে পিপিএফ (PPF: Past-Present-Future) বলে। এ ধরনের সংবাদ কাঠামোকে মার্টিনি গ্লাস (Martini Glass) কিংবা আওয়ারগ্লাস (Hourglass) কাঠামোও বলে থাকে। এ ধরনের কাঠামো সংবাদ সূচনাটি হয় সারমর্ম সংবাদ সূচনা।

খ. 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' ফর্মুলা (The 'Wall Street Journal' formula)

এ ধরনের কাঠামোতে তিনটি স্তর থাকে। এখানে কোন কাহিনীর মাধ্যমে প্রতিবেদনটি শুরু করা হয়। এ স্তরগুলো হলো:

- এ ধরনের কাঠামোতে প্রতিবেদনটির শুরু হয় কোন ব্যক্তি, কোন দৃশ্য কিংবা পরিস্থিতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে। সাধারণত একটি লঘু সংবাদ সূচনার মাধ্যমে এ ধরনের পরিস্থিতির বর্ণনা তুলে ধরা হয়।
- ধীরে ধীরে কোন একক ব্যক্তির ঘটনা থেকে বৃহৎ পরিসরে ঘটনাটি তুলে ধরা হয়। এখানে একটি মর্মস্থল অনুচ্ছেদ (Nut paragraph) থাকে; যা ওই একক ব্যক্তির ঘটনার সাথে ইস্যুটির সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়।
- প্রতিবেদনের শেষাংশে প্রতিবেদক নিজস্ব কেস স্টাডিতে ফেরত আসেন এবং উপসংহার তুলে ধরেন।

চিত্রঃ ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ফর্মুলা

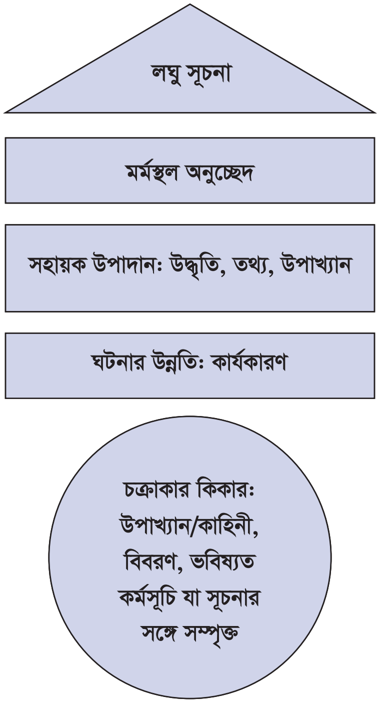

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ফর্মুলার উপযোগিতা সম্পর্কে Carole Rich বলেছেন, "*This is a very versatile formula that can be applied to many news and feature stories. It is useful for brightening bureaucratic stories. While you are reporting, seek out a person who is one of many exemplifying your point, or try to fi nd an anecdote that illustrates the main point of your story.*"[৩৫৪]

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ফর্মুলাকে অনেকে কাবাব ফর্মুলাও (The Kebob Formula) বলে থাকে। বিশেষ কোন ব্যক্তির কোনো একটি মন্তব্য বা কাহিনী বা ঘটনার মধ্য দিয়ে এ ধরনের প্রতিবেদন শুরু হয়। এরপর ওই নির্দিষ্ট ঘটনা বা কাহিনী সামগ্রিক দৃষ্টিকোণের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এর জন্য একটি অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়। তারপর ধীরে ধীরে কাহিনীর বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়। শেষে সেই বিশেষ ব্যক্তিকে আবার হাজির করা হয়। বিষয়টি শিক কাবাব তৈরির মতই যেখানে মাংস ও সবজিসমূহকে স্তরে স্তরে সাজানো হয়। আর প্রথমে যুক্ত করা হয় টকটকে লাল, টসটসে রসালো টমেটো (উদ্ধৃতি, বয়ান বা প্রথম অভিজ্ঞতার বিবরণী)।

[৩৫৪] Ibid, Carole Rich (2010), p. 186.

চিত্র: কাবাব ফর্মুলা

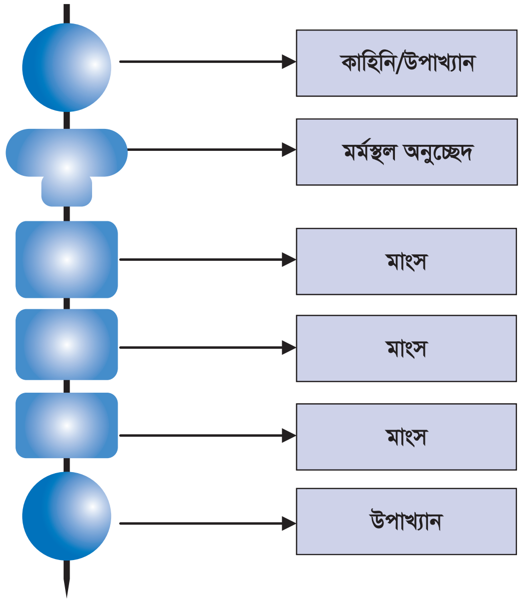

গ. ফোকাস স্ট্রাকচার (Focus Structure)

এ কাঠামোটির সাথে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ফর্মুলার মিল রয়েছে। কোন ইস্যু বা ঘটনা কিংবা বিষয়ের পুরো চিত্রটি তুলে না ধরে শুরুতে কোন একজন ব্যক্তি/ঘটনার কোন একটি দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়। ধীরে ধীরে সে ঘটনা বা দিক থেকে পুরো ইস্যুটির দিকে চোখ ফেরানো হয় এ ধরনের কাঠামোতে। যেমন ধরুন কোন প্রতিবেদক তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের বেতনের অনিয়ম নিয়ে সংবাদ লিখবেন।

এক্ষেত্রে তিনি কোন একজন শ্রমিকের জীবনে নিম্নমানের মজুরির প্রভাব দিয়ে সংবাদ লেখা শুরু করতে পারেন। তারপর ধীরে ধীরে সে নিম্নমানের মজুরির কারণ, বাকি শ্রমিকদের সম্পর্ক, মালিকদের লাভ, কম মজুরি দেয়ার কারণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন। এই কৌশল বড় প্রতিষ্ঠান ও জটিল ইস্যুর ক্ষেত্রে খুব সহজ ও সাবলীলভাবে তথ্য উপস্থাপনের জন্য এ ধরনের কৌশল কার্যকরী। এটি অনেকটা ফিচার লেখার কৌশলের মতও। আবার অনেকেই একে উল্টো পিরামিড কাঠামো এবং উপাখ্যানমূলক সংবাদ কাঠামোর মিশ্রণ। এ ধরনের সংবাদ কাঠামোর গঠন সম্পর্কে Fedler et all. বলেছেন, "*The focus story begins with a lead that focuses on a particular individual, place or situation. A nut graph tells how that individual depicts a more general problem and states the central point of the story. The body of the story develops the central point in detail. The kicker concludes the story and ties it back to the individual in the focus lead.*"[৩৫৫]

[৩৫৫] Ibid, Pressfred Fedler, John R. Bender, Lucinda Davenport & Michael W. Drager (2005), p. 208.

চিত্রঃ ফোকাস স্ট্রাকচার

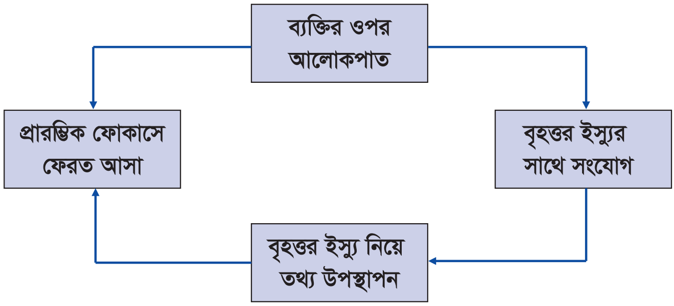

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ফর্মুলার মতো এখানে তিনটি স্তর গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো হলো:

১. ব্যক্তি থেকে বৃহত্তর ইস্যুতে সঞ্চারণ

এ ধরনের কাঠামোতে প্রথমে কোনো ব্যক্তি বা কোনো একটি ঘটনার ওপর আলোকপাত করা হয়। অর্থাৎ সূচনায় এমন একটি ইস্যু তুলে ধরা হয় যা আসলে সামগ্রিক ইস্যুর ইঙ্গিত বহন করে। তারপর ধীরে ধীরে চলে যান বৃহত্তর পরিসরে। এ ধরনের কাঠামো সম্পর্কে নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী বলেছেন, "*সুনির্দিষ্ট থেকে সাধারণ প্রতিবেদনের সঞ্চারণ ঘটতে পারে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কিংবা পঞ্চম অনুচ্ছেদে। তবে সূচনার পরপরই পরিবর্তনের সুরটি প্রতিবেদক যদি পাঠককে জানিয়ে দিতে পারেন তবে সেটিই হবে সবচেয়ে ভালো।*"[৩৫৬]

২. বৃহত্তর ইস্যু সম্পর্কে আলোকপাত

নির্দিষ্ট ইস্যুর সঙ্গে সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের সমন্বয় ঘটাতে হয় এ স্তরে। তবে এর আগে একটি ছোট অনুচ্ছেদে প্রতিবেদক সূচনায় ব্যবহৃত ইস্যুটির সঙ্গে সামগ্রিক বা বৃহত্তর ইস্যুর সমন্বয় ঘটাতে পারেন। উপাখ্যানমূলক সংবাদ কাঠামোতে একে মর্মস্থল অনুচ্ছেদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই বৃহত্তর ইস্যুর বর্ণনা উপস্থাপনের সময় পাঠকের আকর্ষণ ধরে রাখার বিষয়টির দিকে প্রতিবেদককে খেয়াল রাখতে হয়। প্রতিবেদকের লিখন দক্ষতার ওপরই এটি নির্ভর করে। নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী বলেছেন, "*আকর্ষণ ধরে রাখার একটি সুলভ উপায় হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তি বা বিষয়ের দিকে বার বার ফিরে যাওয়া, ঘটনার বা দৃশ্যের বর্ণিল বর্ণনা হাজির করা পাঠকের সামনে। ... প্রতিবেদক এ ধরনের কাঠামো ব্যবহার করলে ঘটনা নিজে আর বলবেন না, তার ভূমিকা তখন কথকের নয়, তিনি শিল্পী-ছবি আঁকবেন, পাঠককে ঘটনাটি যেন হাত ধরে ঘুরে ঘুরে দেখাবেন তিনি।*"[৩৫৭]

৩. শক্তিশালী উপসংহার

এ ধরনের সংবাদ কাঠামোতে রচিত প্রতিবেদনের বড় একটি বৈশিষ্ট্য হলো একটি

---

[৩৫৬] নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি), ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৬, পৃ. ১৩৭।
[৩৫৭] প্রাগুক্ত।

শক্তিশালী উপসংহার। উল্টো পিরামিড কাঠামোতে অনুচ্ছেদগুলো তথ্যের গুরুত্বের ক্রমানুসারে নেমে আসে। ফলে উল্টো পিরামিড কাঠামো সাধারণত উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করতে দেখা যায়। কিন্তু ফোকাস স্ট্রাকচার কাঠামোতে শেষের অনুচ্ছেদে প্রতিবেদক শুরুর ইস্যুতেই ফিরে যান। শুরুর ব্যক্তি বা ইস্যুর পরিণতি বা ফলাফল এখানে তুলে ধরা হয়।

ঘ. হাই ফাইভ (High Fives)

মার্কিন লেখক Carole Rich এই কাঠামোটির প্রণেতা। তাঁর মতে, এ ধরনের কাঠামোর প্রতিবেদনের পাঁচটি স্তর থাকে। এসব স্তরগুলোতে পাঁচটি আলাদা আলাদা দিক তুলে ধরা হয়। তবে একেকটি স্তরের সাথে আরেকটি স্তরের সংযোগ রক্ষা করতে হয়। এই স্তরগুলো হলো:

- সংবাদ (কি ঘটেছে বা কি ঘটতে যাচ্ছে?)।
- প্রেক্ষিত (পটভূমি তুলে ধরা হয়)।
- পরিধি (এটি কি একটি ঘটনা, নাকি স্থানীয় কোন বিষয়, নাকি জাতীয় কোন বিষয় তা তুলে ধরতে হয়।
- প্রান্তসীমা (ঘটনা/বিষয়ের মুখ্য চরিত্র এখানে তুলে ধরতে হয়)।
- প্রভাব (কেন পাঠকের জন্য এ ঘটনা/বিষয় গুরুত্বপূর্ণ?)।

ঙ. পিরামিড কাঠামো (Pyramid Structure)

একে প্রলম্বিত আকর্ষক/কৌতহলোদ্দীপক প্রতিবেদন (Suspended Interest Stories) কাঠামোও বলা হয়। এ ধরনের কাঠামোতে একটি সারমর্ম সংবাদ সূচনার মাধ্যমে শুরু হয়। পাঠককে সংবাদের সূচনায় ঘটনার মূল দিকটি সম্পর্কে পুরোপুরি আলোকপাত করা হয় না তবে একটি ইঙ্গিত দেয়া হয়; যাতে পাঠকের মনে প্রতিবেদনটি সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি হয়। এ ধরনের প্রতিবেদনে নাটকীয়তা থাকে। ধীরে ধীরে পাঠকের সামনে ঘটনার মূল আকর্ষণীয় দিকটি উন্মোচন করা হয়। এ ধরনের কাঠামোর প্রতিবেদনে শেষ অনুচ্ছেদে এসে পাঠক অনুসন্ধানের ফলাফলটি জানতে পারেন।

চিত্র: পিরামিড কাঠামো

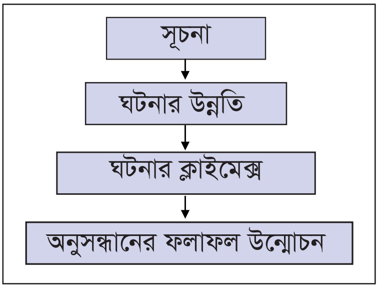

খসড়া ও পুনঃচিন্তা

সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত থেকে যাচাই-বাছাই শেষে তথ্য সাজিয়ে নেয়ার পর সেসব তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদক প্রতিবেদনের স্বরভঙ্গি ও কৌশল নির্ধারণ করে তার প্রতিবেদনের প্রথম খসড়াটি লিখবেন। আসলে দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন যেহেতু স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে রচিত হয় সে কারণে লেখাটি চূড়ান্ত হওয়ার আগে বেশ কয়েকটি খসড়া তৈরি করা

উচিত। অনুসন্ধানী প্রতিবেদকরা জানেন, যে কোনো স্পর্শকাতর বিষয়ে বিশেষ করে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দুর্নীতি সংক্রান্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের চূড়ান্ত অনুমতি দেয়ার আগে সম্পাদক সবদিক বিবেচনা করে নিশ্চিত হতে চান। সেজন্য লেখাটির চূড়ান্ত অনুমতি মেলার আগে প্রতিবেদককে বেশ কয়েকটি খসড়া তৈরি করতে হয়। সম্পাদক প্রতিটি খসড়া খুটিয়ে খুটিয়ে পড়েন এবং বারবার পরীক্ষণ করেন। সম্পাদকের দৃষ্টিতে উদ্রেক হওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হয় প্রতিবেদককে; এ কারণে তাকে তথ্যগুলো যাচাই করতে হয়। তবে অনেকে প্রথম ড্রাফট বা খসড়ার ভুল ব্যাখ্যা করেন। মনে রাখতে হবে, এটি প্রতিবেদকের পূর্ণাঙ্গ সংবাদ কাহিনী নয়; বরং এটি একটি স্কেচমাত্র, যার মাধ্যমে প্রতিবেদক বুঝবেন তার প্রতিবেদনটি কেমন দাঁড়াচ্ছে এবং আর কোনো ধরনের তথ্য-উপাত্ত তার প্রয়োজন কিনা। এ পর্যায়ে প্রতিবেদকের ধামাক্কা সংবাদ সূচনা কিংবা আকর্ষণীয় বা স্মরণীয় উপসংহার ও সাবলীল ভাষার ব্যবহার নিয়ে চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই। কারণ এ পর্যায়ে প্রতিবেদক লিখছেন, সম্পাদনা করছেন না। তবে এ পর্যায়ে কোনো তথ্য নিয়ে কোনো ধরনের সন্দেহের উদ্রেক হলে তা নিয়ে হেলাফেলা করার কোন সুযোগ নেই। প্রতিবেদককে সঙ্গে সঙ্গে মূল নোট ও নথিপত্রগুলো আবার ঘেঁটে দেখতে হবে। প্রয়োজনে শেষ মুহূর্তে সূত্র বা উৎসের সঙ্গে কথা বলতে হবে; আরও একবার সূত্র বা উৎসের দেয়া তথ্য এবং নথিপত্র সম্পর্কে তার নিশ্চয়তা আদায় করে নিতে হবে। অর্থাৎ যে কোন মূল্যে একশভাগ নিশ্চিত হতে হবে। প্রয়োজনে আরো অনুসন্ধান করতে হবে। কিন্তু কোনভাবেই কোন সন্দেহ বা প্রশ্নবিদ্ধ প্রতিবেদন প্রকাশ করা যাবে না। Leonard M. Kantumoya বলেছেন, "*If things do not quite add up, you may be asked to dig a little more. Or, where it is clear that you have failed to make a case, the story will be killed.*"[৩৫৮]

লেখা চূড়ান্ত করার আগে প্রতিবেদনে কোন বিরক্তিকর অংশ আছে কীনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে সংযোগ স্থানগুলোকে ভালভাবে ঝালাই করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদক লেখকের অবস্থান থেকে নয়, তাকে পাঠকের অবস্থান বা দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিবেদনটিকে বিবেচনা করতে হবে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত ঘটনা ও তথ্যের পরম্পরা ঠিক আছে কীনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। পরম্পরা না থাকলে পাঠক/দর্শক খেই হারিয়ে ফেলতে পারেন। তবে প্রথম খসড়াটি তৈরি করার পর পরবর্তী খসড়াগুলোতে যে পুরোপুরি কাঠামো বদলে ফেলতে হয় এমন ধারণা ঠিক নয়। এমনটা করতেও হয় না। শুধু যেখানে যেখানে সমস্যা আছে সেগুলো চিহ্নিত করতে হয়, সে সমস্যাসঙ্কুল জায়গাগুলো বাদ দিতে হয় কিংবা পরিমার্জন করতে হয়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে একাধিকবার খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করার অর্থ হলো প্রতিবেদনটি যাতে নিখুঁত ও নির্ভুল হয় সে চেষ্টা করা। কারণ একটি ভাল প্রতিবেদন একটি ট্রেনের মতো। এটি আপনা আপনিই তার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। বিষয়টি Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists-তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে, "*A good story is like a train. It moves powerfully toward its destination. It may slow down to take on more passengers, or to allow you to focus on a particularly great piece of scenery, but it must not stop. So when you write and edit, focus on the rhythm of the story. The viewer must feel carried from one passage to the next. If*

[৩৫৮] Ibid, Leonard M. Kantumoya (2004), p. 74.

this isn't happening, the story isn't working."[৩৫৯]

ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে ও আমিনুল ইসলাম সংবাদ পুনঃলিখন ও শাণিতকরণের ক্ষেত্রে একটি কাঠামো ও একটি চেকলিস্টের কথা বলেছেন,[৩৬০]

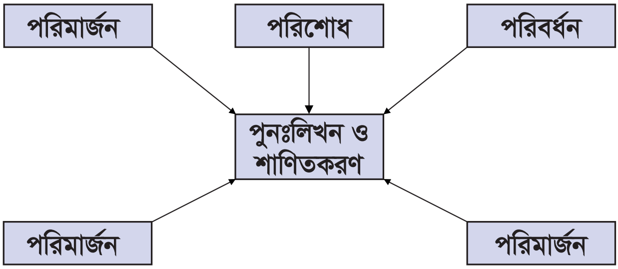

লেখা শেষ করার পর চেকলিস্ট হলো:

- প্রথম অনুচ্ছেদে পুরো সংবাদ কাহিনীর মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে কি না এবং হলে তা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে কি না তা যাচাই করা। এরপর পুরো সংবাদ কাহিনিটি উচ্চস্বরে পড়তে হবে। খেয়াল করতে হবে, লেখাটি নিজ কানে শুনতে ভালো লাগছে কি না।
- উদ্দিষ্ট বক্তব্য সংবাদ কাহিনীতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কি?
- সংবাদ কাহিনীটি কি কেবল দুই-একটি তথ্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে?
- সংবাদ কাহিনীটি কি পাঠকের জানার আগ্রহকে উস্‌কে দিচ্ছে?
- সংবাদ কাহিনীটি কি মাত্র একটি বা দুটি কর্তৃবাচ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে কি?
- একটি ফ্যাক্ট, একটি নতুন ধারণা, সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা পাঠকের সামনে কোনো দৃশ্যপট হাজির করছে কি?
- খুব কমসংখ্যক অথচ জোরালোভাবে উদ্ধৃতির ব্যবহার হয়েছে কি? উদ্ধৃতিটি কী কারণে ব্যবহৃত হয়েছে- সংবাদ কাহিনীটিকে ভাঙার জন্য, সংবাদ কাহিনীর গতিময়তা নিশ্চিত করা নাকি শৈলী বজায় রাখার খাতিরে?
- অপ্রাসঙ্গিক বা বোধগম্য নয় এমন কোনো বিষয় সংবাদকাহিনীতে যুক্ত হয়েছে কি?
- গড়পড়তা পাঠক বুঝতে পারবে না এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কি?
- বাক্যগুলো কি খুব দীর্ঘ হয়ে গেছে?
- প্রাসঙ্গিক তথ্য অথচ কারো প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা বা অনুরাগ প্রকাশিত হয় এমন কোনো বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে কি?
- এমন কোনো শব্দ বা বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে কি, যা প্রশ্নের উত্তর দেয়ার বদলে বিতর্ক উস্‌কে দেয়?
- কোনো শব্দ ফেলে দিলে সংবাদ কাহিনীটির আদৌ কোনো অঙ্গহানি হবে কি?

---

[৩৫৯] Ibid, Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), p. 66.
[৩৬০] প্রাগুক্ত, ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে এবং আমিনুল ইসলাম (২০১৩), পৃ- ১৪৯-১৫১।

সিরিজ প্রতিবেদন লেখা

দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করতে গিয়ে একজন প্রতিবেদক দিন/সপ্তাহ/মাসব্যাপী পরিশ্রম করে অনেক তথ্য বের করে আনতে পারেন। অনেক সময় তার ধারণার বা কল্পনার বাইরেও তথ্য সংগ্রহ হতে পারে। কিংবা ঘটনাটি অনুসন্ধান করার পর তিনি অনেকগুলো দিক বা আঙ্গিক (এঙ্গেল) খুঁজে পেতে পারেন। তখন প্রতিবেদকের পক্ষে এত বেশি আঙ্গিক ও এত বেশি তথ্য একটিমাত্র প্রতিবেদনে তুলে ধরা সম্ভব হয় না। এতে প্রতিবেদনটি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বড় হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া এতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক গুরুত্বহীনভাবে উপস্থাপন হতে পারে যার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি নাও পড়তে পারে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিবেদক সিরিজ প্রতিবেদন তৈরির প্রস্তুতি নিতে পারে। একটি একক প্রতিবেদন লেখার জন্য প্রতিবেদক যেভাবে প্রস্তুতি নিবেন সেভাবেই সিরিজ প্রতিবেদন তৈরির জন্যও প্রস্তুতি নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, সিরিজের প্রত্যেকটি প্রতিবেদনে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক থাকবে; কিন্তু একটির সাথে আরেকটির ধারাবাহিকতা থাকতে হবে। অনেকটা ধারাবাহিক নাটকের মতো। সবগুলো প্রতিবেদন লেখা শেষ হওয়ার পরই প্রকাশের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। অনেক সময় প্রতিবেদকরা সিরিজ প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে সেটি প্রকাশ করেন, পরের দিন আরেকটি প্রতিবেদন লিখেন। স্পর্শকাতর অনুসন্ধানী বিষয়ে এমনটা করা উচিত নয়। কারণ এক্ষেত্রে তথ্যের পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আবার প্রথম প্রতিবেদনটির উপর যতটা গুরুত্ব দেয়া হয় পরেরগুলোর ওপর ততটা দেয়া হয় না। কারণ প্রথমটি প্রতিবেদক অনেক সময় নিয়ে লিখেন; কিন্তু পরেরগুলোর ক্ষেত্রে ডেডলাইনের তাড়া থাকায় অনেক সময় যেনতেনভাবে শেষ করতে দেখা যায়।

টেলিভিশনের জন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখা

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য সম্প্রচার মাধ্যম বিশেষ করে টেলিভিশন ও রেডিও কার্যকরী নয়- এমন একটি ধারণা অনেকেই পোষণ করে থাকেন। সময়ের স্বল্পতা এবং স্থায়ীত্বের অভাবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচারের জন্য অনেকেই মনে করেন সম্প্রচার মাধ্যম কিংবা রেডিও-টিভি উপযুক্ত নয়। The Portland Oregonian-Gi Don Holm বলেছেন, "*I don't think TV or radio can complete with these stories for depth, color, drama, and background. It would take an hour on TV to tell this particular story--and who would spend the memory to sponsor it? A news story is dead for TV after few hours of repetition. In a newspaper the story is still good as long after the event as people are still thinking about it.*"[৩৬১] এমন সমালোচনার বিপরীত বক্তব্যও আছে। ভিজ্যুয়াল দৃশ্য বা ছবির মাধ্যমে তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের জন্য টেলিভিশনে অনেক কার্যকরভাবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তুলে ধরা যায় বলে অনেকে মনে করেন। টেলিভিশন সংবাদের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এর ভিজ্যুয়াল বা ছবি। লিখিত বা মুদ্রিত সংবাদের চেয়ে ছবি সম্বলিত বক্তব্য অবশ্যই মানুষকে বেশি প্রভাবিত করে। তথ্যের চলমান চিত্র প্রদর্শিত হওয়ার কারণে অনেকের কাছে টেলিভিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বেশি।

সুবিধা বা অসুবিধা যাই থাকুক না কেন একটি বিষয় স্বতসিদ্ধ যে, টিভি অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জটিল কাজ হলো স্ক্রিপ্ট বা প্রতিবেদনটি লেখা। কারণ

[৩৬১] Ibid, Neale Copple (1964), p. 80.

পত্রিকার মতোই একজন টিভি অনুসন্ধানী প্রতিবেদক প্রচুর তথ্য, নথিপত্র ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি তিনি ভিজ্যুয়াল বা ভিডিও চিত্রও সংগ্রহ করেন। কিন্তু যেখানে একজন সংবাদপত্র প্রতিবেদক একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার জন্য ৫০০ থেকে ১৫০০ শব্দ পান; সেখানে একজন টিভি সাংবাদিক পান বড়জোর ১৫০ থেকে ২০০ শব্দ। সেজন্য সংবাদপত্রের চেয়ে টিভি সংবাদ স্ক্রিপ্ট ভিন্ন ও আলাদা হয়। আবার সময়ের কারণে টিভি সংবাদ স্ক্রিপ্ট যেমন সংক্ষিপ্ত করতে হয় তেমনি সকলেই যাতে বুঝতে পারে সেজন্য সংবাদটিকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ভাষায় পরিবেশন করতে হয়। আবার টেলিভিশন সংবাদের স্ক্রিপ্টটি তিনি লেখেন চোখে দেখে পড়ার জন্য নয়; বরং দর্শকের কানে শোনার জন্য। সেজন্য Andrew Boyd বলেছেন, "*Writing for broadcast can mean tossing away literary conventions, including the rules of grammar, if the words are to make sense to the ear, rather than the eye. In print, shades of meaning are conveyed with choice adjectives and skilful prose, but the spoken word makes use of a medium, which is altogether more subtle and powerful – the human voice.*"[৩৬২]

মুদ্রণ এবং সম্প্রচার সাংবাদিকতার মৌলিক পার্থক্য হলো মুদ্রণ মাধ্যম হলো লেখার মাধ্যম যেখানে কোনো কিছু পাঠক দেখে পড়তে পারেন। এখানে ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হয়। অন্যদিকে সম্প্রচার মাধ্যম বা রেডিও-টেলিভিশন শোনা এবং দেখার মাধ্যম। এখানে কানে শুনতে হয় ও চোখে দেখতে হয়। মুদ্রণ মাধ্যমে পাঠকরা তাদের রুচি অনুযায়ী পছন্দসই খবর বাছাই করতে পারেন। কিন্তু সম্প্রচার মাধ্যমে সে সুযোগ থাকে না। তাছাড়া মুদ্রণ সাংবাদিকতার চেয়ে সম্প্রচার সাংবাদিকতা অনেক বেশি গতিশীল।

টেলিভিশন রিপোর্টিং এ সময় স্বল্পতা ভালো প্রতিবেদন তৈরির পথে বড় অন্তরায়। সেক্ষেত্রে পুরো বিষয়টিকে কয়েকটি পর্বে ধারাবাহিকভাবে প্রচার করা যায়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন অনুসন্ধানের ফলাফল বা সিদ্ধান্ত দিয়ে সূচনা তৈরি করাই শ্রেয়। অনুসন্ধানের ফলাফলে কি বের হয়ে এসেছে, কি ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে একে একে তা বলা যেতে পারে । কিন্তু এটিই একমাত্র সূচনার ধরন নয়। কখনো কখনো কাহিনীর আকারে কিংবা যেখান থেকে এই অনুসন্ধানের শুরু তা দিয়েও সূচনা লেখা যেতে পারে। নাটকীয়তা, দ্রুত মূল বিষয়ে উপনীত হতে পারা, সংক্ষেপে সামগ্রিক বিষয়টিকে তুলে ধরা, যথাযথ প্রমাণ (ডকুমেন্ট, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি) হাজির করা - এই সব কিছু টেলিভিশন রিপোর্টিং এর লিডকে আকর্ষণীয় করে তুলে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত করা বাঞ্ছনীয়। লেখার সময় সূচনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি শেষও তৈরি করতে হবে। লেখা শেষ হবার পর একাধিক বিষয় পুনরায় লক্ষ্য করা জরুরী। এর মধ্যে অন্যতম হলো পুরো রিপোর্টের বিরক্তিকর অংশগুলো চিহ্নিত করা এবং বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে সংযোগ (Transition) স্থানগুলো ভালোভাবে ঝালাই করা। এ ক্ষেত্রে রিপোর্টটি দর্শকের অবস্থান থেকে দেখবার চেষ্টা করতে হবে। রিপোর্টটি বিরক্তিকর হয়ে উঠা এড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট ঘটনার বর্ণনা যুক্ত করা যেতে পারে। টেলিভিশন রিপোর্টে আমরা শেষটি করি পিটিসি দিয়ে। পিটিসি অর্থাৎ পিস টু দি ক্যামেরা। পিটিসি তে রিপোর্টার সেই বিষয়েরই অবতারণা করবেন যা আগে বলা হয়নি। অথবা রিপোর্টের কোনো একটি বিশেষ

[৩৬২] Andrew Boyd (2001), Broadcast Journalism: Techniques of Radio & Television News, 5th edition, Focal Press, London, p. 56.

অ্যাঙ্গেল যা রিপোর্টটির কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত করবে। রিপোর্টার অবশ্যই অন্য সব রিপোর্টের মতই এক্ষেত্রেও কোনো মতামত দিবেন না। ঘটনা যে ভাবে ঘটছে সেই বিষয়গুলোকেই তুলে ধরবেন।

সম্প্রচার সংবাদ লেখার জন্য অনেকেই পাঁচ তারকা কৌশল অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। এই পাঁচ তারকা হলো- যথার্থতা, সংক্ষিপ্ততা, সরলতা বা সহজবোধ্যতা, সুস্পষ্টতা এবং সততা বা একাগ্রতা। এগুলোর প্রায় সবগুলোই এখন মুদ্রণ মাধ্যমের জন্যও প্রযোজ্য। মুদ্রণ মাধ্যমের লিখন শৈলীতে এগুলো অনেকটাই আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া যথার্থতা ও সততার বিষয়টি নৈতিকতার অধ্যায়ে আরো বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

তবে বর্তমানে টেলিভিশনের লেখার জন্য দু'টি মৌলিক নিয়ম বা রুল অনুসরণ করতেই হয়:

ক. ছবির কথা ভাবা (Think visually)
খ. গল্প বলা (To tell a story)

ছবির কথা ভাবা

ছবি ও শব্দই টেলিভিশনের প্রাণ। ছবি ও শব্দের কিংবা দৃশ্যের বাইরে টেলিভিশনে কিছু বলার সুযোগ নেই। ছবি ও শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সহজ এবং সংক্ষিপ্তভাবে টেলিভিশনে প্রতিবেদন তুলে ধরতে হয়। তাই টিভি সংবাদের স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য প্রতিবেদককে শুরুতেই ছবির কথা ভাবতে হবে। প্রতিবেদক যে ছবি বা ভিজ্যুয়াল দিয়ে শুরু করতে চান তার কথা মাথায় রেখে স্ক্রিপ্ট শুরু করতে হবে। ছবির কথা ভাবতে গিয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হয়:

১. লেখার আগে ছবি/ভিজ্যুয়াল ভাল করে দেখে নিন

একজন পত্রিকার সাংবাদিকের মতোই একজন টিভি অনুসন্ধানী সাংবাদিকও তার তথ্যউপাত্তগুলো সংগঠিত করবেন, মাস্টার ফাইল তৈরি করবেন। কিন্তু একজন টিভি সাংবাদিক এর পরপরই তার লেখা শুরু করে দিতে পারেন না। এক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই লেখার আগে ছবি বা ভিজ্যুয়ালগুলো দেখে নিতে হয় এবং শব্দগুলো শুনে নিতে হয়। অর্থাৎ সংগৃহীত তথ্যউপাত্তের কতটুকু ছবির মাধ্যমে উপস্থাপন করা যাবে, কতটুকু ধারা বিবরণীতে থাকবে, কতটুকু সাক্ষাৎকার বা সাউন্ডবাইটের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে এবং ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা ও সজীবতা তুলে ধরতে কতটুকু অ্যামবিয়েন্ট বা ন্যাচারাল সাউন্ড তুলে ধরা হবে- এসব বিষয়ে লেখার শুরুতেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২. যতটুকু ভিজ্যুয়াল ততটুকুই উপস্থাপন

টেলিভিশন প্রতিবেদনে ভিজ্যুয়াল যেমন সবল দিক তেমনি এটি দুর্বল দিকও বটে। কারণ টিভি প্রতিবেদনে যতটুকু ছবি বা ভিজ্যুয়াল প্রতিবেদকের কাছে থাকবে ততটুকুই তিনি তুলে ধরতে পারবেন। তবে এখানে মনে রাখতে হবে, ভিজ্যুয়াল বলতে শুধু ভিডিও চিত্রকে বুঝায় না, বরং ভিডিও চিত্রের পাশাপাশি সাক্ষাৎকার বা সাউন্ডবাইট, ভক্সপপ, গ্রাফিক্সসহ টেলিভিশনে সম্প্রচারযোগ্য যেকোনো কিছুকে ভিজ্যুয়াল হিসেবে বোঝানো হয়।

৩. যুতসই ছবি ও শব্দ বা ভিজ্যুয়াল নির্বাচন

প্রতিবেদক যে সংবাদ কাহিনী দর্শকের কাছে বলতে চান সেজন্য উপযুক্ত ছবি ও শব্দগুলো বাছাই করে নিতে হয়। প্রত্যেকটি আঙ্গিক বা প্রেক্ষিত প্রমাণের জন্য উপযুক্ত সাউন্ডবাইট, উপযুক্ত ছবি নির্বাচন করে সেগুলোকে ধারাবাহিভাবে সাজিয়ে নিয়েই সে অনুযায়ী স্ক্রিপ্ট লিখতে হয়।

৪. ছবি ও শব্দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা যাবে না

একটি ভালো সংবাদ কাহিনী কখনই তার ছবির সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় না। বরং প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। যেসব ছবি ও শব্দ খুবই শক্তিশালী এবং অর্থবহ সেখানে প্রতিবেদকের ধারা বিবরণী দেয়ার দরকার নেই। টিভি সাংবাদিকতার ভাষায় এ ধরনের ছবি ও শব্দকে ন্যাচারাল সাউন্ড ও পিকচার বলে থাকে। প্রয়োজন সাপেক্ষে একজন প্রতিবেদককে এ ধরনের ছবি ও শব্দ উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করার বিষয়টি স্ক্রিপ্ট লেখার সময়ই ভাবতে হবে। টিভি সংবাদের স্ক্রিপ্টে ছবি ও শব্দের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে -এর এ কথাটি স্মরণ করা যায়, "*For television, the saying 'a picture is worth a thousand words' holds true and the images presented by the cameras will tell the story more effectively than any description. Where there are no accompanying illustrations, the nuances of inflection in the newsreader's voice will paint a picture as colourful as the most purple of prose.*"[৩৬৩]

৫. ছবির হুবুহু বর্ণনা দেয়া যাবে না

টিভি সংবাদের স্ক্রিপ্টে কখনই একজন প্রতিবেদক ছবিতে যা দেখা যাচ্ছে হুবহু তার বর্ণনা তুলে ধরবেন না। ছবি ও শব্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ছবি ও শব্দকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে তিনি স্ক্রিপ্ট লিখবেন।

৬. সংখ্যাকে বর্ণনামূলকভাবে তুলে ধরা

গবেষণায় দেখা গেছে, দর্শক একটি বা দুটি সংখ্যার কথা পরপর মনে রাখতে পারে। এরপরই তালগোল পাকিয়ে ফেলে। সেজন্য সংখ্যা বা পরিসংখ্যানের ব্যাপক ব্যবহার টেলিভিশন সংবাদ স্ক্রিপ্টের জন্য খুবই খারাপ ফল বয়ে আনে। হুবহু সংখ্যা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না হলে মোটা দাগে সংখ্যা (রাউন্ড নাম্বার) ব্যবহার করা উচিত। টিভি সংবাদের সংখ্যা বা পরিসংখ্যান বেশি ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই তা গ্রাফিক্সের মাধ্যমে তুলে ধরা ভাল। টিভি স্ক্রিপ্টে সংখ্যা লিখলে তা কথা লেখা ভাল। যেমন, সংবাদপত্রের জন্য ৭৬,২১২ লেখা যায়; কিন্তু টিভি স্ক্রিপ্টে ৭৬ হাজার লেখা উচিত। ৳ কিংবা % এ ধরনের চিহ্নগুলো ব্যবহার না করে তা কথায় লিখতে হবে। যেমন, ১২% নয়, লিখতে হবে ১২ শতাংশ; ৳ ৭৫ টাকা নয়, লিখতে হবে ৭৫ টাকা।

৭. পরিভাষাকে সহজ করে লেখা

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে সরকারি নথিপত্র, ফাইল, হ্যান্ডআউট প্রতিবেদক সংগ্রহ করেন। এসব নথিপত্র ও হ্যান্ডআউটের ভাষা দুর্বোধ্য হয়। এখানে অনেক পরিভাষা থাকে। এজন্য সরকারি নথিপত্রের ভাষাকে কথোপকথনের ভাষায় রূপান্তরিত করে লিখতে হয়।

---

[৩৬৩] Ibid, p. 58.

গল্প বলা

টিভি সংবাদ লেখার প্রথম ও অন্যতম প্রধান শর্ত হলো এ মাধ্যমে লিখতে গেলে কানের জন্য বা শোনার জন্য লিখতে হয়। Broadcast News of Canada- এর স্টাইল বুকে বলা হয়েছে, "*For years, editors told reporters: Don't tell me about it, write it. Turn that around, and you have a good rule for the broadcast journalist: Don't just write it, TELL ME ABOUT IT.*"[৩৬৪]

যদিও টেলিভিশন দেখা ও শোনার মাধ্যম তা সত্ত্বেও টেলিভিশন সংবাদ কানে শোনার জন্য; চোখে দেখার জন্য নয়। শোনার জন্য লেখার অর্থ হলো তা তুলে ধরতে হবে গল্প বলার মতো করে। কারণ টিভি দেখার জন্য দর্শকদের সাক্ষরজ্ঞানের দরকার নেই। অর্থাৎ নিরক্ষর থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষিত সকলেই টিভি দেখতে পারেন। সে কারণে সকলের পক্ষে বোধগম্য এমন একটি সাধারণ ও সহজ ভাষায় প্রতিবেদককে সংবাদটি লিখতে হবে। কোনভাবেই প্রতিবেদক এখানে তার পাণ্ডিত্য জাহির করার চেষ্টা করবেন না। টিভি সংবাদ লেখার জন্য প্রতিবেদকের নন্দিত কথা শিল্পীর মতো করে গদ্য লেখার দরকার নেই; বরং নির্ভুল ভাষার মাধ্যমে একজন গল্পকারের মতো লিখতে পারলেই চলে। মোহাম্মদ সহিদ উল্যাহ্ বলেছেন, "একজন কথোপকথন-পটু স্বচ্ছন্দ মজলিশি গল্পকারই সম্প্রচার সংবাদ লেখনের উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব"।[৩৬৫] তিনি আরো বলেছেন, "চোখ নিজে পাঁচ-ছয় লাইনের একটি বাক্য নিমিষে পড়ে নিতে পারে। নিজে পড়ার জন্য এ ধরনের বাক্য ঠিক আছে-- কিন্তু শোনার জন্য তো পাঁচ-ছয় লাইনের বাক্য অচল। বেতার ও টেলিভিশনের খবর এই শোনা গেল অথবা নিদেনপক্ষে দেখা এবং শোনা গেলো; পরক্ষণে আবার ভোজবাজির মতো বিলীন হয়ে যায়। শ্রোতার স্মৃতির মণিকোঠায় দ্রুত আঁটকে ধরে রাখতে হবে, বুঝতে হবে, হজম করতে হবে এবং সঞ্চয় করে রাখতে হবে। এতসব দায়িত্ব নিয়ে সম্প্রচার সাংবাদিক কানে শ্রুতিমধুর লাগে এমন করে লিখবেন। ব্যর্থ হলে সম্প্রচার সাংবাদিকতা হবে না।"[৩৬৬]

সহজে লেখার জন্য গল্প বলার ধরন যে কতটা জরুরি তা বোঝা যায় Harris Watts-এর এ কথা থেকে, "*If you find it difficult to put your thoughts down on paper clearly and simply, use the trick of telling someone out loud what you want to say, Your brain will throw out most of the padding automatically. People talk more clearly than they write; so make your writing more like your talking and your viewers will understand you better.*"[৩৬৭] 'গল্প বলা' নিয়মটি অনুসরণ করতে হলে কিছু বিষয় একজন টিভি সাংবাদিককে খেয়াল রাখতে হয়:

১. সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা

সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরাকে ইংরেজিতে বলে 'KISS- Keep it simple and short'। শোনার জন্য লেখার সবচেয়ে উপযোগী উপায় হচ্ছে সহজভাবে লেখা। বর্তমানে সংবাদপত্রের জন্য লেখার ক্ষেত্রেও সহজভাবে লেখার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু টেলিভিশনে সহজভাবে

---

[৩৬৪] Ibid, p. 56.
[৩৬৫] মোহাম্মদ সহিদ উল্যাহ্ (২০০১), বেতার ও টেলিভিশন সাংবাদিকতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪৬।
[৩৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।
[৩৬৭] On Camera (1995), BBC.

লেখার গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ সংবাদপত্র পড়ার সময় পাঠকের রয়ে সয়ে বা একাধিকবার পড়ার সুযোগ আছে। কিন্তু রেডিও-টিভির ক্ষেত্রে একবার সংবাদ সম্প্রচার হয়ে গেলে তা আর দেখা ও শোনার উপায় নেই। ধরুন, কোনো প্রতিবেদক এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থ বুঝতে দর্শকের অভিধানের সাহায্য নিতে হবে। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের পাঠকের পক্ষে অভিধান দেখে সে অর্থটি বের করে সংবাদের পরবর্তী অংশে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু কোন টিভি দর্শকের পক্ষে এটি সম্ভব নয়। তিনি অভিধান দেখতে গেলে খবরের বাকি অংশটি আপনা আপনিই শেষ হয়ে যাবে। গবেষণায় দেখা গেছে, খুব শিক্ষিত সমাজের দর্শকরাও আয়েশী ভঙ্গিতে টিভি দেখেন। দর্শক প্রায়ই কোনো না কোনো কাজের ফাঁকে টিভি দেখেন। যেমন টিভি দেখার ফাঁকে কেউ সংবাদপত্রে চোখ বুলাতে পারেন কিংবা অন্য কোন দিকে মনযোগ দিতে পারেন। ধরুন, কোন গৃহিনী তার শিশু সন্তানকে খাওয়াতে খাওয়াতে টেলিভিশন দেখছেন। এ সময় জটিল ও দুর্বোধ্য ভাষা এবং শব্দের কোন প্রতিবেদন তার কর্ণবেদনাই সৃষ্টি করতে পারে; সৃষ্টি করতে পারে না কোন আবেদন। সেজন্য টিভি সংবাদ যদি খুব বেশি গুরুগম্ভীর ও কঠিন হয়ে যায় তাহলে দর্শক তা নাও বুঝতে পারেন। Ivor Yorke বলেছেন, "*Make your reports for the audience, not your boss or the critics. Be logical, Use clear, direct language that everyone can understand.*"[৩৬৮]

সহজে লেখার প্রথম উপায় হলো চিন্তার সহজবোধ্যতা। টেলিভিশনে একটি এঙ্গেল বা আঙ্গিক নিয়ে একেকটি প্রতিবেদন তৈরি করলে তা দর্শকের হৃদয়ঙ্গম করতে সহজ হয়। চিন্তার বা ধারণা সহজতার পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত ও বহুল প্রচলিত শব্দের ব্যবহার একান্তই জরুরি। যেমন, দীর্ঘ, হ্রাস পেয়েছে ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে বড়, কমেছে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করলে প্রতিবেদন অনেক বেশি সহজ ও সাবলীল হয়। প্রতিবেদককে অবশ্যই সঠিক, স্পষ্ট, সাদামাটা, সরাসরি ও পক্ষপাতহীনভাবে তার প্রতিবেদনটি তুলে ধরতে হবে। সব ধরনের ভাবগাম্ভীর্য, পরিভাষা থেকে টিভি স্ক্রিপ্টকে দূরে রাখুন। BBC BUSH HOUSE NEWSROOM GUIDE-এর নির্দেশনাটি এ রকম, "*Our job is to dejargonize, to declichefy, to make everything clear, simple and concise.*"[৩৬৯] টিভি সংবাদ প্রতিবেদন লিখতে গেলে প্রতিবেদককে আগে তার ব্যবহৃত শব্দগুলো, বাক্যগুলো নিজেকেই বুঝতে হবে। এই বোঝার ক্ষেত্রে কোন ফাঁক থাকলে সাংবাদিক কোনভাবেই সহজভাবে তার স্ক্রিপ্ট লিখতে পারবেন না। একটি বাক্য বেশ সহজ হতে পারে কিন্তু বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহ অথবা সেই বাক্যের বিন্যাস সহজ নাও হতে পারে।

একজন টিভি অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে একথা মাথায় রাখতে হবে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে যে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছেন সে পরিশ্রমের সাফল্য আসবে তখনই যখন দর্শক তার প্রতিবেদনটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। টেলিভিশনের সংবাদ যেহেতু দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ নেই সে কারণে স্পষ্ট, সহজ ও সাবলীলভাবে না বললে কিংবা প্রতিবেদনটি উপস্থাপিত না হলে সেখানে দর্শক সে প্রতিবেদনটি সারা জীবনের জন্য দেখার সুযোগ হারালেন। মোহাম্মদ সহিদউল্যাহ্ বলেছেন, "*সহজবোধ্যতা তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। বিষয়গুলো হচ্ছে; ১. সহজ শব্দ ২. সরল বাক্য এবং ৩. সহজ গঠন বা বিন্যাস। সম্প্রচার*

[৩৬৮] Ivor Young (1990), Basic TV Reporting, Focal Press, London, p. 46.
[৩৬৯] Ibid, Andrew Boyd (2001), p. 62.

প্রতিবেদন বা সংবাদ বিবরণী লেখার মানে হলো, কারো কানে শোনা অথবা তার সঙ্গে চোখে দেখা বোঝা। এই শুনে বা দেখে বোঝার ব্যাপারটি নিশ্চিত করবে সহজ-সরল শব্দ, সাদামাটা বাক্য এবং সংবাদ বিন্যাস। এই তিন সহযোগে লিখিত সংবাদ উপস্থাপনার জন্য যেমন সুখপাঠ্য, তেমনি দর্শক-শ্রোতার জন্যও সুখকর।"[৩৭০] ছোট ছোট সাধারণ বাক্যে টিভি সংবাদ লিখতে হয়। এ বাক্যগুলোতে বক্তব্যধর্মী বাক্য রাখতে হয়। এক্ষেত্রে কারো বক্তব্য বড় বা দীর্ঘ হলে একাধিক বাক্যে তা উপস্থাপন করা যেতে পারে।

সময়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে টিভি সাংবাদিককে সবসময়ই যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত বা ছোট স্ক্রিপ্ট লিখতে হয়। এজন্য সম্প্রচার সংবাদকে 'শিরোনাম সংবাদ'ও বলা হয়। এখানে প্রতিবেদককে নির্দয়ের মতো নিজের তথ্যের ওপর ছুরি চালাতে হয়; কারণ সম্প্রচার সাংবাদিক অবশ্যই জানেন তার কাছে সময়ের কি মূল্য। মোহাম্মদ সহিদউল্যাহ্ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, "*সম্প্রচার সাংবাদিকতার চির সমুপস্থিত প্রভু হচ্ছে সময়। সুতরাং দ্রুত অগ্রসরমান শেষ মুহূর্তকে সারাক্ষণ সজাগ করে চলেছে ঘড়ি; ঘড়ি নির্ধারণ করছে শব্দ ও সংবাদ লেখনি। এ ধরনের অগ্রসরমান সময়ের সদ্ব্যবহারের কারণে সম্প্রচার সাংবাদিকতা অযৌক্তিক আর বাড়তি শব্দাবলির কোনো স্থান নেই।*"[৩৭১]

২. কথোপকথনের ঢঙে লেখা

ইংরেজিতে একে বলা হয়, 'Keep It Conversational'। অর্থাৎ কথা বলার ঢঙে প্রতিবেদন দর্শকের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। কম সময়ের মধ্যে জটিল সব বিষয়ের দিকে খেয়াল রেখে কথা বলার ঢঙে সংবাদের স্ক্রিপ্ট লেখাই টিভি সাংবাদিকের অন্যতম মূখ্য কাজ। টিভি সংবাদ লিখিত কোন কাব্য বা মহাকাব্য নয়; কিংবা নয় কোন অনবদ্য গদ্য কবিতা; বরং এটি আসলে মুখের বচন। এখানে টিভি প্রতিবেদকের মাইকেল মধূসুদন কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের ভাষা প্রয়োগের দরকার হয় না। কারণ গুরুগম্ভীর কোন স্ক্রিপ্ট দর্শকের মন জয় করতে পারে না। সংক্ষিপ্ত, সহজ ও প্রচলিত শব্দ ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে Winston Churchill বলেছেন, "*Short words are best, and old words, when short, are best of all.*"[৩৭২]

টেলিভিশন সাংবাদিকদের স্ক্রিপ্ট লেখার ক্ষেত্রে খুব সাধারণ কিছু ভুলের কথা Ivor Yorke তুলে ধরেছেন এভাবে, "*Something strange comes over many otherwise good journalists when they write for television. Clear thoughts become cluttered and confused, simple sentences convoluted. Direct language translates into `officials'.*"[৩৭৩]

মোহাম্মদ সহিদউল্যাহ্ বলেছেন, "*কথোপকথন মানে সহজ ভঙ্গিতে বলা যেখানে অতিরিক্ত, ভারী, অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে বিষয়গুলোকে জটিল করে ফেলা নয়; সাদামাটাভাবে বলা যায়। কথোপকথনের আদলে সংবাদ লিখতে হলে সম্প্রচার সাংবাদিককে কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে। যেমন -- উল্টো পিরামিড পদ্ধতির লিখন পরিহার করা; বাক্য যতটা সম্ভব ছোট রাখা; উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়াপদের মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপন; সব ধরনের সর্বনাম, বিশেষণ*

[৩৭০] প্রাগুক্ত, মোহাম্মদ সহিদ উল্যাহ্ (২০০১), পৃ- ৪৮।

[৩৭১] প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৭।

[৩৭২] Irving E. Fang (1980), Television News, Radio News, 3rd edition, Rada Press, Inc., p. 25.

[৩৭৩] Ibid, Ivor Young (1990), p. 48

ব্যবহারে সাবধানতা; এবং একটি বাক্যে শুধু একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রাখা।”[৩৭৪]

কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখার জন্য একটি সাধারণ নিয়ম হলো ‘প্রতিবেদককে লেখার আগে তিনি যা লিখতে চান তা জোরে জোরে পড়তে হয়’। সাধারণত মুদ্রণ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বলা হয়, ‘লেখার আগে ভাবুন’। টিভি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এটি হয়ে যায়, ‘লেখার আগে জোরে জোরে পড়ুন’। এই জোরে জোরে পড়ার সময় যতটা প্রাকৃতিক ও প্রচলিত মনে হবে ততই কার্যকর স্ক্রিপ্ট লেখা সম্ভব হবে। শোনা শব্দ থেকে বার্তার অর্থ বোঝা গেলেই প্রতিবেদক সফল। Ivor Yorke বলেছেন, “*The less natural it sounds, the more likely it is to be wrong.*”[৩৭৫]

৩. ধারাবাহিকতা রক্ষা করা

টিভি রিপোর্টিংয়ে দর্শকদের বোঝার সুবিধার্থে ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা ভাল। এক্ষেত্রে ‘বর্তমান-অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত’ এ ধারাক্রম অনুসরণ করাই উত্তম। অর্থাৎ একটি প্যাকেজ সংবাদের সূচনা বা লিঙ্কে বর্তমান বা সাম্প্রতিক ও সবশেষ তথ্য উপস্থাপন করতে হয়। এরপর প্যাকেজের ভয়েস ওভার অংশে ঘটনার অতীতের তথ্য দিয়ে বা যেখান থেকে ঘটনার শুরু সেখান থেকে শুরু করতে হবে। ধীরে ধীরে ঘটনা ও তথ্যের খোলস উন্মোচন করতে হবে। ইংরেজিতে এ ধারাক্রমকে বলে ‘P-P-P-F (Present-Past-Present-Future)’। মানুষের কথোপকথনের ভঙ্গিও এটা। মানুষ যখন কোন ঘটনা অন্য কোন ব্যক্তির কাছে তুলে ধরে তখন ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বলে যায়।

তথ্যসূত্র

Andrew Boyd (2001), Broadcast Journalism: Techniques of Radio & Television News, 5th edition, Focal Press, London.
Anna McKane (2006), News Writing, SAGE Publications, London.
B. S. Brooks, G. Kennedy, D. R. Moen, & D. Ranly (2008), News reporting and writing, 9th edition, New York: Bedford; St. Martin’s.
Carole Rich (2010), Writing and Reporting News: A Coaching Method, Sixth edition, Wardsworth, USA.
Doug Newsom & James A. Wollert (1985), Media Writing: News for the Mass Media, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California.
Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals, http://www.investigative-journalism-africa.info/
Irving E. Fang (1980), Television News, Radio News, 3rd edition, Rada Press, Inc.
Ivor Young (1990), Basic TV Reporting, Focal Press, London.
Leonard M. Kantumoya (2004), Investigative Reporting in Zambia: A Practitioner’s Handbook, First Edition, Friedrich Ebert Stiftung and Transparency International Zambia.
Maier Scott (2002), Getting It Right? Not in 59 Percent of Stories, Newspaper Research Journal, 23:1.
Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists.
Melvin Mencher (1983), Basic News Writing, Wm.C.Brown Company Publishers, p. 115.
Neale Copple (1964), Depth Reporting: An Approach to Journalism, Prentice-Hall, Inc, New Jersey.
On Camera (1995), BBC.

[৩৭৪] প্রাগুক্ত, মোহাম্মদ সহিদ উল্যাহ্ (২০০১), পৃ- ৫৭।
[৩৭৫] Ibid, Ivor Young (1990), p. 48.

Paul N. Williams (1978), Investigative Reporting and Editing, PRENTICE-HALL, INC., Englewood Cliffs, New Jersey.
Pressfred Fedler, John R. Bender, Lucinda Davenport & Michael W. Drager (2005), Reporting for the Media, 8th edition, Oxford University Press, Inc.
Sheila S. Coronel (2009), Digging Deeper: A Guide for Investifative Journalists in the Balkans, BIRN, Sarajevo.
Tony Harcup (2004), Journalism Principles and Practice, Vistaar Publications, New Delhi, p. 111.
আফতাব হোসেন (অনুবাদ) (১৯৯৫), এশিয়ার রিপোর্টারঃ প্রতিবেদন কৌশল সারগ্রন্থ, সম্পাদনা গেরি গিল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৫।
নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী (১৯৯৬), অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি), ঢাকা, জুলাই ১৯৯৬।
ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে এবং আমিনুল ইসলাম (২০১৩), বাংলাদেশে সাংবাদিকতাঃ সংবাদ লেখা শৈলী ও কাঠামো, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা।
মোহাম্মদ সহিদ উল্যাহ্ (২০০১), বেতার ও টেলিভিশন সাংবাদিকতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

অধ্যায়
১৩

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় নৈতিকতা ও আইন

এ অধ্যায়ে থাকছে

- অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় নৈতিকতার ইস্যুসমূহ
- নৈতিকতার সীমা ও ঢাল
- অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও আইন
- তথ্য অধিকার আইন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

"Journalists ought not to stand outside the closed doors of the powerful waiting to be lied to. They are not functionaries, and they should not be charlatans. They ought to be sceptical about the assumed and the acceptable, especially the legitimate and respectable"

(John Pilger, Hidden Agendas)

"*Ethics? As far as I'm concerned that's that place to the east of London where people wear white socks.*"

(Kelvin MacKenzie, former editor of The Sun)

একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক গবেষণার মাধ্যমে তার নির্ধারিত অনুমিতিগুলো যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করে তথ্য ও নথিপত্র সংগ্রহ করেছেন। সেসব তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তিনি প্রতিবেদনও লিখে ফেলেছেন। অর্থাৎ একজন সাংবাদিক তার কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। এখন অপেক্ষা প্রকাশ/প্রচারের; অর্থাৎ জনসমক্ষে প্রতিবেদনটি উপস্থাপনের। কিন্তু তার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাকি আছে। এটি হলো মাননিয়ন্ত্রণ; যাকে প্রায়োগিক দিক থেকে আমরা বলতে পারি 'তথ্য যাচাই' (fact-checking)। এ পর্যায়ে সাংবাদিকতার নৈতিকতার মানদণ্ড এবং বিদ্যমান আইনের আলোকে তথ্যের নির্ভুলতা যাচাই করতে হয়। এ মানদণ্ড যাচাইয়ের ওপরই প্রতিবেদক, প্রতিবেদন এবং সামগ্রিক অর্থে গোটা সংবাদ মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সুনাম নির্ভর করে। এজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক Louis D. Brandeis বলেছেন, "*The function of the press is very high. It is almost holy. It ought to serve as a forum for the people, through which the people may know freely what is going on. To misstate or suppress the news is a breach of trust.*"

যে কোন ক্ষমতাই ভালো ও মন্দ- দুটি দিকে ব্যবহার করা যায়। সাংবাদিকদের স্বাধীনতার যে ক্ষমতা বা শক্তি তাও গঠনমূলক এবং ধ্বংসাত্মক দুটো দিকেই ব্যবহার করা যায়। দুটো দিকে ধার আছে এমন তলোয়ারের মতই এর স্বরূপ। সেজন্য সাংবাদিকদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় তিনি তার ক্ষমতা কোন দিকে ব্যবহার করবেন। গণমাধ্যমের এই ক্ষমতার কথা চিন্তা করেই বিশ্বব্যাপী সরকারগুলো গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ কিছু আইন করেছেন। এসব আইনের বাইরেও বিশ্বের অনেক গণমাধ্যম নিজস্ব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য কিংবা তার

সাংবাদিকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আচরণ বিধি নিরূপণ করেছেন। এসব পেশাগত আদর্শ ও মূল্যবোধের নির্দেশনাই হলো নৈতিকতা। Leonard M. Kantumoya নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, "*Generally speaking, ethics refers to the values that guide the conduct of a person, organisation, or society in interactions with others. Ethics stands on the dividing line between perceptions of right and wrong, fairness and unfairness, good and bad, honesty and dishonesty.*"[৩৭৬] তবে শুধু ব্যক্তির ন্যায়বোধের দ্বারাই ওই ব্যক্তি বা তার পেশার আচরণ নির্ণীত হয় না। বরং বিদ্যমান সমাজ, পেশা কিংবা প্রতিষ্ঠানের গৃহীত আরো কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে তার আচরণ নির্ধারিত হয়। অন্যের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মানদণ্ডের ভিত্তিতে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা নির্ণীত হয়। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্নও এর সাথে জড়িত। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা না থাকলে কিংবা ব্যাপক পরিসরে সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ না থাকলে গণমাধ্যমেও নীতিমালার সঠিক প্রতিফলন হয় না।

নৈতিকতার ইংরেজি *Ethics* শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ *ethica* (মূল শব্দ *ethos*) থেকে; যার অর্থ প্রথা বা আচরণ বা চরিত্র। Bryant নৈতিকতাকে দেখছেন এভাবে, "*Ethics come from the Greek word ethos meaning `character' or what a good person is or does to have a good character.*"[৩৭৭] তবে নৈতিকতা বলতে আইনকে বোঝায় না। নৈতিক দিক থেকে একজন ব্যক্তির উচিত বা অনুচিত কর্তব্যের সীমারেখাই হলো নৈতিকতা। অন্যদিকে আইন হলো সর্বনিম্ন মানদণ্ড ও সর্বোচ্চ সীমারেখা; যা কখনই লঙ্ঘন করা যাবে না। Leonard M. Kantumoya নৈতিকতার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এভাবে, "*Ethics help minimise excesses, instil a sense of responsibility in reporters, and create public respect for individual practitioners and the whole media profession.*"[৩৭৮] সাংবাদিকতার নীতির সঙ্গে দায়িত্বের একটি সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। এখানে নীতি হচ্ছে দর্শনসংস্কৃত একটি ভিত্তি। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের দায়িত্বশীলতা হচ্ছে সেই নীতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে তার প্রতিবেদনে কতটুকু প্রতিফলন ঘটানো হচ্ছে।

নৈতিক কারণেই একজন সাংবাদিককে তার পেশাগত নীতিমালা মানতে হয়। নীতি না মানলে আইনি শাস্তি পেতে হয় না। নীতি হচ্ছে মানার বিষয়। মানতে বাধ্য হওয়ার বিষয় নয়। না মনলে বড় দণ্ডের আশঙ্কা কম। বরং ভৎসনার মুখোমুখি হতে হয়। অর্থাৎ নীতি মানার ব্যাপারে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। এ দিক থেকে বলা যায়, নীতিমালা একটি স্বআরোপিত বিধিনিষেধ। অবশ্য নীতিমালার কিছু কিছু বিষয় আইনের গণ্ডিতেও পড়ে। সেসব বিষয় ভঙ্গ করলে আইন ভঙ্গের অপরাধে শাস্তি হতে পারে। কারণ আইনের ভিত্তি নৈতিকতা। কিন্তু নৈতিকতা আইনের চেয়ে বৃহৎ বা ব্যাপকতর। এজন্য জওয়াদুর রহমান বলেছেন, "সাংবাদিকদের শুধু আইন মেনে চললেই হবে না, আইনে বাধা নেই অথচ নীতিবিরোধী–

[৩৭৬] Leonard M. Kantumoya (2004), Investigative Reporting in Zambia: A Practitioner's Handbook, Transparency International Zambia, p. 76-77.
[৩৭৭] Jennings Bryant, Jay Black and Susan Thompson (1998), Introduction to Mass Communication, 5th edition, McGraw Hill Companies Inc., p. 442.
[৩৭৮] Ibid, Leonard M. Kantumoya (2004), p. 82.

এমন কোনো কাজ থেকেও তাঁদেরকে স্বেচ্ছায় বিরত থাকতে হবে।”[৩৭৯] সাংবাদিক নীতি-নৈতিকতার ধার না ধারলে কি হতে পারে সে পরিণতি তুলে ধরেছেন John Hulteng এভাবে, "*It may well be that if journalism loses touch with ethical values, it will then cease to be of use to society, and cease to have any real reason for being.*"[৩৮০] প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতা হলো একটি ব্যবস্থার মানদণ্ড, নীতি ও মূল্যবোধ যার দ্বারা পেশাগত আচরণের সঠিক আচরণ নির্মিত হয়। চিকিৎসক কিংবা আইনজীবীদের যেমন পেশাগত নৈতিকতার মানদণ্ড আছে তেমনি সাংবাদিকদেরও আছে। সাংবাদিকতা পেশায় সাংবাদিকদের উপযুক্ত আচরণ নির্ধারণের মানদণ্ডই হলো নৈতিকতা। জওয়াদুর রহমান তাঁর 'সাংবাদিকতার নীতিমালা' শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন, "*নীতিমালার প্রতি উদাসীন কোনো শল্যবিদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া যেমন বিপজ্জনক হবে, নীতিমালার প্রতি উদাসীন কোনো সাংবাদিকের হাতে কলম তুলে দেওয়াও তেমনি বিপজ্জনক হবে। কারণ কলমও একটা অস্ত্র যা মঙ্গল ও অমঙ্গল, দুটোই ডেকে আনার শক্তি রাখে। যিনি সাংবাদিকতায় নিয়োজিত আছেন তাঁকে কিছু কাজ করতে হবে এবং কিছু কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। কী করণীয় আর কী বর্জনীয় তা তাঁর পেশাগত নীতিমালাই নির্দেশ করবে।*”[৩৮১] এসব মানামানির বিধানগুলো একদিনে তৈরি হয়নি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে এসব নীতিমালা তৈরি হয়েছে।

একটি ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন মূলত প্রতিবেদকের চিন্তাশৈলী, দক্ষতা আর নীতি জ্ঞাণের সমন্বয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলাফল। The Poynter Institute সাংবাদিকদের যোগ্যতার যে পিরামিড তুলে ধরেছেন তাতে বলা হয়েছে, চারটি যোগ্যতা সাংবাদিকদের অবশ্যই থাকতে হয়। সেগুলো হলো: নৈতিকতা সংক্রান্ত যোগ্যতা; সাংস্কৃতিক ও নাগরিক যোগ্যতা; ভিজ্যুয়াল সাক্ষরতা ও প্রযুক্তিগত যোগ্যতা; এবং সংবাদ মূল্যায়ন, কাহিনি ও ভাষাগত এবং রিপোর্টিং দক্ষতা।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় নৈতিকতার ইস্যুসমূহ (Ethical Issues in Investigative Journalisim)

সাংবাদিক তার কাজের জগতে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নৈতিক বিচার-বিবেচনাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাত্রাগত। এ কারণে নৈতিকতার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা বেশ কঠিন। আমাদের দেশে যেখানে প্রায় সবগুলো সংবাদ প্রতিষ্ঠানেরই নিজস্ব কোন আচরণ বিধি নেই এবং যেখানে প্রেস কাউন্সিলের আচরণ বিধি শুধুই একটি কাগুজে বিষয় সেখানে সাংবাদিকের নিজেকেই নৈতিকতার সমস্যার সমাধান করতে হয়। এক্ষেত্রে বিবেক আর বিবেকের তাড়নায় গৃহীত যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণই তার প্রধান হাতিয়ার। নৈতিকতার জটিল বিষয়গুলো প্রতিনিয়ত চর্চার মধ্য দিয়ে এই যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাটি প্রতিবেদককে অর্জন করতে হয়। আমাদের দেশের সাংবাদিকদের জন্য নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ণয় করা সম্পর্কে নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী বলেছেন, "... *বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলও সাংবাদিকদের জন্য একটি নীতিমালা নির্ধারণ করেছে। প্রেস*

---

[৩৭৯] মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত) (১৯৯৯), সাংবাদিকতা, প্রথম খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ১২৬।

[৩৮০] John Hulteng (1985), The Messenger's Motives: Ethical Problems of the News Media, Engle-wood Cliffs, N. J: Prentcie-Hall, p. 221.

[৩৮১] প্রাগুক্ত, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত) (১৯৯৯), পৃ. ১২৬।

কাউন্সিল প্রণীত সেই 'সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থাসমূহ এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধি' অন্য সব নীতিমালার মতোই পূর্ণাঙ্গ কিছু নয়। তবে সেটিকে ভিত্তি করে নিশ্চয়ই একটি মানচিত্র তৈরি করে নেয়া যায়, যে মানচিত্রে আঁকা রাজপথ ধরে সাংবাদিক নিজের অভিরুচি অনুযায়ী চিনে নিতে পারেন নৈতিকতার অলি-গলি-খানা-খন্দ। ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং তার পরিবেশ-প্রতিবেশের প্রভাব যেমন নির্ধারণ করে মানুষের নৈতিক আচার-আচরণ তেমনি একই সঙ্গে প্রতিবেদকের নিজস্ব জীবন ভাবনা এবং অবশ্যই তিনি যে পরিবেশ-পরিমণ্ডলে কাজ করছেন তার সাথে মিথস্ক্রিয়ায় তার নৈতিক জ্ঞান লাভ করে কার্যকর রূপ।"[৩৮২]

প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১১(২) (বি) ধারা অনুযায়ী কাউন্সিল সাংবাদিকতার উচ্চ পেশাগত মান বজায় রাখার জন্য সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য ২৫টি নীতিমালা সম্বলিত একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করেছে।

প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১১ (এগার) টি ধারা অনুযায়ী প্রণীত সংবাদপত্র, সংবাদসংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয়

আচরণ বিধি

১। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সংবিধান বিরোধী বা পরিপন্থী কোন সংবাদ অথবা ভাষ্য প্রকাশ না করা।

২। মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও অর্জনকে সমুন্নত রাখা এবং এর বিরুদ্ধে প্রচারনা থেকে বিরত থাকা।

৩। জনগণকে আকর্ষণ করে অথবা তাদের ওপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয় জনগণকে অবহিত রাখা একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব। জনগণের তথা সংবাদপত্রের পাঠকগণের ব্যক্তিগত অধিকার ও সংবেদনশীলতার প্রতি পূর্ণ সম্মানবোধসহ সংবাদ ও সংবাদভাষ্য রচনা ও প্রকাশ করা।

৪। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের প্রাপ্ত তথ্যাবলীর সত্যতা ও নির্ভূলতা নিশ্চিত করা।

৫। বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য কোনরূপ শাস্তির ঝুঁকি ছাড়াই জনস্বার্থে প্রকাশ করা। এ ধরনের জনস্বার্থে প্রকাশিত সংবাদ যদি সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে থাকে এবং প্রাপ্ত তথ্য যৌক্তিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হয়, তবে এ ধরনের প্রকাশিত সংবাদ থেকে উদ্ভূত প্রতিকূল পরিণতি থেকে সাংবাদিককে রেহাই দিতে হবে।

৬। গুজব ও অসমর্থিত প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে সেগুলোকে চিহ্নিত করা এবং যদি এসব প্রকাশ করা অনুচিত বিবেচিত হয় তবে সেগুলো প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা।

৭। যে সকল সংবাদের বিষয়বস্তু অসাধু এবং ভিত্তিহীন অথবা যেগুলোর প্রকাশনায় বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা আছে সেসকল সংবাদ প্রকাশ না করা।

৮। সংবাদপত্র ও সাংবাদিক বিতর্কিত বিষয়ে নিজস্ব মতামত জোরালোভাবে ব্যক্ত করার অধিকার রাখেন। তবে অবশ্য করণীয়;

(ক) সত্য ঘটনা এবং মতামতকে পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করা।

(খ) পাঠককে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোন ঘটনাকে বিকৃত না করা।

(গ) মূলভাষ্য অথবা শিরোনামে কোন সংবাদকে বিকৃত না করা বা অসাধুভাবে চিহ্নিত না করা।

(ঘ) মূল সংবাদের ওপর মতামত পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরা।

৯। কুৎসামূলক যা জনস্বার্থ পরিপন্থী না হলে ব্যাহত ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থবিরোধী হলেও যথাযথ কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষরিত যেকোন বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশের অধিকার সম্পাদকের আছে। কিন্তু এমন বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ করা হলে সম্পাদকের তা বিনা খরচে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা।

[৩৮২] নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী (১৯৯৬), অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেডি), ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ৬৫।

১০। ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায় বিশেষ সর্ম্পকে তাদের বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা, ধর্ম অথবা দেশগত বিষয় নিয়ে অবজ্ঞা বা মর্যাদা হানিকর বিষয় প্রকাশ না করা। জাতীয় ঐক্য সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা।

১১। ব্যক্তি বিশেষ, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান অথবা কোন গোষ্ঠী বা বিশেষ শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে তাদের স্বার্থ ও সুনামের ক্ষতিকর কোন কিছু যদি সংবাদপত্র প্রকাশ করে তবে পক্ষপাতহীনতা ও সততার সাথে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকের উচিত ক্ষতিকর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/সংস্থাতে দ্রুত এবং সংগত সময়ের মধ্যে প্রতিবাদ বা উত্তর দেওয়ার সুযোগ প্রদান।

১২। প্রকাশিত সংবাদ যদি ক্ষতিকর হয় বা বস্তুনিষ্ঠ না হয় তবে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার সংশোধন বা ব্যাখ্যা করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষমা প্রার্থণা করা।

১৩। জনগণকে আকর্ষণ করে অথচ জনস্বার্থ পরিপন্থী চাঞ্চল্যকর মুখরোচক কাহিনির মাধ্যমে পত্রিকা কাটতির স্বার্থে রুচিহীন ও অশালীন সংবাদ এবং অনুরূপ ছবি পরিবেশন না করা।

১৪। অপরাধ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সংবাদপত্রের যুক্তি সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করা।

১৫। অন্যান্য গণমাধ্যমের তুলনায় সংবাদপত্রের প্রভাবের ব্যক্তি ও স্থায়িত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি। এ কারণে যে, সাংবাদিক সংবাদপত্রের জন্য লিখবেন তাঁর উচিৎ সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সমাধান থাকা এবং ঝুঁকি এড়ানোর জন্য সূত্রসমূহ সংরক্ষণ করা।

১৬। কোন অপরাধের ঘটনা বিচারাধীন থাকাকালীন সব পর্যায়ে তার খবর ছাপানো এবং মামলা বিষয়ক প্রকৃত চিত্র উদঘাটনের জন্য আদালতের চূড়ান্ত রায় প্রকাশ করা সংবাদপত্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তবে বিচারাধীন মামলার রায় প্রভাবিত হতে পারে, এমন কোন মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ থেকে চূড়ান্ত ঘোষণার আসা পর্যন্ত সাংবাদিককে বিরত থাকা।

১৭। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত পক্ষ বা পক্ষসমূহের প্রতিবাদ সংবাদটিতে সমগুরুত্ব দিয়ে দ্রুত ছাপানো এবং সম্পাদক প্রতিবাদ লিপির সম্পাদনাকালে এর চরিত্র পরিবর্তন না করা।

১৮। সম্পাদকীয়ের কোন ভুল তথ্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ যদি প্রতিবাদ করে, তবে সম্পাদকের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে একই পাতায় ভুল সংশোধন করে দুঃখ প্রকাশ করা।

১৯। বিদ্বেষপূর্ণ কোন খবর প্রকাশ না করা।

২০। সম্পাদক কর্তৃক সংবাদপত্রের সকল প্রকাশনার পরিপূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করা।

২১। কোন দুর্নীতি বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আর্থিক বা অন্য কোন অভিযোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের উচিত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সাধ্যমত নিশ্চিত হওয়া এবং প্রতিবেদককে অবশ্যই খবরের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার মত যথেষ্ট তথ্য যোগাড় করা।

২২। প্রতিবাদ হয়নি এমন দায়িত্বশীল প্রকাশনা খবরের উৎস হতে পারে। তবে পুনঃমুদ্রণ করা হয়েছে নিছক এই অজুহাতে কোন সাংবাদিক কোন সাংবাদিকের কোন খবর সম্পর্কে দায়িত্ব না এড়ানো।

২৩। সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের অধঃপতন তুলে ধরা সাংবাদিকের দায়িত্ব, তবে নারী-পরুষ গঠিত অথবা কোন নারী সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিকের অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা।

২৪। কোন ব্যক্তি সংবাদপত্র, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকরূপে চাকুরী গ্রহণকালে আচরণ বিধির পরিশিষ্টে উল্লেখিত শপথনামা ''ক'' সম্পাদকের সামনে পাঠ ও স্বাক্ষরদান করতে বাধ্য থাকা।

২৫। প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর ১১-(বি) ধারা অনুযায়ী সংবাদপত্র প্রকাশক আচরণ বিধির পরিশিষ্টে উল্লেখিত শপথ নামা ''খ'' পাঠ ও স্বাক্ষর করতে বাধ্য থাকা।

সামগ্রিকভাবে নৈতিকতা হলো ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সমষ্টি যা একজন ব্যক্তির মূল্যবোধ গঠন করে। সাংবাদিক মাত্রই যে কোন ব্যক্তির অপকর্ম ও অপব্যবহারকে তুলে ধরতে চায়। আমাদের দেশে বেশিরভাগ সংবাদ প্রতিষ্ঠানেরই নিজস্ব কোন আচরণ বিধি নেই। অনেক দিক থেকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনার সময় নৈতিকতার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এজন্য যেসব প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব কোন আচরণ বিধি নেই সেসব প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকদের উচিত পেশাগত দায়িত্ব পালনে বর্হিবিশ্বের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের অনুসরণীয় নৈতিকতার মানদণ্ডগুলো মেনে চলা বা অনুসরণ করা। অন্যান্য পেশার মতো সাংবাদিকতাও একটি পেশা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাংবাদিকদের বহন করতে হচ্ছে বিশাল সামাজিক দায়িত্ব। ইচ্ছে করলে তারা যেমন একটা দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন তেমনি কলমের খোঁচায় বা সমাজের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলার দ্বারা দেশের বিপর্যয়ও ঘটাতে পারে। একজন সাংবাদিক ইচ্ছে করে যেমন তথ্য গোপন রাখতে পারেন না আবার অতিরঞ্জনও করতে পারেন না। সাংবাদিককে সত্যের সন্ধান করে যেতে হবে সবসময় এবং যতটা সম্ভব বিস্তৃতভাবে সত্য তথ্য তুলে ধরতে হবে। সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীর কথা সাংবাদিকদের তুলে ধরতে হলে সত্য তথ্য তুলে ধরার প্রতি সচেষ্ট থাকতে হবে এবং শাসক শ্রেণীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সাংবাদিক স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং সমাজে অবাধ তথ্যপ্রবাহে গতি সঞ্চারিত করে- এমন স্বীকৃতির সাথে সাথে সাংবাদিকের দায়িত্ববোধের বিষয়টিও চলে আসে। সে দায়িত্ববোধ হলো জনস্বার্থে কাজ করা। প্রত্যেক সমাজে ভাল বা আদর্শ সাংবাদিকতার মূল্যবোধ সাধারণভাবে সাংবাদিকতার নৈতিকতার মানদণ্ড বা কোড অব ইথিকস দ্বারা স্বীকৃত। সাংবাদিকতা নৈতিকতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো সব সমাজেই একইরকম।

অভিপ্রায় (Motives)

জনগণের জানার অধিকার আছে -- এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করাই গণমাধ্যমের যদি ব্রত হয় তাহলে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন একটি মাত্র উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ে প্রকাশিত হবে; সেটি হলো জনস্বার্থ। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কোন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে পারে না। Leonard M. Kantumoya বলেছেন, "*If we accept that the public's right to know is the media's overriding mission, it follows that an investigative story is justified only if its publication will be for the public good. An investigation undertaken to "fix" someone and settle private scores is wrongly premised because it is driven by a selfish and, therefore, improper motive.*"[৩৮৩] বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রণীত সাংবাদিকদের আচরণ বিধিতে বলা হয়েছে, "জনগণকে আকর্ষণ করে অথবা তাদের ওপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয় জনগণকে অবহিত রাখা একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব। জনগণের তথা সংবাদপত্রের পাঠকগণের ব্যক্তিগত অধিকার ও সংবেদনশীলতার প্রতি পূর্ণ সম্মানবোধসহ সংবাদ ও সংবাদভাষ্য রচনা ও প্রকাশ করা।"

নির্ভুলতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা (Accuracy ad Objectivity)

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সহ সব ধরনের ভাল মানের সাংবাদিকতার ভিত্তি হলো মানুষের সরল বিশ্বাস। এই সরল বিশ্বাস হলো সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য সত্য। শুধু নির্ভুল ও সত্য তথ্য তুলে

[৩৮৩] Ibid, Leonard M. Kantumoya (2004), p. 79.

ধরার মাধ্যমে জনগণের জানার অধিকার পূর্ণ হবে। এই নির্ভুল ও সত্য তথ্য তুলে ধরার অর্থ হলো কোন ধরনের বিকৃতি বা রং না ছড়িয়ে তথ্য পরিবেশন করা। অর্থাৎ প্রতিবেদক তার নিজস্ব মত, পক্ষপাতমূলক বক্তব্য কিংবা দর্শন তুলে ধরবেন না। যে কোন গণমাধ্যম কার্যকরভাবে জনজীবনে প্রভাব রাখতে পারে যদি জনগণের কাছে মনে হয় সে গণমাধ্যমটি সৎ, বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভুল। বিশ্বাসযোগ্যতা হলো জনগণের চোখে গণমাধ্যমের মূল্যায়নের মূল বিষয়।

দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রায়ই কোন না কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করে। কিন্তু কারো পক্ষাবলম্বন কিংবা কারো বিরুদ্ধে লেখা সাংবাদিকের কাজ নয়। তার কাজ হলো নির্ভুলভাবে তথ্য উপস্থাপন করা। এজন্য প্রতিবেদনের খসড়া লেখার পর প্রয়োজনে মাস্টার ফাইলের সাথে আবারো প্রতিবেদক তথ্যগুলো যাচাই করে নিতে পারেন। এখানে মনে রাখতে হবে, প্রতিবেদনের নির্ভুলতা বা সত্যবাদিতাই প্রতিবেদকের একান্ত কাম্য। সব তথ্য নির্ভুলভাবে তুলে ধরা এবং কোন তথ্য ভুলভাবে উপস্থাপন না করা ও কারো পক্ষে প্রতিবেদনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার অর্থই হলো সত্যবাদিতা। একজন বিচক্ষণ সাংবাদিক মাত্রই জানেন মশা-মাছির মতোই গুজব দিক-বিদিগ ছড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু এসব গুজব, অভিযোগ কখনই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হতে পারে না। এসব গুজব, অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে হলে প্রতিবেদককে অবশ্যই যত্ম সহকারে ঘটনা বা বিষয়ের সকল দিক সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত, নথিপত্র ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করতে হয়। Investigative Journalism Manuals-এ খুব চমৎকারভাবে বলা হয়েছে, "*When corruption allegations fly as commonly as mosquitos, journalists have to be very careful not to fall victim to the agendas of informants trying to use them to neutralise rivals, remove obstacles and realise their own ambitions. You cannot move further on the story above until you have investigated all sides of this story, and that involves investigating party factions and tensions, and the conduct of the accuser as well as the accused. You also need to decide where you stand: what are your reporting priorities, and where does the most pressing public interest lie?*"[৩৮৪]

Shirley Biagi বলেছেন, "*Truthfulness in reporting means more than accuracy and telling the truth to get a stroy. Truthfulness also means not misrepresenting the people or the situations in the story to readers or viewers. Another aspect of truthfulness is the responsibility of government officials to not use the media for their own ends -- called disinformation.*"[৩৮৫] নাৎসী জেনারেল গোয়েবলস বলেছিলেন, "*একটা গ্যাস চেম্বারের বিস্ফোরণে কয়েকশত লোক মারা যেতে পারে, কিন্তু একটি পরিকল্পিত মিথ্যা লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে*"। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রণীত আচরণ

---

[৩৮৪] Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals, Chapter two: Generating Story Ideas, http://www.investigative-journalism-africa.info/.

[৩৮৫] Shirley Biagi (1994), Media Impact: An Introduction to Mass Media, Wardsworth, Inc, USA, Updated 2nd edition, p. 443.

বিধির ৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, “সংবাদপত্র ও সাংবাদিক বিতর্কিত বিষয়ে নিজস্ব মতামত জোরালোভাবে ব্যক্ত করার অধিকার রাখেন। তবে অবশ্য করণীয়:

(ক) সত্য ঘটনা এবং মতামতকে পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করা।
(খ) পাঠককে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোন ঘটনাকে বিকৃত না করা।
(গ) মূলভাষ্য অথবা শিরোনামে কোন সংবাদকে বিকৃত না করা বা অসাধুভাবে চিহ্নিত না করা।
(ঘ) মূল সংবাদের ওপর মতামত পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরা।”

সমনীতি/সমব্যবহার (Fairplay)

তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনের সময় প্রতিবেদককে সবসময়ই জনগণের অধিকার ও কল্যাণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাই সমনীতি অনুসরণ করতে হবে। শুধু আইনগত দিক থেকে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো যায়। এই সমনীতি বা সমব্যবহারের আরেকটি দিক হলো প্রতিবেদনে ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিংবা জড়িত সকল পক্ষকে তাদের বক্তব্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ বা জায়গা দিতে হবে। এ সম্পর্কে Shirley Biagi বলেছেন, “*Fairness implies impartiality -- that the journalist has nothing personal to gain from a report, that there are no hidden benefits to the reporter or to the source from the story being presented.*”[৩৮৬]

দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যপ্রমাণ কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতিবেদককে অবশ্যই নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে সেসব তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরতে হবে। উপস্থাপিত তথ্যপ্রমাণের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মত তুলে ধরা হয়েছে কীনা তা গুরুত্বের সাথে খতিয়ে দেখতে হবে। পাশাপাশি এসব অভিযোগ যারা করছেন তাদের মত বা মন্তব্যও হুবুহু বা যথোপযুক্তভাবে তুলে ধরা হচ্ছে কীনা তা যাচাই করে দেখতে হবে। তবে কখনোই কোন উৎস বা সূত্রকে প্রতিবেদকের পুরো প্রতিবেদন দেখানো ঠিক নয়।

ন্যায্যতা বা সমনীতির সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জড়িত:

ক. উপহার ও ভোজ (Freebies and Junkets)

সাংবাদিকতার অধ্যাপক Meyer L. Stein বলেছেন, “*There is hardly a reporter alive who, at one time or another, has not eaten a meal supplied by a news source ... only a naive newsmaker would assume that reporters can be bought with free lanuch.*”[৩৮৭]

সত্যিকার অর্থেই এমন প্রতিবেদক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্রতিবেদকরা প্রায়ই ‘উপহার’ ও বিনামূল্যে সেবা পেয়ে থাকেন। যেমন: কোন সোর্স কোন ভ্রমণের সকল ব্যয় বহন করলেন। এ ধরনের উপহার দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো এগুলো কি সরল মনে দেয়া-নেয়া হচ্ছে নাকি কোন সন্তুষ্টির জন্য করা হচ্ছে? এর মাধ্যমে দাতার সঙ্গে কি

[৩৮৬] Ibid, p. 445.
[৩৮৭] Gerry Keir, Maxwell McCombs & Donald L. Shaw (1986), Advanced Reporting: Beyond News Events, Longman, New York, p. 34.

প্রতিবেদকের কোন বোঝাপড়া হচ্ছে না? এ ধরনের উপহার নেয়ার পর কিভাবে প্রতিবেদক ওই দাতার কোন ভুল বা অনিয়মের খবর তুলে ধরবেন? এই ফ্রিবাই শব্দটি আমাদের দেশে খুব বেশি প্রচলিত নয়। তবে এ ধরনের পরিস্থিতির উপস্থিতি আমাদের দেশে সার্বক্ষণিকভাবে বিদ্যমান। গত কয়েক দশকে কোন এসাইনমেন্ট কাভার করতে গেলে সাংবাদিকদের বিনামূল্যে উপহার দেয়ার প্রবণতা অনেক বেড়েছে। এখন প্রতিবেদকরা হরহামেশাই উপহার হিসেবে বিনামূল্যে বিভিন্ন পণ্য, সেবা বা পরিষেবা পাচ্ছেন। যেমন কোন এয়ারলাইন্স কোম্পানির সংবাদ সম্মেলন কাভার করতে গিয়ে বিনামূল্যে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পাচ্ছেন। এভাবে কোন ফ্রি ভ্রমণের সুযোগ দেয়াকে বলা হয় Junket। বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো রাজধানীর অভিজাত হোটেলগুলোতে সাংবাদিকদের ভোজনের আয়োজন করছে কিংবা সস্ত্রীক বা সবান্ধব ফ্যাশন শো উপভোগের টিকেট দিচ্ছেন সাংবাদিকদের। আপাতদৃষ্টিতে এসব উপহার কিংবা ভোজনের নিমন্ত্রণ এ অনেকেই দোষের কিছু দেখেন না। কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠান এসব উপহার দিচ্ছেন কিংবা ভোজনের আয়োজন করছে তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো সাংবাদিকদের ‘হাতে রাখা’ কিংবা তাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ইতিবাচক রিপোর্টিং নিশ্চিত করা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম কিংবা অন্যায় আচরণ ঢেকে রাখার জন্যই তারা সাংবাদিকদের এ ধরনের উপহার সামগ্রী দিয়ে থাকেন। এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে উন্নত দেশগুলোর অনেক সুখ্যাত সংবাদমাধ্যম উপহারসামগ্রী গ্রহণ, ভোজে যোগদান প্রসঙ্গে কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। যেমন বৃটেনের দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকার সম্পাদকীয় আচরণ বিধিতে ২৫ পাউন্ডের বেশি মূল্যমানের কোন উপহার সাংবাদিকদের দেয়া হলে তা ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই আচরণ বিধিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, “*We should make it clear when an airline, hotel or other interest has borne the cost of transporting or accommodating a journalist. Acceptance of any such offer is conditional on the Guardian being free to assign and report or not report any resulting story as it sees fit.*”[৩৮৮] তবে আমাদের দেশে এই ধরনের উপহার নেয়ার ক্ষেত্রে কোন সংবাদমাধ্যমেই কোন ধরনের বিধি নিষেধ বা আচরণ বিধি নেই। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়ভার কঠোর ন্যায়শীল প্রতিবেদকের ওপরই বর্তায়।

কম বেতনভুক্ত সাংবাদিকরা প্রায়ই ঘুষ নেয়ার ক্ষেত্রে প্রলুব্ধ হন। Derek Forbes বলেছেন, “*নাইজেরিয়ার সাংবাদিকরা প্রায়ই বেতন পেতে দেরি হয় বলে সেখানকার সাংবাদিকদের ঘুষ গ্রহণ একটি প্রথায় পরিণত হয়েছে এবং রাজনীতিবিদরা খুব স্বাভাবিকভাবে সাংবাদিকদের কিনে নিতে পারেন। তানজানিয়াতে সরকারি কর্মকর্তারা ইতিবাচক সংবাদ পরিবেশনের জন্য সাংবাদিকদের বাদামি খাম সরবরাহ করেন।*”[৩৮৯] কিন্তু এ ধরনের ফ্রিবাই নির্ভরতা সাংবাদিকতার স্বাধীনতার প্রতি এক ধরনের উপহাস বটে। এ ধরনের ঘুষ বা উপহার নেয়ার মাধ্যমে সাংবাদিকরা নিজেরা নিজেদের ক্ষমতা

[৩৮৮] Guidelines: The Guardian's Editorial Code, The Guardian, February, 2003, p. 6.

[৩৮৯] Derek Forbes (2005), A watchdog’s guide to investigative reporting: A simple introduction to principles and practice in investigative reporting, Konrad Adenauer Stiftung Media Programme, Johannesburg, Republic of South Africa, p. 62.

ও যোগ্যতাকে অপমান করে। Manual for Arab Journalists on Freedom of Information and Investigative Journalism-এ বলা হয়েছে, "*Journalists must be wary of bribery from politicians, countries promoting tourism or companies promoting products or services. Journalists will be undermining their own credibility if they cover events or review products favourably in return for the gifts provided.*"[৩৯০]

খ. স্বার্থের দ্বন্দ্ব (Conflict of Interest)

প্রতিবেদকের নানা ধরনের স্বার্থ তার প্রতিবেদনের বস্তুনিষ্ঠতার জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করতে গিয়েও এ ধরনের স্বার্থের দ্বন্দ্বে পড়ে প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনের বস্তুনিষ্ঠতাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারেন। যেমন ধরুন, কোন একজন প্রতিবেদক কোন টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির প্রতিবেদন করছেন। এক্ষেত্রে দুর্নীতিতে জড়িত অনেকজনের মধ্যে একজন তার পরিচিত কিংবা বন্ধু। সেক্ষেত্রে ওই বন্ধু বা পরিচিতজনকে আড়াল করে তিনি যদি প্রতিবেদন রচনা করেন তাহলে তার প্রতিবেদনের সত্যতা নিয়ে পাঠকের মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে।

গ. ঘুষ দেয়া/চেকবুক সাংবাদিকতা/বাদামি খাম সাংবাদিকতা (Bribery/Cheque book journalism/Brown envelope journalism)

১৯৮০ দশকের শেষের দিকে যুক্তরাজ্যের গার্ডিয়ান পত্রিকার জনাথন হান্ট 'cash-for-questions' নামে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করেন। এ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বৃটেনের ডানপন্থী সংসদ সদস্য নেইল হ্যামিল্টন বৃটিশ হাউস অব কমন্সে প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আল ফায়েদের কাছ থেকে নগদ অর্থ নিয়েছেন। হ্যামিল্টনকে ব্যবসায়ী আল ফায়েদ সরাসরি অর্থ পরিশোধ করেছিলেন বাদামি রঙের খামে। পরে 'বাদামি খাম' ('brown envelope') সাংবাদিকদের ঘুষ দেয়ার বিষয়টি বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর অর্থ হচ্ছে অর্থ বা টাকার বিনিময়ে তথ্য সংগ্রহ করা। একজন সাংবাদিক সবসময়ই সুনামধন্য সূত্র বা উৎসের উপর নির্ভর করতে পারেন না। অনেক সময় তাদেরকে তথ্যের জন্য সমাজের নিচু স্তরের বিশেষ করে দুস্কৃতিকারীদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। অপরাধীরাও তথ্যের ভাল উৎস হতে পারে। কিন্তু তথ্যের জন্য কোন পারিতোষিক দেয়ার সমঝোতা করা ঠিক নয়। এর পেছনে যুক্তি দেয়া হয় যে, অর্থের মাধ্যমে কোন অপরাধীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হলে প্রতিবেদক অসাবধানতাবশত একজন অপরাধীকে পুরস্কৃত করছেন এবং প্রকারান্তরে অপরাধকেই মহিমান্বিত করছেন। এজন্য অনেক স্বনামধন্য গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের আচরণ বিধিতে অর্থের বিনিময়ে তথ্য সংগ্রহ করাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এমন তথ্যের উৎস নিয়ে জনমনে সন্দেহ দেখা দেয়। তবে তা সত্ত্বেও অনেক গণমাধ্যম জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য অনেক সময় চেকবুক সাংবাদিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী এখন ঘুষ দেয়া ও নেয়া সম্পূর্ণ অনৈতিক ও বেআইনি। এটি একটি দুর্নীতি। কারণ সরকারি দফতরের তথ্য অবশ্যই

---

[৩৯০] Manual for Arab Journalists on Freedom of Information and Investigative Journalism (2007), Article 19, London, October 2007, www.article19.org, p. 21

জনগণের সম্পত্তি; কোন ব্যক্তির নয়। Leonard M. Kantumoya বলছেন, "*Information generated in public office is public, not private, property. A public official should not regard knowledge or information related to his public duties as personal property, and it is wrong for you as a reporter to contribute to such an official's private gain for its release.*"[৩৯১] যদি একজন প্রতিবেদক দুর্নীতিমূলক কোন পদ্ধতি ব্যবহার করেন, তাহলে তিনি কি স্বচ্ছ বিবেক নিয়ে কোন দুর্নীতির অনুসন্ধান করতে পারবেন?– এমন প্রশ্ন থেকেই যায়। বৃটেনের The Press Compliants Commission Code-এ শুধু জনস্বার্থের কথা বিবেচনায় রেখে অর্থের মাধ্যমে তথ্য কেনার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "*Payment should not be made for stories, pictures or information…to people engaged in crime or their associates except where the material concerned ought to be published in the public interest and the payment is necessary for this to be done.*"[৩৯২]

সূত্রের গোপনীয়তা (Confidentiality with Sources)

সূত্রের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য যদি সাংবাদিক কথা দিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই তাকে তা রক্ষা করতে হবে। কোনভাবেই প্রতিবেদক যে কথা দিয়েছেন তার বরখেলাপ করা যাবে না। যদি তিনি তা ভঙ্গ করেন তাহলে পেশাগত জীবনে সূত্রের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবেন।

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের অনেক দেশে বহু সাংবাদিক তথ্যের গোপনীয় সূত্রের নাম প্রকাশ না করার বিষয়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। অনেক সাংবাদিক আলাদতের সামনে সূত্রের নাম প্রকাশ না করে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেছেন। আমাদের দেশের প্রেস কাউন্সিল আইনে বলা হয়েছে, সাংবাদিক খবরের উৎস জানাতে বাধ্য নন। কিন্তু এই আইন শুধু প্রেস কাউন্সিলের বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আদালতে সাংবাদিকদের তথ্যের উৎস জানাতে হয়। গোপন সূত্র থেকে ইঙ্গিত পেয়ে সাংবাদিক যদি কোন তথ্য পান এবং তার ভিত্তিতে অনুসন্ধান করে আরো তথ্য উদঘাটন করেন এবং পরবর্তীতে এ নিয়ে যদি কোন মামলা হয় তাহলে সাংবাদিক আদালতে সে সূত্রের কথা গোপন রাখতে পারবেন না

স্বাভাবিকভাবে জনগণের সাংবিধানিক অধিকারের বাস্তবায়নে সাংবাদিকদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। আমাদের দেশে যদিও তথ্য অধিকার আইন আছে তারপরও সরকারি বিভিন্ন বিভাগ ও দফতর থেকে অবাধে তথ্যপ্রাপ্তির বিষয়টি এখনও স্বাভাবিক প্রপঞ্চ হয়ে উঠেনি। বিশেষ করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদকরা যখন স্পর্শকাতর বিষয়ে অনুসন্ধান করেন তখন সেসব বিষয় নিয়ে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ যেমন সামরিক বাহিনি কিংবা পুলিশ অবাধে তথ্য দিতে চায় না। বেশিরভাগ সময়ই সরকারি বিভাগ বা দফতরের কর্মকর্তারা আইনের মারপ্যাঁচে নাম প্রকাশ করার শর্তে তথ্য দিতে চান না।

[৩৯১] Ibid, Leonard M. Kantumoya (2004), p. 81.

[৩৯২] Andrew Belsey & Ruth Chadwick (2006), Ethical Issues in Journalism and The Media, Routledge, New York, p. 55.

ক্ষমতা ও দায়িত্ব (Power and Responsibility)

বস্তুনিষ্ঠভাবে সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে সাংবাদিকের পেশাগত দায়িত্ব। একজন সাংবাদিককে মনে রাখতে হবে, তার সবচেয়ে বড় সম্পদ তার পাঠক/দর্শক। পাঠক/দর্শক তার প্রতিবেদন বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাসের ভিত্তি হলো বস্তুনিষ্ঠতা। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা একটি সংবেদনশীল বিষয়। এটি একটি ক্ষমতাও বটে। বলা হয়ে থাকে, অসির চেয়ে মসি বড়। এই ক্ষমতার বলে একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদকও কিছু ক্ষমতার অধিকারী হন। যেমন, কোন ঘটনাকে সাজানোর ক্ষমতা, কাউকে অপমান করা, উপহাস করা, কাউকে ধ্বংস করার ক্ষমতা। এই ক্ষমতাগুলো এতটাই শক্তিশালী যে একজন প্রতিবেদক যদি অসংযত কিংবা অপরিণামদর্শী হয়ে যান তাহলে যে কারো কপালে দুঃখ নেমে আসতে পারে। Leonard M. Kantumoya বলেছেন, "*A reporter obsessed with this power ultimately becomes reckless and abandons responsibility. S/he will shake any and every tree and let the leaves fall wherever they may, regardless of the consequences.*"[৩৯৩]

নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য প্রথম নিশ্চিত হতে হবে - প্রতিবেদনে উপস্থাপিত সব তথ্য সর্বৈসর্বাভাবে সত্য। প্রতিবেদনে উল্লেখিত সব সূত্র বা উৎসগুলো সঠিক। একইসাথে প্রতিবেদককে দেখতে হবে তার প্রতিবেদনে কোন আবেগের স্থান নেই; নেই কোন অপমানজনক কিংবা শত্রুভাবাপন্ন কোন তথ্য বা শব্দের উপস্থিতি।

অপমান করার ক্ষমতার অপব্যবহার করা যাবে না

আবেগ, অনুরাগ কিংবা রাগ বা ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে কোন শব্দ কিংবা বাক্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ব্যবহার করা যাবে না। এতে প্রতিবেদকের এতদিনের পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যেতে পারে। Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists-এ বলা হয়েছে, "*Taking gratuitous hostility or aggression out of your story should be common sense: Leaving in such noise increases your legal risks, and can infuriate or humiliate your target to the point where he or she reacts violently.*"[৩৯৪] দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ভাল ও কার্যকরভাবে অনুসন্ধান করলে যে কারো বিরুদ্ধে শক্তিশালী অভিযোগের স্বপক্ষে তথ্য-প্রমাণ একজন সাংবাদিক যোগাড় করতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন ব্যক্তিগত অপমানজনক কিছু করা যাবে না। অনেক সময় যার বা যাদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদক অনুসন্ধান করছেন তিনি বা তারা বিষয়টি জেনে যেতে পারেন এবং নানাভাবে প্রতিবেদককে হয়রানি করতে পারেন। এতে প্রতিবেদক মানসিক চাপ সহ্য করতে না পারে বা আবেগপ্রবণ হয়ে আক্রমণাত্মক শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করতে পারেন। সেজন্য Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists-এ সাবধান করে

---

[৩৯৩] Ibid, Leonard M. Kantumoya (2004) p. 80.

[৩৯৪] Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists, chapter five; Organization: How to Set Yourself Up to Succeed, p. 72.

দিয়ে বলা হয়েছে, "*Reporters should be very, very careful about misusing this power. If an investigation leads to substantial charges against someone, it is generally not necessary to add personal insult to the recipe.*"[৩৯৫] নাইমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী বলেছেন, "বেশিরভাগ প্রতিবেদকই নিজেকে একেবারে ট্রান্সমিটারের চেয়ে বেশি কিছু ভাবেন না। নিজেদেরকে এমন এক ধরনের ফানেল বা টিউব তারা মনে করেন যার মধ্য দিয়ে তথ্যসমূহ শুধু সঞ্চালিত হবে! কী তারা পাঠাচ্ছেন সে সম্পর্কে তাদের তেমন কোন দায়িত্ববোধ থাকে না, তাদের একমাত্র উদ্বেগ বা বিবেচনা– যা তারা পাঠাচ্ছেন তারা যথাসম্ভব সঠিক এবং সম্পূর্ণভাবে করা হলো কি না। কিন্তু প্রতিবেদকের কাউকে বিব্রত করা, উপহাস করা, কোন একটি ঘটনাকে ভিন্ন রকম রূপ দেয়া, এমন কি ধ্বংস করার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে এইট নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে, প্রতিবেদক একেবারে একটা টিউব বা নলের চেয়ে অনেক বেশি কিছু।"[৩৯৬]

আক্রমণ করা যাবে না

অনুসন্ধানী প্রতিবেদক কাউকে আক্রমণ করার জন্য তার প্রতিবেদনটি তৈরি করবেন না। প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে মনে হতে পারে তিনি কাউকে আক্রমণ করছেন; সেক্ষেত্রে অবশ্যই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজস্ব মত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। এমনকি সেই মত অবাস্তব কিংবা অসত্য কোন ব্যাখ্যা হলেও তার মত তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে তার মত বা মন্তব্যটি যে অসত্য তাও যথোপযুক্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে তুলে ধরতে হবে। আর কেউ যদি মত প্রকাশে ইচ্ছুক না হয় সেক্ষেত্রে পাঠক/দর্শককে তাও বলে দিতে হবে। Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists-এ বলা হয়েছে, "Never, ever, ever attack someone in a story without offering them the chance to reply to your evidence. Perhaps they will offer you an absurd explanation. Quote it. Perhaps they will refuse all commentary. Tell the viewer that they chose not to reply, without suggesting that this is culpable."[৩৯৭] গাজী শামছুর রহমান তাঁর 'তদন্তমূলক ও ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকতা এবং আইন' শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন, "*সব মস্তিষ্কে একটি রং থাকে, সেই রংয়ে প্রতিবেদন রঞ্জিত হয়। রং থাকুক, আপত্তি নেই; রং-এ যেন হিংসা না থাকে, হিংস্রতা না থাকে, অসহিষ্ণুতা না থাকে।*"[৩৯৮]

ঔদ্ধত্য ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি অবজ্ঞা (Arrogance and Snobbery)

কিছু রিপোর্টার জগৎ-কাঁপানো কিছু প্রতিবেদন লিখে রাতারাতি তারকা খ্যাতি পেয়ে যান বা তারকা বনে যান। এ ধরনের তরুণ প্রতিবেদকদের ক্ষেত্রে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, এই তারকা খ্যাতি পেয়ে তারকা অনেক সময় ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। এ ধরনের ঔদ্ধত্য ও

[৩৯৫] Ibid, p. 72.

[৩৯৬] প্রাগুক্ত, নাইমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী (১৯৯৬), পৃ. ৭০

[৩৯৭] Ibid, Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009) p. 72.

[৩৯৮] আলী রিয়াজ (১৯৯৪), অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হ্যান্ডবুক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি), ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ১৯০-১৯১।

অবজ্ঞামূলক মানসিকতাসম্পন্ন প্রতিবেদকগণ ধীরে ধীরে তাদের সূত্রগুলোকে হারিয়ে ফেলেন[৪১২] অনেক সময়ই তারা পক্ষপাতমূলক বা একপেশে প্রতিবেদন তুলে ধরেন। এ ধরনের প্রতিবেদকদের পরিণতি সম্পর্ক Leonard M. Kantumoya বলছেন, "*The snobbish reporter only wants to be seen with the high and mighty, shunning grass-roots sources who are critical players in the information-gathering process. Over time, such arrogance and snobbishness shows up in half-cooked, self-opinionated stories based on superficial information.*"[৩৯৯]

ছলচাতুরী (Impersonation/Deception)

যদি প্রতিবেদকের কাছে কখনো মনে হয় তার আসল পরিচয় জানলে উৎস বা সূত্র তথ্য দিবে না সেক্ষেত্রে পরিচয় গোপন করে কিংবা ভিন্ন পরিচয়ে তথ্য সংগ্রহ করা কি নৈতিক? অনেকের কাছে এটি এক ধরনের অপরাধ। নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলোর আশ্রয় নিলে তখন ছলচাতুরী বা প্রতারণা হয়ে থাকে:

১. ভুল উপস্থাপন (মিথ্যা পরিচয়)
২. গোপন ক্যামেরা/রেকর্ডার
৩. ফাঁদে ফেলা
৪. ছদ্মবেশী রিপোর্টিং

The British Press Complaints Commission সাংবাদিকদের জন্য একটি প্রয়োজনীয় কাঠামো দিয়েছেন যেখানে তারা বলেছেন, সাংবাদিকরা এসব জনস্বার্থমূলক ক্ষেত্রে ছলছাতুরী বা প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে। এগুলো হলো:

ক. যদি কোন অপরাধ বা দুষ্কর্ম উদঘাটন করতে হয়

উদাহরণ

নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ডের অনুসন্ধানী সম্পাদক মাজহার মাহমুদ একবার জানতে পারেন রোমানিয়া ও আলবেনিয়ার একটি দুস্কৃতিকারী দল ইংল্যান্ডের সাবেক ফুটবল অধিনায়ক ডেভিড ব্যাকহামের স্ত্রীকে অপহরণের পরিকল্পনা করেছেন। পুরো চক্রটির মুখোশ উন্মোচন করতে তিনি ওই অপহরণকারী দলের সাথে ভিড়ে যান আরো কিছু প্রতিবেদককে নিয়ে।

খ. যদি প্রতিবেদনটি জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং অন্যান্য অধিকারকে সুরক্ষা করে

ধরুন, কোন প্রতিবেদক জানতে পেরেছেন কোন হাসপাতালে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এ অভিযোগ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করছে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদক হাসপাতালের চিকিৎসক সেজে তথ্য যাচাই করতে পারেন।

গ. সরকারি অর্থ লেনদেন কিংবা সরকারি চাকরি করছেন এমন ব্যক্তির ভুলপথে পরিচালিত বক্তব্য, বা আচরণ প্রতিরোধে

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন (Invasion of privacy)

অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবনের সুরক্ষার মধ্যকার দ্বন্দ্ব। সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ১২

[৩৯৯] Ibid, Leonard M. Kantumoya (2004), p. 80.

অনুচ্ছেদে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার স্বীকৃত, "*No one shall be subjected to arbitrary interference with his [sic] privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his [sic] honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*"

প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার আছে। এ অধিকারের বলে তার জীবনের ব্যক্তিগত বিষয়গুলো লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার অধিকার রাখেন যে কোন ব্যক্তি। আমাদের দেশে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার সংরক্ষণের জন্য সরাসরি আইন নেই। তবে ফৌজদারি দণ্ডবিধির মাধ্যমে আইন ব্যক্তির গোপনীয়তা রক্ষা করে। আইনে যতই সুরক্ষা দেয়া হোক না কেন কোন প্রতিবেদক যদি ব্যক্তিগত গোপনীয়তার কপাট একবার উন্মোচন করে ফেললে সে ব্যক্তির যে ক্ষতি হবে তা কোনভাবেই আর পূরণ করা যাবে না। প্রতিবেদকের প্রশ্ন এবং অবৈধ বা গোপন উপায়ে ব্যক্তির গোপনীয় কর্মকাণ্ড কিংবা এ সংক্রান্ত নথিপত্র সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। Andrew Belsey-এর মতে, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা তিন ধরনের- শারীরিক, মানসিক ও তথ্যগত গোপনীয়তা।[৪০০] মানসিক গোপনীয়তাকে তিনি বলেছেন একজন ব্যক্তির চিন্তার ও তথ্যগত গোপনীয়তা হলো তার একান্ত ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ; যেমন: মেডিকেল প্রতিবেদন, ব্যাংক তথ্য ইত্যাদি। অবশ্য Archard গোপনীয়তার লঙ্ঘনকে সংক্ষিপ্ত করে বলেছেন, একজন ব্যক্তির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার ব্যক্তিগত তথ্যগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরাই গোপনীয়তার অধিকার ভঙ্গের শামিল- "*Privacy has to do with keeping personal information non-public or undisclosed. Personal information is that set of facts about oneself a person does not wish to see disclosed or made public.*"[৪০১]

কৌশলী প্রশ্নের সাথে নৈতিকতার বিষয়টি সরাসরি জড়িত। প্রতিবেদক অনেক সময় অনৈতিক লক্ষে পৌঁছানোর জন্য কিংবা ঘটনা/বিষয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিকে বেকায়দায় ফেলতে একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারেন। যেমন ধরুন, কোন প্রতিবেদক কোন চেয়ারম্যানের আর্থিক দুর্নীতি তদন্ত করতে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন, শুনলাম আপনার বাবা চুরির দায়ে জেল খেটেছেন? এ ধরনের একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট ঘটনা/বিষয়ের সঙ্গে কি প্রাসঙ্গিক? যেমন আমাদের দেশে আইনশৃংখলা বাহিনির অত্যাচারে কিংবা হেফাজতে কেউ মারা গেলে অধিকাংশ অপরাধ বিষয়ক প্রতিবেদক নিহতের আত্মীয়-স্বজনকে প্রশ্ন করেন, মৃত ব্যক্তিটির নামে কোন মামলা আছে কিনা? এক্ষেত্রে প্রতিবেদক মামলার সংখ্যা তুলে ধরার মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা বাহিনির হেফাজতে থাকা ব্যক্তিটির মৃত্যুকে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করছেন কীনা তা নৈতিকতার প্রশ্নে বিদ্ধ হতে পারে?

আবার প্রতিবেদক কোন ব্যক্তির গোপনীয় ফাইল, চিঠি বা অন্য কোন দলিল-দস্তাবেজ দেখার জন্য অনুমতি না নিয়ে এমন কিছু পন্থা বা কৌশল অবলম্বন করেন যা ওই ব্যক্তির ব্যক্তিগত

---

[৪০০] Ibid, Andrew Belsey and Ruth Chadwick (2006), p. 83.

[৪০১] David Archard (1998), 'Privacy, the public interest and a prurient public,' in M. Kieran (ed.) Media Ethics, London: Routledge, p. 83.

গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার ভঙ্গের শামিল। অনেক সময় ব্যক্তির গোপনীয় ফাইলও প্রতিবেদকরা চুরি করেন। এক্ষেত্রে প্রতিবেদককে মনে রাখতে বিদ্যমান আইন ভঙ্গ করা কিংবা চুরি করা সবসময়ই অপরাধ।

নৈতিকতার সীমা ও ঢাল

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন, ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ বা পরিচয় গোপন করে তথ্য সংগ্রহসহ নানা ইস্যুতে প্রতিবেদকরা কতটুকু সীমা অতিক্রম করতে পারেন সে বিষয়ে কিছু মাপকাঠি আছে।

ক. জনস্বার্থ (Public interest)

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সাংবাদিকের বিশেষ অধিকার নয় -- এটি সকল নাগরিকের অধিকার। এ স্বাধীনতার বলে গণমাধ্যম মানুষকে তথ্য জানাতে পারে, শিক্ষিত করতে পারে এবং বিনোদন দিতে পারে। অর্থাৎ এই স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকলে গণমাধ্যম তার স্বীকৃত দায়িত্বগুলো পালন করতে পারে। সাধারণভাবে সাংবাদিকদের জন্য, বিশেষ করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য জনস্বার্থ হলো তাদের ব্যবহৃত কৌশলের যৌক্তিকতা নিরূপণের হাতিয়ার। বিশ্বের অধিকাংশ গণমাধ্যম নির্দেশিকা বা আচরণ বিধি অসৎ কিংবা অনৈতিক উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা যেমন, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে, ঘুষ দিয়ে অথবা প্রতারণা বা ছলনার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করাকে শুধু একটি ক্ষেত্রে অনুমতি দেয়া হয়েছে; সেটি হলো জনস্বার্থ। এজন্য Derek Forbes বলেছেন, "*For journalists in general and investigative reporters in particular, public interest is the test most often used to justify their methods.*"[৪০২] বস্তুতপক্ষে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর আঘাত প্রতিহত করার মারণাস্ত্রই হলো জনস্বার্থ।

এই জনস্বার্থ বলতে কি বোঝায়? জনস্বার্থ বলতে জনগণের আগ্রহকে বুঝায় না। অর্থাৎ জনগণের চোখে আকর্ষণীয় কোন বিষয়কে বোঝায় না। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বোঝায় যার সাথে জনসাধারণের কিংবা আইনি স্বার্থ জড়িয়ে আছে। দক্ষিণ আফ্রিকান সাংবাদিক Franz Krüger তাঁর গণমাধ্যমের নৈতিকতা শীর্ষক লেখায় বলেছেন, জনস্বার্থ হলো সাংবাদিকতার সর্বোচ্চ মানদণ্ডের যৌক্তিকতা নিরূপণের হাতিয়ার যেখানে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে:

১. কোন অপরাধ বা গুরুতর দুষ্কর্ম চিহ্নিতকরণ বা উদঘাটন;
২. গুরুতর সমাজবিরোধী কোন কর্মকাণ্ড চিহ্নিতকরণ বা উদঘাটন;
৩. জনস্বাস্থ্য বা নিরাপত্তার সুরক্ষা;
৪. ক্ষমতাবান কোন ব্যক্তির মন্তব্য বা কর্মকাণ্ড থেকে জনগণকে রক্ষা করা;
৫. কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তির কিংবা কোন পাবলিক ফিগারের ভণ্ডামি. মিথ্যা, দ্বিমুখী অবস্থান চিহ্নিত করা বা তুলে ধরা

Krüger বলেছেন, জনস্বার্থের দৃষ্টিকোণ সাংবাদিকদের অধিকারের সীমারেখা টানার ক্ষেত্রে

[৪০২] Ibid, Derek Forbes (2005) p. 55.

এই পাঁচটি বিষয়ে অনেক যুক্তিতর্কের অবকাশ আছে। কারণ গুরুতর বলতে আসলে কতটুকু গুরুতর? পাবলিক ফিগার বলতে কাকে বোঝানো হবে? ভণ্ডামি বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? এখানে অনেক সময় ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার ও জাতীয় স্বার্থের বিষয়গুলো সংঘাত তৈরি করতে পারে।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রণীত আচরণ বিধির ৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "*বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য কোনরূপ শাস্তির ঝুঁকি ছাড়াই জনস্বার্থে প্রকাশ করা। এ ধরনের জনস্বার্থে প্রকাশিত সংবাদ যদি সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে থাকে এবং প্রাপ্ত তথ্য যৌক্তিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হয়, তবে এ ধরনের প্রকাশিত সংবাদ থেকে উদ্ভূত প্রতিকূল পরিণতি থেকে সাংবাদিককে রেহাই দিতে হবে।*" ইস্যুর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য যত বেশি হবে এবং ঘটনা/বিষয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিটি যত বড় পাবলিক ফিগার বা জনব্যক্তিত্ব হবেন তত বেশি মাত্রায় সাংবাদিক ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সীমা অতিক্রম করতে পারেন।

খ. সততা (Honesty)

সততা সংবাদের প্রাণ। সাধারণভাবে বলা হয়, সত্যের সন্ধান ও তা প্রকাশ করা (seek truth and report it), সর্বনিম্ন ক্ষতিসাধন (minimise harm), জবাবদিহিতা (be accountable) ও স্বাধীনভাবে কাজ করা (act independently)- এই চারটি কাজের ভিত্তিতেই পাঠকের সঙ্গে সাংবাদিকের বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে উঠে; যে সম্পর্কের ভিত্তি হলো সাংবাদিকের সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা। সেজন্য এই চারটি কাজই নৈতিকতা মানদণ্ড নিরূপণের মূল অস্ত্র। বস্তুতপক্ষে সাংবাদিকতার মৌল বিষয় হলো সততা। তাই সততার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ সাংবাদিক যে কোন মাধ্যমের জন্য গ্রহণযোগ্য সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন। Stephen Klaidman and Tom L.Beauchamp বলেছেন, "*Reporting the truth is said to be at the heart of the journalistic enterprise.*"[৪০৩]

মিথ্যার আশ্রয়

১৯৮০ সালে হেরোইন আসক্ত আট বছর বয়সী এক বালকের ওপর ওয়াশিংটন পোস্ট-এ একটি মর্মান্তিক প্রতিবেদন ছাপানো হয়। প্রতিবেদকের নাম জ্যানেট কুকি। আর যে ছেলেটি সম্পর্কে প্রতিবেদনটি লেখা হয় তার নাম ছিল জিমি – হলদে চুলের বাদামী চোখ এবং হালকা পাতলা গঠনের বাদামী দেহের মসৃন চামড়ায় তার অসংখ্য ফোঁটা ফোঁটা সুইয়ের দাগ- হ্যাঁ জ্যানেট কুকি ওই বালকের হেরোইন আসক্ত হওয়ার বিস্তারিত কাহিনী লিখেছেন তার প্রতিবেদনে। তিনি লিখেছেন নরম তুলতুলে কেকের ভিতরে স্ট্র ঢুকানোর মত জিমি তার কোমল দেহে সুঁই ঢুকিয়ে দেয়। এভাবেই সিরিঞ্জভর্তি দূষিত তরল তার দেহের তাজা রক্তের মধ্যে মিশে যায়। জিমির কাহিনীর মাধ্যমে জ্যানেট কুকি ওয়াশিংটন শহরে তরুণদের মধ্যে হেরোইন ব্যবহারের এক ভয়াবহ বর্ণনা তুলে ধরেন। নিঃসন্দেহে এটা চমৎকার একটা সংবাদ-কাহিনী। এজন্য ১৯৮১ সালে এটি সাংবাদিকতার সর্বোচ্চ খেতাব পুলিৎজার পুরস্কারও জিতে নেয়। জ্যানেট কুকি রাতারাতি বনে যান তারকা রিপোর্টার। প্রতিবেদনে সবই ঠিক ছিল, কেবল একটি ব্যাপার ভুল ছিল। তা হলো সংবাদ-কাহিনীটি সত্য ছিল না। জিমি নামের আসলে কেউ বাস্তবে ছিল না। বরং কুকিই জিমি চরিত্রটির স্রষ্টা এবং সে নিজেই জিমির হয়ে উদ্ধৃতিগুলো লিখেছে; এবং আরো আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, পুরস্কার পাওয়ার পরে এটা প্রমাণিত হয় যে, কুকি 'ওয়াশিংটন পোস্ট' এ তার শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্যও ভুল দিয়েছেন। পরে তিনি স্বীকার করেন যে, জিমির

[৪০৩] Stephen Klaidman and Tom L.Beauchamp (1987), The Virtuous Journalist, New York, Oxford University Press, p.30.

গল্পটি তার বানানো। কুকি নিজেই স্বীকার করেন 'আমি কখনো কোনো আট বছর বয়সী বলেকের সাথে দেখা করিনি এবং সাক্ষাৎকার নিইনি' এবং তিনি 'ওয়াশিংটন পোস্ট' থেকে পদত্যাগ করেন। কুকি সংবাদ লেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম 'সততা' ভঙ্গ করেছেন।[৪০৪]

জানেট কুকি'র ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা থেকে পদত্যাগের অল্প কিছুদিন পর নিউইয়র্ক ডেইলি নিউজ পত্রিকার নিজস্ব কলামিস্ট মাইকেল ড্যালিও পদত্যাগ করেন। ড্যালি উত্তর আয়ারল্যান্ডের একটা ঘটনা নিয়ে একটি প্রতিবেদন লিখেন এবং ক্রিস্টোফার স্পেল নামে এক ব্রিটিশ সৈনিকের কথা উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেন। কিন্তু উদ্ধৃতিগুলো ছিল তার নিজের বানানো, বাস্তবে ওইসব উদ্ধৃতির বক্তব্য সৈনিকটি দেননি। ড্যালি বলেন, স্পেল ছিল একজন সৈনিকের ছদ্মনাম কিন্তু কলামে তা উল্লেখ করা হয়নি। কলামে ব্যবহৃত অন্যান্য তথ্যসমূহও এভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল।[৪০৫]

আরেকটি ঘটনা, ১৯৭২ সালে সানফ্রান্সিসকো ইগজামিনার-এর একজন রিপোর্টার চীন ভ্রমণ সম্পর্কে কয়েকটি প্রতিবেদন লিখেন কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে প্রতিবেদক কখনো হংকং- এর বাইরে যাননি। পোর্টল্যান্ড ওরিগোনিয়ন পত্রিকার একজন রিপোর্টার ওয়াশিংটনের গর্ভনর ডিক্সিলি রে-এর একটা সাক্ষাৎকার নেন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, সাক্ষাৎকারের সময় ব্যবহৃত টেপরেকর্ডার কাজ করেনি। ফলে সে নিজের স্মৃতি থেকে খেয়াল করে করে প্রতিবেদনটি লিখেন এবং কিছু উদ্ধৃতিও দিয়ে দেন। পরে 'রে' তা মিথ্যা বলে অভিযোগ তোলেন।

সাংবাদিকতায় আসলে বানোয়াট/কল্পকাহিনীর কোনো স্থান নেই। অনেক সময় প্রয়োজনে কাউকে বিপদ না ফেলতে চাইলে আসল নাম উল্লেখ না করে ভিন্ন নাম দেওয়া যেতে পারে, তবে অবশ্যই তার কারণ পাঠককে বোঝাতে হবে। এমনকি অনেক সময় সংবাদ-উৎসও ভুল তথ্য দিতে পারে তাই সোর্সের মন্তব্যের ক্ষেত্রে সোর্সের কথা সরাসরি উল্লেখ করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, সততার কোনো কর্মশালা হয় না – যোগ্যতা/দক্ষতার ঘাটতি থাকলে প্রশিক্ষণ/কর্মশালা করে তা পূরণ করা যায় কিন্তু সততার ঘাটতি পূরণ করা যায় না; এটা থাকতে হয় – ব্যক্তির বেড়ে ওঠা, সামাজিকীকরণ, চরিত্র আর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে।

অধিকাংশ সাংবাদিক মনে করেন, কদাচিৎ এসব ঘটনা ঘটে। কিন্তু কেউই অস্বীকার করে না যে, মাঝে মাঝে তারা এমন কিছু বিষয় লিখেন যা সম্পর্কে তারা পুরোপুরি নিশ্চিত নন, অনেক সময় উদ্ধৃতি নিজ থেকে বানিয়ে দেন এবং বক্তার বক্তব্যকে কখনো নাটকীয়ভাবে, কখনো নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে কমিয়ে/বাড়িয়ে বলেন। মনে রাখতে হবে, মাধুরী সিনেমায় দারুণ মানায়; এমনকি সাহিত্যে বেশ স্বাগত জানানো হয় মনের মাধুরীকে; কিন্তু সাংবাদিকতায় তা সর্বৈব পরিত্যাজ্য। এ ধরনের চর্চা কতটুকু বেশি/কম পরিমাণে হয়ে থাকে তা বড় কথা নয়, আসল কথা হলো এ ধরনের চর্চা সাংবাদিকতায় চলবে না। প্রতিবেদককে তাঁর পাঠকের প্রতি অবশ্যই সৎ হতে হবে। যদি আপনি কোন ব্যক্তির পরিচয় রক্ষার স্বার্থে কাল্পনিক নাম ব্যবহর করেন, তাহলে অবশ্যই তার যৌক্তিকতা পাঠককে জানাতে হবে। যেমন এইডস রোগী, শিশু, ধর্ষণের শিকার। অতএব, যখনই আপনি কোনো সংবাদ লিখতে যাবেন, তখনই নিজেকে নিচের প্রশ্নগুলো অবশ্যই করে নিবেন:

১. লিখিত প্রতিবেদনটি কি পুরোপুরি সত্য?

[৪০৪] Washington Post, 19 April, 1981, p. 14A.
[৪০৫] Newsweek, 4 May, 1981, p. 51.

২. ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলো কি যে রকম বলা হয়েছে হুবহু সে রকম আছে?

৩. প্রতিবেদন বাস্তবে যা, তাকে আপনি রসালো/আকর্ষণীয় করার জন্য হোক বা আবেদনধর্মী করার জন্য হোক, কোন রকম পরিবর্তন করেছেন?

- যদি এসব প্রশ্নের উত্তরে আপনি পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত না হোন তাহলে দোহাই ছাপানোর জন্য সম্পাদককে তা জমা দিবেন না।
- সর্বোচ্চ পরিমাণ সততা নিশ্চিত করার পরেই কেবল আপনি প্রতিবেদনটি জমা দিবেন।
- এটাই নিজের বিবেকের কাঠগড়ায় নিজেকে দাঁড় করানো – সততা পরিমাপের সবচেয়ে কার্যকর গজকাঠি।

গ. যথার্থতা (Accuracy)

সততার প্রমাণ রাখতে হয় চারিত্রিক দৃঢ়তা দিয়ে আর যথার্থতার প্রমাণ দিতে হয় নিজের ও কাজ করার যোগ্যতা দিয়ে। আপনি যা লিখেছেন তাতে শুধু সততা থাকলেই এটা সত্য হয়ে উঠে না বরং এটা অবশ্যই সত্য হতে হয়। অর্থাৎ কেবল আপনার ব্যক্তিগত সততা একটি প্রতিবেদককে যথার্থ করে তোলে না। পরীক্ষায় শিক্ষকগণ ৯০-৮০-৭০-৬০ এভাবে নম্বর দিয়ে থাকেন। উত্তর ৯০% সঠিক হলে পায় 'এ' গ্রেড, ৮০% ঠিক হলে 'বি' গ্রেড, কিন্তু সংবাদ লিখনে নম্বর প্রদানের এই ফর্মুলা কাজ করে না। এখানে ৯০% উত্তর সঠিক মানে 'এফ' গ্রেড দেওয়া হয়। পরীক্ষায় ৩৩ পেলে পাশ কিন্তু সংবাদে ৯৯ পেলে ফেইল। গ্রেস নাম্বারের কোনো সুযোগ নেই। হয় পাশ নয় ফেইল, মাঝামাঝি বলে কিছু নেই। সংবাদকে ১০০% সঠিক হতে হবে অন্যথায় তা ভুল/ব্যর্থ সংবাদ বলে বিবেচিত হবে। Doug Newsom I James A. Wollert Lye চমৎকারভাবে বলেছেন, "*Honesty has to do with character, accuracy with competence. It's not enough to believe what you've written is true. It must be true.*"[৪০৬]

পাঠক/দর্শক বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ চায়। তাদের আস্থা গড়ে উঠে যথার্থ সংবাদকে ঘিরে। মার্কিন সাংবাদিক জোসেফ পুলিৎজার তাঁর সকল সহসম্পাদক ও প্রতিবেদককে এই গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্ল্যাকার্ডে প্রায়শ বড় বড় হরফে 'যথার্থতা', 'যথার্থতা' এবং 'যথার্থতা' শব্দাবলী লিখে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিতেন। সাংবাদিকতায় দায়িত্বহীন ভুলের কোন অবকাশ নেই। যে কোন সংবাদ মাধ্যমের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো তার পাঠক-দর্শক-শ্রোতার আস্থা। যথার্থতাই এ মূল্যবান সম্পদকে যথাযথভাবে সুরক্ষা দিতে পারে।

ভুল পরিহার করা সহজ নয়। কারণ পরিহার করার মতো ভুল অনেক আছে। এ ভুলের পরিমাণ বানান থেকে শুরু করে জায়গার নাম, ব্যক্তির নাম, মৃতের সংখ্যা এবং বিবৃতি থেকে শুরু করে ঘটনার নানা তথ্যগত ভ্রান্তি সবই হতে পারে। এ রকম ভুলের অনেক কারণও আছে। অনেকসময় সময়সীমার চাপে তা হয়ে থাকে, অনেক সময় রিপোর্টটির পেছনের বিস্তারিত তথ্য জানা না থাকার ফলে হয়ে থাকে। অনেক সময় ভুল হয় প্রতিবেদকের তথ্যটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে যাচাই করার তোয়াক্কা না করার ফলে।

---

[৪০৬] Doug Newsom & James Wollert (1985), Media Writing: News for the Mass Media, Wardsworth Publishing Company Belmont, California, p. 33.

ঘ. পক্ষপাতহীনতা (Fairness)

Doug Newsom I James A. Wollert বলেছেন, "*Honesty, though essential, is not enough. Nothing in Journalism is worse than dishonesty, but an honest mistake is almost as bad. Accuracy amd fairness must accompany honesty; good intention are not sufficient.*"[৪০৭] সাংবাদিকতায় সততা জরুরি, তবে এটাই যথেষ্ট নয়। অসততার মতো নিন্দনীয় বিষয় সাংবাদিকতায় আর কোনো কিছুই নেই। আবার উদ্দেশ্য সৎ ছিল কিন্তু লেখার সময় ভুল হয়ে গেছে – না, সাংবাদিকতায় এর কোনো স্থান নেই। সাংবাদিকতায় 'সৎ ইচ্ছাই' যথেষ্ট নয়। 'সততার' সাথে সাথে একজন সাংবাদিকের প্রতিবেদনে যথার্থতা এবং পক্ষপাতহীনতা'র গুণটিও থাকতে হবে। Doug Newsom ও James A. Wollert আরো বলেছেন, "*Good journalists are always accurate. But a cxompletely accurate story is not good journalism unless it is fair as well.*"[৪০৮] Paul Pratte সাংবাদিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে পক্ষপাতহীনতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, "*Impartiality meant a clear distinction between news reports and expressions of opinion.*"[৪০৯]

ভালো সাংবাদিকরা সব সময় নির্ভুল হয়ে থাকেন, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভুল সংবাদও ভালো সংবাদ না, যদি না এটি পক্ষপাতহীন সংবাদ হয়, ভারসাম্যপূর্ণ (Balanced) হয়। অবশ্যই যথার্থতা পক্ষপাতহীনতার একটি অংশ কিন্তু ঝানু সম্পাদকগণ তাঁর রিপোর্টারদের সর্তক করে দেন এই বলে যে, যথার্থতা সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেমন: একগুচ্ছ তথ্য যার সবটাই সঠিক। কিন্তু তাতেও একটা বিশেষ প্রবনতা যোগ করে এবং পক্ষপাতিত্বমূলকভাবে তুলে ধরা যেতে পারে। সেজন্য নিউইয়র্ক টামইসের স্টাইলবুকে বলা হয়েছে, "*A number of facts, each accurate can be juxtaposed and presented in a tendentious, unfair manner.*"[৪১০] তবে পক্ষপাতহীনতা একটি 'বিভ্রান্তিকর' ধারণা-কারণ কোন্টা পক্ষপাতমূলক, কোনটা পক্ষপাতমূলক না সেটা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য না হলেও কঠিন। পক্ষপাতহীনতার মতবাদ (Fairness Doctrine): আমেরিকার The Federal Communication Commission (FCC) জনস্বার্থে কিছু নীতিমালা গ্রহণ করেছে: সকল রেডিও-টিভি চ্যানেলের উচিত;

১.জনস্বার্থমূলক বিষয় তুলে ধরা
২.এবং এসব বিষয় নিয়ে নিরপেক্ষ সংবাদ করা।

যদি কোনো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান উপরিল্লিখিত বিষয়গুলো পালন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সেটি তার লাইসেন্স হারাবে।

একজন ভালো সাংবাদিককে তার প্রতিবেদনে পক্ষপাতহীনতার গুণটি অর্জনের জন্য নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হয়।

ক. সব দিক তুলে ধরা (Giving All Sides)

একটা সংবাদে অনেকগুলো মতামতের অবতারণা হতে পারে। সংবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল

---

৪০৭ Ibid, p. 32.
৪০৮ Ibid, p. 33.
৪০৯ Paul Pratte (1995), Gods within the machine: A history of the American Society of Newspaper Editors: 1923–1993, Westport: CT: Praeger, p. 205–207.
৪১০ Lewis Jordan (ed.) (1976), The New York Times Manual of Style amd Usage, New York: Times Books, p. 75.

মতামত তুলে ধরতে হবে। তাতে বিরোধী/উভয় পক্ষের মতামতও তুলে ধরতে হবে। যদি কোনো সরকারি কর্মকর্তা বলেন যে, সরকারি ব্যয়ের কারণেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, প্রতিবেদকের উচিত অন্য মতাবলম্বী কোনো যোগ্য ব্যক্তির কাছে গিয়ে ভিন্ন/বাড়তি তথ্য খুঁজে বের করা । প্রতিবেদনে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবপক্ষের বক্তব্য তুলে ধরার বিষয়টি প্রতিবেদকের প্রাত্যহিক কাজের অভ্যাসে পরিণত করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে ওয়াশিংটন পোস্টের স্টাইলবুকে।[৪১১]

যখন একজন ব্যক্তিকে তার ভুল কাজের জন্য অভিযুক্ত করা হয়, তখন সবদিক তুলে ধরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি ক, খ সম্পর্কে খারাপ বলে, তাহলে খ এর মন্তব্য অবশ্যই সংবাদে থাকতে হবে। যেমন মেয়র হয়তো বলতে পারেন নতুন গৃহায়ণ প্রকল্প ভালো কিন্তু একজন স্থানীয় জমির মালিক বা আবাসিক শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ী তা দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। একজন প্রতিবেদকের উচিত ভিন্নমতের তথ্য সমান গুরুত্ব দিয়ে সংবাদে তুলে ধরা। যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অভিযুক্ত/সমালোচিত হয়েছে তাদের কথা বলতে দেওয়া এবং তা সংবাদে সংযুক্ত করা জরুরি। এজন্যই একজন প্রতিবেদকের উচিত অভিযুক্ত বা সমালোচিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে যাওয়া এবং তাদের কথা তুলে ধরা। যদি রিপোর্টার অভিযুক্তের কাছে পৌঁছতে না পারে, তাহলে বলে দেওয়া উচিত সে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল। একটা সংবাদের সবদিক উল্লেখ করা মানে সংবাদকে বস্তুনিষ্ঠ করে তোলার সমতুল্য ব্যাপার। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠতা একটা বিপজ্জনক শব্দ যা একেক ব্যক্তির কাছে এক এক অর্থ বুঝায়।

সকল প্রকার কুসংস্কার/পক্ষপাতমুক্ত হওয়া এক অর্থে বস্তুনিষ্ঠতা কিন্তু বাস্তবে কোনো সম্পাদক, প্রতিবেদক বা পাঠকই পুরোপুরি পক্ষপাত বা কুসংস্কারমুক্ত নয়। এমনকি প্রতিবেদক বা টিভি ক্যামেরার সামনে লোকজন যা বলে, তারা টিভি ক্যামেরা বা সংবাদপত্রকর্মী উপস্থিত না থাকলে সেটা বলে না। প্রতিবেদক কতটুকু ক্যামরোর সামনে থাকেন বা থাকেন না সেটা কোন ব্যাপার নয় বরং তারা যে উপস্থিত থাকেন সেটাই মূখ্য বিষয় এবং সেটা ঘটনাকে প্রভাবিত করে। কাজেই সংবাদে সব দিক তুলে ধরলে নিশ্চিত ভাবে বস্তুনিষ্ঠতা অর্জিত হয় এটা একটা পুরোপুরি ঠিক না, তবে বস্তুনিষ্ঠতার কাছাকাছি যাওয়া যায়। অনেক সাংবাদিকদেরই একটা নিজস্ব ঝোঁক, ধারণা এবং কুসংষ্কারাচ্ছন্ন মন আছে যা তার অনুধাবন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। আসলে একটি প্রতিবেদনের সবদিক তুলে ধরে একজন প্রশিক্ষিত সাংবাদিক বস্তুনিষ্ঠতার ঘাটতি পুরণ করতে চান। সাংবাদিকদের নিজস্ব মতামত, চিন্তা-ধারণা থাকা মানে এই নয় যে, তারা তা সংবাদে তুলে দিবেন। সংবাদে কখনই তার নিজস্ব মন্তব্য দেওয়া উচিত নয়।

খ. আরোপণ (Attribution)

আরোপণ পাঠককে তথ্য কোথা হতে আসে তা জানায়। আরোপন দিয়ে বাক্যে ব্যবহৃত তথ্যটির উৎসস্থল কে তা বুঝায়। যদি না সংবাদটি রিপোর্টার কর্তৃক প্রত্যেক্ষদর্শী হয়, তাহলে অবশ্যই এটার সূত্র উল্লেখ করতে হবে। সহজে বোঝা অথবা পরীক্ষা করা যায় এমন কোনো বিষয়ে সূত্র উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, যেমন: ‘ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী’ এ বিষয়ে সবাই অবগত এবং তা কে বলেছে তা পাঠককে উল্লেখ করতে হবে না, কেউ এটা নিয়ে তর্ক করবে না এবং যদি জানতে চায় তাহলে সহজেই যাচাই করে দেখতে পারবে। অক্সিজেন এবং

[৪১১] Robert A. Webb (ed.) (1978), The Washington Post Deskbook on Style, New York: McGraw-Hill, p. 4. .

** বিগত কয়েক বছরে বিমান ভাড়া হাস্যকরভাবে বেড়ে গেছে।

উপরে শব্দসমূহ সৃজনশীল, প্রগতিশীল, চমকপ্রদভাবে, হাস্যকরভাবে - মূলত তথ্য প্রকাশ না করে মন্তব্য প্রকাশ করে। লক্ষ করুন:

** কোম্পানিটির নতুন এবং উন্নয়নমূলক ধারা একে দেশের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানে তুলে এনেছে - বলেছেন আনিসুল হক, একজন স্থানীয় অর্থ বিশেষজ্ঞ।

** ক্লাবটির সদস্যসংখ্যা প্রথম দিকে ধীরগতি ছিল - বলেন এর সভাপতি, কিন্তু এটি তিন বার সেবামূলক পুরস্কার জিতে।

** গত তিন বছরে বিমান ভাড়া প্রায় ৮৫% বেড়েছে, বিমান সংস্থার হিসাব মতে।

মনে রাখতে হবে আপনার পছন্দনীয় মন্তব্য একটা সংবাদে অপছন্দনীয় মন্তব্যের মত খারাপ। পক্ষপাতহীন হওয়া মানে কেবল সংবাদের বিষয়গত দিক দিয়ে হওয়াকে বুঝায় না। বরং যারা আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করে তাদের প্রতি সৎ হওয়াটাই পক্ষপাতহীনতা।

ঘ. পক্ষপাতদুষ্ট ভাষা পরিহার করা (Avoiding Biased Language)

পক্ষপাত আসলে ফুটে উঠে একজন সাংবাদিকের শব্দ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। আপনার ব্যবহৃত বিশেষ্য, সর্বনাম এবং অনেক অপ্রয়োজনীয় বিশেষণ ব্যবহারের মাধ্যমে। যেমন: যদি একটি পত্রিকার বাণিজ্য পাতায় সব সময় বিজনেসম্যান লেখা হয় তাহলে নারীরা নিজেদেরকে ব্যবসার বাইরে মনে করবে। যদি সে শুনে সংবাদকর্মীরা সব সময় পুরুষ হয় এবং পত্রিকায় সবসময় দেখে যে সাংবাদিকের স্থলে সবসময় পুরুষ বাচক সর্বনাম (He) ব্যবহৃত হয় তাহলে নারীরা নিজেকে সেখান থেকে গুটিয়ে নেবে। ..ক্যামেরাপার্সন ..আসলে পুরুষবাচক শব্দ ব্যবহার করলে নারী পুরুষ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, বরং বহির্ভূত করা হয়।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও আইন

গাজী শামছুর রহমান বলেছেন, “সাংবাদিকের জীবন বড় কঠিন। তার চারিদিকে বিপদের কাঁটা। কাঁটাবনে বিহার তাকে করতেই হয়। আইন জানা থাকলে সেই কাঁটা এড়িয়ে যাবার সুযোগ পাওয়া যায়।”[৪১৩] আধুনিক ও গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব ও অধিকার আইন দ্বারা স্বীকৃত এবং সীমিত। আমাদের দেশে আইন সাংবাদিককে বিশেষ কোন অধিকার দেয়নি। বরং একজন ব্যক্তি হিসেবে তিনি অন্যান্য ব্যক্তির মতো একজন সাংবাদিক কিছু অধিকার লাভ করেন। আবার এসব অধিকারের সীমারেখাও টানা আছে। অর্থাৎ কতটুকু অধিকার তিনি ভোগ করবেন তা আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা আছে। এ কারণে জনকল্যাণ বা জনস্বার্থ সংরক্ষণ যে উদ্দেশ্যেই একজন সাংবাদিক পরিচালিত হোন না কেন সাংবাদিককে তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিদ্যমান আইনের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। নৈতিকতা বা পেশাগত নীতিমালা না মানলে সাংবাদিককে ভৎর্সনার শিকার হতে হয়; কিন্তু আইন ভঙ্গ করলে অবশ্যই দণ্ড পেতে হবে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বিশেষ করে দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করার সময় একজন সাংবাদিক প্রায়ই স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। আবার অনিয়ম ও দুর্নীতি খবর বের করতে গিয়ে অনেক কৌশলের আশ্রয় নেন। এজন্য বিদ্যমান কিছু আইন এ কাজের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী আইনের তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন করতে গিয়ে এসব আইনের ব্যতয় ঘটলে

[৪১৩] গাজী শামছুর রহমান (১৯৮৪), সংবাদ বিষয়ক আইন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৮৪, পৃ ৩৬।

২৬.	জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ	১৯৮৬ (১৯৮৮ সালে সংশোধিত)
২৭.	সংশোধিত বিজ্ঞাপন নীতিমালা	১৯৮৭
২৮.	বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে বিদেশী ছবি নির্বাচনের নীতিমালা	১৯৮৮
২৯.	বিটিভির জন্য সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুষ্ঠান সরবরাহ নীতিমালা	১৯৯১
৩০.	স্ট্যান্ডার্ড রিলিজিং রেট অব বিটিভি ফ্যাসিলিটিজ (সংশোধিত)	১৯৯১
৩১.	ভিডিও টেপ ও ১৬ মিঃমিঃ ফিল্মে ধারণকৃত অনুষ্ঠান/সংবাদচিত্র আর্কাইভিং নীতিমালা	১৯৯২
৩২.	সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা ও সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি	১৯৯৩ (২০০২ ও ২০০৩ সালে সংশোধিত)
৩৩.	বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ আইন	২০০১
৩৪.	বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ আইন	২০০১
৩৫.	টেলিকমিউনিকেশন অ্যাক্ট	২০০১ (২০০৬ সালে সংশোধিত)
৩৬.	বাংলাদেশ টেলিভিশনে বেসরকারী উদ্যোগে নির্মিত অনুষ্ঠান নীতিমালা	২০০১
৩৭.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা	২০০২
৩৮.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন	২০০৬
৩৯.	কেবল টেলিভিশিন নেটওয়ার্ক আইন	২০০৬
৪০.	কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালা	২০০৮
৪১.	তথ্য অধিকার আইন	২০০৯
৪২.	বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য টেরিস্ট্রেরিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচার সুবিধা	২০০৯

কাজের ক্ষেত্র ও পরিধি বিবেচনা করে বাংলাদেশে বিদ্যমান গণমাধ্যম সম্পর্কিত আইনগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়ের আইনগুলো অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ও জড়িত। সেগুলো হলো:

১. সাংবিধানিক অধিকার ও মানবাধিকার সনদ;
২. তথ্য অধিকার;
৩. জননিরাপত্তা;
৪. রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা;
৫. মানহানি;
৬. অশ্লীলতা;
৭. ধর্মবিশ্বাস; ও
৮. আদালত অবমাননা

১. সাংবিধানিক অধিকার ও মানবাধিকার সনদ

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ছিল "*Common Standard of achievement for all Peoples and all Nations*"। এ সনদের ১৯ ধারায় বলা আছে, "প্রত্যেকেরই মতামতের ও মতামত প্রকাশের স্বাধীকার রয়েছে; বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং যে কোন উপায়াদির মাধ্যমেও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।" অনুরূপ বিধান লক্ষ্য করা যায় নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রে (International Convenant on Civil and Political Rights-ICCPR), মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সংক্রান্ত ইউরোপীয় চুক্তিপত্রে (European Convenant on Human Rights and Fundamental Freedoms-EHR) এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত মার্কিন চুক্তিপত্রে (American Convenant on Human Rights-AMR)। ২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর

বাকস্বাধীনতার তৃতীয় সীমা: অশ্লীলতা

অশ্লীল কোন কিছু প্রকাশ করা যাবে না। কারণ বাকস্বাধীনতা মানুষকে অশ্লীল হবার অধিকার দেয় না।

বাকস্বাধীনতার চতুর্থ সীমা: রাষ্ট্রদ্রোহিতা

রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক যে কোন ধরনের তথ্য বা বক্তব্য প্রকাশ বা প্রচার করা আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যেসব তথ্য, উক্তি মানুষের মনে রাষ্ট্রের প্রতি হিংসা বা ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করে, সেসব তথ্য ও উক্তি পর্যন্ত বাকস্বাধীনতার সীমা পৌঁছায় না।

বাকস্বাধীনতার পঞ্চম সীমা: শান্তিভঙ্গ

শান্তিভঙ্গমূলক যে কোন ধরনের তথ্য প্রকাশ/প্রচার আইনের দৃষ্টিতে অমার্জনীয়। এ কারণে রাষ্ট্র ও সমাজের শান্তি বিনষ্ট করে এমন তথ্য প্রকাশ/প্রচার কখনই বাকস্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

বাকস্বাধীনতার ষষ্ঠ সীমা: জরুরি অবস্থা

বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ 'জরুরি অবস্থায়' স্থগিত রাখবার বিধান রাখা হয়েছে সংবিধানের নবম-ক ভাগে। সংবিধানের ১৪১ (খ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত বিধানাবলীর কারণে রাষ্ট্র যে আইন প্রণয়ন করিতে ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন, জরুরি-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে এই সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ অনুচ্ছেদসমূহের কোন কিছুই সেইরূপ আইন-প্রণয়ন ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিবে না; তবে অনুরূপভাবে প্রণীত কোন আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা ব্যতীত অনুরূপ আইন যে পরিমাণে কর্তৃত্বহীন, জরুরী-অবস্থার ঘোষণা অকার্যকর হইবার অব্যবহিত পরে তাহা সেই পরিমাণে অকার্যকর হইবে।"

২. তথ্য অধিকার

"সত্যজিৎ রায়ের সেই যে বিখ্যাত ছবি 'হীরক রাজার দেশে', যেখানে বন্ধ করা হচ্ছে পাঠশালা; কেন পাঠশালা বন্ধ? রাজা বলছেন, 'যত জানবে, তত কম মানবে'। কী সাংঘাতিক কথা। তাইতেই তো সে কালের রাজা আর এ কালের সরকার বাহাদুর জনগণকে জানাতে ভয় পায়, পাছে না তারা কম মানে, পাছে না তারা রাজা/সরকারের অবিচার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা ক'য়ে উঠে।"[৪১৯] একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাফল্যের জন্য তার তথ্যভাণ্ডারের উন্মুক্ততা খুব দরকার। জনগণের জন্য সরকারের তথ্য যদি উন্মুক্ত না হয় এবং তথ্যপ্রাপ্তির স্বাধীনতা নিশ্চিত না থাকে তাহলে সেই সরকার একটি প্রহসন ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে না। তথ্য জানার নাগরিক অধিকার একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের খুঁটি। অমর্ত্য সেন বলেছেন, রাষ্ট্রে তথ্যের প্রবাহ অবাধ হলে, গণতন্ত্রের পূবশর্ত যা, ঠেকানো যায় এমনকি দুর্ভিক্ষও। খোলামেলা প্রশাসনের গুরুত্ব বর্ণনা করে এস. পি. গুপ্ত'র মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, "*জানার অধিকার হচ্ছে জ্ঞানের অধিকার*"।[৪২০]

---

[৪১৯] রোবায়েত ফেরদৌস ও ভবেশ দাশ (সম্পাদিত) (২০০৭), তথ্যের অধিকার, চারদিক, ঢাকা।

[৪২০] এম. আমীর-উল-ইসলাম (২০০০), জানার অধিকার মুক্তির অধিকার, নিরীক্ষা: প্রেস ইনস্টিটিউটের গণমাধ্যম সাময়িকী, ৯৬ তম সংখ্যা, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ৩।

হাইড্রোজেন মিলে যে পানি হয় এ কথারও সূত্র উল্লেখ দরকার নেই, যদিও সবাই এটা না জানতে পারে, তবুও এটা নিয়ে কেউ বিতর্ক করবে না। যেকোনো রেফারেন্স বইয়ে অথবা প্রয়োজনে ল্যাবে গিয়ে এটা জানা যাবে। কিন্তু যেসব তথ্য সাধারণভাবে জানা যায় না বা চাইলেই সহজে জানা যায় না, তা অবশ্যই সূত্র উল্লেখ করে দিতে হবে। প্রতিটি মতামতধর্মী বিবৃতির সূত্র উল্লেখ করতে হবে। কত মানুষ তা বিশ্বাস করে তাতে কিছু যায় আসে না। সেটা সূত্র উল্লেখ করতে হবেই। নিচের বিবৃতিটি একটি অনুমানভিত্তিক সংবাদের অংশ মনে হয়।

যেমন: বাংলাদেশ-নেপালের পাঁচ বছরের বিদ্যুৎ চুক্তি ২০১৪ সালে শেষ হয়ে যাবে।
উপরের বাক্যটিতে কথাটি কে বলেছে তা বলে দিতে হবে।

যেমন: 'বাংলাদেশ-নেপালের পাঁচ বছরের বিদ্যুৎ চুক্তি ২০১৪ সালে শেষ হযে যাবে'- বলেছেন জ্বালানি মন্ত্রী।

মনে রাখতে সূত্র উল্লেখ করার মূল লক্ষ্য যথার্থতাকে নিশ্চিত করা। একজন প্রতিবেদকের তথ্য প্রাপ্তির জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা হতে হয় । যেমন, আগামী বাজেট কৃষি নির্ভর হবে - বলেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত। এক্ষেত্রে যদি প্রতিবেদক অর্থমন্ত্রীর নাম উল্লেখ না করতেন, তাহলে এটি হবে আরোপণ জনিত সমস্যা।

গ. সম্পাদকীয় মন্তব্য পরিহার করা (Avoiding Editorial Comment)

নবীন সাংবাদিককরা প্রায়ই সংবাদে তাদের মন্তব্য দিয়ে থাকেন মনের অজান্তে। কিন্তু মন্তব্য থাকবে সম্পাদকীয় পাতায়, সংবাদে নয়। হলুদ সাংবাদিকতার যুগেই এটা করা হতো। ওই সময় এমনকি কটুক্তিপূর্ণ কথাও লেখা হতো সংবাদে, এখন সে যুগ শেষ। সাংবাদিকদের উচিত সংবাদ থেকে সম্পাদকীয় মন্তব্য বাদ দেওয়া। নবীন সাংবাদিকদের উদ্দেশে ১৮৬৬ সালে ওয়াংশিটনের এসোসিয়েটেড প্রেসে Lawrence Gobright লিখেছিলেন, "*My business is merely to communicate facts. My instructions do not allow me to make any comments upon the facts which I communicate.*"[৪১২] অনেক সময় এই সব মন্তব্য অগোচরে থাকে। যদি আপনি লিখেন যে বক্তব্যটি 'চমৎকার' অথবা 'আনন্দদায়ক' তাহলে একজন প্রতিবেদক হিসেবে আপনি নিশ্চিতভাবে সীমালজ্ঞন করলেন। সবার কাছে হয়তো বক্তবটি চমৎকার অথবা মজাদার নাও হতে পারে। এসব শব্দ সাংবাদিকের নিজস্ব মূল্যায়নকে তুলে ধরে। যা সত্যিই পরিহার করা উচিৎ । সাংবাদিকের উচিৎ সত্যের প্রতি লেগে থাকা। যদি এ ধরনের কোনো মন্তব্য দরকার হয় তাহলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে নিন, যিনি এই ধরনের মন্তব্য করতে পারেন এবং তাকে উদ্ধৃত্ত করুন। নিচে এমন কিছু বাক্য দেওয়া আছে:

** নিজেকে দেশের শীর্ষ কোম্পানি হিসেবে তুলে ধরার জন্য প্রতিষ্ঠানটি অন্য একটি সৃজনশীল চিন্তাধারা এবং প্রগতিশীল অনুশীলন পদ্ধতি চালু করেছে।

** ক্লাবটির সদস্য সংখ্যা প্রথম দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে না বাড়লেও এটার কাজের উন্নতি ছিল বেশ চমকপ্রদ।

---

[৪১২] Quoted in D. Mindich (1998), Just the facts: How "objectivity" came to defi ne American journalism, New York: New York University Press, p. 109.

একজন সাংবাদিক দণ্ডিত হতে পারেন। Leonard M. Kantumoya বলেছেন, "*It is worth noting from the outset that, no matter how free a society is, there are laws that set out limits to media freedom and, therefore, impinge on media practice. However, the freer the society is, the less restrictive are its laws governing the media. Reporters are not exempted from civil and criminal laws that apply to all other citizens.*"[৪১৪] বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, আইন অর্থ কোন অ্যাক্ট, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশ আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন প্রথা বা রীতি। বাংলাদেশে গণমাধ্যমের সব ধরনের শাখা বা খাতকে প্রভাবিত করে এমন ৪৩টি আইন, বিধি ও নীতিমালা বৃটিশ আমল থেকে এ পর্যন্ত প্রণীত হয়েছে। এসব খাতওয়ারী নীতিমালা ও বিধিবিধানই এ পর্যন্ত আমাদের গণমাধ্যম আইন ও নীতিমালার প্রয়োজন মেটাচ্ছে। কিন্তু এসব নীতিমালা ও বিধিবিধান খণ্ডিত হওয়ায় এগুলোর রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা এবং অনেক সময় পারস্পরিক সাংঘর্ষিকও বটে। অনেক আইন ইতোমধ্যে কার্যকারিতা হারিয়েছে, অনেক নীতিমালা এবং আইনে রয়ে গেছে অস্পষ্টতা।[৪১৫]

গণমাধ্যম সম্পর্কিত বাংলাদেশে প্রণীত আইন ও নীতিমালাসমূহ[৪১৬]

ক্রমিক নং	আইন/বিধি/নীতিমালার শিরোনাম	সাল
১.	দণ্ডবিধি	১৮৬০
২.	টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট	১৮৮৫
৩.	ফৌজদারি কার্যবিধি	১৮৯৮
৪.	সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট	১৯১৮
৫.	অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট	১৯২৩
৬.	আদালত অবমাননা আইন	১৯২৬ (২০১৩ সালে নতুন বিল পাস)
৭.	ওয়ারলেস টেলিগ্রাফি অ্যাক্ট	১৯৩৩
৮.	সেন্সরশিপ অব ফিল্ম অ্যাক্ট	১৯৬৩
৯.	টেলিভিশন কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স	১৯৬৭
১০.	টেলিভিশন রিসিভিং এপারেটাস (প্রোসেশন এন্ড লাইসেন্সিং) রুলস	১৯৭০
১১.	পাকিস্তান টেলিভিশন করপোরেশন অর্ডার (স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ টেলিভিশন করপোরেশন অর্ডার হয়ে যায়)	১৯৭২
১২.	প্রিন্টিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশনস (ডিকলারেশন এন্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট	১৯৭৩
১৩.	প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট	১৯৭৪
১৪.	স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট	১৯৭৪
১৫.	নিউজপেপার এমপ্লয়িস (কনডিশন অব সার্ভিস) অ্যাক্ট	১৯৭৪
১৬.	নিউজপ্রিন্ট কন্ট্রোল অর্ডার	১৯৭৪
১৭.	নিউজপেপার (এনালমেন্ট অব ডিকলারেশন) (বাতিলকৃত) অর্ডিন্যান্স	১৯৭৬
১৮.	মার্শাল ল' অর্ডার	১৯৭৬
১৯.	বাংলাদেশ সেন্সরশিপ অব ফিল্মস রুলস	১৯৭৭
২০.	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা অর্ডিন্যান্স	১৯৭৯
২১.	এডভার্টাইজিং পলিসি ফর বাংলাদেশ বেতার	১৯৭৯
২২.	বাংলাদেশ বেতারের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের অনুমোদিত নীতিমালা	১৯৭৯
২৩.	রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান নীতিমালা	১৯৮৫
২৪.	কোড ফর সেন্সরশিপ অব ফিল্মস ইন বাংলাদেশ	১৯৮৫
২৫.	বাংলাদেশ টেলিভিশন চলচ্চিত্র সেন্সরবিধি	১৯৮৬

[৪১৪] Ibid, Leonard M. Kantumoya (2004), p. 83.

[৪১৫] এস এম শামীম রেজা ও মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী (২০১০), জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা: একটি কালানুক্রমিক সমীক্ষা ও উদ্যোগের মূল্যায়ন, সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা, [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-ডি], খন্ড ৪, সংখ্যা ৪, পৌষ ১৪১৬।

[৪১৬] তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন ও বিধি বিধানের সংকলন, মে, ২০০৮; Ges http://bdlaws.minlaw.gov.bd

বাংলাদেশ ১৯৬৬ সালের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিটি সমর্থন করেছে।

আন্তর্জাতিক এসব সনদ ও চুক্তিপত্রের মতো বাংলাদেশের সংবিধানেও তার নাগরিকদের স্বাধীন মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও কথা বলার স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার কথা ধ্বনিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩৯: চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা

(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

এখানে সাংবাদিকদের একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত এই তিনটি স্বাধীনতা আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধের অধীন,[৪১৭]

ক. রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বাথে

খ. বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের স্বাথে

গ. জনশৃংখলার স্বার্থে

ঘ. শালীনতার স্বার্থে

ঙ. নৈতিকতার স্বার্থে

চ. আদালত অবমাননা সম্পর্কে

ছ. মানহানি সম্পর্কে এবং

জ. অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে

এসব যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধের কারণে বাকস্বাধীনতার বেশ কয়েকটি সীমরেখা আছে। গাজী শামছুর রহমান এ ধরনের ৫টি সীমার[৪১৮] কথা বলেছেন। এই বইতে আরো একটি সীমা অন্তর্ভুক্ত করে মোট ছয়টি সীমারেখার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো হলো:

বাকস্বাধীনতার প্রথম সীমা: আদালত অবমাননা

আদালত বা বিচার সম্পর্কীয় উক্তিতে বিন্দুমাত্র অবমাননা প্রকাশ শাস্তির যোগ্য। আদালতে কোন মামলা চলাকালে সে মামলার ফলাফল সম্পর্কে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করা, বিচারকের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করে মুখে বা কলমে কোন উক্তি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বাকস্বাধীনতার দ্বিতীয় সীমা: কটুক্তি

কারো ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সম্পর্কে কটুক্তি করা যাবে না। প্রত্যেক মানুষের সুনামের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। বাংলাদেশের কোন সাংবাদিক সে অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারেন না।

[৪১৭] প্রাগুক্ত, গাজী শামছুর রহমান (১৯৮৪), পৃ ২২১-২২২।

[৪১৮] প্রাগুক্ত, গাজী শামছুর রহমান (১৯৮৪), পৃ ২২৫-২২৮।

গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে বিশ্বব্যাপী তথ্য অধিকারের বিষয়টি দানা বাধে। তখন থেকে এ ধারণা স্পষ্ট হতে থাকে যে, তথ্যই গণতন্ত্রের প্রাণ। অবাধ তথ্য প্রবাহ না থাকলে রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। এখন পর্যন্ত প্রায় ৭০টি দেশে এ ধরনের আইন প্রণীত হয়েছে এবং আরো ৫০টির মতো দেশে প্রণয়নের কাজ চলছে।[৪২১]

রোবায়েত ফেরদৌস বলেছেন, "'তথ্য' হলো তা যা মানুষের 'এনট্রোপি' বা 'অনিশ্চয়তা' দূর করে; তথ্য প্রাণ - আধুনিক রাষ্ট্রের; তথ্য অক্সিজেন - গণতন্ত্রের; তথ্যহীন থাকা মানে সন্দেহে থাকা; বসবাস অনিশ্চয়তায়; তথ্য শব্দের উৎস শব্দ 'তথা' - যার অর্থ 'যা তা-ই' বা 'যেমনটা তেমনই'; তথ্য শব্দের আরেক অর্থ তাই 'সত্য'; তথ্য তাই আলোও বটে - সরিয়ে দেয় দোলাচল, সন্দেহ আর দ্বিধাজাত অন্ধকার। তথ্যের আরেক নাম তাই জ্ঞান।"[৪২২]

জনগণের ক্ষমতায়ন, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে ২৯ মার্চ ২০০৯ জাতীয় সংসদে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' পাশ করা হয় এবং ১ জুলাই ২০০৯ থেকে আইনটি কার্যকর হয় এবং ওই তারিখেই প্রধান তথ্য কমিশনার ও দুই জন তথ্য কমিশনারের সমন্বয়ে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ গঠিত হয়। ৮টি অধ্যায় ও ৩৭টি ধারা সম্বলিত এই আইনের উদ্দেশ্য নিছক তথ্যপ্রাপ্তির জন্য তথ্যপ্রাপ্তি নয় বা কেবল তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা নয় বরং এর মৌল উদ্দেশ্য জনগণের পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার চর্চা করে সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি/বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার কাজের ক. স্বচ্ছতা আনয়ন খ. জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধি করা গ. দুর্নীতি হ্রাস করা ঘ. সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

তথ্য অধিকার

এ আইনানুযায়ী তথ্য অধিকার অর্থ– কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার যা ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ইমেইল/ফ্যাক্স/সিডি বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতিতে পাওয়া যেতে পারে। এ আইনের (ধারা ৪)-এ উল্লেখ আছে, "*এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।*"

তথ্য প্রদান ইউনিট

তথ্য অধিকার আইনের ২(ঘ) ধারায় বিধান রাখা হয়েছে যে প্রত্যেক সরকারি, আধা সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের দপ্তরে, আঞ্চলিক, বিভাগীয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য প্রদান ইউনিট গঠন করতে হবে।

---

[৪২১] শামীমা চৌধুরী (২০১০), তথ্য অধিকার আন্দোলন ও তথ্য অধিকার আইন, নিরীক্ষা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের গণমাধ্যম সাময়িকী, ১৮৬ তম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃ ১০।

[৪২২] রোবায়েত ফেরদৌস (২০১২), তথ্য অধিকার আইন : বাস্তবায়ন চালচিত্র ও চ্যালেঞ্জসমূহ, বাংলানিউজ২৪.কম, ১৪ মে, ২০১২।

দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারার বিধান মতে প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাহিদামতো তথ্য প্রদান করবেন।

আপিল কর্তৃপক্ষ

চাহিদামতো তথ্য পাওয়া না গেলে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করা যাবে। তথ্য অধিকার আইনের ২(অ) ধারায় তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধানকে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হবে।

তথ্যপ্রাপ্তির অনুরোধ

তথ্য অধিকার আইনের ৮ ধারার বিধান অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি এ তথ্যপ্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্যের চাহিদা লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিকস মাধ্যমে অনুরোধ করতে পারে।

তথ্য প্রদান পদ্ধতি

তথ্য অধিকার আইনের ৯ ধারায় তথ্য প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে। সাধারণভাবে তথ্য চাওয়ার ২০ কর্ম দিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে হবে। আবেদনকারীর আইনগত ভিত্তি (ধারা-৯) হচ্ছে তথ্য প্রদানের অনীহা, আইনের লংঘন এবং তথ্য প্রার্থী আইনি প্রতিকার নিতে পারে। এই বক্তব্য তুলে ধরে যে তথ্য জনগণের, সরকারের নয়। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। জনগণের রায়ে সরকার নির্বাচিত হয় এবং জনগণের প্রদত্ত করের টাকায় সরকার চলে। তাই জনগণের চাহিদাকৃত তথ্য দিতে সরকার বাধ্য।

তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

এই আইনের ১৩ অনুচ্ছেদে কোনো ব্যক্তি তার কাঙ্ক্ষিত তথ্য না পেলে তথ্য কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। তথ্য কমিশন ওই অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করতে পারবে। তথ্য কমিশনকে অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তির জন্য দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য প্রদানে প্রতিবন্ধকতার জন্য জরিমানা

কমিশনের কাছে যদি প্রতীয়মান হয় যে কোনো কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তখন তথ্য প্রদানের বিলম্বের জন্য প্রতিদিন ৫০ টাকা করে অনধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করতে পারবে। এই জরিমানার টাকা পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি অ্যাক্ট ১৯১৩-এর বিধান অনুযায়ী এই জরিমানার টাকা আদায়যোগ্য। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হলে শৃঙ্খলা ভঙের দায়ে অভিযুক্ত হতে পারেন।

তথ্য প্রদানে অনুসরণীয় ব্যতিক্রমসমূহ

কোন কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে না। যথা:

ক. কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি

হতে পারে এরূপ তথ্য;
খ. পররাষ্ট্রনীতি কোন বিষয় যার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;
গ. কোন বিদেশী সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;
ঘ. কোন তথ্য প্রকাশের ফেল কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;
ঙ. কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা:
অ. আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;
আ. মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;
ই. ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;
চ. কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এরূপ তথ্য;
ছ. কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হতে পারে এরূপ তথ্য;
জ. কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;
ঝ. কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;
ঞ. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;
ট. আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;
ঠ. তদন্তাধীন কোন বিষয় যার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য;
ড. কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এরূপ তথ্য;
ঢ. আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য;
ণ. কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এরূপ কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;
ত. কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;
থ. জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে এরূপ তথ্য;
দ. আইন দ্বারা সংরক্ষিত কোন ব্যক্তির গোপনীয় তথ্য;
ধ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;
ন. মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য।

তথ্য অধিকার আইন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

তথ্য অধিকার আইনের প্রতি আমাদের দেশের সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মীদের অনেক আগ্রহ থাকলেও এ আইন ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করতে তাদের দেখা যায় না। তারা পেশাগত কাজের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য চান। কিন্তু দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য যে কোন বিষয়ের পটভূমিমূলক, প্রাথমিক এমনকি গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংগ্রহ করতে তথ্য অধিকার আইন সাংবাদিকদের জন্য একটি বিরাট হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে বিদ্যমান কয়েকটি আইন দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন-১৯২৩, সাক্ষ্য আইন ও সরকারী চাকরি নীতিমালা এর অনেক ধারা তথ্য অধিকার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় সাংবাদিকরা তথ্য অধিকার আইনের সুবিধা নিতে অনীহা প্রকাশ করেন। তারা এখনও সূত্রের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করাকে অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত ও সহজ বলে মনে করেন। কিন্তু এসব সাংঘর্ষিক আইনের ধারাগুলো অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা তথ্য অধিকার আইনের আছে।

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন কোন ক্ষেত্রে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন সাংঘর্ষিক হয়ে যাচ্ছে। এর মূল কারণ এ সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনে দীক্ষিত এবং পরিচালিত। তথ্য কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রচলিত যে কোন সরকারি গোপনীয় আইনের বিধানাবলীকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা এই আইনে রয়েছে (ধারা-৩)।[৪২৩] তথ্য অধিকার আইনের ধারা-৩ এ বলা হয়েছে, "*প্রচলিত অন্য কোন আইনের - (ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ন হইবে না; এবং (খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।*"

তথ্য কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অবাধ তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন ও বিধিতে বিদ্যমান বাধাগুলো যাতে কোন অন্তরায় না হয় সে লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইনে ধারা ৩ এর বিধানটি রাখা হয়েছে। যেমন- অফিসিয়াল সিক্রেট্স অ্যাক্ট ১৯২৩-এর ৫ (১) অনুচ্ছেদটি সামরিক এবং কৌশলগত গোপনীয়তা রক্ষার নিমিত্তে তৈরি করা হয়েছে। তথ্য প্রদান না করার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাগণ এই অনুচ্ছেদটিই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন। ৫ (১) অনুচ্ছেদে আরও উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তাঁর অধীন বা নিয়ন্ত্রণে কোন গোপন বিষয় (তথ্য) থাকা অবস্থায় (ক) স্বেচ্ছায় বিনিময় করে, (খ) তথ্য ব্যবহার করে (গ) তথ্য বিক্রি করে (ঘ) যৌক্তিক যত্ন নিতে ব্যর্থ হয়- তাহলে ঐ ব্যক্তি উক্ত ধারা মোতাবেক অপরাধী বলে গণ্য হবে। তথ্য অধিকার আইনের ধারা-৩ এর মাধ্যমে এ বাধাগুলো দূর করা হয়েছে।[৪২৪]

একইভাবে সরকারি কর্মচারি আচরণ বিধি (The Goverment Servant Conduct Rules)-এর বিধি ১৯ এ আছে– '*A Government servant shall not, unless generally or especially empowered by the Government in this behalf, disclose directly or indirectly to Government servant belonging to other Ministaries, Division or Departments or*

৪২৩ তথ্য কমিশন (২০১১), বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১, তথ্য কমিশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১১।
৪২৪ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২।

to non-official persons or communicate any information which has come into his profession in the course of his official duties or has been prepared or collected by him in the course of those duties whether from official sources or otherwise.' তথ্য কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তথ্য অধিকার আইনের ধারা-৩ এ এই বাধাটিও দূরীভূত হয়েছে।

দেশে প্রচলিত আরো কয়েকটি আইন ও বিধিতে তথ্য দেয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিধিনিষেধ আছে। ১৪০ বছরের পুরনো এভিডেন্স এ্যাক্টের ১২৩, ১২৪ ও ১২৫ উপধারা মতে কোন সরকারি অঙ্গসংগঠনের বিভাগীয় প্রধানই শুধুমাত্র তথ্য প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখেন। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ ধারা ৯৯ অনুযায়ী তথ্য দেয়া যাবে না। রুলস অব বিজনেস (১৯৯৬) সংবাদকর্মীদের কাছে তথ্য প্রকাশে সরকারি কর্মকর্তাগণের ওপর সুনির্দিষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এর ২৮(১) ধারায় আছে, '*No Information acquired directly from official documents or relating to official matters shall be communicated by a Government servant to the press, to non-officials or even officials belonging to other Government offices, unless he has been generally or specially empowered to do so.*'। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনের আশ্রয় নিয়ে কোন তথ্য চেয়ে আবেদন করলে ৩ উপধারা অনুযায়ী উপরোল্লিখিত এ সকল নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না এবং এ সমস্ত সকল নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করা হবে। নাগরিকগণ তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে এভাবেই তথ্য অধিকার আইনের শক্তি দ্বারা ক্ষমতায়িত হবে এবং ঐ সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক বাঁধাসমূহ অপসারণ করতে সক্ষম হবে যা এখন পর্যন্ত সরকারি এবং বেসরকারি খাতকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

এ কারণে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা অনেক ক্ষেত্রেই ভাল তথ্য পেতে পারেন। একটি কার্যকর স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশ আইন দ্বারা সহায়তা পেয়ে থাকে। বিশেষ করে আমাদের দেশের সাংবাদিকরা তথ্য অধিকার আইনের চর্চা করলে তাদের অনেক সৎ সোর্স কিংবা 'হুইসেল ব্লোয়ার' কর্মী'দের নিরাপত্তা হিসেবে কাজ করবে এই আইনটি। সৎ কর্মকর্তারা চাকরির শর্ত অথবা গোপনীয়তার নীতিমালা দ্বারা বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। আইনি সুরক্ষা অথবা স্পষ্ট নির্দেশনা ছাড়া অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে গিয়ে এসব কর্মকর্তা প্রায়ই তথ্য প্রকাশ করতে হয় আইনগতভাবে অপারগ হন, নয়তো ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন।[৪২৫] দক্ষিণ আফ্রিকা তথ্য প্রাপ্তি আইনের পাশাপাশি 'হুইসেল ব্লোয়ার' আইনও প্রণয়ন করেছে।[৪২৬] যুক্তরাজ্য তথ্য প্রাপ্তির আগেই এই আইন প্রণয়ন করে, যখন কতগুলো তদন্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে তথ্য প্রকাশের সুযোগ থাকলে অনেক সংস্থায় প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নেয়ার মাধ্যমে বিপর্যয় এড়ানো যেত।[৪২৭]

৩. জননিরাপত্তা

দণ্ডবিধির অষ্টম পরিচ্ছেদে জনসাধারণের শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের বিবরণ ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে। জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কাজে নিয়োজিতদের এবং এই ধরনের কাজে

[৪২৫] চারমেইন রডরিগজ (২০১১), তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন প্রায়োগিক নির্দেশিকা, টিআইবি-সিএইচআরআই ২০১১, পৃ ১৫।

[৪২৬] তথ্য উন্মোচনকারী নিরাপত্তা আইন ২০০০ (দক্ষিণ আফ্রিকা)।

[৪২৭] জনস্বার্থ উন্মোচন আইন ১৯৯৮ (যুক্তরাজ্য)।

প্ররোচণাদানকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে দণ্ডবিধির ১৪১ থেকে ১৬০ এবং ৫০৫ নং ধারা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৮ ও ১৪৪ নং ধারায় বিস্তারিত বলা হয়েছে। দণ্ডবিধির ১৫৩ অনুচ্ছেদের ৩টি উপধারায় দাঙ্গা অনুষ্ঠানের জন্য প্ররোচণা দান, শ্রেণী সমূহের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপে প্ররোচণা দানের জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। গাজী শামছুর রহমান বলেছেন, "*শ্রেণী যুদ্ধে উত্তেজিত করার স্বাধীনতা কারো নেই। শ্রেণী বৈরিতা এবং শ্রেণী বিদ্বেষ শুধু ঐক্যকেই ধ্বংস করে না, সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশৃংখলা ও উত্তেজনা সৃষ্টিতেও ইন্ধন যোগায়।*"[৪২৮]

৪. রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা

দণ্ডবিধির ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রাষ্ট্রবিরোধী অপবাদ সম্পর্কিত বিধানবলী বিদ্যমান। এই পরিচ্ছেদের ১২৩ (ক) ও ১২৪ (ক) ধারা সংবাদিকতার সাথে সম্পৃক্ত। রাষ্ট্রদ্রোহ বলতে বোঝানো হয়েছে, "কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর মাধ্যমে অথবা সংকেত সমূহের মাধ্যমে বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির মাধ্যমে, অথবা প্রকারান্তরে আইনবলে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বা করার উদ্যোগ"। তাছাড়া দণ্ডবিধির ৫০৫ ও ৫০৫ (ক) ধারা (১৯৯১ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে যুক্ত) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

৫. মানহানি

মানহানির প্রসঙ্গটি সাংবাদিকদের কাজের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের সাংবিধানিক রক্ষাকবচের আওতায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকলেও কোনো সংবাদ মাধ্যমই উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিংবা অবহেলা বা আকস্মিক কারণে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মিথ্যা, বিদ্বেষপূর্ণ অথবা অবমাননাকর কোন কিছু প্রকাশ বা প্রচার করতে পারে না। দণ্ডবিধির একবিংশ পরিচ্ছেদে মানহানি সম্পর্কিত আইনগুলো উল্লেখ আছে। ৪৯৯ ধারায় মানহানির সংজ্ঞা, ৫০০ ধারায় মানহানির শাস্তি, ৫০১ ধারায় মানহানিকর বস্তুর মুদ্রণের শাস্তির বিধান এবং ৫০২ ধারায় মানহানিকর মুদ্রিত বস্তু বিক্রয়ের অপরাধের শাস্তির উল্লেখ আছে। দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় মানহানির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে, "যে ব্যক্তি কারণ থাকা সত্ত্বেও কথিত বা পাঠের জন্য অভিপ্রেত শব্দাবলী বা চিহ্নাদি সাদৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কিত কোনো নিন্দাবাদ প্রণয়ন বা প্রকাশ করে যে অনুরূপ নিন্দাবাদ অনুরূপ ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করিবে, সেই ব্যক্তি অতঃপর ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত উক্ত ব্যক্তির মানহানি বলে গণ্য হইবে।"

সুনাম আইনের চোখে একটি সম্পত্তি। নিন্দাবাদ দ্বারা সুনাম নষ্ট করা বা ক্ষুণ্ন করাকে মানহানি বলে। নৈতিক গুণ, বর্ণ, পেশা, খ্যাতি ও দেহের নিন্দাবাদ আইনের চোখে মানহানিকর। শুধু মানুষেরই যে মানহানি হয় তা নয়, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানেরও মানহানি হতে পারে। গাজী শামছুর রহমান বলেছেন, "*মানহানির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাংবাদিক হলেও তার ক্ষেত্রে মানহানিজনিত কোন ব্যাপারে আইন প্রয়োগের তারতম্য হয় না। কারণ সাংবাদিকগণ আইনের*

[৪২৮] প্রাগুক্ত, গাজী শামছুর রহমান, ১৯৮৪, পৃ ৮৭।

চোখে কোন বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী নয় বা অন্যান্য ব্যক্তির তুলনায় অধিকতর নিরাপত্তার অধিকারী নয় বরং তার দায়িত্ব অনেক বেশী এবং তাই নিন্দামূলক কোন খবর বা মন্তব্য প্রকাশের সময় তার অধিক সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। মানহানিকর মন্তব্য প্রকাশের পূর্বে তার যৌক্তিকতা বিচার করতে হয়। যদি কোন সাংবাদিক এ ব্যাপারে সতর্ক না হয়ে গল্প-গুজবের ওপর নির্ভর করে মানহানিকর সংবাদ প্রকাশ করেন, তা হলে তিনি কোনক্রমেই ভুল তথ্য পরিবেশনের পরিণতি থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না।"[৪২৯]

মানহানির ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ঢাল সম্পর্কে গাজী শামছুর রহমান বলেছেন, "*সত্যকথা সব সময় বলা বা লেখা যায় না। যে ঘটনা সত্য তা যদি নিন্দামূলক হয় তবে সে ঘটনা শুধু জনকল্যাণের কারণে প্রকাশ করা যায়। জনকল্যাণের প্রশ্ন না থাকলে সে ঘটনা প্রকাশ করা যায় না। জনকল্যাণের উদ্দেশ্য ছাড়া যিনি অন্যের নিন্দাবাদ প্রকাশ করেন তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী।*"[৪৩০]

৬. অশ্লীলতা

বাংলাদেশের আইনে অশ্লীল প্রকাশনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে অশ্লীলতার ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। অশ্লীলতার সংজ্ঞা দণ্ডবিধিতে দেয়া হয়নি। ইংল্যান্ডের আইন থেকে অশ্লীল শব্দটি আমাদের আইনে এসেছে। ইংল্যান্ডের আইনানুযায়ী, মানুষের মনকে বিকৃত ও দূষিত করে তাই অশ্লীলতা। সাধারণভাবে বলা হয়, যে ধরনের বক্তব্য বা প্রকাশনা জনসাধারণের নৈতিকতার জন্য ক্ষতিকারক এবং যা কোনো ব্যক্তির নৈতিক বিচ্যুতি ঘটাতে পারে বা তার নৈতিক স্খলনের কারণ হতে পারে তেমন প্রকাশনাকে আইনত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৩২ সালে একটি রায়ে ইংল্যান্ডের উচ্চ আদালত বলেন, "*জনকল্যাণের জন্য যা লেখা হয় তা অশ্লীল নয়। জনকল্যাণের সীমাকে লংঘন না করে ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে রচনা নিবেদিত তা যতই অশোভন হোন না কেন তা অশ্লীল নয়।*"[৪৩১] আমাদের দণ্ডবিধির ২৯২ ও ২৯৩ ধারায় অশ্লীল প্রকাশনাকে নিষিদ্ধ করার বিধান রাখা হয়েছে এবং এজন্য শাস্তির প্রকৃতি ও মেয়াদ তুলে ধরা হয়েছে।

৭. ধর্মীয় বিশ্বাস

দণ্ডবিধির ২৯৫ (ক) ধারায় বলা হয়েছে, ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মীয় বিশ্বাসজাত অনুভূতিকে আঘাত করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধারায় বলা হয়েছে, "*যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিকদের যে কোন শ্রেণীর ধর্মীয় অনুভূতিতে কঠোর আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষাত্মকভাবে কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর সাহায্যে উক্ত শ্রেণীর ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করে বা অবমাননা করার উদ্যোগ করে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।*"

৮. আদালত অবমাননা

আদালতের আদেশ, নির্দেশ এবং আদালতের মর্যাদা সম্পর্কে অবমাননা করাকে আদালত অবমাননা বলা হয়। আদালত বা বিচারককে কটুক্তি বা মর্যাদাহানিকর উক্তি বা লিখিত বক্তব্য

[৪২৯] প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭।

[৪৩০] প্রাগুক্ত, পৃ ২৬।

[৪৩১] প্রাগুক্ত, পৃ ৭১।

উত্থাপন করার মধ্য দিয়েই আদালত অবমাননা করা হয়। আদালত চলাকালে বা আদালতের বাইরেও আদালত অবমাননার অপরাধ হতে পারে। আদালত অবমাননা বলতে দেওয়ানি অবমাননা এবং ফৌজদারি অবমাননা উভয়টিকেই বোঝানো হতে পারে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮০ নং ধারা ছাড়া বাংলাদেশে আদালত অবমাননার বিচার হতো ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইন অনুসারে। ২০১৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি এই আইনটি সংশোধন করে আদালত অবমাননা বিল-২০১৩ জাতীয় সংসদে পাস হয়।[৪৩২] এ বিলে বলা হয়েছে, কারো বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ উত্থাপিত হলে তাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হবে। জবাবে আদালত সন্তুষ্ট না হলে আইনজীবীর মাধ্যমে বক্তব্য দেয়ার সুযোগ দিতে হবে। বিলটিতে আরো বলা হয়েছে, পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ আদালত অবমাননা হবে না। অধস্তন আদালতের সভাপতিত্বকারী বিচারক সম্পর্কে অন্য কোন অধস্তন আদালত কিংবা সুপ্রিম কোর্টের কাছে কোনো বিবৃতি বা মন্তব্য আদালত অবমাননা হবে না। এমনকি বিচারকের খাস কামরায় বা রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য প্রকাশে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা না থাকলে সেটিও আদালত অবমাননা হবে না। বিলের ১২ নম্বর দফায় বলা হয়েছে, আদালত অবমাননার অভিযোগের বিচার এবং শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকবে। ১৯২৬ সালের আইনটিতেও আদালত অবমাননাকারীর শাস্তি দেয়ার এখতিয়ার ছিল হাইকোর্ট বিভাগের। ২০১৩ সালে পাসকৃত বিলের ১৩ নম্বর দফায় বলা হয়েছে। আদালত অবমাননার অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি অনূর্ধ্ব ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা দুই হাজার টাকার অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবেন। তবে আদালত অবমাননা সম্পর্কিত চলমান কার্যধারায় যে কোন পর্যায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতের নিকট নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করলে আদালত সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা করতে পারবেন। তবে জনস্বার্থে বিচার কার্যের নিরপেক্ষ ও যুক্তিসঙ্গত আলোচনা আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়ে না।

তথ্যসূত্র

Andrew Belsey & Ruth Chadwick (2006), Ethical Issues in Journalism and The Media, Routledge, New York.

David Archard (1998), 'Privacy, the public interest and a prurient public,' in M. Kieran (ed.) Media Ethics, London: Routledge.

Derek Forbes (2005), A watchdog’s guide to investigative reporting: A simple introduction to principles and practice in investigative reporting, Konrad Adenauer Stiftung Media Programme, Johannesburg, Republic of South Africa.

D. Mindich (1998), Just the facts: How “objectivity” came to defi ne American journalism, New York: New York University Press.

Doug Newsom & James Wollert (1985), Media Writing: News for the Mass Media, Wardsworth Publishing Company Belmont, California.

Gerry Keir, Maxwell McCombs & Donald L. Shaw (1986), Advanced Reporting: Beyond News Events, Longman, New York,

Guidelines: The Guardian's Editorial Code, The Guardian, February, 2003.

Gwen Ansell (ed.), Investigative Journalism Manuals,
http://www.investigative-journalism-africa.info/.

[৪৩২] দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

Jennings Bryant, Jay Black and Susan Thompson (1998), Introduction to Mass Communication, 5th edition, McGraw Hill Companies Inc.
John Hulteng (1985), The Messenger's Motives: Ethical Problems of the News Media, Engle-wood Cliffs, N. J: Prentcie-Hall.
Leonard M. Kantumoya (2004) Investigative Reporting in Zambia: A Practitioner's Handbook, Transparency International Zambia.
Lewis Jordan (ed.) (1976), The New York Times Manual of Style amd Usage, New York: Times Books.
Manual for Arab Journalists on Freedom of Information and Investigative Journalism (2007), Article 19, London, October 2007, www.article19.org.
Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan & Pia Thordsen (2009), Story-Based Inquiry: A manual for investigative journalists.
Newsweek, 4 May, 1981.
Paul Pratte (1995), Gods within the machine: A history of the American Society of Newspaper Editors: 1923–1993, Westport: CT: Praeger.
Robert A. Webb (ed.) (1978), The Washington Post Deskbook on Style, New York: McGraw-Hill.
Shirley Biagi (1994), Media Impact: An Introduction to Mass Media, Wardsworth, Inc, USA, Updated 2nd edition.
Stephen Klaidman and Tom L.Beauchamp (1987), The Virtuous Journalist, New York, Oxford University Press.
Washington Post, 19 April, 1981.
আলী রিয়াজ (১৯৯৪), অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হ্যান্ডবুক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি), ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৪।
এম. আমীর-উল-ইসলাম (২০০০), জানার অধিকার মুক্তির অধিকার, নিরীক্ষা: প্রেস ইনস্টিটিউটের গণমাধ্যম সাময়িকী, ৯৬ তম সংখ্যা, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০০।
এস এম শামীম রেজা ও মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী (২০১০), জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা: একটি কালানুক্রমিক সমীক্ষা ও উদ্যোগের মূল্যায়ন, সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা, [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-ডি], খন্ড ৪, সংখ্যা ৪, পৌষ ১৪১৬।
গাজী শামছুর রহমান (১৯৮৪), সংবাদ বিষয়ক আইন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৮৪।
চারমেইন রডরিগজ (২০১১), তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন প্রায়োগিক নির্দেশিকা, টিআইবি-সিএইচআরআই ২০১১।
জনস্বার্থ উন্মোচন আইন ১৯৯৮ (যুক্তরাজ্য)।
তথ্য উন্মোচনকারী নিরাপত্তা আইন ২০০০ (দক্ষিণ আফ্রিকা)।
তথ্য কমিশন (২০১১), বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১, তথ্য কমিশন, ঢাকা।
তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন ও বিধি বিধানের সংকলন, মে, ২০০৮; Ges http://bdlaws.minlaw.gov.bd.
দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।
নাঈমুল ইসলাম খান ও খ. আলী আর রাজী (১৯৯৬), অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেডি), ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৬।
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত) (১৯৯৯), সাংবাদিকতা, প্রথম খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯।
রোবায়েত ফেরদৌস ও ভবেশ দাশ (সম্পাদিত) (২০০৭), তথ্যের অধিকার, চারদিক, ঢাকা।
রোবায়েত ফেরদৌস (২০১২), তথ্য অধিকার আইন : বাস্তবায়ন চালচিত্র ও চ্যালেঞ্জসমূহ, বাংলানিউজ২৪.কম, ১৪ মে, ২০১২।
শামীমা চৌধুরী (২০১০), তথ্য অধিকার আন্দোলন ও তথ্য অধিকার আইন, নিরীক্ষা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের গণমাধ্যম সাময়িকী, ১৮৬ তম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০।

লেখক পরিচিতি

রোবায়েত ফেরদৌস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও স্বর্ণপদক জয়ী; ছাত্রজীবনে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়ে গোল্ডমেডেলিস্ট; সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু; ১৯৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন; এখন সহযোগী অধ্যাপক; বিভিন্ন জার্নালে বিশটিরও বেশি গবেষণা নিবন্ধ বেরিয়েছে; রচিত-সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা দশ: জেন্ডার যোগাযোগ, গণমাধ্যম ও আদিবাসী, গণমাধ্যম/শ্রেণিমাধ্যম, পাঠ্যপুস্তকে জেন্ডার সংবেদনশীলতার স্বরূপ বিশ্লেষণ, তথ্যের অধিকার, দুর্নীতি-সুশাসন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, তসলিমার ‘ক’: পাণ্ডুলিপি পোড়ে না, বাংলাদেশের সংবাদপত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা, আদিবাসী ভাবনা: জয় নয় সমর্পন ও বিশেষ জনের বিশেষ সাক্ষাৎকার অন্যতম। আদিবাসী ও সংখ্যালঘু অধিকার, নারী অধিকার, গণমাধ্যমের গতিধর্ম, শিক্ষা ও রাজনীতি বিষয়ে খবরের কাগজে নিয়মিত লেখালেখি করেন। অ্যাকাডেমিক ও ব্যক্তিগত কাজে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার ২৫টিরও বেশি দেশে ভ্রমণ করেছেন; টেলিভিশন অ্যাংকর এবং মানবাধিকার আন্দোলনের অন্যতম অ্যাকটিভিস্ট।

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ; বর্তমানে একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক; ২০০৯ সালে শিক্ষকতায় যোগদানের আগে একযুগেরও বেশি সময় মুদ্রণ ও সম্প্রচার মাধ্যমে সাংবাদিকতা করেছেন। ১৯৯৭ সালে দৈনিক রূপালী'র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি হিসেবে সাংবাদিকতার শুরু; দৈনিক প্রাইম, দৈনিক প্রথম আলো'তে স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক যায়যায়দিন ও চ্যানেল ওয়ানে সিনিয়র রিপোর্টার, দেশ টিভি ও কালের কণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। দৈনিক আমাদের সময়, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন ও এটিএন টাইমসের সংবাদ পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। পাশাপাশি ইউনিসেফ, আইএলও এবং এডিবি'র পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ ও সিরিজ বোমা হামলা নিয়ে জনাব চৌধুরীই প্রথম অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করেন, যার জন্য পেয়েছেন কয়েকটি পুরস্কার এবং জঙ্গিদের কাছ থেকে মৃত্যু হুমকি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য ২০০৭ সালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি থেকে অনুসন্ধানী টিভি সাংবাদিকতার পুরষ্কার পান। বিভিন্ন জার্নালে বেরিয়েছে বেশ কয়েকটি গবেষণা নিবন্ধ; গণমাধ্যম ও রাজনীতি নিয়ে খবরের কাগজে নিয়মিত লেখালেখি করেন। স্ত্রী টেলিভিশন সাংবাদিক কাজী রুনা এবং একমাত্র সন্তান রাজ্যই তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু।

সাইফুল হকের জন্ম চট্টগ্রামে, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৮২ সালে। বাবা ফারুক আহমেদ ও মা জিন্নাতুন নিছা চৌধুরীর চার সন্তানের মধ্যে তৃতীয় সাইফুল হক অসামান্য কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ২০০০ সালে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে। উক্ত বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী অর্জনের পর যুক্ত হন টেলিভিশন সাংবাদিকতায়। কিছুকাল সাংবাদিকতার পাশাপাশি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর ২০০৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি উক্ত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। নিয়মিত গবেষণা প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি তিনি সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষক হিসেবে সারাদেশে বিভিন্ন কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন। পেশাগত কাজের সূত্রে ভ্রমন করেছেন যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, জার্মানি, চেক প্রজাতন্ত্র, নেপাল ও ভারত। সাংবাদিকতার অগণিত শিক্ষার্থীর পাশাপাশি ব্যক্তিজীবনে স্ত্রী সাওরিন বিনতে সালাম ও কন্যা আলীযাহ্ শেরনাজ হককে নিয়ে তাঁর সংসার। গবেষণার প্রিয় প্রসঙ্গঃ অনলাইন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা।

978-984-33-8377-8